প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গো যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাংলা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : EBG : 03 : পর্যায় : 10, 11, 12 & 13

	রচনা	সম্পাদনা
একক 41-42	ড. সুকুমার দেব	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক 43-45	ড. সুকুমার দেব	অধ্যাপক উজ্জ্বলকান্তি মজুমদার
একক 46-51	অধ্যাপক দিলীপ কুমার নন্দী	অধ্যাপক পবিত্র সরকার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG-03

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
10

একক **41**	❑	চর্যাগীতি—নির্দিষ্ট পাঁচটি গীতি	9-42
একক **42**	❑	বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধা-বিরহ অংশ	43-130

পর্যায়
11

একক **43**	❑	বৈষ্ণবপদ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস	131-151
একক **44**	❑	রামায়ণ — অরণ্যকাণ্ড — কৃত্তিবাস ওঝা	152-214
একক **45**	❑	চৈতন্য ভাগবত ঃ বৃন্দাবনদাস ঃ আদিখণ্ড — দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়	215-268

পর্যায় 12

একক 46	❑ কাব্য পাঠের ভূমিকা	271-282
একক 47	❑ আধুনিক বাংলা কাব্য	283-290
একক 48	❑ মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ	291-332

পর্যায় 13

একক 49	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পাঁচটি কবিতা	333-375
একক 50	❑ কাজী নজরুল ইসলাম : তিনটি কবিতা	376-405
একক 51	❑ জীবনানন্দ দাশ : তিনটি কবিতা	406-432

একক ৪১ ❑ চর্যাগীতি—নির্দিষ্ট পাঁচটি গীতি

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য
৪১.২ প্রস্তাবনা
৪১.৩ মূলপাঠ
৪১.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠ্যান্তর প্রসঙ্গ)
৪১.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি
৪১.৪ বাচ্যার্থ
৪১.৫ গূঢ়ার্থ
৪১.৬ সমাজচিত্র
৪১.৭ আধ্যাত্মভাবনা
৪১.৮ কাব্যমূল্য
৪১.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
৪১.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দাবি
৪১.১১ বিশিষ্টতা, উপসংহার
৪১.১২ অনুশীলনী
৪১.১৩ উত্তরমালা
৪১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের ফলে শুধু বাংলা ভাষা নয়—সমগ্র পূর্বাঞ্চলের নব্য ভারতীয় ভাষার প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে'র ৫ জন পদকর্তার পদ আলোচনাসূত্রে আদিযুগের ধর্মপ্রধান এই পদগুলিতে প্রকাশিত বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্বকথা, তৎকালীন সমাজ জীবন, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদির পরিচয় জানা যাবে।

- রূপকের মোড়কে বৌদ্ধ-সাধনতত্ত্বের জটিলতার মধ্যেও সিদ্ধাচার্যগণ কাব্য সৌন্দর্যের যে দ্যুতি ছড়িয়েছেন—সে সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছনো যাবে।
- বিভিন্ন চর্যাপদ পাঠে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে।
- লোকজীবনের নানা ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কার ইত্যাদির স্পষ্ট চিত্রও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।
- চর্যাপদ মূলত ধর্মতত্ত্ব ও সাধনা-বিষয়ক রচনা হলেও এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে।

- ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামে যে গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন—তা থেকেই এই এককে বিশিষ্ট কবিদের পদগুলি তুলে ধরে আলোচনা করা হলো যাতে পৃথক পৃথক পদকর্তার চিন্তা-চেতনার নানা দিক এবং এঁদের কবি-কৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সহজ হয়।

- নেপাল রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত মুনি দত্তের টীকা সহ ৫০টি পদ পাওয়া গেলেও চর্যাপদের মূল পুঁথিতে ২৪টি বিভিন্ন ভণিতায় লিখিত ৪৬১/২টি পদ পাওয়া যায়। ৫০টি চর্যায় ২৪জন সিদ্ধাচার্য কবির নাম আমরা পাই। তাঁরা হলেন—(১) লুই, (২) কুক্কুরী পা, (৩) বিরুআ, (৪) গুণ্ডুরী, (৫) চাটিল, (৬) ভুসুকু, (৭) কাহ্ন, (৮) কামলি, (৯) ডোম্বী, (১০) শান্তি, (১১) মহিত্তা, (১২) বীণা, (১৩) সরহ, (১৪) শবর, (১৫) আজদেব, (১৬) ঢেন্ডনপা, (১৭) দারিক, (১৮) ভাদে, (১৯) তাড়ক, (২০) কঙ্কন, (২১) জঅনন্দি ; (২২) ধাম, (২৩) তন্ত্রীপাদ এবং (২৪) লাড়ী ডোম্বী। তবে ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে পদগুলির ভণিতা অনুসারে পদকর্তাকে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে কেউ কেউ গুরুর ভণিতা দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা' শব্দটি যোগের মধ্যে। আবার কিছু কিছু পদ ছদ্মনামে লিখিত বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন।

  এই এককে লুই পাদ, শবর পাদ, টেণ্টন পাদ, ভুসুকু পাদ ও চাটিল পাদের একটি করে পদ আছে। প্রতিটি পদের পাঠান্তর ও ভাবানুবাদের সঙ্গে টীকাসহ নানাদিক থেকে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। পদগুলি এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা পাঠ করলে চর্যাপদ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে।

- 'সন্ধ্যাভাষা' অর্থাৎ আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত এই পদগুলি প্রথম পাঠকালে খটমট লাগলেও দু'তিনবার পাঠ করে টীকা অংশের সহজ অর্থ জানার পর পদগুলি আর কঠিন বলে মনে হবে না। 'বাঙলা সাহিত্যে'র প্রথম পর্যায়ের চর্যাপদ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান এই এককের পদগুলি পাঠ করার পর আরো সমৃদ্ধ হবে।

৪১.২ প্রস্তাবনা

পাঁচটি চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গুহ্য সাধন-সংকেত রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান ধর্মমত বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানের পরের স্তরই হলো সহজযান। মন্ত্র-তন্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া-সাধনার ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, আনন্দ-বেদনার তালে তালে বহমান বাস্তব জীবনের জরা-মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পথেরই পথিক। তবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁরা নির্বাণ লাভের গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের কথাই বলেছেন। বিভিন্ন পদে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে কোনো কোনো চর্যা গীতিতে তত্ত্ব উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপনীয় আছে বাহ্য অর্থের আবরণে। এই এককের চারটি চর্যাপদ তুলে ধরে প্রতিটি পদের সার্বিক আলোচনা করা হ'ল।

৪১.৩ মূল পাঠ

১

[পুথিপৃষ্ঠা ৩। খ]

।। রাগ পটমঞ্জরী—লুইপাদানাম্।।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো[১] কাল।। ধ্রু।।
দিঢ়[২] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।।
[৩]লুই ভণই[৩] গুরু পুচ্ছিঅ জাণ। ধ্রু।।
সঅল [৪] স [মা] হিঅ[৪] কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই[৫] ।। ধ্রু।।
এড়িএউ[৬] ছান্দক বান্ধ[৭] করণক পাটের[৭] আস।
সুন্ন[৮] পাখ[৯] ভিড়ি[৯] লাহু রে পাস।। ধ্রু।।
ভণই লুই আম্হে ঝাণে[১০] দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি[১১] পিণ্ডি[১১] [১২]বইটা[১২]।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১. পইঠা (বাগচী, শহী)
২. দিট (শাস্ত্রী, সেন)
৩-৩. ভণই লুই (টী)
৪-৪. সমাহি (টী)
৫. মরিঅই (বাগচী)
৬. এড়িঅউ (বাগচী)
৭-৭. করণ কপটের (বাগচী)
৮. সুনু (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
৯-৯. ভিতি (শাস্ত্রী, সেন)
১০. সাণে (পুথি, সেন)
১০-১১. পাণ্ডি (পুথি)
১২-১২. বইণ (পুথি)

৫

[পুথিপৃষ্ঠা ৯। ক-খ]

।। রাগ গুর্জরী-চাটিল্লপাদানাম্।।

ভবণই গহণ[১] গম্ভীর[১] বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাই।। ধ্রু।।
ধামার্থে[২] চাটিল[২] সাঙ্কম [৩]গঢ়ই[৩]।
পারগামিলোঅ নিভর তরই।। ধ্রু।।
[৪]ফাড্ডিঅ[৪] মোহতরু[৫] পাটি[৫] জোড়িঅ।
আদহ[৬] দিঢ়[৬] টাঙ্গী নিবাণে[৭] কোহিঅ[৭]।। ধ্রু।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।। ধ্রু।।
জই তুম্হেলোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১. পুথিতে গম্ভীর—এরপর একটি কাটা আ-কার চিহ্ন আছে। তদনুসারে ‘গম্ভীরা’ (সেন)।

২-২. পুথিতে চাটিব লিখে তার ‘ব’ কেটে মাথায় ‘ল’ লেখা আছে।

৩-৩. গটই (শাস্ত্রী)। ৪-৪. ফাড়িঅ (টীকা) ৫-৫. পাটি (পুথি, শাস্ত্রী, সেন)

৬-৬. দিটি (শাস্ত্রী), দিঢ়ি সেন, শহী)

৭-৭. কোড়িঅ (সেন, শহী, বাগচী)

৬

[পুথিপৃষ্ঠা ১১। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্।।

[১]কাহেরে[১] ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
[২]বেঢ়িল[২] [৩]হাক[৩] পড়অ চৌদীস।। ধ্রু।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ [৪]ভুসুকু[৪] অহেরী।। ধ্রু।।
তিণ ন [৫]চ্ছুপই[৫] হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।। ধ্রু।।
হরিণা [৬]বোলঅ হরিণা সূণ হরিআ[৬] তো।।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।। ধ্রু।।
[৭]তরসঁন্তে[৭] হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুক ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ [৮]পইসঈ[৮]।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১. কাহৈরি (পুথি, শাস্ত্রী),

২-২. বেটিল (শাস্ত্রী, সেন)

৩-৩. ডাক (সেন),

৪-৪. ভুকু (পুথি), ভুকুঅ (শাস্ত্রী)

৫-৫. ছুবই (শহী), খণ্ডই (টীকা)

৬-৬. বোলঅ সুণ হরিণা (বাগচী), বোলই হরিণা সুণ (শহী)

৭-৭. তরঙ্গান্তে (শাস্ত্রী), তরঙ্গাতে (শহী), তরঙ্গাতে (টীকা)

৮-৮. পুথিতে ‘পয়ইসই’ লিখে য় বর্ণটি বর্জনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

২৮

[পুথিপৃষ্ঠা ৪১। খ-৪২। ক]

।। রাগ[১] বলাড্ডি[১]—শবরপাদানাম্।।

[২]উঞ্চা উঞ্চা[২] পাবত[৩] তঁহি[৩] বসই সবরী বালী।
[৪]মোরঙ্গি[৪] পীচ্ছ[৫] পরহিণ[৫] সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধ্রু।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী [৬]গুহাড়া[৬] [৭]তোহৌরী[৭]।

নিঅ[৮] ঘরিণী[৮] ণামে সহজ সুন্দারী।। ধ্রু।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
এঁকেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।। ধ্রু।।
তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো[৯] মহাসুহে[৯] সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ[১০] ণইরামণি[১০] দারী পেহ্মা রাতি পোহাইলী।। ধ্রু।।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন[১১] নিরামণি[১১] কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি[১২] পোহাই[১২] ।। ধ্রু।।
গুরুবাক[১৩] পুঞ্চআ[১৩] বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ।
একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।। ধ্রু।।
উমত সবরো গরুআ [১৪]রোষে[১৪]।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১ বরাটি (তিব্বতী)
২-২ উঁচা উঁচা (শাস্ত্রী, বাগচী), উচা (টীকা)
৩-৩ তহি (বাগচী) তহিঁ (শহী)
৪-৪ সোরাঙ্গ (শহী)
৫-৫ পরিহাণ (শহী)
৬-৬ গুহারী (শহী)
৭-৭ তোহোরি (বাগচী), শহী-তে পদটি পরের পঙ্‌ক্তির গোড়ায় আছে। পুথিতে এই পদের পর যতিচিহ্ন নেই।
৮-৮ ঘরণী (সেন)
৯-৯ মহাসুখে (বাগচী)
১০-১০ নৈরামণী (বাগচী)
১১-১১ পুথিতে 'রি'-র উপরে 'নি'-র Over-writing আছে। নৈরামণি (বাগচী, শহী)।
১২-১২ পোহাম (পুথি) ১৩-১৩ পুচ্ছিআ (বাগচী), ধনুআ (শহী)।
১৪-১৪ পুথিতে 'সরোষে' লিখে, 'স' কাটা হয়েছে। গরু আস রোষে (সেন)। রোসেঁ (শহী)।।

৩৩

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৮। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—[১]টেণ্টণ[১] পাদানাম্।।

টালত মোর ঘর নাঁহি [২]পড়বেষী[২]।
[৩]হাড়ীত[৩] ভাত [৪]নাঁহি[৪] নিতি আবেশী।। ধ্রু।।
[৫]বেঙ্গসঁ সাপ[৫] [৬]বডহিল জাঅ[৬]।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে [৭]যামাঅ[৭]।। ধ্রু।।
[৮]বলদ[৮] বিআএল গবিআ [৯]বাঝেঁ[৯]।
পিটা দুহিএ এ তিনা [১০]সাঁঝে[১০]।। ধ্রু।।
জো সো [১১]বুধী[১১] [১২]সৌ নিবুধী[১২]।
জো যো [১৩]চৌর[১৩] [১৪]সৌ দুষাধী[১৪]।। ধ্রু।।
[১৫]নিতে নিতে[১৫] ষিআলা ষিহে যম জুঝতা।
টেণ্টণ পাএর গীত [১৬]বিরলে[১৬] বুঝঅ।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১	ঢেন্ঢণ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)	২-২	পড়বেশী (বাগচী) পড়বেসী (শহী)
৩-৩	হুণ্ডী (টীকা)	৪-৪	নাহি (বাগচী, শহী)
৫-৫	বেঙ্গ সংসার (শাস্ত্রী) বেগ সংসার (সেন) বেঙ্গাস সাপ (বাগচী)		
৬-৬	চঢ়িল জাই (শহী)	৭-৭	সামাই (শহী)
৮-৮	বলদা (টীকা)	৯-৯	বাঁঝে (বাগচী, শহী)
১০-১০	সাঁঝ্যে (পুথি)	১১-১১	বুদ্ধি (টীকা)
১২-১২	সোহি নিবুধী (শহী)	১৩-১৩	চোর (বাগচী, শহী)
১৪-১৪	সোই সাধী (বাগচী) সোহি সাধী (শহী)		
১৫-১৫	নিতি নিতি (টীকা, বাগচী, শহী)	১৬-১৬	বিচিরলেঁ (পুথি)

৪১.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠান্তর প্রসঙ্গ)

(১) লুই পাদের প্রথম সংখ্যক পদ—
লুই পাদের ‘কা আ তরুবর পঞ্চ বিডাল’ গীতটির রাগ পটমঞ্জরী। ১০টি চরণে বিধৃত পদটিতে রূপকের মোড়কে সহজিয়া সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এই গানটিকে টীকাকার মুনি দত্ত ‘মহারাগনয়চর্চা’ অর্থাৎ মহাঅনুরাগের পদ্ধতির রূপ বলে চিহ্নিত করেছেন।

(২) চাটিল বা চাটিল্লপাদের ৫ সংখ্যক পদ।
চাটিল্ল পাদের এই পদটির রাগ ‘গুর্জরী’ এই গানে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বর সঙ্গো বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। এই গানে অস্তিত্ব-প্রবাহকে নদী প্রবাহের রূপকের মধ্য দিয়ে পদকর্তা প্রকাশ করেছেন।

(৩) ভুসুকু পাদের ৬ সংখ্যক পদ।
ভুসুকুপাদের এই পদটির রাগ ‘পটমঞ্জরী’। শিকারের রূপকে পদটির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ হরিণ-হরিণী ও মৃগয়ার রূপকে চিত্তের দুই অবস্থা ও অবস্থান্তরের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

(৪) শবর পাদের ২৮ সংখ্যক পদ।
এই পদটির রাগ ‘বল্লাড়ি’। এই পদে নগরের বাইরের জীবনচিত্র শবর দম্পতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই দম্পতির প্রেম ও মিলনের রূপকে মহাসুখলাভের তত্ত্বটি পাদকর্তা তুলে ধরেছেন।

(৫) টেন্টন টেণ্টন’-পাদের ৩৩ সংখ্যক পদ।
পদটি প্রহেলিকাচ্ছন্ন যার ফলে দুর্বোধ্য। পরমার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে যাদের ধ্যান ধারণা আছে, তারাই শুধু এর অর্থ সঠিক বুঝতে পারবেন।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (১ম সংখ্যক)

পইঠো—পুথিতে স্পষ্টভাবে ‘পইঠো’ লেখা আছে। পাঠান্তরে ‘পইঠা’ আছে। এখানে পুথির ‘পইঠো’ অর্থহীন বা অসংগত নয়।

সমাহিঅ—প্রাকৃতের প্রাচীন পদ বজায় আছে। পুথিতে 'সমাহিঅ' কথাটির মাঝামাঝি বন্ধনসূত্রের জন্য ফাঁক আছে। বর্তমানে সুতোর ঘসায় 'সমা' অংশটি নষ্ট হয়েছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সময়ে 'স' অক্ষুণ্ণ ছিল, 'মা' নষ্ট হয়েছিল।

সুন্ন—পুথি লিপিতে 'ন্ন' ও 'নু' প্রায় একরূপ। এজন্য পাঠান্তর হয়েছে 'সুনু'। কিন্তু অন্যান্য চর্যাগীতির নিশ্চিত 'ন্ন'র সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পাঠটি 'সুন্ন'।

ঝাণে—টীকার 'ধ্যানবশেন' পদ থেকে 'ঝাণে' পাঠের সমর্থন পাওয়া যায়। তিব্বতি অনুবাদেও 'ঝাণে' সমর্থন করতে দেখা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৫ সংখ্যক) ঃ

গড়ই—চর্যায় 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। হয়তো সেই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-'গটই' পাঠ করেছেন। তবে 'গঢ়ই' পাঠ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা সঠিক।

পটি—'পাটি' অক্ষরের লিপিভ্রম। ১৫

দিঠি—দিঢ়ি—'দিঢ়ি' নজিরবিহীন অক্ষর। অন্যান্য চর্যাগীতিতে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ক্রিয়া বিশেষণ রূপে 'দিঢ়' পদ আছে। এখানেও 'দিঢ়' পাঠই সঙ্গততর বলে মনে হয়।

কোড়িঅ—অর্থানুযায়ী—'কহিঅ' 'কাহিঅ' পাঠই যুক্তিযুক্ত।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৬ সংখ্যক) ঃ মূল পদে আছে 'কাহেরে' আর পাঠান্তরে দেখা যায় 'কাহৈরি'। পদটির পর অসমাপিকা ক্রিয়া 'ঘিনি' আছে। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিভক্তিযুক্ত 'কাহৈরি' পদটি ব্যাকরণের দিক থেকে প্রযোজ্য নয় তাই পাঠান্তরের 'কাহৈরি' পাঠ অশুদ্ধ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে মুনিদত্তের টীকায় দ্বিতীয় বিভক্তিযুক্ত যে 'কাহেরে' পদটি আছে সেটিই সঠিক ধরে নেওয়া যায়।

'হাক' ও 'ডাক' ঃ— মূল গীতিতে 'হাক'-পাঠান্তরে 'ডাক' রয়েছে। পুঁথিতে হা অক্ষরটি যেভাবে লেখা ছিল সেটি আধুনিক 'ডা' অক্ষরের মতো। মনে হয় এর জন্যই পাঠান্তরে 'ডা' আছে। কিন্তু পুথির অন্যান্য পদে 'ডা' ও 'হা' নিশ্চিত রূপ নিয়েই আছে। সেই সব অক্ষরের সঙ্গে তুলনা করলে—'ডা'-এর পরিবর্তে 'হা' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

'হরিণী বোলঅ হরিণী সুণ হরিআতো'—এই চরণটি নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে গবেষকদের মধ্যে। এর কারণ পাঠের অর্থ স্পষ্ট ও সুসংগত নয়। পাশাপাশি টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী এই পদ্যাংশের একটি পৃথক ও অর্থের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ পাঠের আভাস পাওয়া যায়।

প্রবোধকুমার বাগচী—টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সূত্র ধরে—'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো'। পাঠটি গ্রহণ করেছেন। এই পাঠ অর্থের দিক থেকে পুথির পাঠের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

ভুসুকু অহেরী—পাঠান্তর ভুকু—অসাবধানতাবশতঃ লিপিকার হয়তো 'সু' অক্ষরটি লিখতে ভুলে গেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভুকুঅহেরী' পাঠ গবেষকগণ ভুল পদবিশ্লেষণ বলে মনে করেন। এছাড়া 'ভুকু'র চেয়ে 'ভুসুকু' পাঠ ছন্দের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য।

ছুবই—মূল পুঁথিকে স্পষ্টভাবে 'ছুপই' লেখা আছে—কাজেই 'ছুবই'—এই পাঠশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (২৮ সংখ্যক) ঃ

পুঞ্চআ—এখানে 'পুঞ্চআ' পাঠান্তর থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু 'ধনুআ' পাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই।

উঞ্চা উঞ্চা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধ কুমার বাগচীর গ্রন্থে—উঁচা-উঁচা আছে। এতে অর্থের বা ছন্দের কোন হেরফের ঘটে নি। পরিহিন—ড. শহীদুল্লাহের—'পরিহান'—ছিন্-ভিন্ ইত্যাদির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টেণ্টন-'টেণ্টন' শব্দের অর্থ জুয়াড়ি, ধূর্ত। এখানে হয়তো ধূর্ত বা চতুর অর্থটি গ্রহণযোগ্য। এই গীতিতে চাতুর্যের পরিচয় আছে। 'টেণ্টনপাদ' হয়তো কবির ছদ্মনাম। চাতুর্যপূর্ণ প্রহেলিকাচ্ছন্ন পদ রচনা করতেন বলেই হয়তো এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। চর্যাপুথিতে 'ট' ও 'ঢ'-এর লিপি দেখতে একরূপ হওয়াতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. সুকুমার সেন, ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণ—'ঢেণ্ঢনপাদ' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু ড. নির্মল দাশ অর্থহীন বলে এই পাঠ গ্রহণে নারাজ। তাঁর মতে—'টেণ্টণ্টে'র অর্থানুযায়ী কর্পূরমঞ্জরী, দেশীনামমালা, বর্ণারত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গাল ইত্যাদি গ্রন্থে এই শব্দটির ধূর্ত, চতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁর মতে 'ঢেণ্ঢন'-এর বদলে 'টেণ্টন' পাঠই গ্রহণযোগ্য।

বেগ-সংসার—পুঁথির 'বেগসংসার' পদ দুটির সঠিক পাঠ 'বেঙ্গাসঁ সাপ।'

সঁসার—এই পদটির 'র' হরফটি চর্যার অন্যান্য গীতির 'র' থেকে সামান্য পৃথক দেখতে। সম্ভবত এটি 'র' নয় 'প'।

বিরলেঁ—পুথির 'বিচিরলেঁ'—লিপিকারের লিপিভ্রম বলে মনে হয়।

বড়হিল—'বধ্' ধাতুর অর্থ কাটা, ছেঁড়া। 'বড়হিলে'র অর্থ স্পষ্ট জানার জন্য 'চঢ়িল' পাঠ নিষ্প্রয়োজন।

৪১.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি

লুইপাদ ঃ চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে ২৪ জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গেছে। কবি লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। 'লুই' শব্দটি "রোহিত" শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে মনে করে গবেষক প্রবোধচন্দ্র বাগচী কবিকে নাথ যোগীদের আদি সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের সঙ্গো একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের কাছে এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি নন। চর্যাপদের টীকাকার মুনি দত্ত মীননাথের দোহা তুলে ধরে বলেছেন—"তথা চ পরদর্শনে মীন নাথঃ।" এ থেকেই বোঝা যায় লুইপাদ ও মীননাথ—দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি।

লুইপাদের ২টি চর্যাগীতি (১নং ও ২৯নং) চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়। গীতি দুটির পদ সংখ্যা, ছন্দ ও রাগিনী একই। দুটি পদেই দু'বার করে ভণিতা আছে। আলোচ্য পদটি ভালভাবে পাঠ করলেই দেখা যাবে ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে এবং শেষ পদে। লুইপাদ আদি পদকর্তা বলে সুচিহ্নিত। কবি দশম শতাব্দীতেই পদটি রচনা করেছেন বলে গবেষকদের ধারণা।

কবি পরিচিতি ঃ চাটিল্ল পাদ বা চাটিল পাদ (৫ম সংখ্যক) ঃ বিরুআ, গুণ্ডরী, বীণা প্রমুখ সাধক পদকর্তাদের মতো চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদের একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তবে এই একটি পদের মধ্য দিয়েই পদকর্তার কবি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। তেঙ্গুর তালিকায় চাটিলের নাম নেই। তারানাথও কবির নাম উল্লেখ করেননি। জ্যোতিশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'অথ চৌরাশী সিদ্ধ বর্ণনা'তে ৬৪তম সিদ্ধরূপে এজন 'চাটল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিনয়শ্রী সিদ্ধ নামের ক্ষেত্রে জনৈক 'চাটলা'কে স্মরণ করেছেন। চর্যাপদের ৫ পদসংখ্যার চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদ আলোচ্য 'চাটাল' ও 'চাটলা'—বিভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গবেষকের মতে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, মতান্তরে বরিশাল জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) চন্দ্রদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পদে নদীমাতৃক বাংলাদেশের যে জীবন্ত চিত্র আছে তাতে বরিশালের কবি বলে ধরে নেবার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নেই বলে মনে হয়। কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে স্পষ্ট মতামত এখনও পাওয়া যায়নি।

পদকর্তা পরিচিতি (৬ সংখ্যক) ঃ ভুসুকু পাদ রচিত আটটি চর্যাগীতি পাওয়া গেছে। গীতি রচনার সংখ্যার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তাঁর ৬ ও ২৩ সংখ্যক গীতিতে মৃগয়ায় রূপককে আশ্রয় করে সাধনতত্ত্বটি তুলে ধরেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু ভুসুকুর ৪৯ সংখ্যক পদে বর্ণিত "বাজণার পাড়ী পঁউআ খালে বাহি উ" চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের 'মহানদী' বা 'পদ্মানদী'র আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ভুসুকুর একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির প্রতিও গবেষকগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশ ও জলপথে দস্যুবৃত্তির নানাচিত্রও ভুসুকুর লেখায় দেখা যায়।

পদকর্তা পরিচিতি (২৮ সংখ্যক) ঃ শবরপাদ—চর্যাগীতিতে মোট ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব নাম থেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তি পরিচয় উদ্ধারে নানা অসুবিধা আছে। এর মূলে রয়েছে নাম উল্লেখের ব্যাপারে টীকাকারের কিছু কিছু ভুল। শবরপাদের নামে ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানে 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে তা ভণিতা বলে মনে হয় না, কিন্তু টীকায় পদটি কবিনাম হিসেবে উল্লিখিত। ড. সুকুমার সেনের মত অনুযায়ী চর্যা গীতিকায় যে সকল সিদ্ধাচার্যের নাম আছে তা থেকে দুটি নাম বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে 'বীণা' ও 'শবর' শব্দ দুটি যেভাবে আছে তা, ভণিতা বলে মনে হয় না। 'শবরীপাদ' নামে এক বা একাধিক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। চর্যাগীতির প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, ভুসুকপাদ, কাহ্নপাদ ও শান্তিপাদের পাশে শবরপাদের নামটিও উল্লেখযোগ্য।

পদকর্তা পরিচিতি (৩৩ সংখ্যক) ঃ বিরুআ (বিরূপ), চাটিল, বীণা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সহজপন্থী" কবিদের মতো টেন্টনপাদেরও মাত্র একটি পদ। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' সঙ্কলিত হয়েছে। পদ সংখ্যাতিত। মুসলমান অভিযানের পর বাংলাদেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত না থাকলেও বিলুপ্ত হয়নি। নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের সাধারণ লেখার মধ্যেও চর্চাগীতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। পরবর্তিকালের ভাবুক যোগী ও বৈষ্ণবদের কিছু কিছু গানে চর্যাগীতির হুবহু অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি পুঁথিতে কবীবের ভনিতাযুক্ত আট ছত্রের একটি গীতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢেণ্ঢনপাদের গানে আছে দশ ছত্র। দু'জনের লেখায় চারছত্র ভাবে ভাষায় এক, অপর অংশ ভাষায় পৃথক।

ঢেণ্ঢন পাদের গীতের শেষাংশ হলো—

নিতে নিতে বিআলা ষিহেঁ সম জুঝঅ
ঢেণ্ঢনপাত্রর গীত বিরলে বুঝঅ।।

কবীরের গানের শেষাংশে দেখা যায়—

"নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।"

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চর্যাপদের ধারা মুসলমান আক্রমণের পরেও মরুপথে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী অধ্যাত্ম সাধক সম্প্রদায়ের হাতে চর্যাপদের ঐতিহ্যধারা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। টেন্টন পাদের পদটির অনুবৃত্তিই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

৪১.৪ বাচ্যার্থ

বাচ্যার্থ (১ম সংখ্যক) ঃ কায় (রূপ) তরুবর। তার পাঁচটি ডাল। চিত্ত চঞ্চল তার মধ্যে কাল প্রবেশ করেছে। দৃঢ়ভাবে মহামুখ পরিমানকর। লুই বলে, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে সব জান। সমাধি সকল দিয়ে কি হবে ; সুখ-দুঃখ নিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেককেই মরতে হবে। (এজন্য) ছন্দের (বাসনার) বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পটুত্বের আশা ত্যাগ করো। শূন্যতার দিকে পাশ ফের। লুই বলে, আমার ধ্যানে, (পাঠান্তরে 'ইশারায়'—এই যুগনদ্ধ রূপ) দেখেছি। ধমন-চমন অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দুই পিঁড়িতে বসেছি।

বাচ্যার্থ (৫ম সংখ্যক) ঃ ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে। তার দুই তীর কর্দমাক্ত, মাঝখানটা অথৈ। চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো তৈরি করেছে। পারাপারের যাত্রীরা নিশ্চিন্তে পার হয়। মোহরূপ বৃক্ষ ফাড়া হলো, তার তক্তা জোড়া হলো, অদ্বয় টাঙ্গী নির্বাণে দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ করা হলো, সেতুতে ডান-বাঁ হবে না। বোধি-কাছেই-দূরে যেয়ো না। ওহে, তোমরা যদি পরগামী হতে চাও তবে শ্রেষ্ঠ সাঁই চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।

বাচ্যার্থ (৬ম সংখ্যক) ঃ কাকে সঙ্গে নিয়ে কাকে বাদ দিয়ে কীভাবে আছি, চারদিক ঘিরে ধরে হাঁক পড়েছে। নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু হয়েছে। ভুসুকু একটু সময়ের জন্যও শিকার ছাড়ে না। হরিণ ঘাস স্পর্শ করে না, জলপান করে না। হরিণ হরিণীর বাসস্থান জানে না। হরিণ হরিণীকে বলে ; শোন, জুয়াড়ি তুই (পাঠান্তরে হরিণ হরিণীকে বলে—তুই শোন) এ বন ছেড়ে তুই পালিয়ে যা। ভীত-ত্রস্ত পালিয়ে যাওয়া হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, (এই পদের তাৎপর্য) মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

বাচ্যার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ উঁচু উঁচু পাহাড়। শবরী বালিকা সেখানে বাস করে। তার পরনে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করো না, একান্ত অনুরোধ (ও তোমার) নিজেরই সহধর্মিণী, ওর নাম সহজ সুন্দরী। বনের গাছ গাছালি মুকুলিত হ'ল। তাদের ডালপালা আকাশে ঠেকলো। কানে কুন্তল ও কণ্ঠে বজ্র ধারণ করে শবরী এই বনেই একাকিনী বসবাস করে। তিন প্রকার ধাতুর খাট ও মহাসুখের বিছানা পাতা হলো। শবর প্রেমিক, নৈরামণি প্রেমিকা। প্রেম মিলনে রাত কাটলো। গুরু বাক্য পুচ্ছ যুক্ত বাণ্। সেই তীরে নিজের মনকে বিদ্ধ কর। এক শরে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। ভীষণ ক্রোধে শবর উন্মত্ত। পর্বতের শিখর সন্ধিতে আত্মগোপন করলে শবরকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

বাচ্যার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ ঘন বসতিতে আমার ঘর (অথচ) পাড়া পরশি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (কিন্তু) ঘরে প্রতিদিনই অতিথির আগমন। ব্যাঙ সাপকে কাটে, কী আশ্চর্য, দোয়া দুধ আবার বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ বিয়ায়—গাভী বন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যা পাত্রে দুধ দোহন করা হয়। যা সেই বুদ্ধি—তা-ই-খারাপ বুদ্ধি। যে চোর সেই কোটাল। প্রত্যেক দিন শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢনপা-এর গীত কদাচিৎ বোঝা যায়।

৪১.৫ গূঢ়ার্থ

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ঃ পদকর্তা লুইপাদ শরীরকে গাছের সঙ্গে তুলনা করে পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে গাছের শাখা স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

বিষয় বাসনায় চিত্ত চঞ্চল হয় বলেই আমরা সংসার জীবনে নানা দুঃখ ভোগ করে কাল কবলিত হই। কিন্তু এই চাঞ্চল্য দূর করে মহাসুখ লাভ করবার জন্য চিত্তকে দৃঢ় করতে হবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করে এসব জানতে হয়।

যোগ-ধ্যান-সমাধিছ ইত্যাদির দ্বারা দুঃখের প্রভাব থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমাধি ভঙ্গের পরই জাগতিক জ্ঞানের উদয় ঘটলেই আবার দুঃখ সাগরে পতিত হতে হয়। এই পন্থা চিরস্থায়ী মহাসুখলাভের প্রকৃত উপায় নয়।

আসলে বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আশাই মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণ। এসব থেকে মুক্ত হতে না পারলে অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে না পারলে চিরকাল দুঃখে জীবন কাটাতে হবে। বাসনার নিবৃত্তিই মহা সুখলাভের প্রকৃত পথ।

এই বাসনার নিবৃত্তি কীভাবে হয়? যতদিন সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বদ্ধমূল থাকবে, ততদিন সংসার আমাদের মন প্রাণকে আকর্ষণ করবেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সংসারকে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এর মতো ভ্রান্তিরূপেই দেখা হচ্ছে—এই ধারণা জন্মালেই সংসারের বন্ধন-আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সজীব-চিত্র এই পদে আছে। নদী পারাপারের জন্য সেতুর ব্যবহার—বংলার বুকে জীবন্ত। সহজ চিত্রকল্পের সাহায্যে সহজিয়া সাধক কবি সহজিয়া সাধনতত্ত্বটি এই পদে প্রকাশ করেছেন।

পার্থিব জগতকে কবি গহন-গভীর বেগবান নদীর সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

'ভবনই গহণ গম্ভীর বেঁগে বাহী'। উপমাটি সার্থক

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৫ম সংখ্যক) ঃ

বিশ্ব সংসার নদীর মতো। নদীর বুকে যেমন দিনরাত ঢেউ উঠছে আবার নদীর বুকেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেইরূপ সংসারেও বিষয় বাসনার তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয় গভীরে জাগছে আবার পাওয়া-না পাওয়ার বেদনায় তা হারিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই পদকর্তা একে 'গহন' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বলেছেন। প্রবহমান নদীর দুই তীরে যেমন কাদা জমে ঠিক তেমনি মানব-সংসারের দুই তীরও নানাদোষে দূষিত হয়। কলুষপূর্ণ এই 'ভবনদী' পার হওয়া খুবই কষ্টকর।

ঘট-লট-স্তম্ভ-কুম্ভাদির মতোই বৃতবিকারই ভব-সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। বিষয় বিষে জর্জরিত চোখে এসব ধরা পড়ে না বলেই সিদ্ধাচার্য চাটিল সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুকে অবলম্বন করেই সাধক কবি 'ভবনদী' পার হতে বলেছেন। এই সেতু কীভাবে তৈরি হবে? এর উপায় চাটিল্লপাদ বলেছেন। মোহগ্রস্ত চিত্ত যাকে গীতিকার গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই চিত্তকে ফেঁড়ে গাছের পাট যেমন ফাঁড়ার পর পৃথক করা হয় ঠিক তেমনি চিত্তের বিষয় গ্রহকে খণ্ডিত করে জ্ঞানলোকের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিতে বলেছেন। সবশেষে অদ্বয় জ্ঞানরূপ কুঠারের সাহায্যে নির্বাণকে সুদৃঢ় করে সেতু নির্মাণ করতে বলেছেন। সেতুতে চড়ে ডানে বামে অর্থাৎ বিমার্গে চলতে নিষেধ করেছেন। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব ত্যাগ করে যদি চলা যায় তবে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ ঘটবে।

মহামোহস্বরূপা এই ভবনদী যারা পার হতে ইচ্ছা করে তারা যেন অনুত্তর ধর্মস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা করে।

শব্দার্থ ঃ—

ভবনই	—	বিশ্বসংসার।
গহন	—	ভয়ঙ্কর।
প্রান্তে	—	দুই তীরে, দুই ধারে।

চিখিল	—	পাঁক।
থাহী	—	থৈ।
ধামার্থে	—	ধর্মার্থে।
সাংকম্	—	সাঁকো।
গঢ়ই	—	গড়ি, তৈরি করি।
অদঅ	—	অদ্বয়।
নিয়ড্ডী	—	নিকটে।
হোইব	—	হবে।
পুচ্ছ	—	জিজ্ঞাসা করিও। ৩৩

এরূপ চিত্তকে ঘিরেই জরা-মৃত্যুশিকারীর দল ছুটে আসে। চরম বিপদ মুহূর্তে চিত্ত সঠক ঠিকানা খুঁজে পেয়ে ভোগ-সুখের জগত ত্যাগ করে। নির্বাণ-হরিণীকে পাবার জন্য আকুল হয়। নির্বাণ বা মহাসুখ হরিণীর রূপ ধারণ করে নির্বাণ লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্ত হরিণকে ঠিক পথের সন্ধান দেয়। সহজিয়া তত্ত্ব কথাটি ভুসুকুপাদ বাস্তব শিকারের পটভূমিকায় সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। পাদটির মধ্যে গীতি কবিতার মূর্চ্ছনাও খুঁজে পাওয়া যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৬ সংখ্যক) ঃ

চঞ্চল চিত্ত ভুসুকুপাদ নিজের চিত্তকেই হরিণের সঙ্গে তুলনা করে শিকারের উপমার সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। শিকারিগণ চারদিক থেকে বন ঘিরে ফেলে হরিণকে মারবার জন্য সচেষ্ট। এই কঠিন পরিস্থিতিতে হরিণীর আহ্বানে সে তার মুক্তি সাধন করে চলে এসেছে।

হরিণ নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রু হয়েছে। অর্থাৎ তার মাংসের লোভেই সকলে তাকে হত্যা করতে ছুটে আসে। ঠিক এইরূপ অবিদ্যা বিমোহিত চিত্ত হরিণ মদ-মাৎসর্যাদি দোষের জন্য নিজের সর্বনাশ সাধন করে। এসব বুঝেও ভুসুকু সদগুরুর নির্দেশ বাণে তাকে ধ্বংস করেন নাই। কিন্তু চরম বিপদ মুহূর্তে পান-আহার ভুলে অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সুখ ত্যাগ করে বিপদশূন্য স্থানে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পথের সন্ধান পান না। কারণ তার সঙ্গিনী নৈরাত্মা দেবী রূপিণী হরিণীর নিরাপদ বাসস্থান ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, সেইজন্য ভোগ-সুখ বিভোর চিত্ত হরিণ তার সন্ধান করতে পারে নি।

এই পদটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের তত্ত্বকথা থাকলেও মিলন উন্মুখ নর-নারীর প্রেমাকাঙ্খা যেভাবে কবি প্রকাশ করেছেন তাতে শাশ্বত প্রেমধর্মী সৃষ্টিরূপেও পদটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। ধর্মীয় তত্ত্বকে দূরে রাখলেও এর সাহিত্যিক মূল্য চিরন্তন। প্রেম ও প্রকৃতির সমন্বয়ে এই পদটিতে ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (২৮ সংখ্যক) ঃ

মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দৈবী বাস করেন। এই মহাসুখ চক্র হ'ল কায়াকঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর। শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মাদেবী ময়ূর পুচ্ছ দিয়ে দেহকে সাজিয়েছেন, গলায় গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পরেছেন। শবর প্রকৃতপক্ষে বজ্রধর। তিনি বিষয় বাসনায় মগ্ন, অন্যদিকে শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মা ও প্রকৃতি

ভাব বিকল্পরূপ নানা অলঙ্কার পরিধান করে আত্মগোপন করে আছেন। এই অবস্থায় দুই এর মিলন কীভাবে হবে?

এইপদে দেখা যায় শবরী সাধককে বিষয় বাসনায় উন্মত্ত শবরকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে বলেছে—'তুমি বিষয়ানন্দে মত্ত হয়ে আমাকে চিনতে ভুল করো না।' তার সাজসজ্জা দেখে ভুলবশতঃ পরস্ত্রী মনে হলেও শবরী নিজের পরিচিতি স্পষ্টভাবে দিয়ে বলেছে—'আমি সহজ সুন্দরী নামে তোমার নিজের গৃহিণী বা স্বরূপ প্রকৃতি। সুতরাং মিলন পথে দ্বিধা যেন না থাকে। শবরী তার দেহ সজ্জার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে অবিদ্যা প্রাপকের গভীরে তাকে অনুভব করতে বলেছে। শবরীর নির্দেশ ও আহ্বান মতো নৈরাত্মাকে লাভ করার জন্য শবর কায়বাক্‌চিত্তকে সুসংযত করে মহাসুখরূপ বিছানা পেতে চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখ ও জ্ঞানের আলোয় জীবনের ক্লেশ অন্ধকার রাত্রির পাথার পেরিয়ে শবরীর সঙ্গো মিলনানন্দে বিভোর হন।

সাধক এই চরম লগ্নে কীভাবে উপস্থিত হবে তার জন্য গুরুর নির্দেশের কথাও আছে। এই নির্দেশের মধ্যেই পরম নির্বাণ লাভের সঠিক নিশানা রয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৩৩ সংখ্যক) ঃ আমার ঘর টালির অর্থাৎ বস্তিতে আমার কোনো পড়শি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্যই (প্রতিদিন) প্রেমিক অতিথি। বেঙ্গোর (বেগের) সংশয় বেড়ে যায়। দোয়া দুধ কী বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়লো (বাচ্চা দিল), গাই বাঁঝা (বাচ্চা প্রসব করে না)। তিন সন্ধ্যা পীঠ দোহন করা হয়। সেই যে বুদ্ধি (অর্থাৎ বলদের বুদ্ধি) সে সার্থক বুদ্ধি। যে চোর সেই পুলিশ। প্রতিদিন শেয়াল সিংহের সঙ্গো যুদ্ধ করে। টেণ্টন পাদের গীত খুব কম (লোকেই) বোঝে।

গূঢ়ার্থ ঃ এই চর্যাপদে অবাস্তব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে ঢেণ্ঢণপাদ সহজ সাধনা ও সহজ অনুভূতির আভাস দান করেছেন। কায়-বাক্ চিত্তের সব রকমের প্রকৃতিদোষ মহাসুখচক্রে লয় পাচ্ছে। সেই চক্রই আমার গৃহ চন্দ্র সূর্যের মতো প্রতিবেশী অর্থাৎ গ্রাহ্য গ্রাহকভাব লুপ্ত হয়েছে।

দেহের মধ্যে যে আমার চিত্ত নেই—তা গুরুর উপদেশ বুঝে এখন আমি সব সময় নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করছি। অর্থাৎ কামনা-বাসনাময় ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে আমার বোধ লুপ্ত হওয়ায় এখন আমি সবসময় প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করছি।

নিরাবয়ব অর্থাৎ সর্বশূন্য এই সংসারের জ্ঞান আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—যার ফলে বোধিচিত্ত আশ্চর্যভাবে বজ্রাগার থেকে মহাসুখচক্রের দিকে যাচ্ছে।

সক্রিয় মন থেকে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলেই পদকর্তা বোধিচিত্তকে বলদ বলেছেন। এই বলদ প্রসব করে অর্থাৎ রূপ জগতের সৃষ্টি করে। আর এই চিত্তই যখন অচিত্ততায় লীন হয়ে নৈরাত্মাকে লাভ করে তখন রূপ জগতের দৃশ্যাদির জ্ঞানও লোপ পায় বলে নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা বলা হয়েছে। কায়-বাক্ চিত্তের আভাসে গঠিত অবিদ্যা-পীঠ আমার দ্বারা তিনসন্ধ্যা অর্থাৎ সব সময় নিঃস্ব ভাবের মধ্যে লীন হচ্ছে।

বালযোগীদের স্বল্পজ্ঞান পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞেরা ঠিক মতো উপলব্ধি করেন না, কারণ, তাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন। যে চিত্ত সবিকল্প জ্ঞান দ্বারা বিষয়সুখ অন্যায়ভাবে আহরণ করে তাকেই চোর বলা যায়। কারণ বিষয়ের সঙ্গো চিত্তের কোনো পরমার্থিক সম্বন্ধ নেই। এই চিত্তই নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করলে সাধু হয়।

দুঃখ, জরা-মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ে ভীত সংসার চিত্তকে শৃগাল তুল্য। এই চিত্তই যখন বিশুদ্ধ হয় তখন সজ্ঞানস্বরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তা আয়ত্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়।

ঢেণ্টণ পাদের এই গানের কোনো কোনো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন, সকলে বুঝতে পারেন না।

৪১.৬ সমাজ চিত্র

দেশ-কাল-সমাজকে দূরে রেখে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধির-জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। চর্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের দিক থেকে ছিল জীবনবিমুখ। জগৎ জীবন মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই বেশি নির্ভর করেছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই চর্যাপদে আমরা সমাজ ও জীবনের রূপচিত্র পাই তা পরোক্ষ-খণ্ডিত ও আভাস ইঙ্গিতময়। সিদ্ধাচার্যগণ অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে নানা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকজীবন থেকে।

বাংলাদেশে সেন রাজাদের যখন আধিপত্য, তখনই চর্যার গানগুলি রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাগণ পরধর্মে অসহিষ্ণু ছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত আর বেদধর্ম ও বেদাচারের বাইরের জনগোষ্ঠী ছিল অস্পৃশ্য অন্ত্যজ। এই তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে চর্যাপদ রচিত।

চর্যাগীতির রচয়িতাগণ ডোম্বী, কামলি, শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির লোক এবং চর্যাগীতির ডোমনী, শবর, চণ্ডালী, ব্যাধ, জেলে, ধুনুরী ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীও অস্পৃশ্য শ্রেণির। সামাজিক বিভাজনের স্পষ্ট রূপরেখা কাহ্ন পাদের চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

> “নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছোই ছোই জাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িআ।”

উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করতো, আর ডোম, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকজন নগরের বাইরে—জনপদ থেকে বহুদূরে পাহাড়ে, জঙ্গালে মালভূমিতে বাস করতো। এদের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যই শ্রেণি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা। মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকরূপে—ডোমনী, শবরী ইত্যাদি নারী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই রূপক ব্যবহারের মধ্যেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্পর্শ যোগ্যতার ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্ত্যজ শ্রেণির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। নানা বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্ণের জীবনচিত্র সজীবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, তাঁতী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর জীবন্ত-জীবিকা প্রকাশে তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি করা, খেয়া পারাপার করা, শিকার করা ইত্যাদির পরিচয় আছে।

ডোম্-ডোমনীর নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে ডাকাতি ইত্যাদির বর্ণনায় নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ আছে। ৫ সংখ্যক পদে চাটিল্লপাদ বলেছেন—

“ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী।।

দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।”

এর সঙ্গে 'সাঙ্কম গঢ়ই'ও আছে। নদী পারাপারের পারিশ্রমিক রূপে যৎসামান্য 'কড়ি' বা 'বুড়ি' ডোমজাতি পেতো। ডোম পুরুষেরা কাপালিক বেশে পায়ে নূপুর ও কানে কুণ্ডল পরে নাট্যগীতি করেও অর্থ উপার্জন করতো। এছাড়া মদ চোলাই করা (৩), শিকার করা (৬,২৩) কাঠের কাজ করা (৫,৪৫), তুলা ধোনা, মোটা কাপড় বোনা (২৬,২৫) ইত্যাদি কাজেও অন্ত্যজ শ্রেণি যুক্ত ছিল।

আপনাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ৫ সংখ্যক পদে নৌকো পারাপার, সেতু নির্মাণের কথা আছে।

'পার গামিলোঅ নিভর তরই' 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ'—ইত্যাদি চরণ এর দৃষ্টান্ত। ভুসুকুপাদের ৬ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা—

'কাহেরে যিনি মেলি অচ্ছ হু কীম।

বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।'

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র ঢেণ্টণপাদের ৩৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

হাড়ীত ভাত নাঁহি, নিতি আবেশী।।”

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হতো চুরির ভয়ে ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে।

৩৩নং পদে এর দৃষ্টান্ত আছে।

“জো সো চৌর সৌ দুষাধী।” এছাড়া ২,৩৮,৪৯ সংখ্যক চর্চা গীতিতেও চুরি ডাকাতির প্রসঙ্গ আছে। চর্যায় গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জীবন্ত চিত্র আছে। যৌথ পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী-পুত্রবধূ (বহুড়ী) নিয়ে যৌথ সংসার। স্বেচ্ছাচার ছিল না। গৃহবধূ শাশুড়ীকে ভয় পেতো। এছাড়া নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে—যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালী সমাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এর পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাহ্নপাদের ১৯ সংখ্যক পদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

“জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।

কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।”

শবর পাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের স্পষ্ট চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে প্রমোন্মত্ত শবর-শবরীর মিলনসুখের পাশাপাশি মান-অভিমানের চিত্রও আছে। ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায় ভুলের অবসান হলে উন্মত্ত শবরকে শবরী অনুনয় করে বলে—

“উমত সবরো পাগল শবরো মাকর গুলী-গুহাড়া তো হৌরী।

নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।”

ব্যবহারিক জীবনে হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা আয়না, কাঁকন, কুন্তল ইত্যাদি ব্যবহার

করতো। ধনী ব্যক্তিরা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। সমাজ জীবনে মদের আসক্তি ব্যাপক ছিল। যার ফলে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা রমরমা ছিল। বিরুআর ৩ সংখ্যক চর্যায় শুঁড়িবাড়ির বিশেষ বর্ণনা আছে।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত রাগ-রাগিনীর নাম, বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়—চর্যার যুগে নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। কাহ্নপাদের পদে নাচ-গান ও নাটকের কথা আছে।

"একসো পদুমা চৌসঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।"

নাটগীতির পালায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতো।

সব দিক থেকে আলোচনা শেষে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজ জীবনের মূল স্রোত ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিলেন, তার জন্যই বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজ চিত্র চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪১.৭ অধ্যাত্ম ভাবনা

চর্যাগীতিতে যে ধর্ম সাধনার ইঙ্গিত আছে, তা প্রধানত সহজযান বৌদ্ধধর্মের। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন সংকেতই রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান মতবাদ বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি।

বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্যপথ ধরে কায়া সাধনায় ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজয়ানীদের ধর্ম সাধনায় 'সহজ' শব্দটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি সার্থকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হ'ল এই ধর্ম সাধনার সাধ্য সহজ এবং অপরটি হ'ল সিদ্ধাচার্যদের সাধনপদ্ধতি বক্র নয়—সহজ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। অন্যান্য সাধকেরা ধ্যান-জপ-তপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে মুক্তির সন্ধানী হয়েছেন। কিন্তু চর্যার গীতিকারগণ সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা না করে, ধ্যান-সমাধির ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। আপনাদের পাঠ্য তালিকার লুইপাদের ১ম সংখ্যক পদে তার পরিচয় আছে।

"স অল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখে দুখেতে নিচিতি মরি অই।।"

প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে ২৯, ৩৪, ৪০ সংখ্যক পদেও। আগম পুঁথি সবই মিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর ও গ্রাহ্য সব কিছুই নিষ্ফল। কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। চর্যার 'সহজ' ও 'সহজলাভের' ঋজু পথ—সাধারণ মানুষ জানেনা। এই দুই এর সঠিক পরিচয় একমাত্র গুরুর কাছে পাওয়া যাবে। তাই চর্যার কবি বলেছেন—

"গুরু পুচ্ছিঅ জান।"

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সহজিয়া ধর্মের সাধনপ্রণালী অনেকটা প্রাধান্য পেয়েছে। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোনো

নতুন তত্ত্ব প্রমাণের চেয়ে সত্যলাভের সহজ সাধন পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সিদ্ধাচার্যগণ। তন্ত্রের বহিরঙ্গের বিষয়গুলি দূরে রেখে মূল সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তন্ত্রের মূল সাধনা 'কায়া সাধনা'। সহজিয়া সাধকগণও তাঁদের ধর্মীয় প্রধান তত্ত্বাদি এই দেহের ভিত্তিতেই প্রতিবাদন করেছেন। 'বোধিচিত্ত' বা 'মহাসুখ'কে পরম সত্য ও কামনার বিষয়রূপে সিদ্ধাচার্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা' ও 'উপায় রূপিণী করুণা'কে সাধনার দ্বারা যদি একাত্ম করা যায় তবেই এই 'মহাসুখ' লাভ সম্ভব।

এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব সহজিয়া সাধকগণ দেহের নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর স্থাপন করে দেহের চারটি চক্রের কল্পনা করেছেন। সেগুলি হ'ল—(১) 'নির্মাণ চক্র'—এই চক্র নাভিতে, (২) 'ধর্মচক্র'—হৃদয়ে, (৩) সম্ভোগচক্র—কণ্ঠে (৪) 'সহজচক্র' বা 'মহাসুখচক্র'—মস্তকে অবস্থিত। এই চারটি চক্রের মধ্যে 'সহজচক্র'ই 'বোধিচিত্তে'র প্রকৃত স্থান। এইসব চক্রের পাশাপাশি তিনটি প্রধান নাড়ীকেও সহজিয়া সাধকগণ সাধনার সাহায্যরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই নাড়ী ৩টি হলো—(১) বাম নাসিকা ছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'বামগানাড়ী'—এটি 'প্রজ্ঞারূপিণী', (২) ডান নাসিকাছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'দক্ষিণগানাড়ী' যা 'উপায়রূপিণী' এবং (৩) নাসিকার বাম ও ডান ছিদ্রের দুই নাড়ীর মাঝখান দিয়ে 'মধ্যগানাড়ী'—'অবধূতিকা' প্রবাহিত। এই 'মধ্যগানাড়ী'-ই অদ্বয় বোধিচিত্ত সাধনার প্রধান অবলম্বন। পূর্বালোচিত চক্র ও নাড়ীর নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে সহজানন্দ, মধ্য মার্গে আনন্দনুভূতি দেখা দেয়। বোধিচিত্তের চারটি চক্রের মতোই 'আনন্দানুভূতির'ও চারটি স্তব আছে। সেগুলি ক্রমানুসারে 'আনন্দ', 'পরমানন্দ', 'বিরমা-নন্দ' ও 'সহজানন্দ'। 'বিরমানন্দে'র অর্থ হ'ল—পার্থিব ভোগ-সুখের বিরাম, আর 'সহজানন্দের অর্থ হ'ল আত্যন্তিক আনন্দ।

আলোচিত এই সাধনতত্ত্বই চর্যাগীতিকারগণ নদী, বৃক্ষ ইত্যাদি নানা রূপকের আবরণে তুলে ধরেছেন।

৪১.৮ কাব্য মূল্য

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় জীবনের অস্তিত্বহীনতাই মুখ্য। এজন্য চর্যাগীতিকার জীবনের প্রতি বিপুল আগ্রহ ও জীবনের বিস্তৃত পটভূমিকা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন জীবনের রূপরেখাও জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'তত্ত্বকথা' নৌযাত্রা, দাবাখেলা, শিকার, মদচোলাই, নদী-পারাপার ইত্যাদি লৌকিক উপমানের সাহায্যে যে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে সমাজজীবন ও তার পরিবেশ পটভূমি জীবন্তরূপ পেয়েছে। জীবনের সুখ-দুঃখ, সংরাগ-বিরাগের সামান্য ছোঁয়াও আছে। এই সব গানে জীবনরসের সজীবতাও লক্ষণীয়। বিষাদ ও শৃঙ্গার রসাত্মক গানগুলিতে এবং সামাজিক অন্যায় অত্যাচার, সংসার জীবনের অসঙ্গতি, নিরাপত্তার অভাব, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তির ফলে অসহায় মানুষের অসহায়তার রিক্ত চিত্র যে সব চর্যাগীতিতে আছে তা মানবিক অনুভূতি স্নাত।

ভুসুকু পাদের ৪৯ সংখ্যক পদে মানুষের রিক্ত অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

"বাজণাব পাড়ী পঁউআ ঘাঁলে বাহিউ।
অদ অ দঙ্গালে দেশলুড়ি উ।"

সংসার জীবনের চরম-বিপর্যয়ের চিত্রটি।

“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।” —অংশে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র ব্রাহ্মণ্য-শাসিত জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিও চর্যাগীতিতে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন দিকটি কাহ্ন পাদের লেখায় তীব্র ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ হয়েছে—

“নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।”

সামাজিক ভ্রষ্টাচারও কুক্কুরী পাদের পদে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত—

“দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামুর জাঅ।।”

কাব্যরূপ ঃ চর্যাকার ও টীকাকারদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চর্যার গানগুলি ‘চর্যা’ বা ‘চর্যাগীতি’ নামে চিহ্নিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বলে গবেষকগণ মনে করেন। কাঠামোগত দিক থেকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী কঠোর অনুশাসন চর্যাপদে না থাকলেও সেকালের সমসাময়িক সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থাদির মধ্যে সেকালের প্রচলিত কাঠামোই যে চর্যাপদে আছে সে সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায়। ‘মানসোল্লাস’ ‘সঙ্গীত রত্নাকর’—গ্রন্থে চর্যার আকারগত কাঠামোর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

‘প্রতিপদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত, পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত গীতি তাকে চর্যা বলা হয়।” (বাংলার সঙ্গীত)

ড. সুকুমার সেন মানসোল্লাসের ও ‘চর্যাপ্রবন্ধে’র নমুনাকে তাঁর ‘চর্যাগীতি পদাবলী’তে তুলে ধরে বঙ্গানুবাদ করেছেন “অর্থ অধ্যাত্ম বিষয়ক, মিল আছে, দুই-তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা।”

চর্যাগীতিতে ১৪, ১২, ১০, ৮ চরণের গীত আছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় সনেটের নির্দিষ্ট চরণ সংখ্যা এতে নেই। অর্থাৎ চরণ সংখ্যার ব্যাপারে কঠোর নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম দেখা যায় না। ‘ভনিতা’ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। রূপক ব্যবহারে মোটামুটি ঐক্য দেখা যায়। চর্যাগীতির রূপ বৈশিষ্ট্যই মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারায় গ্রহণ করতে দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গল কাব্যধারা এর সাক্ষ্য বহন করছে।

ছন্দ ঃ চর্যাগান রচনার সময় চর্যাকারদের সামনে (১) অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ এবং (২) লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দের আদর্শ ছিল। পদকর্তাগণ সংস্কৃতের ছান্দসিক আদর্শ গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় আদর্শের বিচিত্ররূপ থেকে কিছুটা উদারপন্থী নীতি নিয়ে ‘পাদাকুলক’ ছন্দে চর্যাগান রচনা করেছেন। এই ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের স্থাপনার ব্যাপারে কঠোর কোনো নিয়ম নেই। চর্যাগীতির ৩৬টি গানই এই ছন্দে রচিত। তবে প্রতিটি গানে ৪+৪+৪+৪ = ১৬ মাত্রার ‘পাদাকুলক’ ছন্দের আদর্শ রক্ষিত হয়নি। যার ফলে কোনো কোনো চরণে মাত্রার সংখ্যা ১৫ কিংবা ১৪ ও পাওয়া যায়। নিখুঁত পাদাকুলক ছন্দের নিদর্শন—

“দুলি দুহি / পিটা // ধরণ ন / জাই। ৪+৪+৪+৪
রুখের / তেন্তলি // কুম্ভীরে / খা অ।।” ৪+৪+৪+৪

চর্যাকারগণ প্রকৃত রূপ-সচেতন ছন্দশিল্পী ছিলেন না। তত্ত্বকথায় গভীর মনঃসংযোগের ফলে ছান্দসিক প্রকরণে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অলংকার, সন্ধ্যা ভাষা ও প্রহেলিকাময় তত্ত্বকথার দিকে তাঁদের নজর বেশি ছিল। তবে অপভ্রংশের বন্ধন থেকে ছন্দ ব্যবহারে যে শিথিলতা চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন তার পথ ধরেই পরবর্তিকালে বাংলার নিজস্ব পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।

অলঙ্কার ঃ প্রাচীনতম অলঙ্কারের ঐতিহ্যমুক্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করে চর্যাকারগণ সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সহজিয়াতত্ত্ব প্রকাশের জন্য তাঁরা সতর্কভাবে শব্দালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে 'শ্লেষ' অলঙ্কারই দেখা যায়। যেমন শাসু (৪, ১১)—(১) শাশুড়ী, (২) শ্বাস, হরিণী (৬)—(১) মৃগী, (২) নৈরাত্মা দেবী, কুম্ভীর (২)—(১) প্রাণী অর্থে, (২) কুম্ভকযোগ ইত্যাদি।

এইসব দৃষ্টান্তে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—দুই প্রকার অর্থই আছে। যার ফলে সন্দেহে এই শব্দগুলিকে শ্লেষ অলঙ্কার বলা চলে।

চর্যাগীতিতে অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য আছে। তার মধ্যে রূপক, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, উপমা, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রচুর উদাহরণ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো।

(১) দৃষ্টান্ত অলংকার—

"আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএমো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।।"

এখান উপমেয়—'আইএ অণুঅনা এ জগরে'—অর্থাৎ আদৌ অনুৎপন্ন জগৎ এবং উপমান—'রাজসাপ' অর্থাৎ 'রজ্জুসর্প'—দুটি পৃথক স্বাধীন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ও পৃথক কিন্তু ভাব সাদৃশ্যে উভয় ধর্মই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়েছে এই উদাহরণে।

রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঃ

'অপণা মাংসে হরিণী-বৈরী, বর সুণ
গোহালী কিমো দুধ্য বলঙ্গে'—ইত্যাদি

লোক প্রবাদগুলি আসলে উপমান ও উপমানের অন্তরালে যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে—তাই উপমেয়।

রূপক ঃ চর্যাপদে রূপক অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রূপকে উপমানই উপমেয়ের চেয়ে প্রবল। কিন্তু এই প্রাবল্যের হের-ফেরের জন্য রূপকাশ্রিত চর্যাগুলিকে (১) উপমেয়—প্রবল, (২) উপমেয়—উপমান সমান, (৩) উপমান প্রবল—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

রূপকের দৃষ্টান্ত ঃ

'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল',
ভবন গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী',
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ' ইত্যাদি।

দেহকে গাছের, সংসারকে নদী, মোহকে তরুর সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে রূপক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাগীতিতে গীতের প্রয়োজনেই অলঙ্কার প্রয়োজন হয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত, সুখ-দুঃখাশ্রিত

সংসার জীবন, সমাজ পরিবেশ ও লৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চর্যাকারগণ উপমানের উপাদান সংগ্রহ করে অর্থালঙ্কারের মালা গেঁথেছেন। তবে সেই অলঙ্কার কোথাও ভার বোঝা হয়নি বরং কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ড. নির্মল দাসের ভাষায়—"যে গানে অলঙ্কারের পরিমাণ যত বেশি বিচিত্র ও বহু ব্যাপক, সেই গানের কাব্যোপযোগিতাও তত বেশি। সুতরাং অলঙ্কারের মূল্যেই চর্যার কবিত্ব, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।"

৪১.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য

শব্দার্থ (১ম সংখ্যা) ঃ

কাআ	—	কায়, দেহ
কাল	—	সময়
চিত্র	—	চিত্ত
পইঠো	—	প্রবেশ করিল
দিঢ়	—	দৃঢ়, শক্ত
মহাসুহ	—	মহাসুখ
পরিমাণ	—	প্রমাণ বা পরিমাণ করা
ভণই	—	বলে
পুছে	—	জিজ্ঞাসা করে
পুছিঅ	—	জিজ্ঞাসা করিও
জান	—	জানো
করি অই	—	করা হয়
সুখ দুখেতেঁ	—	সুখে-দুঃখে, সুখ দুঃখের দ্বারা
নিচিত	—	নিশ্চিত
মরি আই	—	মারা পড়ে
এড়ি এউ	—	ছাড়া হোক
ছান্দক	—	ছন্দের, অর্থাৎ বাসনার
বান্ধ	—	বন্ধন
করণক	—	ইন্দ্রিয়াদির
পাটের	—	পটুতার
আস	—	আশা
সুনুপাখ	—	শূন্যরূপ পাখা
ভিতি—পাঠান্তরে ভিড়ি	—	দৃঢ়ভাবে
চমন	—	রেচক, অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ
পাস	—	পার্শ্ব
বইঠা	—	বসা

শব্দার্থ (৫ম সংখ্যা) ঃ

বেঁগে	—	গতিতে
চিখিল	—	কর্দমাক্ত
থাহী	—	থৈ
ধামার্থে	—	ধর্মের জন্য
সাঙ্কম	—	সাঁকো
জোড়িঅ	—	জোড়া হ'ল
দিঢ়	—	শক্ত
ফাড্ডিঅ	—	ফাড়িয়া
আদঅ	—	অদ্বয়, চিরন্তন
পারগামী	—	পারাপারের লোকজন
লোহ	—	লোক
নিয়ড্ডী	—	নিকটে

শব্দার্থ (৬ সংখ্যা) ঃ

কাহারে	—	কাকে
ঘিনি	—	ঘিরে
অচ্ছহু	—	যুক্ত আছি
কিস	—	কিসে
বেঢ়িল	—	বেড় দিল
চৌদীস	—	চারদিকে
আপণা	—	নিজের
বৈরী	—	শত্রু
খনহ	—	ক্ষণমাত্র
অহেরী	—	শিকারী
তিন	—	তৃণ
ছুছু লই	—	স্পর্শ করা
পিবই	—	পান করা
পাণি	—	জল
নিলঅ	—	বাসভূমি
বোলঅ	—	বলে
তো	—	তুমি

দীসঅ	—	দেখতে পাওয়া
ভণে	—	বলে
পই সই	—	প্রবেশ করে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ঘিনি/ঘেনেলি	—	স্বরসঙ্গতি
খনহ	—	পদমধ্য-হ-ধ্বনির উচ্চারণ সংরক্ষণ
ভুসুকু ভণই	—	মুখ্য কারকে শূন্য বিভক্তি
পড়অ	—	অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতো 'অ' স্বর সংযোগ
ছাড়অ	—	ঐ
অচ্ছহু	—	বর্তমান অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে বহুবচন বিভক্তি 'হু'

শব্দার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞ্চা উঁঞ্চা	—	উঁচু-উঁচু
পাবত	—	পর্বত
মোরঙ্গী	—	ময়ূরাঙ্গিক
পীচ্ছ	—	পুচ্ছ
গিবত	—	গলায়
মৌলিল	—	মুকুলিত হ'ল
হিণ্ডই	—	ঘুরে বেড়ায়
দারী	—	নাগরী
কাপুর	—	কর্পূর
পঞ্চআ	—	বাণের পুচছ
লোড়িব	—	খোঁজা হবে

শব্দার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত	—	বস্তিতে
পড়িবেষী	—	পাড়া-পড়শি, প্রতিবেশী
নিতি	—	নিত্য, সর্বদা
আবেশী	—	অতিথি
বড়্‌হিল	—	বাড়িল
জা-অ	—	যায়
দুহিল	—	দোয়া

বেণ্টে — বাঁটে
সামায় — ঢোকে
বিআঅল — প্রসব করলো
গাবিআ — গাভী
বাঁঝেঁ — বাঁঝা
পিটা — পীঠে
সাঁঝে — সন্ধ্যায়
বুধী — বুদ্ধি
জো-সো — সেই যে
ষিআলা — শেয়াল
ষিহে — সিংহের
জুঝঅ — যুদ্ধ করে
বুঝঅ — বোঝে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

টালত — স্থানাধিকরণ
হাঁড়ীত — আধারাধিকরণ
মোর — সম্বন্ধপদ
সাঁঝে — কালাধিকরণ
বুঝঅ — অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতো 'অ' স্বরসংযোগ
সাঁঝ — সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ নাসিক্যী ভবন
দুহিত্র — দুহিএ < দুহ্যতে - ভাববাচ্য

শাব্দিক টীকা (১ সংখ্যক) ঃ

সমাহিঅ—সং সমাধ্যা > প্রাঃ সমাহিঅ
পুচ্ছিঅ—পৃচ্ছ + ক্ত = পৃচ্ছিতঃ (= পৃষ্টঃ) > পুচ্ছিঅ
ভিড়ি—√ভিড় (দেশী) + ইত > ভিড়িঅ > ভিড়ি
বইঠা—উপবিষ্টঃ > বইট্‌ঠ > বইঠা
আম্‌হে—অস্মাভিঃ > অম্‌হাহি > অম্‌হহি > অম্‌হে
দিঠা—দৃষ্ট > দিট্‌ঠ > (দীঠ) দিঠা

শাব্দিক টীকা (৫ সংখ্যক) ঃ

বেগেঁ < বেগেন

চিখিল < অবহট্‌ঠে 'চিখিল্ল'

'গাথা সপ্তশতী'তে 'কাদা' অর্থে 'চিক্‌খল্ল' ও 'চিক্‌খিল্ল' পদটি পাওয়া যায়।

থাহি—স্থাঘ + ইক = স্থাঘিক > থাহিঅ > থাহী

গঢ়ই—গ্রথতি > গঢই > গঢ়ই

চর্যাপদে 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। এর জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'গটই' পাঠ করেছেন, তবে অনেকের মতে 'গঢ়ই' পাঠই অনেকটা ভাষাতত্ত্ব সম্মত।

জোড়িঅ—'যুক্ত'-জাত প্রাকৃত ধাতু।

জোড + ইঅ (সংস্কৃত ক্ত-জাত) > জোডিঅ > জোড়িঅ।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

নিয়ড্ডী—নিকট > ণিঅড + হি > নিঅড্ডি > নিয়ড্ডী।

তুম্‌হে—*তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ) > তুম্‌হহি > তুমহে।

সামী > স্বামী।

শাব্দিক টীকা (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে।

ঘিনি—*গৃহ্নিত (= গৃহীত) > ঘিণিঅ > ঘিনি।

মেলি—সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি 'মেল্ল' + ইতা (সংস্কৃত-ক্ত প্রত্যয়জাত) > মিল্লিঅ > মেলি।

কীস—কী দৃশ্‌ > কীস। অথবা—কস্য > কিস্‌স > কীস।

বেঢ়িল—বেষ্টিত > বেড্‌টিঅ > বেঢ়িঅ + ইল্ল > বেঢ়িল।

শাব্দিক টীকা (২৮ সংখ্যক) ঃ

গুলী—*ঘূর্ণ > ঘুল্ল > গুল্ল > গুল + ঈ = গুলী।

ছাইলী—ছাদিত > ছাইঅ + ইল = ছাইল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)।

পরহিণ—পরিহিত > পরহিন।

মৌলিল—মুকুলিত > মউলিঅ + ইল = মউলিল > মৌলিল।

শাব্দিক টীকা (৩৩ সংখ্যক) ঃ

বড়্‌হিল—বর্ধিত > বড়্‌হিল + ইল (অতীত বাচক) = বড়্‌হিল।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ + (ই) ল (অতীত বাচক) বি আ অল, বি আ এল।

দুহিত্র—দুহ্যতে > দুহিঅই > দুহিত্র।

তিনা—ত্রীণি > তিন্নি > তিনি, তিনা।

মৌ—সংঘলু > স + উ > মউ > মৌ।

নিবুধী— < নির্বুদ্ধি। পুঁথিতে আছে 'মৌ ধনি বুধী'।

ধনি < ধন্য। পুঁথির পাঠে 'সেই বুদ্ধির প্রশংসা রয়েছে। কিন্তু মুনী দত্তের টীকায় 'সেই বুদ্ধির' নিকৃষ্টতার কথা আছে।

ষিআলা < শৃগাল।

ষিহে—সিংহেন > সিহেঁ = ষিহে।

গুঝঅ < যুধ্যতে।

বিরলেঁ—কিন্তু পুঁথিতে আছে 'বিচিরলেঁ'। এটি লিপিভ্রম বলে অনেকের ধারণা।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (১ সংখ্যক) ঃ

সংপৃষ্ঠ > পচ্ছিত > পুছিঅ—জিজ্ঞাসা করিয়া।

চীএ—চিত্ত > চীঅ + এ (অধিকরণ বিভক্তি) = চীএ।

সুখে দুখেতেঁ—সুখে দুঃখে—অধিকরণ কারক এবং সুখ ও দুঃখের দ্বারা—করণকারক।

নিচিত—নিশ্চিত—অর্ধ তৎসম।

এড়ি এউ—ছাড়া হোক—অনুজ্ঞাকর্ম।

করণক—ইন্দ্রিয় সমূহের - ষষ্ঠী।

পাটের—পটুতার - সম্বন্ধপদ।

ভিড়ি—দৃঢ়ভাবে—অঙ্গে অঙ্গে চেপে—অসমাপিকা ক্রিয়া।

পইঠো—প্রবিষ্টঃ > পইটঠ্ (সমীভবন) > পইঠো।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৫ সংখ্যক) ঃ

নিয়ড্ডী—নিয়ড্ডী / নিঅডি—য়-শ্রুতি।

দিঢ় - দৃঢ় / দিঢ় - তদ্ভব।

জোড়িঅ—অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মতোই স্বরসংযোগ ঘটেছে—জোড়ি + অ।

ফাড়িঅ—ঐ-ফাড়ি + অ (কর্মবাচ্যে ও এইরূপ (ইঅ) প্রয়োগ দেখা যায়।

মাঝ—মধ্য > মজ্ঝ > মাঝ—সম-যুগ্ম ব্যঞ্জন বর্ণের একক ব্যঞ্জনে সরলীকরণ এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তি হ্রস্বস্বরের পূরক দীর্ঘত্ব।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

হোহী—ভব > হো + হি + (প্রাচীন অনুজ্ঞা ক্রিয়া বিভক্তি রক্ষিত) > হোহী।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে (কর্ম বিভক্তি)।

যিনি—অসমাপিকা ক্রিয়া।

মেলি—অর্থ (ত্যাগ করে) প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ‘ত্যাগ করা’ অর্থে ‘মেল্ল’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়।

পড়অ—পততি > পড়ই (মূর্ধণ্যীভবন ও ঘোষী ভবরণ)

তর মঁন্তে ✓ এস্ + শতৃ = এ্যসান্তে > তরসন্ত + এঁ = তরসন্তেঁ > তরসঁন্তো (নাসিক্য ধ্বনির পূর্ব সংক্রম।)

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞ্চা—উচ্চ > উঞ্চ (বিষমীভবন) + আ (স্বার্থে) সংস্কৃত বসতি > বসই—তদ্ভব শব্দ।

গুঞ্জরী—গুঞ্জার (ফুলের) হার—ষষ্ঠী, স্ত্রীলিঙ্গ।

মা—নিষেধার্থে - অবহট্‌ঠ।

মহাসুখে—মহাসুখের দ্বারা—করণ, মহাসুখেতে অধিকরণ।

নির্বাণে > নিবাণে—অধিকরণ।

পাইসন্তে—প্রবেশ করতে—শতৃজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

কই সে—কি প্রকারে। করণকারক।

লোড়িব—খোঁজা হবে। কর্মবাচ্য।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত—টাল + ত (অন্তঃজাত অধিকরণ বিভক্তি)।

বড়্হিল—বর্ধিত > বড়্হিঅ + ইল (অতীতবাচক) = বড়্হিল।

দুহিল—* দুহিত (= দুগ্ধঃ) > দুহিঅ + ইল (অতীত বাচক)।

দুহিল—বিশেষণ পদ।

দুধু—দুগ্ধ > দুদ্‌ধ > দুধ (= দুধ) > দুধু (স্বরসঙ্গাতি)।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ > (ই) ল (অতীতবাচক)।

ষামাঅ—সমায়তি > সমাআই > সমাই > সামাই (স্বরসঙ্গাতি)।

ষম = সম (অনুসর্গ)।

৪১.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগোষ্ঠীর দাবি প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এর ভাষারীতি রহস্যময়। ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’, ‘সরহের দোহা’, ‘কৃষ্ময়াচার্যের দোহা’ ও ‘ডাকার্ণবে’র পুঁথি একসঙ্গে প্রকাশ করে তার মুখবন্ধে, (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পৃষ্ঠা ৬) লিখেছেন—

“যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।” হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই মতামত ভাষাতাত্ত্বিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নেননি। ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার নানা পত্র-পত্রিকায় এবং ১৯২০ সালে ‘The History of the Bengali Language’ বক্তৃতামালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চর্যা ও দোহাকোষগ্রন্থ দুখানিকে হিন্দি ভাষায় রচিত বলে মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে ধ্বনি তত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ডাকার্ণব ও দোহাগুলির ভাষা পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশ। কিন্তু চর্যার ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব যে বেশি সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন। তৎকালীন যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল সর্ব ভারতীয় গণ সাহিত্য রচনার সাধারণ মাধ্যমে। তার প্রতিফলন স্বাভাবিক ভাবেই চর্যাপদের ভাষাতে দেখা যায়। তবে চর্যাপদের বেশির ভাগ শব্দই যে মাগধী অপভ্রংশ জাত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান কালের ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অসমিয়া ভাষা বৃহত্তর বঙ্গাদেশের উপভাষারূপেই গণ্য হতো। তাই এই দুই ভাষার সঙ্গো চর্যার ভাষার ক্ষীণ যোগ থাকতেও পারে। মৈথিল ভাষার কয়েকটি ক্রিয়াপদ ও চর্যায় আছে। তবে এসব উপাদান আগন্তুক। সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে তাঁদের সহজিয়া সাধনতত্ত্বমুখী করতেই কথ্য ভাষা তথা উপভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ড. নির্মল দাশের মন্তব্য—"এই ভাষা বহু উপভাষাবিশিষ্ট একটি মান্যেতর (Non-standard) কথ্য ভাষা।"

চর্যার রহস্যময় ভাষারীতি 'সন্ধ্যা' বা 'সান্ধ্য' ভাষারূপে পরিচিত। নানা গবেষণা ও আলোচনার সূত্র ধরে চর্যাগীতির ভাষাতে বাংলা এবং তা বাংলাদেশের বাঙ্গালীর রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির অব্যবহিত জননীও এই মাগধী অপভ্রংশ। এদিক থেকে এরা বাংলার সমগোত্রীয়। এই জন্যই ভাষাগত বিচারে মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া ভাষা সম্প্রদায় চর্যার সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দাবি করেন। অন্যদিকে দেখা যায়, চর্যাগীতির ভাষাগত মূল কাঠামোটি শৌরসেনী অপভ্রংশের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দি ভাষা এই অপভ্রংশ থেকেই সৃষ্ট। এই যুক্তি দিয়েই হিন্দি ভাষীর চর্যাপদ রচনার দাবি করে থাকেন। আঞ্চলিক এই দাবিদারদের দাবি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত সেটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মৈথিলী ভাষা সম্প্রদায়ের যুক্তি হলো চর্যার অধিকাংশ কবি মৈথিলী ভাষী। চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে মৈথিলী ভাষার প্রচুর মিল আছে। চর্যায় নাসিক্য ধ্বনির প্রাচুর্য ও দন্ত্য শিস্‌ধ্বনির প্রাচুর্যের সঙ্গো মৈথিলী সাদৃশ্য আছে। ব্যাকরণগত নানাদিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। যেমন চর্যার 'আজি', 'সাঙ্গাম', 'তেন্তলী', 'টাঙ্গী' প্রভৃতি শব্দ মৈথিলীতে ব্যবহৃত। চর্যার অনেক ইডিয়ম ও প্রবাদ-প্রবচন মৈথিলী ভাষায় আছে।

কিন্তু এই যুক্তিগুলি ধোপে টেকে না। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা ভাষারও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। চর্যার যে শব্দগুলি মৈথিলী বলে দাবি করা হয় সেগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারেরও সম্পদ। চর্যার ইডিয়ম ও প্রবচনগুলি প্রাচীন বাংলার সম্পদ বলে গ্রহণ করতে ভাষাতাত্ত্বিক বাধা নেই। চর্যার যুগে চর্যাকারগণ ছিলেন 'বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গাভাষী'। তখন বিহার এই ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ড. সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও হিন্দিভাষীদের দাবি নস্যাৎ করেছেন। সুনীতিবাবুর মতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি যখন গড়ে উঠেছিল, তখন শৌরসেনী অপভ্রংশ পূর্ব ভারতের লোকজীবনে সাহিত্য সৃষ্টির সাধারণ বাহন হিসাবে বিবেচিত হতো। সুতরাং চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের ব্যাপক প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ হিন্দিপ্রেমিক পণ্ডিতগণ চর্যার ভাষাকে প্রাচীন হিন্দি ভাষা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের এ সম্পর্কে যুক্তি হ'ল চর্যার শব্দরূপ হিন্দি শব্দরূপের খুব কাছাকাছি। চর্যা হিন্দির চিরাচরিত দোহা ছন্দে রচিত। কবিগণ বিহারের অধিবাসী ইত্যাদি। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সহজেই খণ্ডন করা যায়।

চর্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশ পদের প্রাচুর্য থাকলেও ভাষাগত মূল কাঠামোটির কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাঠামোটি বাংলার কাছাকাছি। দোহা ছন্দ থাকলেও তা সীমাবদ্ধ। বিহারের নন, চর্যাকারগণ ছিলেন বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গাবাসী।

বিজয় চন্দ্র মজুমদার হিন্দির পাশাপাশি চর্যাপদে ওড়িয়া লক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর মতে, 'যামায়' নিঃসন্দেহে ওড়িয়া পদ। জঁহি, তঁহি, এঠু ইত্যাদি শব্দে এবং অধিকরণ পদ চান্দরে, বিষয়রে, ক্রিয়াপদ—অছ, ফিটিলি, অন্যান্য ওড়িয়া পদ যথা চিখিল, বেণি ইত্যাদির মধ্যেও সেই লক্ষণ আছে। ওড়িয়া শব্দের কিছু কিছু ব্যবহার দেখে চর্যাকারগণ ওড়িয়াবাসী এবং ওড়িয়া ভাষায় গীত রচনা করেছেন—এ দাবি কেউই মেনে নিতে পারেন নি। ঠিক একইভাবে অসমিয়ারাও দাবিদার হয়েছেন। তবে হিন্দি ও মৈথিলী ভাষার দাবিদারগণ সোচ্চার। কিন্তু খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই সমস্যার সমাধান হবে না। চর্যাগানের ভাষা-পরিচয়গত সমস্যার মূলে রয়েছে ভাষাগত উত্তরাধিকারের বিষয়টি। নব্যভারতীয় আর্যভাষার দাবিদার হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা। হিন্দির জন্ম শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে, অপর চারটি ভাষার উৎস মাগধী অপভ্রংশ। চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের যে প্রাচুর্য দেখা যায় তা ঋণ গ্রহণ সূত্রে আহৃত। চর্যা ভাষার রূপতত্ত্বে হিন্দি ভাষার রূপ তত্ত্বর ধারাবাহিক কোনো যোগসূত্র নেই। চর্যাগীতির সঙ্গো হিন্দির ভাষাগত উত্তরাধিকত্বের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

অপর চারটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক প্রত্ন ঔপভাষিক সম্পর্ক আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু চর্যার যুগে স্বাধীন ভাষার স্তরে পৌঁছতে পারে নি। এর ভাষা বহু উপভাষা বিশিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য একটি কথ্য ভাষা। যাকে মগধীয় প্রত্নভাষা বলা যায়। এই ভাষার মধ্যেই সুপ্ত ছিল পরবর্তীকালের বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়া ভাষার বীজ। চর্যার প্রত্ন ভাষায় বঙ্গীয় প্রত্ন উপাদানের মাত্রা বেশি আছে। তাছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও বলা যায়—চর্যাগীতির ভাষা বাংলা এবং এইসব গীত রচনা করেছেন অধিকাংশ বাঙালি। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষের যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো।

চর্যার ভাষার নিজস্ব সম্পদ বাংলা পদ ও ইডিয়মগুলি। চর্যায় আমরা খাঁটি বাংলার শব্দরূপ দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ 'সুখে-দুখেতে', 'পাটের আস', 'হাঁড়ীত ভাত নাহি'—ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ ক্রিয়া বিভক্তিও চর্যাগীতিতে প্রচুর আছে। যথা—'গুণিআলেহুঁ', 'দুহিল দুধু', 'থির করি' ইত্যাদির প্রয়োগ বাংলা দেশের বাগ্‌ধারার একমাত্র সম্পদ।

শব্দরূপে তৃতীয়ায় তেঁ (৩) —'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরি অই'। ৪র্থীতে—রেঁ (রে)—'সো কর উ রসরসানারে কংখা'। ৬ষ্ঠীতে—এর (র) 'হরিণা হরিণীর নিলঅন জানী'। সপ্তমীতে—তঁ, তে (তেঁ)-এ—'হাড়ীত ভাত নাই', 'বেন্টে যামাঅ' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ চর্যাগীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, 'দি আঁ চঞ্ঝালী।' সঙ্গো, সাঙ্গো—'দুজ্জন সাঙ্গো অবসরি জাই। 'ডোম্বী এর সঙ্গো জো-জোই রত্তো' ইত্যাদি।

বিশিষ্ট ক্রিয়াবিভক্তি—'ইব' (ভবিষ্যতে)—'কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস।'

ইল, ইলা (অতীত)—'জে জে আইলা সে সে গেলা'। 'সসুরানিদ গেল'।

অস্ত্যর্থক ধাতুরূপে 'আছ' ও 'থাক' ধাতুর ব্যবহার—'জইতো মূঢ়া আচ্ছসি ভান্তী।'

চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের অধিকাংশই বাংলাদেশে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের ধারাটি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও ক্রমপ্রবহমান।

দৃষ্টান্ত ঃ 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী'—প্রবাদটি শ্রীকৃষ্মকীর্তনে এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বহুল ব্যবহৃত।

'জো সো চৌর সেই দুষাধী'—ভাষান্তরে রামেশ্বরের শিবায়ণে—'দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্যে গলাকাটা' হয়েছে।

'হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী'-র সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের—'অষ্টাসিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত' তুলনীয়।

চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে 'বঙ্গাল', 'বাঙ্গালী'—জাতিবাচক শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'বঙ্গ' ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশের নাম কোথাও নেই। পদশীর্ষে রাগ নির্দেশে 'গৌড়' নামটিও পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি নামও চর্যার গানে ছড়িয়ে আছে যেমন ডোম, চণ্ডাল, তাঁতি, তাম্বুলি, শুড়ি, গোয়ালা ইত্যাদি। কয়েকজন পদকর্তার নামেও এইরূপ জাতিবাচক ইঙ্গিত আছে।

জন্মগত দিক দিয়ে কিংবা কর্মযজ্ঞানুসারে চর্যার অনেক সাধক কবিই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি সরহ, লুই, শান্তি রক্ষিত, কুক্কুরী পাদ, শবর পাদ প্রমুখ কবি বাংলাদেশেই থাকতেন। মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যার ৪৯ সংখ্যক পদে 'বাজনার পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ'-চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের মহানদী বা পদ্মানদীর আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। ভুসুকুর একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটিও আছে।

নদী, সাঁকো, নৌকা, নদী পার পারের দৃশ্য ইত্যাদির পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণির যে জীবনচিত্র চর্যাপদসমূহে আছে, তার মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন ও প্রকৃতি চিত্রই প্রতিফলিত।

চর্যার গানগুলি যে সব অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, সেই অঞ্চলগুলি বাংলার শাসনকর্তাদেরই অধীন ছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে তালপাতার পুঁথিতে চর্যার পদ ও টীকাগুলি পেয়েছিলেন তা বাঙলা অক্ষরেই লেখা। এছাড়া চর্যার ভাষা ও সাহিত্য রীতির অনুবর্তন বাংলাসাহিত্যে যেমন হয়েছে, চর্যার দাবিদার অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে তেমন হয় নি।

চর্যার প্রবাদ প্রবচন, ব্যাকরণগত ভাষাগত নানাদিক ও প্রকৃতি জীবন চিত্র, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সামাজিক তথ্যাদি থেকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালির নিজস্ব সম্পদ। চর্যাপদে বৃহত্তর বঙ্গের এমনকি বহির্বঙ্গের নানা প্রভাব থাকতেই পারে তবে সেসব উপাদান আগন্তুক।

৪১.১১ বিশিষ্টতা—উপসংহার

বিশিষ্টতা ঃ সাধনার ভিত্তিমূলে আছে গুরুবাদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সাধনাতেই গুরুবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। চর্যাগীতিতেও এই গুরুবাদের বিশেষ গুরত্ব ও স্বীকৃতি আছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের গূহ্য সাধনার বিষয় ও সাধন পদ্ধতি জানার জন্যই বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থাদিতে গুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ও নানাদিক থেকে তান্ত্রিক যোগাচারের প্রভাবে প্রভাবিত। পরমসত্য বা সহজানন্দ জপ-তপ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত শাস্ত্রপাঠেও জানা সম্ভব নয়, এর জন্যই সদ্‌গুরু বচনকে পাথেয় করে তাঁর নির্দেশিত পথেই চলার জন্য চর্যাকারগণ বলেছেন। লুইপাদের “লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅজাণ।।” এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তবে এই গুরুবাদে গুরুকে ‘সহজ’ লাভের উপায় হিসাবেই চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন। গূহ্য সাধনতত্ত্বের ভাষাও প্রহেলিকাচ্ছন্ন। রূপকে সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে এই সাধনতত্ত্ব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য। কাব্যমূল্যের বিচারে, দেশ-কাল-সমাজ ভাবনার আলোকে ১০ম—১২শ শতাব্দীতে (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে) রচিত চর্যাগীতিগুলি বাংলা সাহিত্য ধারার উৎসরূপে চির-চিহ্নিত।

পাঁচজন চর্যাগীতিকারের ৫টি গীত আপনারা পড়ে পদকর্তা পরিচিত, প্রতিটি পদের বাচ্যার্থ, গূঢ়ার্থ জেনে প্রাচীন যুগের সমাজচিত্র সম্পর্কে আপনাদের মনে যে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, তার উপাদান ‘সমাজচিত্র’ অংশে আপনারা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্ম ভাবনার স্বরূপটিও ‘অধ্যাত্ম ভাবনা’ অংশে আলোচিত হয়েছে। কাব্যমূল্য বিচার, শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানাদিক থেকে চর্যাপদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। গূঢ় সহজিয়া সাধনতত্ত্বমূলক পদগুলি যাতে সহজে অনুধাবন করতে পারেন, তার জন্য এই পর্যায়ের প্রতিটি অংশও সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশ-কাল-সমাজের নানা অঙ্গ যথা—ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, জীবন জীবিকা, দৈনন্দিন জীবনচিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও মোটামুটি ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাগীতির ধারার অনুবর্তনেও দেখা যায় তুর্কী আক্রমণের পর বাংলদেশে সবদিক থেকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তা থেকে ধর্মচর্চা ও ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও রেহাই পায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদ আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আর্নল্ড বাকে প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরো কিছু চর্চাগীত আবিষ্কার করেন। তবে ভাষাগত বিচারে এই পদগুলি অর্বাচীন হলেও বিষয়বস্তু রচনারীতি ও রূপকের দিক থেকে এই সব গান প্রাচীন চর্যা গানেরই নিখুঁত অনুবর্তন। চর্যাগীতির ধারা বাংলাদেশ লুপ্ত হয়ে গেলেও চর্যা পদকর্তার সহজিয়া তান্ত্রিক-ধর্ম-সাধনার রূপরেখাটি পরবর্তীকালে নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখা ও বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মভাবনার মধ্য দিয়ে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চর্যাগীতির ভাবগত ধারাটি বাউল গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনা ও ব্যক্তি সচেতন আধুনিক সাহিত্যের যোগসূত্র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে পাওয়া যায়। ঔপনিষদিক দীক্ষা ও বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগের ফলেই ব্রহ্মচিন্তা ও মনের মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনায় একাত্ম হয়েছিল। হাজার বছরের চর্যাগীতের ঐতিহ্য নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগেও প্রবহমান।

৪১.১২ অনুশীলনী

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) ‘পিবই’ শব্দটির অর্থ হ’ল ———।

(খ) ‘ধমন-চমন-বেণি-পাণ্ডি-বইঠার’ মধ্য দিয়ে কবি ——— পদ্ধতির কথা বলেছেন।

(গ) ‘লুই’ শব্দটি ——— শব্দ থেকে উদ্ভূত।

(ঘ) লুইপাদ ও মীননাথ দুজন ——— ব্যক্তি।

(ঙ) বিষয় বাসনা চিত্ত ——— হয়।

(চ) ভুসুকুপাদ ——— কে চঞ্চল চিত্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(ছ) শবরী হলেন ————।

(ছ) বাসনার নিবৃত্তিই ——— এর প্রকৃত উপায়।

২। **নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিকচিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।**

	ঠিক	ভুল
(ক) ১নং পদটি ঢেণ্ঢন পাদের লেখা	☐	☐
(খ) নিবৃত্তির দ্বারা মহাসুখ লাভ হয়।	☐	☐
(গ) পরম নির্বাণ লাভের জন্য গুরুর নির্দেশের প্রয়োজন নেই।	☐	☐
(গ) চিত্ত হরিণ শান্ত-ধীর।	☐	☐
(ঙ) জরা-মৃত্যু ভীত জীবন ‘শৃগাল’ সম।	☐	☐
(চ) চর্যাপদে মহাযানী-তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।	☐	☐

৩। **নিচের চরণগুলির সাধারণ ও তত্ত্বগত দিক ব্যাখ্যা করুন। (৪টি বাক্যের মধ্য দিয়ে)**

(ক) ‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।’

....

....

....

(খ) 'উঁচা-উঁচা পাবত তহি বসই শবরী বালী।'

....

....

....

(গ) 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

....

....

....

৪। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। (তিনটি বাক্যের সাহায্যে)

(ক) ঢেণ্ঢনপাদ তাঁর পদে কাকে চোর বলেছেন?

....

....

....

(খ) ঢেণ্ঢন পাদ কাকে 'শৃগাল' এবং কাকে 'সিংহ' বলেছেন?

....

....

....

(গ) পঞ্চভূত ও পঞ্চস্কন্ধ কি?

....

....

....

(ঘ) চর্যাপদের আদি পদকর্তা কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

....

....

....

(ঙ) শবরী কে? তার দেহশয্যার বর্ণনা দিন।

....

....

....

(চ) সহজিয়া তত্ত্ব সাধনা বলতে কি বোঝেন?

....

....

....

৫। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

পুচ্ছিঅ, সুনুপাখ, ভণই, সেজি, বিন্ধহ, সামায়।

৬। ব্যাকরণগত টীকা লিখুন।

নিচিত, পাটের বসই, নিবানে।

৭। নিচের দেওয়া তথ্যাদির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চর্যাপদ পাদাকুলক ছন্দে লেখা।	☐	☐
(খ) চর্যাপদের দাবিদার একমাত্র বাঙালি।	☐	☐
(গ) চর্যাপদের ভাষা সহজ-সরল।	☐	☐
(ঘ) চর্যাপদে নগরজীবন প্রাধান্য পেয়েছে।	☐	☐

৪১.১৩ উত্তরমালা

১। (ক) পান করা, (খ) প্রাণায়ম্, (গ) রোহিত, (ঘ) ভিন্ন, (ঙ) চঞ্চল, (চ) হরিণ, (ছ) নৈরাত্মা দেবী, (জ) মহাসুখলাভ।

২। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।

৩। (ক) দেহ যেন গাছের পাঁচটি ডাল।

পাঁচটি ডাল হলো পঞ্চ স্কন্ধ।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ।

এই পাঁচটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গাছের ডাল এবং দেহকে গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(খ) উঁচু উঁচু পর্বত। সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী বাস করেন। এই মহাসুখচক্র হ'ল—কায়া কঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর।

(গ) হরিণের শত্রু তার নিজের মাংস। হরিণের মাংসের লোভেই শিকারীর দল তাকে ঘিরে ফেলে। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে। তার চারদিকে জরা-মৃত্যু শিকারীর দল ধেয়ে আসে।

৪। (ক) সংসার জীবনে বিষয় সুখের প্রতি সকলের রয়েছে তীব্র আকর্ষণ। বিষয় সুখে মগ্ন চিত্তকেই ঢেণ্ঢন পাদ চোর বলে চিহ্নিত করেছেন। এই চিত্ত কখনই নির্বিকল্পরূপ লাভ করতে পারে না।

(খ) ঢেণ্ঢনপাদ বিষয় সুখে মগ্ন, জরা মৃত্যু ভয়ে ভীত চিত্তকে 'শৃগাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সর্ব ভীত চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখনই তা 'সিংহে' রূপান্তরিত হয়। এরপরই শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

(গ) পঞ্চভূত হ'ল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চস্কন্ধ হ'ল—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ। প্রাণায়মের দ্বারা পঞ্চভূতের অশুদ্ধ দেহ শুদ্ধ হয়।

(ঘ) চর্যাপদের আদি কবি লইপাদ। লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। লুইপাদের দুটি চর্যাগীতি চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়।

(ঙ) বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী হলেন শবরী। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করেছেন। গলায় গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পড়েছেন।

(চ) গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া সাধনা করতে হবে। কায়া সাধনার মধ্য দিয়েই বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এই নির্বাণ লাভের জন্য চাই গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণ।

৫। জিজ্ঞাসা করিও, শূন্যরূপ পাখা, বলে, শয্যা, বিদ্ধকর, ঢোকে।

৬। নিশ্চিত > নিচিত (অর্দ্ধতৎসম), পটুতার—সম্বন্ধ পদ, (সং) বসতি > বসই (তদ্ভব শব্দ) (সং) নির্বাণে > নিবাণে — অধিকরণ কারক।

৭। (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল।

৪১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি — ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২। চর্যাপদ — মণীন্দ্রমোহন বসু।

৩। চর্যাগীতির ভূমিকা — জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — (প্রথম খণ্ড — পূর্বার্ধ) শ্রীসুকুমার সেন।

৫। চর্যাগীতি — তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬। চর্যাগীতি পরিক্রমা — ড. নির্মল দাশ।

একক ৪২ ❑ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধা-বিরহ অংশ

গঠন

৪২.১ উদ্দেশ্য

৪২.২ প্রস্তাবনা

৪২.৩ মূলপাঠ

৪২.৪ মূল পাঠের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

 ৪২.৪.১ কাহিনী

 ৪২.৪.২ রাধা-বিরহ কাহিনীর নির্যাস

 ৪২.৪.৩ প্রতিটি পাদের সহজ ব্যাখ্যা

 ৪২.৪.৪ চরিত্রচিত্রণ

 ৪২.৪.৫ প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

 ৪২.৪.৬ নাট্যগুণ

 ৪২.৪.৭ কাব্যমূল্যায়ন

 ৪২.৪.৮ 'রাধা-বিরহ' অংশটি কি প্রক্ষিপ্ত?

 ৪২.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

৪২.৫ সারাংশ

৪২.৬ অনুশীলনী

৪২.৭ উত্তরমালা

৪২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল—

- তুর্কীবিজয়ের পর বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্ধকারময় যুগের আলোকবর্তিকারূপী বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিস্তারিত আলোচনার সূত্রে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে।
- বারোটি খণ্ডের সঙ্গো 'রাধাবিরহ' অংশটি যুক্ত। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষ ও ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম 'রাধা-বিরহ' একমাত্র এই শেষাংশের সঙ্গো 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নেই। 'রাধা-বিরহ' অংশের মধ্য দিয়ে রাধার প্রেম ভাবনার অতলান্ত রূপটি ধরা পড়েছে।

- 'রাধা-বিরহ' অংশের মোট বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা এবং কবিতাবলীতে কি কি রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে তার সংখ্যাতত্ত্ব স্পষ্ট রূপে ধরা পড়বে।
- রাধা-বিরহের মূল কাহিনী, অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই কাব্যাংশের পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্যান্য খণ্ডে কাহিনীর প্রাধান্য। কিন্তু রাধা-বিরহ অংশে ভাবের প্রাধান্য। এই ভাব-জগতের সন্ধানী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে নতুন ভাবনার অধিকার অর্জন করা সম্ভব হবে।
- গীতি কবিতার মূর্চ্ছনা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তার পথরেখাও চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে।
- 'রাধা-বিরহ' অংশে রাধাপ্রেমের মধ্যে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীর মধুর রসধারায় স্নাত রাধা-প্রেমের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।
- প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র আলোচ্য কাব্যাংশে যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে—সেদিকেও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হবে।
- কৃষ্ণহারা রাধার মর্মযন্ত্রণার কথা জানা যাবে।
- অন্যান্য খণ্ডে অশ্লীলতার ছোঁয়া থাকলেও এই অংশে তা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। প্রেমের স্বর্গরাজ্যে উপনীতা রাধার অন্তর বেদনা ও প্রেমভাবনার অনন্তরূপ সম্পর্কে চিন্তার জগতে রাধা চরিত্র সম্পর্কে নূতন ধ্যান-ধারণা জন্মাবে।
- এই অংশের ভাষাতাত্ত্বিক টীকায় আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার রূপ রেখাটি তুলে ধরায় সে যুগের ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই অংশের পার্থক্য কোথায়? তারও তথ্যাদি পাওয়া যাবে।
- রাধার ক্রমবিবর্তিত চিন্তা-চেতনার মনস্তাত্ত্বিক অতুলনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে।

৪২.২ প্রস্তাবনা

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গবেষকগণ এই কাব্যের অধিকাংশ পদের ভনিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ দেখে এবং গ্রন্থের ভাষা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি আলোচনা করে মতামত দিয়েছেন যে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন কবি। ভাবগত ও অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী কিছুটা অনুসরণ করে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীণ প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যখানি লিখেছেন। কাব্যখানিতে মোট ১৩টি খণ্ড আছে। তবে জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, বাণখণ্ড ইত্যাদি ১২টি খণ্ড লিখে ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম 'রাধা-বিরহ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এতে 'খণ্ড' শব্দটি নেই। মূল পুঁথিতে আছে— 'অথ রাধাবিরহঃ।' এই অংশটি খণ্ডিত। ১৮৯/২ পত্র থেকে ২২৬/২ পত্র পর্যন্ত 'রাধা-বিরহ' অংশ। মূল কাব্যের প্রথম ২টি পাতা ও শেষের ১টি পাতা পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত পুঁথির যা পাওয়া

গেছে তার উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ খণ্ডিত 'রাধাবিরহ' অংশে বাংলা কবিতা আছে মোট ৬৯টি এবং সংস্কৃত কবিতা আছে ১৭টি। প্রতিটি পদের সঙ্গে যুক্ত আছে রাগ-রাগিনী। তার সংখ্যা হ'ল মোট ২৩টি। এদের নাম যথাক্রমে বিভাষ, বেলাবেলী, ভৈরবী, ধানুষী, কোড়া, মালব, ভাটিআলী, ললিত, বঙ্গাল, কেদার ইত্যাদি। এছাড়া তাল, মান ও ধ্রুব পদেরও উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের সহজ সরল ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনী বিন্যাস করা হ'ল। রাধার বিরহ যন্ত্রণা, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাধা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়ে রাধার উজ্জ্বল প্রেমমূর্তিটি তুলে ধরা হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের রাধা ও এই এককের রাধার পার্থক্য লক্ষ্য করে চরিত্রটির স্পষ্ট বিবর্তন স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হবে। গীতি কবিতার সুর ভাব-গভীরতার ব্যঞ্জনা কিভাবে আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা জেনে 'রাধা-বিরহ' অংশের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, প্রেমবৈচিত্র্য ভাষাগত দিক ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচ্য অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষার এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অথরাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতঃপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি।।
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা।।

❑ এই রূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কোনো রকমে গৃহকর্ম করিয়া নিজের গৃহে কিছুকাল কাটাইলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী অপেক্ষাও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট রাধা বড়াইকে এইরূপ বলিলেন।।

৩৫০. বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

দূতা চিরকাল ভৈল   তভোঁ বনমালী নাইল
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে।
বড়ায়ি (১৯০/১) গো।। ১
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন   চিত্তে না পড়এ আন
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।। ২
আইল চৈত মাস   কি মোর বসতী আশ
নিফল যৌবন ভারে।। ৩
বিরহে আন্তর জলে   সুতিলোঁ কদমতলে
আধিক আন্তর মোর পোড়ে।। ৪
পরিধান নেত লাসী   হাথত মোহন বাঁশী
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে।। ৫

সুতিলোঁ সখির বোলে — সজল নলিনীদলে
তাতে হৈতেঁ আনল শীতলে।। ৬
ডালি ভরী ফুল পানে — মোরে পাঠায়িল কাহ্নে
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে।। ৭
তাম্বল না লৈলোঁ করে — তোক মাইলোঁ চড়ে
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে।। ৮
দূতী ধরোঁ তোর পাএ — হের মোর প্রাণ জাএ
কহ মোরে জীবন উপাএ।। ৯
বহে প্রভাত সমএ — মলয় শিয়ল বাএ
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।। ১০
সাগরসঙ্গাম গিআঁ — গাএর মাঁস কাটি (১৯০/২) আঁ
আপণা মগর ভোজ দিআঁ।। ১১
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ — হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ
আর তার না পায়িবোঁ লাগ।। ১২
কিবা পুরুব জরমে — খণ্ডব্রত কইল আহ্মে
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ।। ১৩
আণি দেহ বনমালী — বন্দিআঁ দেবী বাসলী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৪

❑ **রাধার উক্তি :** হে দূতী, অনেকদিন হইয়া গেল, তবু বনমালী আসিলেন না। তাঁহাকে কতকাল পরে আমি পাইব ।। ১।। স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি। এখন আর কিছু আমার মনে পড়ে না। তাঁহাকে কি প্রকারে পাইব ।। ২।। চৈত্রমাস আসিয়া গেল, নিষ্ফল যৌবনভার লইয়া আমার জীবনের কি আশা।। ৩।। বিরহে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কদমতলায় শুইলাম, তাহাতে হৃদয়জ্বালা আরো বাড়িল।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশি, সে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।। ৫।। সখীর কথায় সজল পদ্মপত্রে শুইলাম। আগুনও তাহা অপেক্ষা শীতল।। ৬।। ডালা ভরিয়া কৃষ্ণ আমাকে ফুল পান পাঠাইলেন, তাহা আমি হাত দিয়াও ছুঁইলাম না।। ৭।। হাতে পান লইলাম না, তোমাকে চড় মারিলাম, তাই কৃষ্ণ আমাকে অসুখী করিলেন।। ৮।। দূতী তোমার পায়ে ধরি, দেখো আমার প্রাণ যায়, আমার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দাও।। ৯।। প্রভাতকালে শীতল মলয় বাতাস বহিতেছে, বৃন্দাবনে কোকিল কূজন করিতেছে ।। ১০।। সাগরসঙ্গমে গিয়া নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া মকরকে খাওয়াইব।। ১১।। এ জন্মে বোধ হয় তেমন ভাগ্য করি নাই। কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইলাম, আর তাঁহার নাগাল পাইব না।। ১২।। পূর্বজন্মে হয়ত আমি খণ্ডব্রত করিয়াছি, তাহার ফলেই কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ১৩।। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ১৪।।

৩৫১. বেলাবলীরাগ ঃ ।। কুড়ুক্ক ঃ।।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ম করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।। ১
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ম আনিআঁ দেহ মোরে হে।। ধ্রু
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে।। ২
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ[১] তাহার বদনে (১৯১/১)।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে।। ৩
চউঠ পহরে কাহ্নু করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি প্রথমভাগে যে স্বপ্ন দেখিলাম সেই স্বপ্ন বিষয়ক সব কথা তোমাকে বলিতেছি বসিয়া শোনো। সে কৃষ্ম কদমতলায় বসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।। ১।। হে বড়াই, আমার জীবন নিষ্ফল, সেই কৃষ্মকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দেহে চন্দন লেপন করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া মধুর স্বরে আড়বাঁশি বাজাইলেন। অনন্তর তিনি রতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি সম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে ইহাই দেখিলাম।। ২।। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমি কৃষ্মের কোলে বসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া আমার মনোহরণ করিয়া লইলেন। আমি মদনপীড়িতা হইলাম।। ৩।। চতুর্থ প্রহরে কৃষ্ম অধর পান করিলেন। আমার রতিরসলালসা জাগ্রত হইল। এমন সময় দারণ কোকিলনাদে আমার নিন্দা ভাঙ্গিয়া গেল।। ৪।।

৩৫২. বিভাষরাগ ঃ ।। কুড়ুক্ক ঃ ।।

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্নু। আগ বড়ায়ি। চিত্তে মোর না পড়ে আন।। কি হরি হরি।।
হানিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি। তেঁ মোর দগধ পরাণে।। কি হরি হরি।। ১

মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি। আণিআর বনমালী।। ধ্রু
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে। না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ।।
ঝাঁটি করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ। রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ।। ২
এ মোর বাহুর বলএ। সব খন খসিআঁ পড়এ।।
অনমীষ নয়ন করিআঁ। বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ।। ৩
এবেঁ মোর সংপুন বএসে। কিকে কাহ্ন করে আমরিষে।।
ঝাঁ (১৯১/২) ট করী আন কাহ্ন পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, আমি স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিলাম। তিনি ছাড়া আমার চিত্তে আর কিছু স্থান নাই। ওগো বড়াই, মদন পঞ্চবাণ হানিল তাই আমার হৃদয়জ্বালা।। ১ ।। নবমল্লিকার কুঞ্জে মুকুল ধরিয়াছে। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দক্ষিণ হইতে মলয় বাতাস বহিতেছে। আমার শরীর কেমন করিতেছে জানি না। শীঘ্র কৃষ্ণকে লইয়া আসি, মিলনসুখে রজনী যাপন করি।। ২ ।। আমার এই বাহুর বলয় নিরন্তর খসিয়া পড়িতেছে। আমি ব্যাকুল হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার পথ চাহিয়া আছি।। ৩।। এখন আমার সম্পূর্ণ বয়স। কৃষ্ণ এখন ক্রোধ করে কেন? অবিলম্বে কৃষ্ণকে আমার পার্শ্বে আনো।। ৪ ।।

৩৫৩. ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকস্বা।।

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে। সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে।।
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ১
পাগলী রাধা গোআলিনী গো। কথাঁ পাব নান্দে[১] যশোদার পো।। ধ্রু
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ। সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর। কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার।। ২
বিথুর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে। তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে।।
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ। তাহাক করিব আহ্মে কমন উপাএ।। ৩
আনেক কাকুতী করে তোক গোআলিনী। আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।।
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (১৯২/১) স বাসলীগণ।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি :** কৃষ্ণের তাম্বুল তোমার হাতে দিলাম। আমার মাথায় সে তাম্বুল ভাঙ্গিলে। এখন তোমার মন ঘুসঘুস করিয়া পুড়িতেছে। তোমার নবযৌবন পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখো।। ১।। পাগলী গোয়ালিনী রাধা, নন্দযশোদার পুত্রকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। রাধা, তোমার গায়ে যে গন্ধ চন্দন দিলাম তাহা তুমি বাম পায়ে মুছিলে। এখন আর কি বলিতেছ? কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।। ২।। কৃষ্ণের জন্য তোমাকে বিস্তর বলিয়াছি। তখন তুমি আমাকে বাম হাতে চড় মারিলে। এখন কৃষ্ণের জন্য তোমার প্রাণ যায়। আমি তাহার কি উপায় করিব।। ৩।। তোমাকে অনেক কাকুতি করিয়া দেব চক্রপাণি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। এখন নিজের মন নিবারণ করিয়া থাকো।। ৩

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো।

৩৫৪. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার। ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে[১] সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।। ১
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান। আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্নু।। ধ্রু
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর। যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবেঁ কাহ্নু না মিলিহে করমের ফলে। হাতে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।। ২
কাহ্নু সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী। আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী।।
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার। আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্নু একবার।। ৩
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর। এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলান্ত বিদূর।।
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস (১৯২/২) লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, এ ধন-যৌবন সবই অসার। গজমুক্তার হার ছিঁড়িয়া ফেলিব। মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব।। ১।। নিষ্ঠুরা বড়াই গো, আমার প্রাণদান করো। নিজের ভাগ্যদোষে কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ধ্রু।। মাথা মুড়াইয়া সাগরে যাইব। যোগিনী বেশ ধরিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব। যদি কর্মফলে কৃষ্ণকে না পাই তাহা হইলে হাতে তুলিয়া বিষ খাইব।। ২।। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইল না। আমার অঞ্চলের ধন বিধাতা হরণ করিলেন। বড়াই গো, এখনো প্রতিকার করো, কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও।। ৩।। আমার মাথায় শম্ভুসদৃশ খোঁপা, আমার সীমন্তে সিন্দুরী। তাহা দেখিয়াও কৃষ্ণ দূরে গেলেন কেন? আমাকে অনাথ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।। ৪

৩৫৫. ভৈরবীরাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।।

কাল কাহ্নঞিঁ[১] কঠিন তার আন্তর ল বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ গেল বৃন্দাবনে।। ১
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্নু এবেঁ গেল নিজ থান তাক পাইব কেনমনে।। ধ্রু
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে তোর নেহে তিনাঞ্জলী[২] দিআঁ।। ২
কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাহবোঁ আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী তবেঁ তাক আণো গোআলিনী।। ৩
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত (১৯৩/১) বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো। ❑ ২ অ। প্র ঃ নান্দো।

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** কৃষ্ণের বর্ণ কালো, তাঁহার অন্তর কঠিন। অনুরোধ উপরোধে তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেমলাভের আশায় অনেক সন্তাপ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। নিজের মনকে নিবারণ করিয়া থাকো। নিজের মান রাখিয়া কৃষ্ণ নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর কেমন করিয়া পাইবে।। ধ্রু।। তোমার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়াছে। তিনি ভালমন্দ কিছু না মানিয়া তোমার প্রেম বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।। ২।। কোন্ পথে যাইব এবং কোথায় তাঁহার নাগাল পাইব, হে সুবদনী, তুমি নিজেই সে কথা বলো। অনেক কৌশল করিয়া মুরারিকে জানিতে হইবে। তবে ত তাঁহাকে লইয়া আসিব।। ৩।। সেই নটরূপী গদাধর বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইব।। ৪।।

....

৩৫৬. কোড়ারাগঃ ।। রূপকং ।। লগনী।। দণ্ডকং।।

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ। সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ।। ১
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ। কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ।। ২
বসন্তকালে কোকিল রাএ। মণে মনমথ সে বাণ তাএ।। ৩
আহ্মার বোল সাবধান হয়। বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।। ৪
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে। আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে।। ৫
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়। সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ।। ৬
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে। আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে।। ৭
বাঘ ভালুকে আতি গহনে। কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে।। ৮
বাঘ ভালুকে বা আহ্মার খাউ। কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ।। ৯
যমুনা বহে খরতর ধার। কেমতেঁ তাহাত হয়িবেঁ পার।। ১০
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে (১৯৩/২) ।। ১১
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১২

....

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, এসো আমার প্রাণ রক্ষা করো। মন্মথর বাণ আর আমি সহিতে পারি না।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ মন্মথ কোথায়? কোথায় তাঁহার বাণ? কোন্ বাণেই বা তিনি প্রাণ লন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ বসন্তকালে কোকিল ডাকিতেছে। মনে মন্মথ আর এই কোকিলের ডাক তাঁহার বাণ।। ৩ ।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথায় মন দাও। বাহিরে চন্দ্রকিরণে শয়ন করো।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ চন্দ্রকিরণে শুইব কি? তাহাতে মদনের দাহ আরো অধিক বাড়িয়া যায়।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথা যদি তোমার পছন্দ হয় তবে শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাও।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ সেই চন্দনে দেহ পুড়িয়া যায়। আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাও।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ গহন অরণ্যে অনেক বাঘ ভালুক। সে বৃন্দাবনে কেমন করিয়া যাইবে।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ বাঘ ভালুকে আমায় খায় ত খাক্। কৃষ্ণের জন্য যদি প্রাণ যায় সেও ভাল।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ যমুনা খরধারায় বহিতেছে। তাহাতে পার হইবে কি করিয়া।। ১০।। রাধার উক্তি ঃ তরঙ্গচঞ্চল যমুনার জলে যদি ডুবিয়া মরি তাহা হইলে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিব।। ১১।। বড়াইর উক্তি ঃ কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করো।। ১২।।

৩৫৭. বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল। প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।। ১
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে। এহি চিহ্নে কাহ্নঞিঁকে চাইহ গোকুলে।। ২
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ। করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ।। ৩
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে। যোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে।। ৪
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ। চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ।। ৫
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান। শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন।। ৬
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে। আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে।। ৭
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে। মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে।। ৮
তথাঁ ন (১৯৪/১) পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে।। ৯
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে। শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে।। ১০
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে। তরুগণে চঢ়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে।। ১১
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে। তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে।। ১২
তথাঁত চাহিআঁ না পাহ যবেঁ কাহ্ন। তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান।। ১৩
তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে। গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে।। ১৪
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে। তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে।। ১৫
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে। সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে।। ১৬
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে। তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে।। ১৭
তথাঁ সুধি পাইবোঁ যথা বসে (১৯৪/২) জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে।। ১৮
তোল বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১৯

❑ **রাধার উক্তি :** হে বড়াই, শত পল সোনা লইয়া প্রাণনাথ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলো।। ১।। তাঁহার বর্ণ কালো, তাঁহার মাথায় ঘোড়া চুল, এই চিহ্নে গোকুলে তাঁহার খোঁজ করিবে।। ২।। গায়ে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া হাতে করতাল ও মুখে মধুর বাঁশি বাজান।। ৩।। কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবাস, যোলো শত গোপী তাঁহার পাশে পাশে যায়।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, তাহা সম্মুখে পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পায়ে নূপুর রুণুঝুনু বাজিতেছে।। ৫।। বড়াই, এক কর্পূরবাসিত পানসুপারি লইয়া যাও, কষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া আনো।। ৬।। আগে বসুদেবের ঘরে তাঁহার খোঁজ করিও। তাঁহার বালকস্বভাব অনেক মায়া করেন।। ৭।। সেখানে না পাইলে যশোদার কোলে খোঁজ করিও, নিদ্রাবেশে সেখানে মায়া পাতেন।। ৮।। সেখানেও না পাইলে যমুনার কূলে দেখিও, গো-বৎস চরাইবার জন্য তিনি গোকুলে

১ 'কাহ্ন' তোলাপাঠে। ❑ ২ 'চাইহ' তোলাপাঠে। পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

যান।। ৯।। সেখানে না পাইলে যমুনার ঘাটে দেখিও, বালকদের সঙ্গে কৃষ্ম যমুনার নিকটেই বেড়ান।। ১০।। বৃন্দাবনে ফল খাইবার জন্য তিনি গাছে গাছে চড়েন। সেখানেও ভাল করিয়া খোঁজ করিও।। ১১।। হাতে তাঁহার লাঠি, মহানন্দে তিনি বাঁশি বাজান। নারদ মুনির সঙ্গে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে।। ১২।। সেখানেও না পাইলে গোপগণের আবাসে তাঁহার খোঁজ করিও।। ১৩।। সেখানে খোঁজ করিয়া সঙ্কেতস্থানে যাইও যেখানে তিনি গোপীগণসহ কেলি করেন।। ১৪।। সেখানেও যদি না পাও তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে গিয়া তাঁহার সন্ধান করিবে।। ১৫।। সেখানে না পাইলে সাগর গোয়ালার ঘরে গিয়া ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে।। ১৬।। সেখানেও তাঁহাকে না পাওয়া গেলে সকলের কাছে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিও।। ১৭।। তাহা হইলে জগন্নাথ কৃষ্ম কোথায় থাকেন সে সংবাদ জানিতে পারিবে। আদ্যন্ত সব কথা তোমাকে বলিলাম।। ১৮।। তোমার কথায় কৃষ্ম আমার নিকটে আসিবেন।। ১৯।।

....

৩৫৮. ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢী ল বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর হাত আনুমতি কর আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নঞিঁ।। ১
রাধা ল। না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা তরেঁ কাহ্নঞিঁ মেলিব তোহ্মারে।। ধ্রু
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আওর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ।। ২
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মধুরা পুরী নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।। ৩
চল তোঁ মথুরা পুরী (১৯৫/১) তথাঁ তোকে পাইবে হরী না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্দ বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** হে সুন্দরী রাধা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি। চলিবার শক্তি আমার নাই। আমি যে কথা বলি তাহাতে সম্মত হও। নিজেই কৃষ্মের সন্ধান করো।। ১।। রাধা আমার কথা অবহেলা করিও না। যে পথে তাঁহার উদ্দেশ পাও সেই পথে নিজে যাও সেখানে কৃষ্মকে পাইবে।।ধ্রু।। খুঁজিতে খুঁজিতে যখন কৃষ্মের নাগাল পাইবে তখন বিনয়সহকারে তাঁহাকে বলিও। আর একটি উপায় বলি, তুমি তাঁহার পায়ে ধরিও, তবেই তিনি তোমার প্রতি সদয় হইবেন।। ২।। কৃষ্মের সন্ধানে মথুরাপুরীতে এবং নানা পর্বতে গিরিগুহায় ও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিও। অনেক কষ্ট করিয়া চণ্ডীকে পূজা মানত করিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৩।। মথুরা নগরে চলো, সেখানে কৃষ্মের দেখা মিলিবে। তাঁহাকে পাইলে আর তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিও না।। ৪।।

৩৫৯. মালবরাগঃ।। একতালী।।

দধি দুধে সাজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল। জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে।। নাএ।।

আল হের। না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল। তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা।। নাএ।। ১
আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে।। নাএ।। ধ্রু
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। কণ্নত কুণ্ডল হিরার ধার।।
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে। কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে।। ২
যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ। তখনেই তাক না এড়িবোঁ।।
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন্মনে। কাহ্নঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে।। ৩
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে। না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে।।
যত কৈল সব মতিমো (১৯৫/২) যে। গাইল বডু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে বড়াই দধিদুধ সাজাইয়া লইয়া মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে যাইব। দেখো বড়াই, সেখানে যদি দুধ না বিকায় তবু ত কৃষ্মের সহিত দেখা হইবে।। ১।। দেখো বড়াই, মথুরার নামে প্রাণ কাঁদে। কৃষ্মকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়।। ধ্রু।। তিনি বকুল ফুলের মালা পরিয়াছেন। তাঁহার কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুন্তল। পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র। সেই কৃষ্মকে দেখিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।। ২।। কৃষ্মকে দেখিলে আর ছাড়িব না।। ৩।। তোমার কথা শুনিলাম না, কৃষ্মের পানসুপারি খাইলাম না। যাহা করিয়াছি বুদ্ধিভ্রংশ হেতু করিয়াছি।। ৪।।

---

১ প্রথমে ‘যেহ্নে’ লেখা। পরে হ্ন’র ‘ে’-কার কাটা এবং তোলাপাঠে ‘মনে’ যুক্ত।

৩৬০. ভাঠিআলীরাগঃ।। লখুশেখর ঃ।।

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী।। আল।।
এঁবে মোর মণের পোড়নী।। আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।। আল।। ১
কমণ উদ্দেশ্যে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ।। আ।। ধ্রু
মুকুলিল আম্ব সাহারে। মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে।।
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।। ২
দেব অসুর নরগণে। বস হএ মনমথবাণে।।
না বসএ তথাঁ কি মদনে। যে দিগেঁ বসে নারায়ণে।। ৩
পীন কঠিন উচ তনে। কাহাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গানে।।

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে। তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে[১] ।। ৪
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে। না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে।।
যত কৈলোঁ সব মতিমোযে। গাই (১৯৬/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই গো, যেদিকে কৃষ্ণ গেলেন বসন্ত কি সে দিক জানে না? এখন আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মত।। ১।। আমি কোন্ দিকে যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব।। ধ্রু।। আমের শাখায় মুকুল ধরিয়াছে। মধুললোভে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। সে ডাক আমার পক্ষে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ।। ২।। দেবতা, অসুর এবং মানুষ — মন্মথবাণে বশ হয় সকলেই। নারায়ণ যেদিকে অবস্থান করেন, মদন কি সেদিকে থাকে না।। ৩।। পীন পয়োধর দিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিব। তবু যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।। ৪।। আমি কৃষ্ণের কথা শুনি নাই, তাঁহার পান লই নাই। যাহা করিয়াছি তাহা নির্বুদ্ধিতাবশেই করিয়াছি।। ৫।।

---

১ 'মো' তোলাপাঠে।

....

৩৬১. ধানুষীরাগঃ।। যতিঃ।।

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী। যোড়হাথ করী বনমালী।।
তাত বড় পাইল আপমান। তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন।। ১
এবেঁ তোর বিরহ পোড়নী। আল। কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী।। ধ্রু
তোর সখিজন হেন চাহে। কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[১] নেহে।।
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ। বৃন্দাবনে। কেলি করে সেহি গোপীগণে।। ২
যোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ। বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ।।
নানা রসে বসে বনমালী। তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী।। ৩
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে। তবেঁ তার পাব দরশনে।।
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৩] সম্ভাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্রাবলী তোমাকে সত্য কথা বলি। বনমালী হাত জোড় করিয়া অপমানিত হইয়াছেন। তাই তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।। ১।। এখন তোমার বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। তোমার সখীর চায় কৃষ্ণ তোমার প্রেম পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে তাহারা বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণকে লইয়া কেলি করিতে পারে।। ২।। বৃন্দাবনের মধ্যে বসিয়া বনমালী তোমাকে বঞ্চনা করিয়া যোল সহস্র গোপী লইয়া নানা রসে দিনযাপন করিতেছেন।। ৩।। চলো রাধা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে। তখন কৃষ্ণ তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারেন।। ৪।।

....

---

১ 'হো' তোলাপাঠে। ❑ ২ 'হ' তোলাপাঠে। ❑ ৩ 'বা' তোলাপাঠে।

৩৬২. ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

অশরীরশর কৃশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চিরতানি (১৯৬/২) হরেরভিমন্যুজননীং জরতীমবদৎ।।

❑ মন্মথশরে অভিমুন্যপত্নী রাধার অঙ্গলতা খিন্ন, বিরহবেদনায় তিনি পীড়িত, তাঁহার মনে সুখের লেশ নাই। কৃষ্ণের চরিত চিন্তা করিয়া তিনি বড়াইকে বলিলেন।।

....

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলেঁ বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।। ১
বড়ায়ি গো।। কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল মোঞঁ নারী বড়ো আভাগিনী।। ধ্রু
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল তার সমে হো বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ তাহার উচিত ফল পাইলোঁ।। ২
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে।। ৩
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইব বড়ু (১৯৭/১) চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই না, যাঁহার জন্য আমি লঘুগুরুজন মানি নাই, আমার মনে হয় তিনি আমার প্রতি রোষবশত আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীর সহিত বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।। ১।। বড়াই গো, দুঃখের কথা কত বলিব? ডুবিয়া মরিব বলিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, সে সরোবরও শুকাইয়া গেল, আমি এমনই মন্দভাগিনী।। ধ্রু।। নন্দের নন্দন যিনি যশোদার পুত্র, সেই কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বর্ধিত করিলাম, যে কাজ গোপন রাখা উচিত ছিল তাহাই প্রকাশিত করিয়া উচিত ফল পাইলাম।। ২।। আমার স্বামী দুর্দান্ত বলিয়া গোপবংশে বিখ্যাত। আমার ননদ প্রতি কথায় দোষ ধরে। গোপীর সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত বলিয়া আমার কলঙ্ক রটনা করিয়াছে।। ৩।। এতসব যে আমি সহ্য করিলাম, সে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের জন্য। ওগো বড়াই, আমাকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাও।। ৪।।

৩৬৩. বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

হরি হরি। আসুখ না, কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব, তোর প্রিয় বনমালী।।
হরি হরি। মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ।। ১
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে। আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে।। ধ্রু

আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে। চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে।।
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে। আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে।। ২
কেমনে বেড়াএ কাহ্নু কিবা রূপ ধরে। একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে।।
আবাসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে। পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে।। ৩
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে। গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।।
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব (১৯৭/২) শ্রীনিবাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** গোপ কন্যা রাধিকা, তুমি দুঃখ করিও না। প্রিয় বনমালীকে তুমি নিকটে পাইবে। তোমার চাঁদের মতো মুখখানি মলিন করিও না। তোমার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।। ১।। হৃদয়ে ভরসা রাখিয়া আমার কাছে থাকো। গোকুলের কৃষ্ণ আপনি আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন।। ধ্রু।। আমার সহিত আইস। চলো বৃন্দাবনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার প্রিয় নারায়ণের খোঁজ করি। সবার কাছে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। শ্রীমধুসূদনকে অবশ্যই কেহ না কেহ দেখিয়া থাকিবে।। ২।। আচ্ছা, কৃষ্ণ কিভাবে বেড়ান, কি কি রূপ ধারণ করেন, একে একে আমাকে সব কথা বলো ত। তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান অবশ্যই কেহ দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দেখা পাইবই।। ৩।। নন্দনন্দন শ্রীনিবাস জলেই থাকুন আর স্থলেই থাকুন অথবা বৃন্দাবনে গোচারণেই রত থাকুন, সব স্থান খুঁজিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট আনিব।। ৪।।

....

৩৬৪. ললিতরাগঃ।। একতালী।।

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা যেন উয়ে গগনে চন্দ গোটা।। ১
দূতা ল তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ।। ধ্রু
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী জীএ রাহি তার দরশনে।। ২
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ হেন বেশ হেন দরশনে
নেত পরিধান লাসী হাথে মৌহারী বাঁশী সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে।। ৩
মোঞঁত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ এবেঁ তাক চাহি বন[১] দেশে।
তথাঁ (১৯৮/১) ত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের রূপ বর্ণিত।

....

---

১ 'ন' তোলাপাঠে।

৩৬৫. কেদাররাগ ঃ ।। রূপকং ।।

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান। তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন।।
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে। হাথত লগুড় করা রাখএ গোকুলে।। ১
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে। আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে।। ধ্রু
কিবা রাতী কিবা দিন মাঝ বৃন্দাবনে। নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে।।
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন। তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন।। ২
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল। তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২]।।
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল। ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল।। ৩
পরভয় কর রাধা আহ্মার বচনে। সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে।।
কদমতলাক জাইউ চি (১৯৮/২) ত্তের হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী তুমি আমার প্রাণের সমান, তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না। কৃষ্ণ কদম্বতলে অবশ্যই আসেন এবং হাতে লাঠি লইয়া গোচারণ করেন।। ১।। গোয়ালিনী, যমুনার কূলে চলো। সেখানে বালক গোপালের দেখা নিশ্চয় পাইবে।।ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি নারায়ণ সর্বদাই বৃন্দাবনে নানা ফুল তুলেন, নানা ফল খান এবং গোপীযুবতীগণের সহিত কেলি করেন। রাধা সেখানে গেলে নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে।। ২।। হে রাধা, শুভযাত্রা করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করো। সেখানে গমন করিলে তোমার মনোরথ সফল হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব জানি, তিনি কদম্বের তল ছাড়িতে পারেন না।। ৩।। আমার বাক্যে বিশ্বাস করো, আমি সত্যকথা ভিন্ন মিথ্যা বলি না প্রসন্নচিত্তে কদমতলায় যাও।। ৪।।

---

১ 'রাধা' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'সকল'। পরে 'ক' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ক' করা। ❑ ৩ 'সে তো' তোলাপাঠে।

৩৬৬. ধানুষীরাগ ঃ ।। একতালী।।

কদমতরুতল গিআঁ। কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ।। আল রাধা।।
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী। কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী।। ল।। ১
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে। চলি গেলি রাধিকা হরিষে।। ধ্রু
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে। পরিধান কর নেত বাসে।।
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে। বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে।। ২
তরুদল চালএ পবনে। কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে।
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে। বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে।। ৩
হেনমতেঁ কতোখন রহী। কদমতলাত রাধা রাহী।।
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধা কদম্বতরুতলে গিয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং অঙ্গে অগুরুচন্দন মাখিয়া দুই চক্ষু কাজলে রঞ্জিত করিলেন।। ১।। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বড়াইয়ের নির্দেশমত হৃষ্টমনে গমন করিলেন।। ধ্রু।।

তিনি পুষ্পমাল্যে কেশপাশ বাঁধিলেন, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলেন, ভৃঙ্গার ভরিয়া জল এবং বাটা ভরিয়া কর্পূর ও তাম্বুল লইলেন।। ২।। বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মন হইল কৃষ্ণ আসিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চাহিতেছেন।। ৩।। এইভাবে কদমতলায় কিছুক্ষণ থাকিলেন, কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না।। ৪

৩৬৭. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

কদম্বস্য তলে স্থিতা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি (১৯৯/১) ললাপ নিরন্তরং ।।

❑ রাধা সেই কদম্বতলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া মদনানলে সন্তপ্ত হইয়া বড়ই বিলাপ করিলেন।।

....

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে।।
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে।। ১
আল। দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল নিফলে পোহাইল রাতী।। ধ্রু
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি নিকট মেলিল আসিআঁ।।
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে।। ২
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।।
একেঁ দহদহ ঘসির আগুন আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গান দিঁতে না পাইলোঁ (১৯৯/২) এ শাল থাকিল বুকে।। ৩
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।।
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, দিবসে সূর্যের উত্তাপ, রাত্রেও চন্দ্র অনল বর্ষণ করে। এত দুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখে আমার নিদ্রা নাই। শীতল চন্দন অঙ্গে মাখিতেছি তবু বিরহজ্বালা শান্ত হয় না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া বাঁচি।।১।। কাল-দূতী জলে ডুবিয়া মরুক। আশা ভরসা দিয়া আমাকে আনিল। কিন্তু বৃথা রজনী অতিবাহিত হইল।। ধ্রু।। তাই বলি বড়ায়ি, কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বাড়াইয়া লাভ কি? বড়ই, এখন আমার মৃত্যু সন্নিকট। কয়েকদিনের সুখের জন্য দ্বিগুণ জ্বালা। আমার কর্মফলে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।। ২।। যে নন্দনন্দন সর্বক্ষণ কপোলে চুম্বন করেন, সেই হাতের নিধিকে এই অভাগিনীর অবহেলায় কে হরণ করিল? এ ঘসির আগুন স্বভাবতই ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহা কি আবার কেহ ফুঁ দিয়া জালে? হায়, নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলাম না, এ শাল বুকে বিঁধিয়া রহিল।। ৩।। আমার যৌবন বলো, ধনরত্নই বলো সব বৃথা। আমার গৃহবাসে কি সুখ? অন্নপানীয় কিছুই আমার ভাল লাগে না। আমার জীবন রাখি কি আশায়? আমি মাথা মুড়াইয়া যোগিনী হইয়া নানা দেশে বেড়াইব।। ৪।।

---

১ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'আসে'। পরে 'আ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বা'।

৩৬৮. মল্লররাগঃ।। রূপকং।।

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী। একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী।।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ। মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও।। ১
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে। সবখন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ। ল।। ধ্রু
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে। কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে।।
মোঞঁ তাকে মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত। এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।। ২
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি (২০০/১) ল মোরে নান্দের সুন্দর।।
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ। কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ।। ৩
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। বিকশিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।।
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মেঘান্ধকার ভয়ঙ্কর রাত্রি, আমি কদম্বতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছি। চারিদিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করি।। ১।। বড়াই গো, এ যৌবন যে আর রাখিতে পারি না। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সর্বদাই মন কাঁদিতেছে ।। ধ্রু।। ভ্রমর ভ্রমরীসহ গুঞ্জন করিতেছে, সহকার শাখায় বসিয়া কোকিল কূজন করিতেছে। বড়াই, আমার নিকট তাহারা যমদূতের সমান। হায়, যশোদানন্দন আসিয়া কবে আমার এ দুঃখের খণ্ডন করিবেন।। ২।। বড় আশা করিয়া বনমধ্যে আসিলাম, তবু সেই সুন্দর নন্দনন্দনের দেখা পাইলাম না। আমার উন্নত যৌবন ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণ একথা বুঝিতেছেন না।।৩।। বসন্তকালে মলয় পবন বহিতেছে, বিকশিত পুষ্পগন্ধ সেই বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়াই গো, শীঘ্র করিয়া এবার আমার নন্দনন্দনকে আনিয়া দাও।। ৪।।

....

৩৬৯. কহূরাগঃ।। যতিঃ।।

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ।। ১
আল হের। কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি। কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে।। ধ্রু
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি এহাত কেমন হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী হএ মোর তবেঁসি নিস্তারা।। ২
এহি ত বৃন্দাবনে বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ (২০০/২) র নেহে।
এবেঁ থীর নহে ....[১] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে মরি জাইব কাহ্নের বিরহে।।৩
এহি বৃন্দাবন এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, মথুরার পথে এই কদম্বের তলে ধীরে ধীরে বসন্তবায়ু বহিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে শয্যা রচনা করিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছি।। ১।। বড়াই গো, কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগো প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। গহন গভীর এই বিরহসাগর। এ সাগর কি করিয়া পার হইব? আমার কুচকুম্ভকে ভেলা করিয়া কৃষ্ণ করিয়া যদি পার করিয়া দেন তবেই নিস্তার পাই।। ২।। এই বৃন্দাবন দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে আর বিরহ জ্বালায় হৃদয় দগ্ধ হয়। এখন কোনো প্রকারের চিত্ত ধৈর্য মানে না। কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিব।। ৩।। বড়াই গো, এই বৃন্দাবনে তিল তিল করিয়া খুঁজিলাম, তবু কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্র ঃ চিত।

৩৭০. বেলাবলীরাগঃ ।। যতিঃ।।

রাধামাধবমুন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা।।

❑ তখন মদনকাতরা রাধিকা বনান্তরে মাধবকে অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।।

....

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল। আল হের বড়ায়ি
মোঞঁ দুখমতী তাক না শুনিল।। হরি হরি।।
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল।। হরি হরি।। ১
এবেঁ হৈল মোহোর আরততী[১]। আর হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গো সুরতী।। ধ্রু

যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী। মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী।।
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী। আহ্মাক ছাড়িআঁ কা (২০২/১) হ্ন গেলা কতী।। ২
সংপুন শশধর বদনে। কমললোচন পাপ বিমোচনে।।
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী। রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী।। ৩
কি না বিধি লিখিত কপালে। মোরে দয়া না করে বালগোপালে।।
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাকে যত কথা বলিলেন, আমি মন্দভাগিনী তাঁহার কোনো কথাই শুনিলাম না। এখন ওগো বড়াই, আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, সেই কারণেই এত দুঃখ পাইলাম।। ১।। এখন আমি কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁহাকে বলো যে রাধা তাঁহার মিলন প্রার্থনা করে।। ধ্রু।। বলিও, কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন তখন আমি বালিকা ছিলাম। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গেলেন।। ২।। পূর্ণচন্দ্রের মত যাঁহার মুখ, পদ্মের মত লোচনযুগল, পাপবিমোচন সেই কৃষ্ণ আমাকে অতিশয় দুঃখ দিয়া কোনো যুবতীর সঙ্গে কেলি করিতেছেন।। ৩।। হায় অদৃষ্টে কি লিখিত আছে? বালগোপাল আমাকে দয়া করিলেন না, কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ আরতী।

৩৭১. কহূরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

সংপ্রহৃষ্টোহদ্য গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধন্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাং।।

❑ গোবিন্দ প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রমোদ বিহার করিয়াছেন। হে বড়াই, কিভাবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতে যাওয়া যায় তাহা বলো।।

আজি, সপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন।। ১
কি হরি হরি গোবিন্দ এ আল প্রাণ নৈল বাঁশির নাদে।। ধ্রু
নানা আভরণগণে শোভক ও নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ ভাবি ভাবি তাহার নেহা।। ২
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ (২১০/২) থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ নিফলে পোহাইল রাতী।। ৩
সে নারীর সফল জীবন এ জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি নন্দনন্দন আসিয়া বাহুপাশে বাঁধিয়া আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন

দিলেন।। ১।। হে হরি, হে গোবিন্দ, বাঁশির শব্দে আমার প্রাণ লইল।।ধ্রু।।নীল জলদের ন্যায় তাঁহার দেহ নানা আভরণে শোভিত। হায়, সেই কৃষ্ণের প্রীতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়াছি।। ২।। নানা ফুলে শয্যা রচনা করিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে শুইয়াছিলাম। এমন সময় জাগিয়া উঠিলাম। হায়, বৃথাই রাত্রি কাটিয়া গেল।। ৩।। তিনি আলিঙ্গন দিয়া যাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই রমণীরই জীবন সার্থক।। ৪।।

৩৭২. মালবরাগঃ।। প্রকীর্ণকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর। বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।। ১
হেনা বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর। তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর।। ২
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহি কিছু বুধী। হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী। ৩
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন। তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন।। ৪
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন। তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন।। ৫
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব (২০২/১) তোকে দেব চক্রপাণী।। ৬
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী। একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।। ৭
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী। মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী।। ৮
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে। অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।। ৯
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ১০

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী রাধা আমার কথা শোনো। আজ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গেলেন।। ১।। আমার মনে হয় তিনি বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার খোঁজ করি। বনে ভয়ের কিছু নাই।। ২।। রাধার উক্তি ঃ মুগ্ধা, বড়াই, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। হাতে পাইয়াও গুণনিধি কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিলে।। ৩।। চলো, চলো, তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে অবশ্যই নন্দনন্দনের দেখা পাইব।। ৪।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথায় বড়াই বৃন্দাবনে গিয়া সেখানে রাধিকাকে এই কথা বলিল।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ রাধা, কৃষ্ণের সন্ধানে তুমি নিজে অগ্রসর হইয়া যাও। তবেই দেবচক্রপাণিকে তুমি দেখতে পাইবে।। ৬।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া রাধা হৃষ্টমনে একাকীই বৃন্দাবনে গেলেন।। ৭।। গিয়া দেখিলেন বনমালী গোষ্ঠরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া মদনকাতরা রাধা মূর্ছিতা হইলেন।।৮।। তখনই বড়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুখে জল দিয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল।। ৯।। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া রাধা বলিতে লাগিলেন।। ১০।।

৩৭৩. বিভাষরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।। রূপকস্বা।।

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।। ১
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমরুতী।। ২

আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে।। ৩
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে (২০২/২) ব গদাধরে।। ৪
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ।। ৫
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।। ৬
না শুণিলোঁ তোর বোল আঁ[২] জাইতেঁ পানী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী।। ৭
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।। ৮
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৯

❑ কৃষ্ণের প্রতি রাধা। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া রাধা প্রতিটি ঘটনার জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১ 'তোক' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ লআঁ। ❑ ৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৪. ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে। আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।।
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার। তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার।। ১
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ সুখ। চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ।। ধ্রু
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই (২০৩/১) হনের[৩] বাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এঁবে দেব চক্রপাণী।।
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ। ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ।। ২
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী। ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী।।
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন। না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন।। ৩
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন। এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন।।
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে গোপকন্যা, দধি বিক্রয় করিবার জন্য যখন প্রতিদিন যাইতে তখন আকুল অনুনয় করিয়াছি। আজ তাহা কেন ভুলিলে? তোমাকে যমুনা পার করিয়া দিলাম, তোমার দধিভার নিজে বহন করিলাম, তবু তোমার মন তুষ্ট করিতে পারিলাম না।। ১।। যৌবনের অহংকারে আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ, হে রাধা, সে জন্য আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।। ধ্রু।। তুমি আইহনের রাণী, বড়লোকের স্ত্রী। তুমি দেবচক্রপাণিকে ভজনা করিতে আসিয়াছে কোন্ লজ্জায়? রাধা, তোমার কাজের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। আমি দেবরাজ, আমাকে তুমি ভার বহাইয়া বঞ্চনা করিয়াছ।। ২।। আমার প্রতি মন না দিয়া, যাও গৃহে গিয়া নিজের স্বামী আইহনের সেবা করো। আমাকে এত অনুনয় করিতেছ কেন? এখন বৃন্দাবন চলিলাম, আর গণ্ডগোল করিও না।। ৩।। তোমার যৌবনকে এখন আমি তুচ্ছজ্ঞান করি। তোমার প্রতি এখন আমার অনুরাগ নাই—এই সত্য কহিলাম। ইহা জানিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

---

৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৫. বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী। ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী।।
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী। কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী।। ১
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন। জায়িতেঁ নে মোর আপন ভুব (২০৩/২) ন।। ধ্রু
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ। বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন।।
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ। এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ।। ২
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল। হে[১] ভাবি আইলোঁ মোঞঁ কদমের তল।।
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে। তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে।। ৩
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে। দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে।।
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে। আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে।। ৪
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে। আহ্মার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে।।
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, হে বনমালী, ত্রিভুবন তোমার অধিকারে, ত্রিভুবনের তুমি প্রভু। নরসিংহরূপে তুমি হিরণ্যকসিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে। কংস নিধনের উদ্দেশ্যে তুমি গোকুলে অবতরণ করিয়াছ।।। ১।। হে শ্রীহরি, হে গোবিন্দ, হে মধুসূদন, আমাকে স্বস্থানে লইয়া চলো।। ধ্রু।। আমার সহিত বিবিধ কেলি করিয়া আমার প্রাণ হরণ করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমার সন্ধানে আমার বক্ষের পাঞ্জর বিদীর্ণ হইল। হে হৃষীকেশ এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম।। ২।। তোমা ভিন্ন আমার রূপযৌবন নিষ্ফল জানিয়া আমি কদম্বের তলে আসিয়াছি। তোমার জন্য সারা রাত্রি এখানে কাটাইলাম।। ৩।। একদিন তুমিই আমার রূপযৌবনে মোহিত হইয়া দূতীর হাতে কর্পূর তাম্বুল পাঠাইয়াছিলে। তখন আমার বুদ্ধি ছিল অপরিণত, তাই দূতীকে মারিয়াছি। এখন বিরহ অনলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে।। ৪।। আমি তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, প্রভু আমার সকল দোষ মার্জনা করো। আমাকে তোমার পার্শ্বে বসিতে অনুমতি দাও।। ৫।।

---

১ অ। প্রঃ হেন। ❑ ২ 'রূপ' তোলাপাঠে।

৩৭৬. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

নিকট না আইস লোক বুলিব অবো (২০৪/১) ল।
দূর থাকি বোল রাধা সূণ মোর বোল।।
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার। সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।। ১
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ। পরনারী হরণ না করোঁ মো।। ধ্রু
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কূলে। আহ্মে ত ভাগিনা তোর[১] দেবসমতুলে।।
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সক্ষ্মে[২] কেলি। মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী।। ২
দূতা মিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী। তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী।।
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ৩
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর। মায় জশোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর।।
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** নিকটে আসিও না, লোকে কুকথা বলিবে। আমার কথা শোনো, দূরে থাকিয়া যাহা বলিবার আছে বলো। এতদিনে বুঝিলাম কলিকাল আসিয়াছে। সকল লোক ছাড়িয়া নারী অবৈধরূপে ভাগিনাকে কামনা করো।। ১।। রাধা, এ তোমার কি অন্যায় কথা? আমি কখনও পরনারী হরণ করি না।। ধ্রু।। সদ্বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, আমি তোমার ভাগিনেয় দেবসমতুল্য। তোমার সহিত আমার মিলন সমুচিত নহে। সুতরাং আমার সঙ্গে রঙ্গরস করিও না।। ২।। যখন দূতীর হাতে গলার গজমোতি উপহার পাঠাইয়াছিলাম তখন ত বলিয়াছিলে তুমি শিশুকাল হইতে সতী। এখন এত মনোবেদনা কেন? যাও, তোমার এই নবযৌবন পুঁটলি বাঁধিয়া রাখো।। ৩।। আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মামা হইলেন বীর আইহন। মাতা যশোদা স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছেন। সেইজন্য আমার মামী, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।। ৪।।

---

১ 'র' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ সমে।

৩৭৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ (২০৪/২) র বন। আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন।।
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত। নাগর জনের হেন .....[৩] উচীত।। ১
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে। নিদয়হৃদয় কর[৪] দয়া কর মোর।। ধ্রু
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী।।
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী। আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী।। ২
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন। একবার কর দেব আহ্মার সমান।।
তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[৫]
কর রতী অনুমতী পয় বনমালী।। ৩

নিফল না কর রাধা[৬] কাহ্ন আহ্মার যৌবন। যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।।
আলিঙ্গন দিএঁা রাখ আহ্মার জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪।।

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মধুকর গুণ বুঝিয়া বন পরিহার করো। যে বনে কমল বিকশিত হইয়াছে সেই বনে আইস। আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কেন? ইহা নাগরজনের পক্ষে উচিত নয়।। ১।। তোমাকে দেখিয়া আমি মদনানলে দগ্ধ হইতেছি। নিষ্ঠুর কানাই আমাকে দয়া করো।। ধ্রু।। হে কৃষ্ম, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারো প্রতি আমার আকর্ষণ নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। সত্য কিনা দূতীকে জিজ্ঞাসা করো। বড় আশা করিয়া খোঁপায় ফুল দিয়া তোমার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছি।। ২।। হে কৃষ্ম, একবার কায়মনে প্রসন্ন হইয়া আমার মনে রাখো। আমি তোমার অযোগ্য নহি। হে বনমালী, হে প্রিয়তম, একবার আমার আলিঙ্গন-প্রার্থনা পূরণ করো।। ৩।। আমার যৌবন ব্যর্থ করিও না। যে যাচক তাহাকে তুষ্ট করো। আলিঙ্গন দান করিয়া আমাকে বাঁচাও।। ৪।।

---

৩ ছাড়। প্রঃ না হএ। ❑ ৪ অ। প্র ঃ কাহ্ন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী। ❑ ৬ রাধা শব্দটি অতিরিক্ত বসিয়া গিয়াছে।

৩৭৮. মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

অহোনিশি যোগ ধেআই। মন পবন গগনে রহাই।
মূল কম (২০৫/১) লে কয়িলে মধুপান। এবেঁ পাইএঁা আহ্মে ব্রহ্মগেআন।। ১
দূর আনসুর সুন্দরি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞীঁ ।। ধ্রু
ইহা[১] পিঙ্গালা সুসমনা সন্ধী। মন পবন তাত কৈল বন্দী।।
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট। ২
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ। তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন।।
এবে দেহে মোর নাহি বিকার। আসার দেখীলো সব সংসার।। ৩
রাধাক বুলিলোঁ[২] নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণী।
ধেআনে থাকিল নিচলমনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **কৃষ্মের উক্তি ঃ** মন পবনকে গগনে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র আমি যোগসাধন করি। এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মূলকমলে মধুপান করিয়াছি।। ১।। সুন্দরী রাধিকা দূরে থাকো, আমাকে কামনা করিও না।। ধ্রু।। ইড়া পিঙ্গালা ও সুযুম্নার সন্ধিস্থলে মন-পবনকে বন্দী করিয়াছি। দশম দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এখন আমি যোগমার্গে আরোহণ করিয়াছি।। ২।। আমি জ্ঞানবানের সাহায্যে মদনবাণকে ছিন্ন করিয়াছি। তাই তোমার যৌবন দেখিয়া আর ভুলি না। আর আমার দেহে কোনো বিকার নাই। সমস্ত সংসারকে অসার বুঝিয়াছি।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ দেবচক্রপাণি নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ম রাধাকে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হইলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্র ঃ ইড়া। ❑ ২ অ। প্র ঃ বুলিল।

৩৭৯. বঙ্গালবরাড়ী[১] ।। রূপকং।।

চিরাদমধুরাং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং।।

❑ জগতের মনোরমা শ্রীরাধিকা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই অমধুর বাক্য অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন। অনন্তর করুণামিশ্রিত এই বাক্য বলিলেন।।

....

আতি দুখিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ল।
আল মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল। আল চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল তিরিবধপাপ নাহি (২০৫/২) ক ডর তোহ্মারে ল।। ১
কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।
আল মাথ তুলিঞাঁ দেখব আহ্মার গতী ল।। ধ্রু
যাবত আছে পরাণে ল। তাবত দেহ বচনে[৩]
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল।
যবে দরশন ভৈল। তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ।। ২
কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগি ল। সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোএঁ ত বড় আভাগী[৪]।
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল। আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ।। ৩
দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল।।
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল। জীএঁ মোঁ সঙ্গামে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[৫] বসলীবরে ল।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, আমি অতি দুঃখিনী বালিকা, বনমল্লিকা দলের মত কোমল আমি। তাহাতে মদনজ্বালায় প্রাণ কাতর। আমি তোমার চরণ ধরিয়া বলি আমাকে বিরহজ্বালায় আর জ্বালাইও না। স্ত্রীবধ পাপের ভয়ও কি তোমার নাই ।। ১।। ওগো, মাথা তুলিয়া আমার দশা দেখো। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ।। ধ্রু ।। দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সম্মতি দাও। নহিলে তোমার ধ্যানেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। যখন দেখা হইল তখনই কেন ত্যাগ করিলে না? এখন তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখিনী করিলে ।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার প্রেম লাভের আশায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। অভাগিনী আমি তবু তোমাকে পাইলাম না। গতজন্মের পুণ্যফলে এতক্ষণে তোমার দেখা পাইয়াছি। দামোদর

আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।। ৩ ।। আমার দেহের অবস্থা দেখিয়াও তুমি নিষ্ঠুর হইয়া রহিলে, তুমি স্ত্রী না পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনও আমাকে দয়া করো। তোমার আলিঙ্গন পাইয়া প্রাণে বাঁচি ।। ৪ ।।

১অ। প্রঃ বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ। ❑ ২ 'র' কাটিয়া তোলাপাঠে 'রো'। ❑ ৩ ছাড়। প্রঃ বচনে ল। ❑ ৪ ছাড়। প্রঃ আভাগী ল। ❑ ৫ 'গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস' বাক্যটি লিপিকরের অনবধানতাবশত দুই বার বসিয়া গিয়াছে।

৩৮০. ভৈরবীরাগ ।। রূপকং ।। যতির্ব্বা ।।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম (২০৬/১) আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা। ১
রাধা ল। আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী ইল[১] মোরে। ধ্রু
উত্তম কুলত মোর চরম ভৈল ল আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... [২] আহ্নে দেখ ত্রিভুবনে সারে ।। ২
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারি   ধরণী পাতিল সব পাপ করম নেবারী ।। ৩
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** আমি রঘুবংশপ্রধান, আমার নাম শ্রীরাম। আমার কথা তুমি শোনো. পুত্র এবং বান্ধবাদিসহ লঙ্কার রাবণ যখন দুর্বার হইয়া উঠিল তখন আমিই তাহার দশ মাথা ছেদন করিয়াছি ।। ১।। রাধা, তোমা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিলাম। পিতা আমার বসুদেব, মাতা দৈবকী ।। ধ্রু ।। উত্তম কুলে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পরদার গ্রহণ করি না। ত্রিভুবনে আমি প্রধান ।। ২।। আমি হরি, আমিই নারায়ণ, মুকুন্দমুরারী আমারই নাম। আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর নিধন করিয়া ধরণীকে সকল পাপ কর্ম হইতে মুক্ত করিয়াছি ।। ৩।। লজ্জাহীনা রাধিকা, এখনো আমার আশা পরিত্যাগ করো, এখনো সকল গোপী ইহা জানে না। তুমি নিজবাসে ফিরিয়া যাও ।। ৪।।

১অ। প্রঃ হইল। ❑ ২ ছাড়।

৩৮১. শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ।। ল
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ।। ল ।। ১
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।

বড় দুখ পাইলোঁ (২০৬/২) তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ।। ল ।। ধ্রু
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে।।
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ।। ২
হেন মনে পরিভাব জগত ইশর। আহ্মাক পরাণে মাইলে কী লাভ তোহ্মার।।
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী। তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী।। ৩
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে। সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে।।
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বহু তপস্যার ফলে বিধাতার কাছে তোমাকে পাইয়াছি। কেন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া থাকো তাহা হইলে আমিও যোগিনী হইয়া আমার সেবিকা হইয়া থাকিব ।। ১ ।। আর তোমাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইব না। তোমার বিরহে দগ্ধ হইয়া বড় দুঃখ পাইয়াছি।। ধ্রু ।। হে প্রভু, হে গদাধর, আমাকে প্রাণে মারিও না। তোমার কি স্ত্রীবধের ভয় নাই? কি স্বপ্নে কি জাগরণে সারাক্ষণ মনে মনে তোমার চিন্তা করিয়াছি। হে কৃষ্ণ, তোমা হইতে তাহার এই ভাল ফল পাইলাম। ।। ২ ।। হে জগদীশ্বর, এই কথাটি মনে করিয়া দেখো ত, আমাকে প্রাণে মারিলে তোমার লাভ কি? আমি অনাথ রমণী, তোমার অনুগত, তোমার ভক্ত, তথাপি, হে মুরারী, আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছ।। ৩ ।। আমার প্রতি প্রেমবশত এতকাল এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ত্যাগ করিতে পার নাই। এখন কোন্ লজ্জায় আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ ।। ৪ ।।

---

১ 'জবে' তোলাপাঠে ❑ ২ 'আর' তোলাপাঠে। ❑ ৩ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ৪ 'হ'র 'া'-কার ও 'র' তোলাপাঠে।

৩৮২. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে।।
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ তোহ্মা তেজিলো জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ।। ১
না কর জতন সুন্দরী রাধা আহ্মাত না (২০৭/১) পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ।। ধ্রু
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে তোক না কৈলোঁ[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে কেহ্নে চাহসি আহ্মারে[২] ।।
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরল বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এরে যাউর[৩] যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ।। ২

আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী সুণ মুগধী পামরী ।।
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
.. .. [৪] যুগতি করিঞাঁ তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ।। ৩
তেজ সঙ্গ মোর[৫] নাহি মোতে রঙ্গ আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে।।
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** তোমার প্রথম যৌবনে তোমার জন্য কাতর হইয়া অন্ন গ্রহণ করি নাই। তোমার উপরে রাগ করিয়া দূতীর কথায় তোমাকে পঞ্চশর হানিয়াছি। এখন মনকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে সযত্নে পরিহার করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছি। এখন হে গোপকন্যা, আমাকে লাভ করিবার জন্য বৃথাই অনুনয় করিতেছ।। ১।। আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিও না। আমিই সত্য আমিই ত্রেতা আমিই দ্বাপর আমিই কলি। নিরঞ্জনকায় বুদ্ধও এই আমি।। ধ্রু।। অহোরাত্র যমুনাতীরে অবস্থান করিয়াছি, তখন আমাকে গ্রাহ্য করো নাই। এখন মদনশরাহত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমি যখন হাসিয়া কথা বলিয়াছি তখন একটি সরস কথা বলো নাই। হে আইহন ঘরণী, এখন তোমার যৌবন ছারখার হউক।। ২।। আমি কশ্যপ ঋষির পুত্র, তুমি সাগর দুহিতা। যৌবনের অহংকারে হে মুগ্ধা পামরী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। তোমারই জন্য সকল দৈত্যকে আমি নিধন করিয়াছি। সকল দেবতা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আমার জন্য তোমাকে সমর্পণ করিলেন।। ৩।। এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার সহাচর্যে এখন আমার আনন্দ নাই। গোকুলে আমার দ্বারা ভার বহাইয়া আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছ। এখন আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মোকে কৈলে। ❑ ২ অ। প্রঃ আহ্মারে চাহসি কেহ্নে। ❑ ৩ অ। প্রঃ যাউক। ❑ ৪ আনুমানিক ছয়টি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে। বসন্তরঞ্জন 'সব দেবেঁ মেলি' বসাইয়াছেন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তেজ মোর সঙ্গ।

৩৮৩. কহুরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

আহে কাহ্নাঞিঁ।

আছিলোঁ (২০৭/২) মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গরতী এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী এবেঁ কৃষ্ণ১ করহ আদেশ।। ১
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।। ২
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ ঊতপতী তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে নিঠুর বোলহ কী কারণে।। ৩

সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ পাপেঁ হএ নরকের ফল।। ৪
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে তোহ্মে দেব কংশের আরী।
গোপীর বালেন্দু হরি আহ্মে বিরহিণী নারী তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী।। ৫
তোরে বো (২০৮/১) লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী।। ৬
না বোল মোরে[২] নিরাস একবার নেহ পাশ তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৭

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ম, আমি নিতান্তই শিশু ছিলাম। রঙ্গরতি জানিতাম না। এখন দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি। তোমা ছাড়া আর আমার গতি নাই। হে কৃষ্ম, আমার প্রতি অনুকূল হও।। ১।। কৃষ্মের উক্তি ঃ রাধা, বসুদেব আমার পিতা, গোকুলে আমার বাস, গোপগণ আমাকে ভালরূপে জানে। তাহারা শুনিলে লজ্জা পাইবে। তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার নিকটে তুমি বৃথাই আসিয়াছ।। ২।। রাধার উক্তি ঃ স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা নিতান্তই তুচ্ছ। নানা দোষে তাহার উৎপত্তি। তাহার প্রতি কী কেহ দীর্ঘকাল কোপ পোষণ করে? তোমার বিরহদুঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুল, আমাকে কেন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ।। ৩।। কৃষ্মের উক্তি ঃ ওগো সুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝিয়াছি। এখন পাপ-পুণ্যের কথা বলি শোনো। পুণ্য করিলে স্বর্গে গিয়া নানা সুখ উপভোগ করে। পাপের ফলে নরকে যাইতে হয়।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ তুমি দেবকীর পুত্র, তুমি বাসুদেব, হে প্রভু, তুমি কংসের অরি। গোপীগণের নিকট নবোদিত চন্দ্রের মতো প্রিয়। তোমা ভিন্ন আমি প্রাণে বাঁচি না।। ৫।। কৃষ্মের উক্তি ঃ শোনো চন্দ্রাবলী, তোমাকে বলি। আমি দেববনমালী। আমার নিকট পাপকথা বলিও না। যশোদা আমার মাতা, আইহন আমার মামা। তুমি আমার নিকট সম্পর্কের মাতুলানী।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ আমাকে এমন নৈরাশ্যকর কথা বলিও না। তুমি আমার পতি, একবার তোমার পার্শ্বে আমায় গ্রহণ করো। বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার চরণভজনা করিতে পাইলাম।। ৭।।

---

১ প্রথম 'সরস' ছিল, পরে কাটিয়া তোলাপাঠে 'কৃষ্ম'। ❑ ২ 'মোরে' তোলাপাঠে।

৩৮৪. শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

দূতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার। লাজে পিঠ দিআঁ মো বলিলোঁ দধিভার।।
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল। রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল।। ১
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে। যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ। ল।। ধ্রু
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ। হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ।।
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর। তভোঁ মোর বচনে (২০৮/২) না দিলেঁ উত্তর।। ২
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী। তবেঁ বোলাইলে সতী আইহনের রাণী।।
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী। তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী।। ৩

নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর। জুণি সুধি পাএ রাধা[1] রাজা কংশাসুর।।
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ণ পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—তখন আনকূল্য করো নাই ; এখন জানিও তোমার প্রতি আমার আর অনুরাগ নাই।।

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।

....

৩৮৫. রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ। আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ।।
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে। তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে।। ১
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী।। ধ্রু
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী। রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী।।
তোহ্মাতে লাগি (২০৯/১) আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ।। ২
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ। অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ।।
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, কোন্ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। হে ভুবনেশ্বর, একবার বিচার করিয়া দেখো। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। হে দেবরাজ, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। বিনা দোষে কেহ রমণীকে ত্যাগ করে না। হে চক্রপাণি, সীতার জন্য রাম দুঃখ পাইলেন (বিনা দোষে সীতাকে ত্যাগের কারণে।)।। ধ্রু।। কী স্বপ্নে কী জাগরণে একেলা কদমতলায় বসিয়া দিবারাত্র মনে মনে তোমারই চিন্তা করি। তোমার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় তবে জানিও স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।। ২।। মদনানলে আমি বিকল হইয়াছি। ক্রোধ বিসর্জন দিয়া আমার অবস্থা দেখো। একবার চলো, তোমায় আমায় বৃন্দাবনে যাই।। ৩।।

---

৩৮৬. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ মন জাএ তোহ্মারে।। ল।।১
আল। চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাত যশোদা তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে।। ধ্রু
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে।। ২
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ তোর সুরতির আশে।

বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ দেখি লেক উপহাসে।। ৩
এ (২০৯/২) তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম। পূর্বে যে কৃষ্মকে রাধা নানা স্থলে বঞ্চনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম বলিতেছেন— এখন চিন্তা করিয়া তোমা হইতে আমার মন নিবৃত্ত করিয়াছি।

....

৩৮৭. ললিতরাগঃ ।। কুড়ুক্ক।।

সরস বসন্ত কালে কোকিলের কোলাহলে এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে।।
এবেঁ তোহ্মার বিরহে মোর আকুল দেহে আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে।। ১
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী।। ধ্রু
আছিলোঁ মো শিশুমতী না বুঝিলোঁ সুরতী
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।।
এবেঁ মো ভরযুবতী তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ গতী এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী।। ২
সাগর সঙ্গম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে।।
এহা জাণী গদাধর একবার দয়া কর নহে তি (২১০/১) রী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৩
যত কৈলোঁ সংযম করিলোঁ ব্রত নিয়ম নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম।।
এহি শপথ করোঁ কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** সরস বসন্তকাল আসিয়াছে, কোকিলের কূজন শুনিতেছি হে কৃষ্ম, (কেমন করিয়া রক্ষা করি) আমার এ নবযৌবন। তোমার বিরহে ব্যাকুল। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। আমি তোমার মাতুলানী নই। তোমার আমার প্রেম দেবতাসমাজে সকলেই ভাল করিয়া জানে।। ধ্রু।। তখন শিশুমতি ছিলাম বলিয়া রতিকলা বুঝিতাম না। তাই তোমার বাক্যে সম্মতি দিই নাই। এখন আমি পূর্ণযৌবনা, তোমা ছাড়া অন্য গতি নাই। ইহা বুঝিয়া আমার প্রতি অনুকূল হও।।২।। (নহিলে) সাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিব অথবা এইখানেই বিষ খাইয়া মরিব। ইহা জানিয়া একবার আমার প্রতি দয়া করো। অন্যথা তুমি স্ত্রীবধের পাপে লিপ্ত হইবে।। ৩।। যত সংযম করিয়াছি, যত ব্রতনিয়ম পালন করিয়াছি, আমার সে সকল ধর্মানুষ্ঠান সবই বিফল হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আর কখনো তোমাকে বঞ্চনা করিব না।। ৪।।

....

৩৮৮. দেশবরাড়ীরাগঃ ।। লঘুশেখর।।

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী। তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী।।
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী। পরিহরি আপণার আইহন পতী।। ১

এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো। এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো।। ধ্রু
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী। পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী।।
আসুর মারিআঁ খন্ডিবোঁ পৃথিবীর ভাব। পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার।। ২
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী। পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী।।
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ। তোক (২১০/২) দেখি আরবার মন না জাএ। ৩
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন। আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্নু।।
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে চন্দ্রাবলী, আমি যখন তোমাকে অনুনয় করিলাম তখন তুমি আমার পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া গালি দিলে। এখন নিজের স্বামী আইহনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন।। ১।। এখন হে রাধা, মায়ামোহ বিস্তার করিতেছ কেন? নন্দপুত্র আর ইহাতে ভুলিতেছে না।। ধ্রু।। সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে এই বিধান করিয়াছেন যে পাপ করিলে কোনো কর্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। অসুর নিধন করিয়া আমি পৃথিবীর ভার খণ্ডন করিব। পাপ করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।। ২।। হে আইহনমহিষী, আমাকে লাভ করিবার জন্য আর প্রয়াস করিও না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া দেহ নির্মল করিয়াছি আর তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না।। ৩।। দিবারাত্র আমি যোগসাধনায় মগ্ন। তোমার মোহে আর আমার মন মুগ্ধ হইবে না। হে গোপকন্যা, এই বুঝিয়া আমার আশা পরিত্যাগ করো।। ৪।।

৩৮৯. শ্রীরাগঃ ।। যতি।।

মৈনাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ। আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নঞিঁ আপণ হৃদএ।।
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার। তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ কাজ[২]।। ১
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন। তাহার উচিত ফল দিলেক মদন।। ধ্রু
কাহ্নু তোর নেহে আপনাক বড় মানোঁ। তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ।।
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে।। ২
শরণ পসিলোঁ কাহ্নু চরণে তোহ্মারে। যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে।।
সকল সন্তাপ কাহ্নু সহিবাক পারী (২১১/১)। তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী।। ৩
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার। তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার।।
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** যে মরিয়াই আছে তাহাকে মারিলে কী লাভ হইবে, হে কৃষ্ণ, তাহা আপন মনেই একবার চিন্তা করিয়া দেখো। তুমি তিন ভুবনের অধিকারী, সামান্য গোপনারী—সে তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য।। ১।। দুর্বুদ্ধিবশত তোমার কথা শুনি নাই এখন মদনের হাতে তাহার উচিত ফল পাইলাম।। ধ্রু।। হে কৃষ্ণ, তোমারই প্রেমের গৌরবে আমি গর্বিতা, সেই তুমিই যে আমার প্রতি রুষ্ট হইবে আমি জানিতাম না।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার চরণে শরণ লইলাম,

আমার যে গতি করিতে চাও এখনই তাহা করো। আমি সকল তাপ সহিতে পারি, কেবল তোমার বিরহজ্বালা সহিতে পারি না।। ৩।। একবার হে জগন্নাথ, ইহার প্রতিকার করো, তোমার প্রসাদে বিরহদুঃখ দূর হউক, অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে আশ্বাস দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মৈলাক ❑ ২ অ। প্রঃ ছার।

৩৯০. দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে। শুণী মোরে মনমথ মারে।।
তিরী বধ ভয় না মানসি। কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি।। নাএ।। ১
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে।। নাএ।। ধ্রু
দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ। তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ।।
জিআঅ আড় নয়নে চাহী। বিরহের জালাএ মরে রাহী।। ২
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে। তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে।।
এহা জাণী দয়া ধর মণে। আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে।। ৩
তোমা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী। তভোঁ কেহ্নে (২১১/২) দয়া না করসী।।
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ভ্রমরের গুঞ্জন কোকিলের কুহুধ্বনি মদনের বাণরূপে আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, কেন অকারণে মাতুলানী সম্বোধন করিতেছ? তোমার কী স্ত্রীবধের ভয় নাই।। ১।। হে কৃষ্ণ, নিষ্ঠুর হইও না। কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হইতেছ না।। ধ্রু।। হে আমার দুঃখদাতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে জগন্নাথ, তোমার বিরহজ্বালায় রাধার জীবন যায়। তুমি আড়নয়নে তাকাইয়া আমাকে বাঁচাও।। ২।। আমার যৌবন তিলমাত্র ক্ষয় পায় নাই, কিন্তু তোমাকে না পাইয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বুঝিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে লইয়া কুঞ্জবনে চলো। ৩। তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া দিবারাত্র চোখের জল ফেলিতেছি। তবু কেন তুমি দয়া করিতেছ না? হে শ্রীনিবাস, মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না।। ৪।।

৩৯১. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।। ১
আল। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয় তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া।। ধ্রু
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে দূতার হাথত দিআঁ।
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ।। ২

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে তেঁসি জীবন তাহারে।। ৩
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্ণাঞিঁ নিরব হয়িলা গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম। তাম্বুল খণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম রাধার পূর্ববর্তী আচরণের জন্য অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন—এই অবস্থায় যখন বড়াই তোমার কাছে যাইতে বলিবে কেবল তখনই তোমার নিকট যাইব।

৩৯২. কোড়া (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

কৃষ্মস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ

❑ কৃষ্মের বচন শুনিয়া রাধা বড়াইর নিকট গিয়া যাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা পায় এমন কথা বলিলেন।।

....

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী।। আল।। ১
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোত্র।। ধ্রু
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ণ কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে।। ২
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আমি দেহ যবেঁ কাহ্ণে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গানে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে।। ৩
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্ণে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো (২১২/২) র প্রাণ যাএ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি অন্ধকার। প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে নাই সে রমণী কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।। ১।। হে বড়াই, আমার এ কি হইল? আমি যে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া নন্দনন্দনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।। ধ্রু।। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলাম কৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছি। জাগিয়া দেখিলাম সে বালগোপাল নাই। আমার এ যৌবন ব্যর্থ হইল। এখন অনলই আমার একমাত্র আশ্রয়।। ২।। হায়, আমি যে ডালেই আশ্রয় করি তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি এমন আশ্রয় আমার নাই। কৃষ্ণকে যদি একবার আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করি। একবার পাইলে আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িব না।। ৩।। এই লও অমূল্য রত্ন উপহার লও। দূতী, আমার কথা শোনো, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই দেখো আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ৪।।

---

৩৯৩. গুজ্জরীরাগঃ।। যতিঃ।।

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে। তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে।।
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে। বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে।। ১
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী। কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী।। ধ্রু
এড় ঘর যাএঁ্যা মোএঁ শকতি না কর। কথাঁ গিএঁ্যা পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর।।
মোএঁ ভালেঁ জান[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্নু। এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান।। ২
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান। নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।।
নানা রঙ্গো রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। ৩

রাধার প্রতি বড়াই। তাম্বুলখণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বড়াই রাধাকে অভিযোগ করিয়া বলিতেছে—কৃষ্ণ হয়ত এখন নানা রঙ্গে অন্য রমণীর পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন।

---

১ ‘ক’ তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ জাণোঁ

৩৯৪. রামকিরীরাগঃ[৩] যতিঃ।

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে। বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের (২১৩/১) তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে।।
তোহ্মে যাত্রা করো শুভক্ষণে বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে।। ১
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে।। ল ।। ধ্রু
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী। পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী।।

মোএঁ সে দগধকপালী নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী।। ২
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী। পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যাশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী।।
কাহ্নু না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী। চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী।। ৩
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে। কোকিল কৈল পালি গানে।
আ (২১৩/২) গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।।
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে। শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। পূর্বে কৃষ্ণকে নির্বুদ্ধিতাবশত বঞ্চনা করিবার ঘটনাদি উল্লেখ করিয়া রাধা বলিতেছেন—এখন আমি লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণ লইলাম।

৩। অ। প্রঃ রামগিরীরাগঃ।

....

৩৯৫. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী ।।

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী। পাছু না গুণিলী আছিদরী।।
বড় রোষ তার মনে জাগে। এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে।। ১
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী। মোএঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী।। ধ্রু
কাকুতী করিল কাহ্নু তোরে। মোক পাঠায়িল বারে বারে।।
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে। তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে।। ২
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে। ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে।।
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে।। ৩
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী। তোর দুখ না সহে পরাণী।।
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে। গাই (২১৪/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি বড়াই। বুদ্ধিহীনা রাধা অহংকার বশে একদিন শ্রীহরিকে তুষ্ট করেন নাই, কৃষ্ণ বড় রুষ্ট হইয়াছেন এই কারণে। এখন কৃষ্ণকে কোথায় পাওয়া যাইবে।

....

৩৯৬. পাহাড়ীআরাগঃ।। প্রকীর্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখিগণমুবাচেদং মাধবংপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া।।

❑ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া মদনশরে জর্জরিতা রাধিকা মাধবকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সখীগণকে বলিলেন।।

....

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ আপণেঞিঁ কর শুধী।। ল বড়ায়ি।। ১
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপাণী।। ল রাধা।। ২
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী আসিআঁ দিল দরশনে।। ল রাধা ।। ৩
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে।। ল মুণী।। ৪
কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।
(২১৪/২) কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।। ৫
রাধার বচন শুণী মাহামুনী বাসলী[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে।। ৬
নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে।। ৭
নারদের বোল বেদ সমতুল মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী।। ৮
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।। ৯
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারো বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে।। ১০
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী বোল হরষিত মণে।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ (২১৫/১) উপেখিআঁ করিবোঁ তাক যতনে।। ১১
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ নিদুখ কাহ্নচরণে।। ১২
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** (তখন রাধা বড়াইকে বলিলেন) আমাকে তাঁহার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? কৃষ্ণ আমার হৃদয়চন্দন। হে বড়াই, তুমি নিজেই তাঁহার সন্ধান করো।। ১।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া বড়াই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল। বড়াইর উক্তি ঃ তুমি আমি দুইজন মিলিয়া বৃন্দাবনে খোঁজ করি চলো, তাহা হইলে হয়ত চক্রপাণিকে পাওয়া যাইবে। ।। ২।। কবির বিবৃতি ঃ দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিয়াও তাঁহার দেখা পাইলেন না, তখন তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ মুনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।। ৩।। নারদের চরণে প্রণাম করিয়া রাধা বলিলেন ঃ হে মুনিবর, কঠিনহৃদয় নন্দনন্দন জগন্নাথ কোথায় অবস্থান করিতেছেন আমাকে বলো।। ৪।। হে নারদ, আমার জীবন যৌবন, আমার ধনরত্ন, আমার বেশবাস সবই নিষ্ফল। তাঁহাকে না পাইলে আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া মুনিবর ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানযোগে জানিলেন, নাগর কৃষ্ণ কদম্বতলে আছেন।।৬।। তখন নারদ বলিলেন ঃ বৃন্দাবনে কদম্বতলে পুষ্পশয্যায় দেবরাজ বসিয়া আছেন। সেখানে গেলে তাঁহাকে পাইবে।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ নারদের বচন বেদতুল্য, এই মনে করিয়া চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ বৃন্দাবনে বনমালীর দেখা পাইলেন।। ৮।। দূর হইতে কৃষ্ণ মুখ দেখিয়া রাধা সংজ্ঞা হারাইলেন। তখন বড়াই রাধার মুখে ভৃঙ্গারের জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।। ৯।। চৈতন্য লাভ করিয়া রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরিয়া বলিলেন ঃ আমার মুখে কথা সরিতেছে না, আমার দুই চরণ চরৎশক্তিরহিত।। ১০।। বড়াইর উক্তি ঃ প্রাণের নাতিনী তুমি। প্রসন্ন মনে বলো, এ বার কী করিতে হইবে। তোমার জন্য প্রাণ দিয়াও আমি তাহা করিব।। ১১।। রাধার উক্তি ঃ আমার প্রতি যখন তোমার এতই দয়া তখন হে বড়াই তুমি একবার নিজেই যাও, গিয়া সদানন্দ সেই কৃষ্ণচরণে এই দুঃখিনীর দুঃখকথা ভাল করিয়া নিবেদন করো।। ১২।। কবির বিবৃতি ঃ এই কথা শুনিয়া বড়াই কৃষ্ণ সন্নিধানে সব কথা বলিল।। ১৩।।

---

১ অ। প্রঃ বসিলা।

৩৯৭. দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।। ১
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।। ধ্রু
কুসুমশর হুতাশে। তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।।
ক্ষেপে সজল নয়নে। দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন (২১৫/২) লিনে।। ২
দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্গাররাশি সমানে।

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।।
বাম করতে বদনে। দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে।। ৩
খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে।।
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে। নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** স্তনবিনিহিত হারখানির ভারও রাধার পক্ষে দুর্বহ, মনে হইতেছে। কাতরহৃদয়া রাধা চলিতে পারিতেছে না। সরসচন্দন পঙ্ক পায়ে মাখিতে তাহার বড় শঙ্কা, আর চন্দ্রকিরণ ত তাহার নিকট অগ্নির সমান অসহ্য।। ১।। তোমার বিরহের আগুনে রাধা দগ্ধ হইয়া আছে, তোমার দর্শন পাইলে তবে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।। ধ্রু।। মদনের পুষ্পশরের জ্বালায় জর্জরিত রাধা একপাশে বসিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং সজল নয়নে ক্ষণে ক্ষণে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হায় নীলপদ্ম দুইটি যেন বৃন্তচ্যুত হইয়াছে।। ২।। কিশলয় শয্যা তাহার কাছে অগ্নিরাশির সমান, তাহা দেখিয়া সে ভয়ে দুই চক্ষু বন্ধ করে। বাম হাতে মুখ রাখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রাধা একমনে তোমার কথাই চিন্তা করে।।৩।। সে কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে কখনো বা উল্লসিত হইতেছে। মদনশরাতুরা হতভাগিনী তোমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে সে শক্তিটুকুও নাই।। ৪।।

....

৩৯৮. বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।।
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে। ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে।। ১
আল। কাহাঞিঁ ল। রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শ (২১৬/১) রণে[১]।। ধ্রু
আহোনিশ মদন মারে তারে শরে। হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে।।
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে। তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে।। ২
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার। রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।।
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ। প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরুপ।। ৩
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।।
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহণে।। ৪
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে। দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।।
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৫

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্র ও চন্দন (জ্বালাকর বলিয়া) রাধা সর্বক্ষণ তাহাদের নিন্দা করিতেছে। মলয়পবন তাহার নিকট গরলতুল্য বোধ হইতেছে। কুসুমশয্যা তাহার পক্ষে মদনের শয্যা। সেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া সে তোমার আলিঙ্গন কামনার ব্রত পালন করিতেছে।। ১।। বিরহদহনে দগ্ধ হইয়া রাধা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ।। ধ্রু।। মদনদেব দিবারাত্র তাহাকে শরাঘাত করিতেছে। তাই রাধা হৃদয়ে নলিনীদলের বর্ম পরিধান করিয়াছে। তুমি ত সর্বক্ষণই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার বিবিধ চেষ্টা।। ২।। তাহার নয়নে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, মনে হয় যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র হইতে অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্দর্পরূপী তোমার চিত্র অঙ্কন করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে।। ৩।। সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাধার ধারণা হইয়াছে যেন তুমি তাহার সম্মুখেই আছ। তাই সে কখনো হাসিতেছে কখনো রোষ প্রকাশ করিতেছে কখনো কাঁদিতেছে আবার কখনো বা ভয়ে কাঁপিতেছে। হতভাগিনীর গৃহ আজ অরণ্যরূপ, সখীগণ জালের মতো তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বিরহের নিদারুণ অগ্নিজ্বালা বহন করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে।। ৪।। রাধার অবস্থা হইয়াছে বনের হরিণীর মতো। সে ভীত চকিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, দয়া করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দাও।। ৫ ।।

....

১ প্রথমে ছিল ‘তোর দরশনে’। পরে ‘তো’ ও ‘র’-এর মধ্যে তোলাপাঠে ‘ম্মা’ যুক্ত করিয়া ‘তোম্মার’ হয় এবং ‘দরশনে’ কাটিয়া ‘শরণে’ করা হয়।

৩৯৯. মালবরাগঃ ।। রূপকং।। কাব্যুক্তি[১] প্রকীর্ণক।। লগনী।।

অ (২১৬/২) ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষেহন্যরমণীকরণে ।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনস্তনোতি মদনঃ কদনং।।

❑ এখনো তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে? ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন, সুতনুরাধিকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

....

কাহ্নাঞিক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে। চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।। ১
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে। সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে।। ২
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী। রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।। ৩
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই। হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি।। ৪
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই। রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ।। ৫
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী। ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।। ৬
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী (২১৭/১)।। ৭
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে। সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।। ৮
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৯

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** (কৃষ্ণকে মধুর বচনে বলিল) চন্দ্রাবলী রাধা তোমার বিরহে কাতরা।। ১।। তাহার দেহ নবনীত কোমল রসের সিন্ধুসদৃশ। এখন সে পূর্ণযৌবনা, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রীত করো।। ২।। রাধিকা প্রাণে

দুঃখ পাইবে ইহা আমি সহিতে পারি না। অতএব হে মুরারি, আমার কথা শোনো, আর বিলম্ব করিও না।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্মের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া অনেক কাকুতি করিল।। ৪।। অগ্রপশ্চাৎ বুঝাইয়া বড়াই বারবার বলিল ঃ কথা শোনো, রাধাকে তুষ্ট করো।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইলেন।। ৬।। কৃষ্মের উক্তি ঃ রাধিকা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুক এবং মধুক্ষরা বাণী বলুক।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্মের আদেশে বড়াই দ্রুত গতিতে রাধার নিকট গিয়া সকল কথা কহিল।। ৮।। তাহা শুনিয়া রাধার এক মুহূর্তকে এক যুগ বলিয়া মনে হইল।। ৯।।

---

২ অ। প্রঃ কাব্যোক্তি। ❑ ৩ অ। প্রঃ কুরুযেমনোহন্যরমণীকরণে।

৪০০. ভৈরবীরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়া প্রমোদিতঃ।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং।।

❑ মাধবের আদেশে আনন্দিত হইয়া বড়াই উল্লসিত রাধিকার জনমনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল।।

....

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা সিসত সিন্দুর ন[১] সুরে।। ১
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার উচ কুচযুগল ঊপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।। ২
পহ্লাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে দেখি আভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল অতি যতনে যেন কম্বু রতনক রতনে।। ৩
মণিকিরণ ঊজলে আঙ্গাদ ভু (২১৭/২) জযুগলে পহ্লায়িল আতি কুতূহলে।
বাহুতে কনক চূড়ী মুকুতা রতনে জড়ী রতন কঙ্কণ করমুলে।। ৪
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।। ৫
কর্পূর কস্তুরী যোগ[২] আআর[৩] তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।। ৬
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী বতিভাবে রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিএঁা কাহ্ন[৪] উতরল ভৈলা মনে গায়িল বড়ু চণ্ডাদাসে।। ৭

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** তোমার কবরী শম্ভু সদৃশ, চাঁপা ফুল দিয়া তাহা বেষ্টন করা হইয়াছে। সীমন্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে যেন নবোদিত সূর্য।। ১।। রাধার গলায় রত্নমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই মুক্তামালা যেন সুমেরুশিখরের দুই পার্শ্বে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মতো শোভা পাইতেছে।। ২।। বড়াই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলঙ্কার পরাইল, যেমন স্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্নকে অন্যান্য রত্ন দিয়া সজ্জিত করিল।। ৩।। হৃষ্টচিত্তে রাধার হাতে মণিকিরণে সমুজ্জ্বল অঙ্গাদ, বাহুতে মুক্তা ও রত্নে জড়িত সোনার চুড়ি, করমূলে রত্নকঙ্কণ পরানো হইল।। ৪।।

রতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিঙ্কিণী, রাধা তাহাই গাঁথিয়া কটিদেশে পরিলেন। সোনার মল্লতোড় ও পাসলি দিয়া জঙ্ঘা চরণ এবং পদাঙ্গুলি ভূষিত করিলেন।। ৫।। কর্পূরকস্তুরীযুক্ত তাম্বুল এবং সুগন্ধ রঞ্জনে রাধার মুখ রঞ্জিত হইল।। ৬।। যিনি স্বভাবতই সুন্দরী, বিলাসবেশ পরিধান করিয়া (অধিকতর মনোহারিণী হইয়া) রাধা রতিভাবে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হইল।। ৭।।

---

১ অ। প্রঃ নব। ❑ ২ অ। প্রঃ যোগে। ❑ ৩ অ। প্রঃ আওর। ❑ ৪। অ। প্রঃ কাহ্নে।

৪০১. কোড়াদেশরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধিকা মনসিজজ্বরাতুরাং মণ্ডণেত্যাদি গুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরির্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ।।

❑ মদনবিহ্বলা এবং মণ্ডনবশত দ্বিগুণ রমণীয় রাধিকাকে দেখিয়া মন্মথশরকতর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ এইভাবে কেলিবিলাসে রত হইলেন।

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে। আল কৈল আলিঙ্গানে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে।।
কাহ্ন করিল চুম্বনে। কপোল যুগ নয়ানে।।
ললাট অধর রতন যুগল নয়ানে।। ১
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম (২১৮/১) নোরথ রাধার পিরিতী।। ধ্রু
যুড়ী রসনে বসনে। কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে।।
তার দসন রস কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।। ২
দৃঢ় করি দুয়ি তনে। নখ দিয়া ঘন ঘনে।।
পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মরণে[১]।।
রাধাঞেঁ কৈল কুজনে। মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।। ৩
আতি চির আনুবন্ধে। রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে।।
ভৈল মুকুল নয়নে। সুখী ভৈল দুই জনে।
...[২]বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ কবির উক্তি। রাধা-কৃষ্ণের কেলিবিলাস বর্ণিত। 'সম্ভোগ-চিত্রের পালাবাদল' দ্রষ্টব্য।।

১ অ। প্রঃ মণে। ❑ ২ ছাড়। প্রঃ গাইল।

....

৪০২. শ্রীরামগিরীরাগঃ।। আঠতালা।।

এহে রহিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী। চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী।
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী। এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী।
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ (২১৮/২) নিন্দ।। ধ্রু
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল। নব কিশলয়ত শয্যা বচিল।।
নিজ উরু তলে তাক নিশ্চলে রাখিল। তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল। ২
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।।
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস।। ৩
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন। বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন।।
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলিগণে।। ৪

❑ বিহারান্তে গোপবালিকা রাধিকা কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া বলিলেন ঃ হে চক্রপাণি, তুমি ভিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই। হে কৃষ্ণ, আমার চিত্ত একান্তভাবে তোমাতেই নিবন্ধ।। ১।। হে গোবিন্দ, আমি বড়ো শ্রান্ত হইয়াছি। তোমার উরু পাতিয়া দাও, মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাই।। ধ্রু।। কবির বিবৃতি ঃ এ কথায় কৃষ্ণ সম্মত হইলেন। তিনি কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং নিজ উরুতলে রাধিকাকে শোয়াইয়া মনে মনে কিছু চিন্তা করিলেন।। ২।। এমন সময় শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর এবং কোকিল মিলিয়া কলগীত ধরিল, চরিদিকে ফুলের গন্ধ বহিতে লাগিল, রাধার নয়নে নিদ্রা নামিয়া আসিল।।৩।। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বড়াইয়ের নিকট গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।। ৪।।

....

৪০৩. কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে। এবেঁ মেলাণী দেহ অহ্মারে।।
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে। রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে।। ১
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি। কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল।। ধ্রু
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক (২১৯/১) রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে জাইব আহ্মে মথুরা নগরে।। ২
নিন্দ ছল করি তাক[১] রাধার পাশে বড়ায়িক বুলিহ[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু কাঢ়ি......[৩] মথুরা নগরক কাহ্নে।। ৩

কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইএঁ বুইল বচন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি। এবার আমাকে বিদায় দাও। বৃন্দাবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে। তুমি সত্বর রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।। ১।। বড়াই, তোমারই জন্য রাধার সঙ্গে বিলাস করিয়াছি।। ধ্রু।। আর একটি কথা হে বড়াই, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি শোনো। আমি মথুরায় চলিলাম, তুমি রাধাকে আপনার মতো ভাবিয়া যত্ন করিয়া রাখিবে।। ২।। কৃষ্ণ বড়াইকে নির্বন্ধ সহকারে বলিলেন ঃ ঘুমের ভাণ করিয়া রাধার পার্শ্বে থাকো। কবির বিবৃতি ঃ এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাধার মাথার নীচ হইতে নিজের উরু সরাইয়া কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন।। ৩।। কিছুক্ষণ পরে রাধাচন্দ্রাবলী জাগরিত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পাশে দেখিতে পাইলেন না। তখন বড়াইকে জাগাইয়া এই কথা বলিলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ থা। ❑ ২ অ। প্রঃ বুলিল। ❑ ৩ একটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে মনে হয়। বসন্তরঞ্জন ঐ স্থলে ‘গেলা’ বসাইয়াছেন।

....

৪০৪. ভায়িঠালীরাগঃ[১]।। যতিঃ।।

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে নিন্দত এড়িএঁ গেল মোরে।। ১
বড়ায়ি গো কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল। আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে।। ল।। ধ্রু
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোএঁ সব খণে সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতী তার মোর হউ দরশনে।। ২
মে কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িএঁ পালাইবে কাহ্ন তবে কেহ্নে (২১৯/২) কাল ঘুম যাইবোঁ।।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার তা লাগি গরল মোএঁ খায়িবোঁ।। ৩
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দূতী তোর পাএ রোঁ[২] এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থান[৩] আণ শ্রীমধুসূদনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বালগোপাল এখনই ত কদম্বতলে ছিলেন। আমি তাঁহার উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলাম। কেলিবিলাসে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণবিরহে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি, তুমি শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি সর্বক্ষণ আমার কেবল এই চিন্তা—তাঁহাকে কখন পাই। দূতী তোমার পায়ে পড়ি আমার প্রাণপতিকে আনিয়া দাও তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হউক।। ২।। আমাকে তিনি ফেলিয়া পলাইবেন তাহা কেমন করিয়া জানিব। জানিলে কি এমন কালঘুম ঘুমাই? আমার এ রূপ এ যৌবন সবই ব্যর্থ। হায় তাঁহার জন্য বিষ পান করিব।। ৩।। দেখ দূতী, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিতেছি, এইবারটির মতো আমার আশা পূর্ণ করো। একবার যাও শ্রীমধুসূদনকে আমার নিকট আনো।। ৪।।

....

---

১ অ ঃ ভাঠিয়ালীরাগ ঃ ❑ অ। প্রঃ ধরোঁ। ❑ ৩। অ। প্রঃ থানে।

৪০৫. দেশাগরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল তোর সঙ্গে রতিকুতুহলে।
রাধা ল তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে।। ১
রাধা ল কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে। না জাণো সে গেল কোণ দিশে।। ধ্রু
প্রবোধবচন কত বুঝাএঁা তাহারে আণিএঁা মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে।। ২
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লএঁা কাহ্ন রতি ভু (২২০/১) ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে।। ৩
এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিএঁা চাহোঁ তাক যবেঁ পাএঁো তার দরসনে।
...তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ....[১] বাসলীচরণে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** তোমার সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ত এই কদম্বতলে এখনই ছিলেন। বুদ্ধিহীনা রাধিকা তুমি নিজেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব।।১।। কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন তাহা তা জানি না। রাধা তাঁহার উদ্দেশ্য পাইব কেমন করিয়া।। ধ্রু।। কত প্রবোধবাক্য বলিয়া কত বুঝাইয়া তবে তাঁহাকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইলাম। আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন আর তুমি টের পাইলে না।। ২।। পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের মন কপটতায় পূর্ণ। আমার মনে হয় তিনি অন্য কোনো যুবতীর সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি করিতেছেন।।৩।। এখন তুমি এখানে থাকো, আমি গিয়া তাঁহার সন্ধান করি। তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্রঃ বন্দিএঁা।

....

৪০৬. রামগিরিরাগঃ।। আঠতালা।।

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরা°। রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধা মধুসূদনং।।
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা। জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্‌বচঃ শৃণু।।

❑ হে রাধা, একাকিনী বনে বনে ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি শ্রীমধুসূদনকে পাইলাম না। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। আজ সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্যবোধ হইতেছে।।

....

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি। এখান আসিবে মোর সুন্দ[২] কাহ্নাঞিঁ।।
তেকারণে আহ্মে গিএঁা তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোএঁ উচিত ফল পাইলোঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিমো মোঞেঁ একসরী কুঞ্জে।

কা লএঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে।। ধ্রু
দুয়াজ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী। আহ্মাক তেজিএঁ আজি কথাঁ গেলা হরী।।
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লএঁ সুখরতি (২২০/২) ভুঁজয়ে মুরারী।। ২
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ। কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে।।
চিন্তিএঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপায়[৩]। কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ।। ৩
চারি পহর দিন পুরিল সকল। কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল।
এবেঁ কেহ্নেমনে রহে আহ্মার জীবন। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রথম প্রহরে মনে করিলাম আমার কৃষ্ণ-সুন্দর এখনই আসিবেন। তাই হে বড়াই, আমি নিজে গিয়া তাঁহার খোঁজ করিলাম না। এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম।। ১।। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন, আমি একাকিনী কেমন করিয়া কুঞ্জে দিন কাটাই।। ধ্রু।। দ্বিতীয় প্রহরে আমি একাকিনী ভাবিতে লাগিলাম আজ কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। কোন্ রমণী আজ সুতীর্থে স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছে যাহার সহিত মুরারি সুখবিলাসে মগ্ন আছেন।। ২।। তৃতীয় প্রহরে কোকিল বারংবার ডাকিতে লাগিল আর কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম।। ৩।। এমনি করিয়া দিনের চারি প্রহরই কাটিয়া গেল। কৃষ্ণকে না পাইয়া কদম্বতলে আসিলাম। এখন হে বড়াই, কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ শ্রমভরাতুরা। ❑ ২ অ। প্রঃ সুন্দর। ❑ ৩ অ। প্রঃ উপায়ে।

....

৪০৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী। যে নারীক লএঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী।। ১
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী। এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী।। ধ্রু
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে। শিশু লএঁ বাটে হাটে হরিযে বুলে।। ২
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে। ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে।। ৩
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত কেলিবিলাস করিতেছেন, তাহারই শুভদিন। সে রমণী পুণ্যবতী।। ১।। রাধিকা, তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ। দেখি, এখন ভাল করিয়া সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করি।। ধ্রু।। তিনি কখনো কদম্বতলে কখনো বা যমুনাকুলে কখনো বা হাটেবাটে হৃষ্টমনে গোবৎস লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান।। ২।। হে গোপকুমারী, যখন তাঁহার দেখা পাইব তখন তাঁহাকে কী বলিব সে কথা আমাকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দাও।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনিয়া রাধা আনন্দিত মনে বলিলেন।। ৪।।

....

৪০৮. মল্লাররাগঃ ।। কু (২২১/১) ডুক্কঃ।।

চাহ চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে। বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে।।
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে। আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে।। ১
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু কয়ী। গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল।। ধ্রু
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে। ছাওআল হঞাঁ কাহ্ন রহে খণে খণে।।
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে। সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে।। ২
এবার পারিলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে। খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে।।
য়েবার আণিঞাঁ দিলে কাহন মোর ঠায়ি। তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি।। ৩
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। য়েতেকে ষাণিল নারী যেহেন শরীরে।।
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই যমুনার দিকে তাঁহার খোঁজ করো, বকুলতলায়ও ভাল করিয়া দেখিও। যমুনার তীরে কুঞ্জবনে এবং বড়ো বড়ো গাছের উপরেও তাঁহার সন্ধান করিও।। ১।। তাঁহার দেখা পাইলে বিনয় করিয়া বলিও, রাধা বনমধ্যে একাকিনী তোমার জন্য বড়ো আকুল হইয়াছে।। ধ্রু।। শিশুগণ যেখানে অবস্থান করিতেছে সেখানেও দেখিও, কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিশুমূর্তি ধারণ করেন। চারিযুগ ধরিয়া তাঁহার চরিত্র কেহই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার যাহাতে দেখা পাও সেজন্য সাবধান হইয়া চেষ্টা করিও।। ২।। বড়াই, এবার সেই মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলে আর প্রাণ থাকিতে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িব না। এবার তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ দিব না।।৩।। মহাদেব অর্ধঅঙ্গে গৌরীকে ধারণ করিয়াছেন আর গঙ্গাকে ধরিয়া আছেন শিরে। ইহা হইতে বুঝা যায় রমণী পুরুষের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণকে এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও।। ৪।।

....

৪০৯. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

হেন রাধিকার বচনে। চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে (২২১/২) ল।।
আল বড়ায়ি। সুণিঞাঁ রাধার আরতী। কাহাকেহো না কৈল সংহতী ল।। ১
আল বড়ায়ি। মনে ধনী রাধার বচনে। কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে।। ধ্রু
যমুনা[১] পাঞাঁ গোপালে। পুন গেলী বকুলের তলে।।
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে। চাহিলেক গাছের উপরে।। ২
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী। শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী।।
একশরী বনের ভিতরে। ভএঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে।। ৩
বাহুড়িঞাঁ বড়ায়ির[২] থানে। বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে।।
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধিকার এই কথা শুনিয়া বড়াই বৃন্দাবনে চলিল। রাধার অনুনয় বাক্য শুনিয়া বড়াই কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী বাহির হইল।। ১।। রাধার বাক্য মনে ধরিয়া বড়াই বনে বনে কৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিল।। ধ্রু।। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বকুলতলায় উপস্থিত হইল, সেখানেও তাঁহার দেখা না পাইয়া গাছের উপর তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল।। ২।। সেখানেও বনমালীর দেখা মিলিল না। বড়াই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একাকিনী স্ত্রীলোক নির্জন বনে বড়ো ভয় পাইল।। ৩।। দীর্ঘকাল পরে বড়াই রাধিকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৃষ্ণের উদ্দেশ মিলিল না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ যমুনাত না। ❑ ২ অ। প্রঃ রধিকার।

....

৪১০. ভায়িঠালীরাগঃ[১] যতিঃ।

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে　　শুতিলোঁ দিএঁ৷ শিয়রে।
　প্রাণের বড়ায়ি ল দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন　　যেহেন ভৈল সপন
　প্রাণ বড়ায়ি ল যাগিএঁা চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে। ল।। ১
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি　　উদ্দেশ বো (২২২/১) ল বড়ায়ি। ল।
　প্রাণ বড়ায়ি ল তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই।। ধ্রু
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ　　যার বিরহে পুড়িলোঁ
　সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল　　কিবা আপরাধ কৈল
　যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে।। ২
সোঞঁরী কাহ্নের বাণী　　না রহে মোর পরাণী
　চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস　　দিনে দিনে তনু যেষ
　ভাবিএঁা সে কাহ্নের নেহে।। ৩
বিধি বিপরিত ভৈল　　আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
　বিরহে মা জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে　　কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রাণের বড়াই, শ্রান্তিবশত কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলাম, নয়নে দারুণ নিদ্রা নামিয়া আসিল। সেই অবসরে তিনি স্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হইলেন। জাগিয়া দেখি গোবিন্দ নাই।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন

আমাকে বলিয়া দাও। তোমাকে সঙ্গো লইয়া আমি সেখানে যাইব।। ধ্রু।। যাঁহার বিরহে দগ্ধ হইয়া বহু দুঃখ পাইলাম তিনি কেন আমাকে নিকটে যাইবার অনুমতি দেন না? কেন এমন দুর্দিন আসিল? আমি কি অপরাধ করিলাম যে কৃষ্ণ আমার উপর রুষ্ট হইলেন।। ২।। কৃষ্ণের কথা মনে করিয়া আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না, আমার দেহের সংজ্ঞা নাই। আমি সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার প্রেমের প্রতীক্ষায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।। ৩।। বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ তাই কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হায়, এ বিরহ সহ্য করিয়া আর কতদিন বাঁচিব। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন তুমি আমাকে সেকথা বলিয়া দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ ভাঠিয়ালীরাগ।

....

৪১১. গুজ্জরীরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে। বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে।।
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর। যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।। ১
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
কবির আপণ কাজ না জাণিব আ (২২২/২) নে।। ধ্রু
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী। চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী।।
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে। ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে।। ২
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর। ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর।।
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর। আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর।। ৩
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর। রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর।।
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি। আর দেরি করিতে ভয় হয়। রাধা চঞ্চল হইও না, মনকে শান্ত করো। এখন গৃহে ফিরি, নহিলে লোকে জানিতে পারিবে।। ১।। পরে কৃষ্ণকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। এমন ভাবে নিজের কাজ করিবে যে অন্যলোক কিছুই জানিতে পারিবে না।। ধ্রু।। বড়ো কাজ করিয়া লোক জানাজানি করিতে নাই। যে নারী বুদ্ধিমতী সে এমনি করিয়া চিরদিন সুখভোগ করে। আমার কথা শোনো, মন স্থির করিয়া শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহা হইলে আইহন দোষ দিবে না।। ২।। রাধা, তোমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেছি আমার কথা শোনো। শীঘ্র গৃহে ফিরিলে কেহ তিরস্কার করিবে না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কথা শোনো, গদাধর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আসিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। তুমি অস্থির হইও না।। ৩।। এইরূপে বিবিধ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া বড়াই সখীদলসহ রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল।। ৪।।

৪১২. মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

নিনায় কতিচিৎ কালং কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং।।

❑ কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া রাধা জয়তীকে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বলিলেন।

....

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল। এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।।
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ।। ১
(২২৩/১) শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল।। ধ্রু
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মোকরিবোঁ শঙ্খচূর।।
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।। ২
পুণমতী সব গোআলিনী আছে সুখে। কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে।।
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ। বজরে গটিল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ।। ৩
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ। সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।।
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের ভারে ডালগুলি নুইয়া পড়িয়াছে, হায়, এখনে বালগোপাল গোকুলে আসিলেন না। আমার এ উন্নত যৌবন বসনাঞ্চলে আর কতদিন আবৃত রাখিব। নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াও গেলেন না ।। ১।। হায় বড়াই, শৈশবের প্রেমকে নষ্ট করিয়া দিল জানি না, প্রাণনাথ ত এখনো গৃহে আসিলেন না। ধ্রু।। বড়াই, আমি সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বিষাক্ত শরের আঘাতে হরিণীর যেমন হয়, কৃষ্ণবিহনে আমার প্রাণও সর্বক্ষণ সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে।। ২।। আর সব গোয়ালিনী পুণ্যবতী, তাহারা সুখে আছে। আমি কী দোষ করিয়াছি যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখ দিলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু আমার বুক বজ্র দিয়া গঠিত, তাই এখনো বিদীর্ণ হইল না।। ৩।। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আষাঢ় আসিল, হায়, নিষ্ঠুর সে নন্দনন্দন তো এখনো আসিলেন না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ গঢ়িল।

....

৪১৩. শ্রীরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন।।

❑ চতুরা রাধিকা, মেঘান্ধকার (বর্ষার) এই চারিটা মাস কোনো প্রকারে কাটাইয়া দায়ও, আমার এখন যাইবার মতো শক্তি নাই।।

....

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। মদনে[১] কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।।
পা (২২৩/২) খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।

মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস। এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস।। ধ্রু
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।।
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা। হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা।। ২
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে। শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ। চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট[২] জায়িবে বুক।। ৩
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী। মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।।
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** আষাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে। মদনজ্বালায় আমি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। হায়, আমি ত পাখি নই, নহিলে আমার প্রাণনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উড়িয়া যাইতাম।। ১।। বর্ষার এই চারিমাস কেমন করিয়া কাটাই। আমার এখন পূর্ণ যৌবন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিরাশ করিলেন।। ধ্রু।। শ্রাবণ মাসে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে, শয্যায় একলা শুইয়া নিদ্রা আসিতেছে না। আর যে পুষ্পশরের জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছি না। বড়াই এবার তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলনের আয়োজন করো।। ২।। ভাদ্র মাসের আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার করিয়া আছে। ময়ূর, দাদুরী ও ডাহুকের কলরব শোনা যায়। এই অবস্থায় যদি কৃষ্ণমুখ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।।৩।। আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা ধরিয়া আসিবে, মেঘ চলিয়া গেলে কাশফুল ফুটিবে। তখনো যদি কৃষ্ণ দেখা না দেন তাহা হইলে এ জীবন বিফল হইবে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মদন। ❑ ২ অ। প্রঃ ফুটি।

....

৪১৪. মালবশ্রীরাগঃ।। যতিঃ।।

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি।।

❑ কল্যাণী রাধিকা, খেদ করিও না, মন স্থির করো। কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।।

....

হাথে চান্দ মা (২২৪/১) নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিনাঞ্জলী[১]।।
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে। কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে।। ১
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ। আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ।। ধ্রু
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল। কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল।।
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল। তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল।। ২
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল। ঝালিআর ডাল[২] যেন তখনে পালাইল।।

দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে। কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে।। ৩
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে। কেমতেঁ পাঁও এবেঁ শ্রীমধুসূদনে।।
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, হাতে চাঁদ তুলিয়া দিবে এই ভরসা দিয়া আমাকে পাগল করিলে। আমি আইহনকে অবজ্ঞা করিলাম, লাজলজ্জা বিসর্জন করিলাম। তুমি আশ্বাস দিয়া সরিয়া গেলে, আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কালযাপন করিতেছি।। ১।। বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকে ভাল করিয়াই চিনিলাম। স্পর্শরস দূরের কথা তাঁহার দর্শন পর্যন্ত পাইলাম না।। ধ্রু।। বড়াই, তোমারই কথায় প্রেম বাড়াইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত ভাল করিয়া রসভোগের সুযোগ পাইলাম না। পূর্বজন্মে হয়ত খণ্ডব্রত করিয়াছি তাই আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না।। ২।। তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন দেখা দিয়া মুহূর্তমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই অন্তর্ধান করিলেন। মদনজ্বালায় আমার তনুদেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যিনি কৌতুকবশে আমার প্রেমের উদ্বোধন করিলেন তিনিই তাহা বিনষ্ট করিতেছেন।। ৩।। বড়াই গো, তোমার কথায় আমার মন শান্ত হইতেছে না। বলো কেমন করিয়া এখন শ্রীমধুসূদনকে পাই। আমি বলি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একবার যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ তিলাঞ্জলী। ❑ ২ 'পাঠ-পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

....

৪১৫. আহেররাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।। লগনী।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ।।

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুনা।।

❑ হে রাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জানিলেই বা কি? আর না জানিলেই বা কি? কারণ আমি এখন যাইতে অসমর্থ।।

....

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী আণিআঁ দিআর জগন্নাথে।। ১
আল রাধে
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার বোল পালী গেলা দেবরাজে।। ২
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহি জাণ তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে।। ৩
আনুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্নু পাইব আহ্মে চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো।। ৪
এ বোলে (২২৫/১) পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ আজি মোর ভৈল শুভদিনে।

যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান তবেঁ তার পাইব দরশনে।। ৫
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন গেলা দূর মথুরা নগরী।। ৬
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী মুথরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
চরণে ধরোঁ তোহ্মা কাহ্ন দেহ একবার নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৭
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না ময়িলোঁ সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে।। ৮
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে (২২৫/২) সি কালে তার থান জাহ একবারে[২]।। ৯
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলো গমনে মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১০

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আমার কথা শোনো। এই রত্নাঙ্গুরীয় দিতেছি, হাতে পরো। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি জগন্নাথকে আনিয়া দাও।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ লজ্জাহীনা রাধা, তুমি চুপ করিয়া থাকো। তাঁহাকে এখন কোথায় পাইব। পাপিষ্ঠা, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একবার বলিলাম। তিনি আমার কথা রক্ষা করিয়া গেলেন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ ওগো বড়াই, এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না। তোমার বয়স হইয়াছে। আলস্যবশত তোমার দুঃখবোধ লুপ্ত হইয়াছে। তাই তুমি রুষ্ট হইতেছ।। ৩।। বড়াইর উক্তি ঃ বাজে কথা বলিও না। রাধা, তুমি বড়ো প্রগল্‌ভা। কে তোমার সঙ্গে কথায় পারিবে? কোথায় কৃষ্ণকে পাইব সেই কথা আমাকে বলিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিব।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তোমার মুখচুম্বন করি। আজ আমার শুভদিন হইল। ওগো বড়াই, কৃষ্ণ যেখানে যেখানে ঘুরিয়া বেড়ান সেই সেই স্থানে সন্ধান করো। অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধিকা তোমাকে বলি শোনো। কোথা গিয়া শ্রীহরির সন্ধান করিব? আমার চলিবার শক্তি নাই। অনুমান হয় কৃষ্ণ তোমাকে উপেক্ষা করিয়া সুদূর মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ বৃদ্ধা তোমার পরামর্শেই প্রাণেশ্বর আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গিয়াছেন। তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি একবার কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিব।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ আচ্ছা, সত্য করিয়া বলো যে আর কখনো আমাকে তিরস্কার করিবে না। তাহা হইলে মথুরায় যাইতে পারি। বারংবার অনেক দুঃখভোগ করিয়াছি। প্রাণে যে মরি নাই সে আমার বড়ো ভাগ্য। এইসার কথা তোমাকে বলিলাম।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ এই মাথায় হাত দিয়া তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি, তোমাকে আর কখনো দুঃখ দিব না। আমার কপালে যাহা আছে কালক্রমে তাহা ফলিবেই। তবু তুমি একবার তাঁহার কাছে যাও।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধা, তোমার কথায় কৃষ্ণের উদ্দেশে এই দেখো মথুরায় যাইতেছি। তাঁহার নাগাল পাইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য অতিশয় যত্ন করিব।। ১০।।

---

১ 'সু' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ একবার।

....

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং। জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা।।
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ। রাধিকামন্নয়িঃশেষ[১] নাগরো পরমাক্ষরং।।

❑ বৃন্দা মথুরানগরে গিয়া মধুসূদনকে বলিল, বিরহিণী রাধা তোমার শরণার্থী। এই কথা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন।।

....

৪১৬. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল। তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে।।
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে।। ১
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিরা নাহিঁ করে।। ধ্রু
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে।।
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর (২২৬/১) তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।। ২
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী।।
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর।। ৩

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** রাধা বড়ই প্রগল্‌ভা। তাহাকে দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তাহার নিকটে যাইতে ভয় লাগে। গোপীদের মধ্যে একজনও ভালো নয়। সকলেরই দুষ্ট স্বভাব। তুমি নিজেই বলো, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাই।। ১।। রাধার জন্য আমি কি করি নাই বলো? তথাপি আমাকে যাইবার জন্য আর কেন বলিতেছ।। ধ্রু।। আমার দগ্ধ প্রাণ শান্ত করিবার জন্য তুমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া বলিলে। তবু রাধা আমার প্রতি আনুকূল্য করিল না। তাই স্থির করিয়াছি আর তাহার মুখ দেখিব না।। ২।। দেখো বড়াই, বেশি কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। রাধা যাহা বলিয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নয়। তাই তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৩।।

---

১ অ। প্রঃ রাধিকামন্যুনিঃশেষঃ।

....

৪১৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত।।

আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী।। ১
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে।। ধ্রু
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ।
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ[১] কেহ্নে।। ২
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুণি আধম জন আন্ত (২২৬/২) রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।। ৩
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **বড়াইয়ের উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি না। হাতে পাওয়া অমৃতকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? বনমালী, আমার কথায় ভরসা করিয়া আইস। চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমাকে দুর্বচন বলিবে না।। ১।। দুখিনী রাধিকা বিরহে ব্যাকুল, তাহাকে এখন ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।। ধ্রু।। আমার কথায় যদি তাহার কাছে আসিতে না চাহ তাহা হইলে পরে কিন্তু বিরহ-দুঃখ পাইবে। একদিন তাহার জন্য ভাত খাও নাই, আজ শর্করা খাইতে অনিচ্ছুক কেন।। ২।। সোনার ঘট ভাঙ্গিলেও জোড়া যায়। সজ্জনের প্রেমও তেমনই। কিন্তু যে জন অধম, যাহার অন্তর কপটতাপূর্ণ, তাহার প্রেম মাটির ঘটের সমান।। ৩।। রাধিকা আপন গৃহে বসিয়া রহিল, আর তুমি আসিয়া রহিলে মথুরা নগরে। আসা যাওয়া করিয়া আমার প্রাণান্ত হইল।। ৪।।

---

১ পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

....

৪১৮. বিভাষরাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।।

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম গুণী তারে।।
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে।। ১

আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী।। ধ্রু
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।।
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী।। ২
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস।।
বিরহে কা[১]

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই তোমাকে বলি, তুমি আর অনুরোধ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আমার আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। সে যে আমাকে কত দুঃখ দিয়াছে তাহা ত তোমার অবিদিত নয়। আমি মনস্থির করিয়াছি আর তাহাকে দেখিব না।। ১।। ওগো বড়াই, যাও তুমি সেখানে ফিরিয়া যাও। রাধিকার জন্য আর আমাকে বলিও না ।। ধ্রু।। কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রস দিবে? রাধা যত কথা বলিয়াছে তাহা ত তোমার অজানা নয়। এই ধন-রত্ন-রাজ্য-ঐশ্বর্য সবই ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করিতে পারি না।। ২।। গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়াছি। স্থির করিয়াছি কংসের বিনাশ করিব।।

---

১ পুথি অসমাপ্ত। শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

৪২.৪ মূলপাঠের নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪২.৪.১ কাহিনী

'রাধা-বিরহের'র পূর্ব খণ্ডের নাম 'বংশীখণ্ড'। এই খণ্ড থেকেই রাধার বিরহ-বেদনার সূত্রপাত। 'রাধাবিরহে'র মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে কাহিনী সূত্র হিসাবে 'বংশীখণ্ডে'র কাহিনী চুম্বকাকারে তুলে ধরা হ'ল। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ ও রাধার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটলেও দেহজ মিলন ঘটেনি। রাধার কথা কৃষ্ণ রাখবে—কখনও অমান্য করবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী রাধার হাতে সমর্পণ করে চলে যায়। এরপর দীর্ঘদিন দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাত নেই। দীর্ঘ-অদর্শনে রাধার প্রাণমন ছটফট করতে থাকে। এই বিরহ যন্ত্রণাই অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য লাভ করেছে 'রাধাবিরহ' অংশে।

এই অংশে দেখা যায়— কৃষ্ণগত প্রাণা রাধা গতানুগতিকভাবে গৃহের কাজকর্ম করে। কিছুতেই উৎসাহ নেই। দীর্ঘদিন অতিবাহিত। কৃষ্ণ উধাও। রাধা স্বপ্নে প্রাণাধিক প্রিয়কে দেখে। চৈত্রমাসে শীতল বাতাস বইতে লাগলো—বসন্ত সখা কোকিলের কুহুতানে বৃন্দাবন মুখর। কৃষ্ণহারা রাধার জীবনযাপন অসহ্য। রাত্রে কৃষ্ণ মিলনের স্বপ্ন দেখে রাধার হৃদয় যন্ত্রণা বেড়ে যায়। বড়াই দূতীকে—কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবার জন্য জানায় তীব্র আকুতি।

কিন্তু পূর্বের নানা ঘটনা এনে বড়াই রাধাকে কঠোর-কঠিন ভাষায় গঞ্জনা দেয়। উদাহরণ হিসাবে কৃষ্ণের দেওয়া তাম্বুল, গন্ধ চন্দন রাধা কিভাবে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সে সব কথা বলে। কৃষ্ণের কথা বলতে রাধা বড়াইকে চড় মেরেছিল। সে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে যে এখন তার কিছু করার নেই। সে রাধার নতুন যৌবনকে পুঁটলি বেঁধে রাখতে বলে। স্পষ্ট ভাষায় বলে—কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে **চলে** গেছে।

বড়াই-এর রূঢ় কথায় রাধিকা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তার ধন-যৌবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে হয়। গলা থেকে রাধা গজমুক্তার হার ছিঁড়ে ফেলতে চায়, সিঁথির সিঁদুর মুছতে চায়, বাহুর বলয় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায়। শুধু তাই নয় মাথা মুড়িয়ে সাগরের জলে ঝাঁপ দিতে চায়, যোগিনী সেজে দেশত্যাগী হতে চায়। বৃন্দাবনে যাবার জন্য রাধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঘ-ভালুক-যমুনার খরস্রোত—কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাকে বিরত করতে পারবে না। যমুনার প্রবল স্রোত ধারায় ডুবে মরলেই সে কৃষ্ণকে পাবে—এই ধারণা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে।

রাধা *বড়াইকে* শতপল সোনা নিয়ে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে যাবার জন্য অনুরোধ করে। রাধার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষ্ণের অপরূপ রূপ। কৃষ্ণের কালো গায়ের রঙ, মাথার ঘোড়াচুল, গায়ের চন্দনগন্ধ, হাতের করতাল, মুখের মধুর বাঁশী, পায়ের নূপুর ইত্যাদি রাধা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। *বড়াইকে* কর্পূর-বাসিত পান-সুপারী নিয়ে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে পাঠানোর জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল। শত অনুরোধ *বড়াই* প্রত্যাখ্যান করে। অজুহাত হিসাবে সে বৃদ্ধা, চলৎশক্তি নেই ইত্যাদি বলে রাধাকেই কৃষ্ণের খোঁজে বের হতে বলে। রাধাকে মথুরা, গিরিগুহা ও অরণ্যে যাবার পরামর্শ দেয়। এরসঙ্গে চণ্ডীপূজা দেবার কথাও বলে। রাধার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কৃষ্ণবিরহে যত সে অস্থির হয়ে পড়ে *বড়াই* তত তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে বলে যে, কৃষ্ণ হাতজোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও রাধা তাকে যেভাবে অপমানিত করেছে, তার ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। রাধার হৃদয়যন্ত্রণাকে তীব্রতর করার জন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ষোল হাজার গোপী নিয়ে রাসলীলায় মগ্ন আছে—এ সংবাদও দেয়। এ সবকিছু শোনার পর রাধার বিরহ-আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। *বড়াইকে* তার হৃদয়ের আর্তি করুণভাবে জানাতে থাকে।

রাধার শত আবেদন নিবেদন ও সীমাহীন হৃদয় বেদনায় *বড়াইর* মন কিছুটা গলে। সে রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণের খোঁজে বের হয়। বৃন্দাবনের কদমতলায় রাধা মোহিনী বেশ ধারণ করে। কচি পাতার শয্যা রচনা করে কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ। কৃষ্ণ এলো না। আশাহত হয়ে দুজনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। দূর থেকে তারা কৃষ্ণকে গরু চরাতে দেখে। কৃষ্ণকে দেখা মাত্র রাধা জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে রাধাকৃষ্ণের কাছে গিয়ে পূর্ব অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চায়। সুযোগসন্ধানী কৃষ্ণ রাধাকে রূঢ় ভাষায় অপমান করে পত্যাখ্যান করে। তবে যাবার সময় আভাসে ইঙ্গিতে বলে যে *বড়াই* বললে সে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে বড়াইও রাধাকে অনেক কটু কথা বলে। রাধা চোখের জলে বুক ভাসায়। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণও স্থানত্যাগ করে।

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মিলন স্বপ্নে বিভোর রাধা *বড়ায়িকে* নিয়ে আবার কৃষ্ণের সন্ধানে বের হয়। কদমগাছের নিচে কৃষ্ণকে দেখে রাধা আবার জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* যত্নে জ্ঞান ফিরে এলে রাধা বড়াইর মারফৎ বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। বিয়ের ব্যাপারে কৃষ্ণের শর্ত হ'ল — রাধাকে মনোহর বেশে আসতে হবে এবং মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ করতে হবে। কৃষ্ণের দেওয়া শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পর কৃষ্ণ রাধাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং রাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন ঘটে।

মিলন শেষে ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের উরুতে মাথা রেখে অঘোরে গুমিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে কংসবধের নাম করে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যায়। তবে বিদায় মুহূর্তে বিশেষভাবে *বড়াইকে* বলে যায় সে যেন রাধাকে নিজের মতো করে দেখা শোনা করে।

ঘুম ভাঙতেই রাধা দেখে তার পাশে কৃষ্ণ নেই। শুরু হয় *বিচ্ছেদ-বেদনার যন্ত্রণা*। চোখের জলে বুক ভাসায়। আকুলভাবে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। *বড়াই* বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করার জন্য নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে। শেষে দুজনে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। দিকে দিকে বসন্তকালের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধার যৌবন বসন অঞ্চলে ঢাকা যায় না। বর্ষাকাল এলো। প্লাবনমুখর দিনে বিরহে রাধার বুক ফেটে যায়। নিরুপায় হয়ে *বড়াইর* কাছে মিনতি জানায়। রাধার ঐকান্তিক অনুরোধে বড়াই মথুরায় যায়। কৃষ্ণকে সব কথা খুলে বলে। কৃষ্ণ খুবই রুষ্ট। রাধাকে দেখলে নাকি তার হৃদকম্প হয়। রাধা কোনোদিনই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-প্রীতি দেখায়নি বলে অভিযোগ করে। *বড়াইকে* বৃন্দাবনে ফিরে যেতে বলে। কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝানোর পর, কৃষ্ণের স্পষ্ট জবাব হ'ল সে ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারে কিন্তু বাক্য জ্বালা তার সহ্যাতীত। মথুরায় তার আগমনের কারণ হিসেবে কংসবধের কথা বলে।

(এখানেই কাব্যের সমাপ্তি। পরবর্তীকালে কি ঘটেছিল তা আজও অজানা)।

৪২.৪.২ 'রাধাবিরহ' কাহিনীর নির্যাস

১। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন একবার মাত্র ঘটতে দেখা যায়।

২। রাধার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। সবসময় শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছ থেকে নানা অজুহাত দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তার কাছে রাধার হৃদয় আকুল প্রেমের কোনো মূল্যই নেই। দেহজ মিলনে বাধ্য করে কামনার ক্ষুধা জাগ্রত করে যে ভূমিকা কৃষ্ণ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় চরিত্রহীনতা ও শঠতার নিদর্শন।

৩। শুধু রাধার দেহভোগের পর ঘুমন্ত অবস্থায় রাধাকে ফেলে চুপিসাড়ে চলে যাবার মুহূর্তে বড়াইকে যখন রাধাকে নিজের মতো করে দেখার জন্য অনুরোধ জানায়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সহানুভূতিশীল মানবিক আবেদনের দিগন্ত কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

৪। বড়াইর চরিত্রের বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। সমগ্র অংশ জুড়ে রাধার মর্মযন্ত্রণারই প্রাধান্য।

৬। রাধার বিরহ-বেদনা মর্মস্পর্শী। অনন্ত প্রেমের স্পর্শে ধন্য। কোথাও অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। রাধার প্রেম ভাবনাই মুখ্য স্থান নিয়েছে।

৭। বর্ষা ও বসন্তের প্রকৃতি চিত্ররূপ পেয়েছে।

৮। প্রকৃতি চিত্রণে, প্রেম ব্যাখ্যায় ও তন্ময়-মন্ময় ভাব প্রকাশে কবির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আছে।

৯। গীতি কবিতার মূর্চ্ছনা আছে।

১০। কাহিনীর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

১১। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

৪২.৪.৩ প্রতিটি পদের সহজ ব্যাখ্যা

'রাধাবিরহ' অংশের মুখবন্ধে 'অত রাধাবিরহঃ' — সংস্কৃত (১) পদটিতে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কিছুদিন নিজের বাড়িতে গৃহকর্মে মগ্ন ছিল। কিন্তু হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের দীর্ঘ বিরহে হরিণ-নয়না রাধা বৃদ্ধা (*বড়াই*) কে তার মনের কথা খুলে বলে।

পদ নং ১

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং ।। দণ্ডকঃ।। (পত্র ১৮৯/২-১৯০/২)

দীর্ঘকাল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও বনমালী এলো না কেন রাধা *বড়াইকে* জিজ্ঞাসা করে। কতদিন পর তাকে পাওয়া যাবে। স্বপ্নে আমি (রাধা) কৃষ্ণকে দেখেছি। চিত্ত উতলা কি করে তাকে পাওয়া যাবে? চৈত্র মাস, যৌবনভাব নিয়ে দিন কাটোনো অসহ্য। বিরহবেদনায় অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কদমতলায় শয়ন করে রাধার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণের পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশী। সে যে কোথায় অন্তর্হিত হলো?

সখীর কথায় পদ্মপাতায় শুয়ে মনে হয়েছে এর চেয়ে আগুনও শীতল। কৃষ্ণ ডালা ভরে পুল পান পাঠিয়েছিল, তা রাধা হাত দিয়েও স্পর্শ করেনি। বড়াইকে চড় মারার জন্য কৃষ্ণ রেগে রাধাকে বেদনা দিচ্ছে।

রাধার *বড়াইর* প্রতি আকুল প্রার্থনা — দূতী তোর পায়ে ধরি, দেখ আমার প্রাণ যায়, জীবনরক্ষার পথ দেখাও। সকালবেলা স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, বৃন্দাবন কোকিলের কূজনে মুখর। রাধা বলে সে সাগরে গিয়ে নিজহাতে দেহের মাংস কেটে কুমিরকে খাওয়াবে। নিজেকে ভাগ্যহীনা বলেই সে কৃষ্ণকে হারিয়েছে। আর হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গসুখ পাবে না। পূর্বজন্মে খণ্ডব্রত করার জন্যই কৃষ্ণকে হারিয়েছে। ভণিতায় বাসলী দেবীর বন্দনা করা কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধার খণ্ঠে 'বনমালী এনে দাও।' —এই আর্তিকে প্রকাশ করেছেন।

(পদটিতে বড়াইর প্রতি রাধার বেদনমথিত উক্তি পাওয়া যায়)

পদ নং ২
বেলাবলী রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

প্রথম রাতের স্বপ্নের কথা রাধা প্রাণ খুলে *বড়াইকে* বলেছে। কদমতলায় কৃষ্ম রাধাকে আদরে কোলে নিয়ে চুম্বন করে। কৃষ্মবিনা রাধার জীবন ব্যর্থ। তাই বারংবার কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বড়াইর প্রতি রাধার আকুতি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের স্বপ্নে কৃষ্মের মধুর বাঁশী-বাজানো সুরতি চাইলে প্রত্যাখ্যান, কৃষ্মের কোলে বসা, মৃদু হাসির ছটায় মন জয় করে নেওয়া ইত্যাদি নানা চিত্র। চতুর্থ প্রহরে চুম্বন ও রাধার রতি-রস-লালসা জাগানোর কথা। কোকিলের কুহুতানে ঘুম ভাঙা।

(রাধার *বড়াইর* প্রতি উক্তি)।

পদ নং ৩
বিভাষরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি)

রাধার হৃদয় ব্যাকুল, আর্তি, কৃষ্মকে স্বপ্নে দেখা তার পঞ্চবাণ-হানা, হৃদয় দগ্ধ হওয়া ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কুঞ্জ মুকুলিত, দখিনা মিষ্টি মধুর হাওয়া, মন-প্রাণ উতলা। রাধার একান্ত অনুরোধ—‘দ্রুত কৃষ্মকে এনে দাও, মিলন সুখে রাত্রি কাটাই। শীঘ্র কৃষ্মকে পাবার জন্য অনিমেষ নয়নে রাধা ব্যাকুলচিত্তে পথ পানে তাকিয়ে আছে।

পদ নং ৪
ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।।

(*বড়াইর* উক্তি) রাধার প্রতি *বড়াইর* কটু কথা। রাধার মনকে পুটলী বেঁধে রাখতে বলে। *বড়ায়ি* কৃষ্মের দেওয়া তাম্বুল রাধাকে দিয়েছিল, সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এখন কৃষ্মকে কোথায় পায়ো যাবে, তা জানে না। রাধার প্রতি একের পর এক অভিযোগ। গন্ধ চন্দন পা দিয়ে মুছে ফেলেছে, তাকে চড় মেরেছে ইত্যাদি।

কৃষ্ম বৃন্দাবন ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে। মাথা কুটে মরলেও এখন তাকে পাওয়া যাবে না। কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সেও নিরুপায়।

পদ নং ৫
ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার উক্তি) কৃষ্ম বিরহে রাধার জীবন বৃথা। সে গজমুক্তার হার ছিড়বে, সিঁথির সিঁদুর মুছবে, হাতের বালা ভাঙবে। দৈবদোষে কৃষ্মকে হারিয়েছে. মাথা মুণ্ডণ করে এমনকি বিষপানে আত্মহত্যার জন্যও রাধা প্রস্তুত। রতি-সাধ পূর্ণ না হওয়ার বেদনায় বেং কৃষ্মের বিরহে দিশেহারা।

পদ নং ৬
ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(রাধার প্রতি *বড়াইর* উক্তি)

কৃষ্মের হৃদয় কঠোর কঠিন। শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাধার কাছে আসে না। রাধার প্রেমের জন্য শ্রীকৃষ্ম

বহু সন্তাপ পেয়েই বৃন্দাবন ছেড়েছে। তার নাগাল পাওয়া ভার। শ্রীকৃষ্ণ নানা রূপ ধরে। কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, সে কথা বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করে।

পদ নং ৭

কোড়ারাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।। দণ্ডকং।।

(রাধা ও বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ আমার জীবন রক্ষা করো। মন্মথবাণ সহ্য করতে পারছি না।

বড়াই ঃ মন্মথ ও বাণ কোথায়?

রাধা ঃ বসন্তের কোকিলের ডাকই বাণ।

বড়াই ঃ সাবধান হও, চন্দ্রালোকে শয্যা পাতো।

রাধা ঃ চন্দ্রকিরণে শয়ন করলে মদনের জ্বালা আরো বাড়ে।

বড়াই ঃ আমার কথা পছন্দ হলে দেহে শীতল চন্দন লাগাও।

রাধা ঃ চন্দনে দেহ পুড়ে যায়—আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো।

বড়াই ঃ বৃন্দাবনের বনে ভালুক আছে। সেখানে কেমন করে যাবো।

রাধা ঃ বাঘ-ভালুক আমাকে হত্যা করুক। কৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নই।

বড়াই ঃ খরস্রোতা যমুনা কি করে পার হবো?

রাধা ঃ যমুনার জলে মরলেও কৃষ্ণের সঙ্গলাভ হবে।

বড়াই ঃ কৃষ্ণের আশা রাধা ত্যাগ করো।

(নাট্য-রসে এই পদটি সিক্ত)

পদ নং ৮

বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার উক্তি)

শতপল সোনা নিয়ে প্রাণনাথের উদ্দেশে বড়াইকে যাবার জন্য রাধার অনুরোধ। ঘোড়াচুলের অধিকারী কৃষ্ণকে গোকুলে খুঁজতে হবে। কৃষ্ণের গায়ে সুগন্ধি চন্দন, অধরে মধুর বাঁশী। শীতবস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শেষে রাধা বড়াইকে সন্ধানের পথ বলতে গিয়ে বসুদেবের বাড়ি, যশোদার কোলে, যমুনার তীরে, শিশুদের মাঝে, নারদমুনির কাছে, গোপগণের কাছে, নিধুবনে, সাগরের ঘরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। এসব স্থানে না পেলে জনগণের কাছে কৃষ্ণের সন্ধান নিতে বলেছে। রাধার আশা বড়াইর কথায় কৃষ্ণ তার কাছে ফিরে আসবে।

পদ নং ৯

ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর উক্তি) রাধার শত অনুরোধের উত্তরে বড়াই বলেছে, সে অতিবৃদ্ধ দেহে শক্তি নেই। সে রাধাকেই সন্ধানে যেতে বলে। কৃষ্ণের দেখা পেলে সে যেন তার পায়ে ধরে। মথুরা, নানা পর্বত, গিরি-গুহায়, বনে-জঙ্গলে

তার খোঁজ করতে হবে। চণ্ডী দেবীর পূজা করতেও বলে। মথুরায় কৃষ্ণের দেখা পেলে রাধা যেন তার সঙ্গ না ছাড়ে সেকথাও বলে।

পদ নং ১০

মালবরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার বক্তব্য)

রাধার দৈ, দুধের ভাঁড় সাজিয়ে মথুরায় যাবে। এসব বেচার মধ্যেই কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে। মথুরায় যাবার জন্য তার প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখবার সাধ জাগে। কৃষ্ণের দেখা পেলে আর তাকে ছাড়বে না। নিজেকে বকুল ফুলের মালা, হীরের ঝালর দেওয়া কুণ্ডল ইত্যাদিতে সাজিয়েছে। যোগীর মতো কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্না। বড়াইর সব কথা শুনবে। আগে বুদ্ধি দোষে যা করেছে তার জন্য রাধা অনুতপ্ত।

পদ নং ১১

ভাঠিয়ালী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার উক্তি) চক্রপাণি যেদিকে সেদিকে কি বসন্ত অজ্ঞাত? তার মনে বিরহের দাহ। আমের শাখার মুকুলে ভরে গেছে, চারদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন, ডালে ডালে কোকিলের কূজন—এসবই বজ্রাঘাত মনে হয়। দেহ-মন দিয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গানের জন্য রাধা প্রস্তুত। এতেও যদি তাকে না পাওয়া যায় তবে রাধার প্রাণ চলে যাবে। শেষে নিজের বুদ্ধিদোষের কথা বলেছে।

পদ নং ১২

ধানুষীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইর উক্তি কৃষ্ণ অপমানিত হয়েই রাধাকে ত্যাগ করেছে। শুরু হয়েছে বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় সে পাবে? ষোল হাজার গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ রসমগ্ন রয়েছে। রাধাকে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সেখানে তার দেখা পাওয়া যাবে এবং কৃষ্ণও রাধার সঙ্গে কথা বলবে।

পদ নং ১৩

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

পদটির পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হল'—অনঙ্গাশরে অভিমন্যু পত্নীর (রাধা) দেহ কৃশ। (সে) তীব্র মনোবেদনাদগ্ধ নিরানন্দ মন নিয়ে দীর্ঘদিন হরিচিন্তা শেষে বৃদ্ধা (বড়াই) কে বললো—

(রাধার উক্তি) কৃষ্ণের পরিবর্তে সে জীবনে আর কিছু চায় না। কাউকে সে মানে না। দুঃসময় জীবন-হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছে কিন্তু সে হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে। সে বড়ো অভাগিনী। গুপ্ত প্রেমকে সে প্রকাশ করেছে স্বামী, ননদ ও গোপীদের কত না আঘাত। শুধু কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধা সব সহ্য করেছে।

পদ নং ১৪

বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) হায়-হায় গোপকন্যা যেন দুঃখ না করে। কৃষ্ণকে শীঘ্রই পাবে। রাধার চাঁদের মতো মুখকে ম্লান করতে নিষেধ করেছে। মনে ভরসা রাখতে বলেছে। বৃন্দাবনে যাবার সাথী হতে চেয়েছে। দুজনে

মিলে কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াবে। কৃষ্ণের জীবনের খুঁটিনাটি সব বড়াই রাধার কাছে জানতে চায়। বৃন্দাবনের জল-স্থল এক কথায় সর্বত্র অনুসন্ধান করা হবে। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবেই।

পদ নং ১৫

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, সোনার রঙের কেশদাম সজ্জিত, মেঘের ছটার মতো নীল দেহ, কপালে চন্দনের ফোঁটা—কৃষ্ণকে দেখে মনে হয় যেন পূর্ণচন্দ্র। দিশেহারা রাধা-দূতীকে কৃষ্ণ কোন্ পথে কিভাবে হেসে, নেচে, গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করে। রাধার মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নীলোৎপলের মতো নয়ন, মানিকের মতো দাঁত, পদ্মফুলের মতো মুখ ইত্যাদি ভেসে উঠেছে। ভাব দৃষ্টিতে দেখা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হতেই অভাগিনী রাধার বুক ভাঙা আর্তনাদ। কৃষ্ণকে ফিরে পাবার জন্য বড়াইর বুদ্ধির উপরই এখন একমাত্র ভরসা।

পদ নং ১৬

কেদাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) প্রাণসম আদরের নাতনী রাধাকে বড়ায়ি সত্য কথা তুলে ধরে বলে—শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় আসে, মাঠে গরু চরায়, যমুনার তীরে থাকে। সেখানে গেলে কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে। রাতদিন কৃষ্ণ নানা ফুল চয়ন করে, ফল খায়। গোপীদের নিয়ে নিধুবনে ক্রীড়া করে। সেখানেও তার দেখা পাওয়া যাবে। মন দৃঢ় করে যাত্রা করতে বলে। মনের আনন্দে কদমতলায় যাবার জন্য রাধাকে বড়াই নির্দেশ দেয়।

পদ নং ১৭

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়ুই চণ্ডীদাসের বর্ণনা) বড়াইর নির্দেশে রাধা কদমতলায় গিয়ে নব কিশলয়ে শয্যা পেতে, অগরুচন্দন গায়ে মেখে, দু' চোখে কাজল পরে, ফুলের মালায় কেশপাশ সজ্জিত করে, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, ভৃঙ্গার জলপূর্ণ করে, বাটাভরা কর্পূর পান নিয়ে অপেক্ষমানা। হাওয়ায় গাছ দুলছে। রাধা এই গাছকেই কৃষ্ণ মনে করছে। কিন্তু আশাহত হয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বড়াইর কাছে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সুদীর্ঘ অপেক্ষা করেও কৃষ্ণকে দৈব দোষে পেলো না।

পদ নং ১৮

পাহাড়ীআ রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(পাদ আরম্ভের পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোক)

নির্দিষ্ট কদমতলায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে
মদন আগুনে অনুতপ্ত রাধার বিলাপ

(রাধার স্বগতোক্তি) দিনের সূর্য তাকে পুড়িয়ে মারছে, রাতের চাঁদ তাকে দুঃখ দিচ্ছে। এ প্রাণ ধারণ অসহ্য। শীতল চন্দন গায়ে মেখেও বিরহ আগুন দূর হয় না। রাধার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ—ও বড়াই, পৃথিবী চৌচির হোক, আমি তার ভিতরে গিয়ে লুকোই। বড়াইকে আশাভঙ্গের জন্য অভিসম্পাত করে। সব আশা ছেড়ে রাধা মৃত্যুর

প্রহর গোণে। ক্ষণিকের সুখের জন্য দীর্ঘ বিরহজ্বালা জীবনসাথী হলো। দেহ মন পূর্ণ সঁপে দিতে না পারার অন্তর জ্বালায় রাধার প্রশ্ন—'আমার যৌবন ও ধনরত্নে কি হবে? গৃহবাসে কি হবে? আশাহীন জীবনে যোগিনী হয়ে রাধা ঘুরে বেড়াতে চায়?

পদ নং ১৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার উক্তি) মেঘান্ধকার ভীষণ রাত্রি। রাধা একাকী কদমতলায় বসে চোখের জলে বুক ভাসায়। কৃষ্ণকে সে দেখতে না পেয়ে বলে—'হে মেদিনী, বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করে লুকোই। তার মন কৃষ্ণের জন্য সব সময় কাঁদছে। ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন, কোকিলের কূজন রাধার কাছে যমদূতের মতো মনে হচ্ছে। এই দুঃখের দিন কবে শেষ হবে? আশার প্রদীপ জ্বেলে বনে বনে ঘুরেও প্রত্যাশা পূর্ণ হলো না। উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ডালি আকুল কণ্ঠে বড়াইর প্রতি রাধার অনুরোধ, বড়াই গো, শীঘ্র নন্দের নন্দনকে ফিরিয়ে আনো।'

পদ নং ২০

কহুরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার উক্তি) বনমালীর উদ্দেশ্যে রাধার খেদোক্তি—'হে বনমালী, বালিকা বয়সে, তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হয়েছিলে, তোমার ফুলদান গ্রহণ করিনি, দূতীকে মেরেছি, আমার সেই দোষ খণ্ডন করো, হে মদনমূরতি।' কদমতলার সব দোষকে খণ্ডন করতে বলেছে। অহঙ্কারকে ভুলে যেতে বলেছে। নৌকো পারাপারের সময়, ভারবহনের সময়, জল নিয়ে যাবার সময় যে যে দোষ রাধা করেছে, সেগুলি খণ্ডন করার অনুরোধ জানিয়েছে। অভিমান দূরে রেখে আলিঙ্গান করে কৃষ্ণকে রাধা প্রাণরক্ষা করতে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়েছে। তার শেষ অনুরোধ —আমাকে উপেক্ষা করো না নন্দের নন্দন।

পদ নং ২১

বেলাবলীরাগঃ ।। যতি।।

(পদের আরম্ভে সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

মদনজ্বরে আক্রান্ত হয়ে, বন-বনান্তরে কৃষ্ণকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রাধা বড়াইকে বলে।)

মূলপদে—(বড়াইর উদ্দেশে রাধার উক্তি।)

প্রভু জগন্নাথ যে কথাগুলি রাধাকে বলেছিল রাধা তা শোনেনি, আজ সব বুঝতে পেরে শতদুঃখ পাচ্ছে। ব্যাকুলভাবে বড়াইকে বলে—'ওগো বড়াই, কৃষ্ণকে বলো—আমি তার মুরতি প্রার্থনা করি। নাবালিকা আর নেই—রাধা এখন পূর্ণ যুবতী। বারবার তার মানসপটে কৃষ্ণের চাঁদের মতো মূর্তি, পদ্মের মতো চোখের কথা মনে পড়ছে। অন্য যুবতীর সঙ্গে হয়তো কৃষ্ণ বিভোর। এসবই রাধার কপালের দোষ। বালক গোপাল তাকে দয়া করলো না। কৃষ্ণের উদ্দেশে আজ রাধা দিশেহারা।

পদ নং ২২

কহুরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ ।।

(পাদের মুখবন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দু'চরণের বঙ্গানুবাদ) আজ আনন্দিত গোবিন্দ আমার সঙ্গে প্রমোদবিহার করেছেন। হে বৃন্ধা, তাকে কিভাবে প্রণাম নিবেদন করবো বলো।)

(রাধার উক্তি বড়াইকে) রাধা স্বপ্ন দেখেছে শ্রীকৃষ্ম এসেছে। সে বাহুবন্ধনে তাকে বাঁধে। গোবিন্দের বাঁশির সুর তার প্রাণহরণ করেছিল। তার দেহ নীল আকাশের শোভা। কৃষ্মহারা রাধার প্রাণ আকুল। কৃষ্মের প্রীতিকথায় সে বিভোর। নানা ফুলের বিছানায় কৃষ্মের কোলে রাধা শয়ন করলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল—গোটা রাত বৃথা গেল। কৃষ্মের প্রেমেই নারীর জীবন ধন্য।

পদ নং ২৩

মালবরাগঃ ।। প্রকীর্ন্নকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াই ও রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি এবং শেষে কবির বিবৃতি।)

বড়াই আদরের নাতনীকে তার কথা শুনতে বলেছে। সকালে কৃষ্ম বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। মনে হয় বনের ভেতরে গেছে। সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভয়ের কিছু নেই। প্রতি উত্তরে রাধা বড়াইকে বুদ্ধিহীনা বলে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আকুল। সেখানে অবশ্যই কৃষ্মকে পাবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় বড়াই রাধার কথায় বৃন্দাবন যায় এবং রাধাকে এগিয়ে যেতে বলে এবং তাকেই খুঁজতে বলে। কারণ তাহলেই কৃষ্ম তার সঙ্গে মিলিত হবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় আনন্দচিত্তে রাধা বৃন্দাবন যায়। সেখানে মদনরসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তার চোখে মুখে জল দিয়ে বড়াই তাকে সুস্থ করে তোলে। চেতনা পেয়ে রাধা বলতে শুরু করে নানা কথা।

পদ নং ২৪

বিভাষরাগঃ ।। দণ্ডক।। একতালী।। রূপকস্বা।।

(কৃষ্মকে রাধা কথাগুলি বলেছে) কৃষ্ম রাধাপ্রেমে উদ্বেলিত হয়েছিল। সে সময় রাধা বালিকা। কৃষ্মের পাঠানো পান-ফুল নেয়নি। তার দূতীকে চড় মেরেছিল।

পূর্বের এসব দোষ ক্ষমা করতে বলেছে। কদমতলায় যে দুঃখ দিয়ে ছিলেন তার অপরাধও মার্জনা করতে বলেছে। অহংকারে না বুঝে অনেক দোষ করেছে। গদাধর তা যেন খণ্ডন করে। নৌকোতে নদী পার হবার সময়, ভার বহাতে গিয়ে, জল আনতে গিয়ে যে সব দোষ করেছে তাও ভুলে গিয়ে খণ্ডন করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। শেষে সব অভিমান ভুলে আলিঙ্গন করে প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়েছে।

পদ নং ২৫

ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্মের উক্তি) ঃ দই রাধা বিক্রি করতে গেলে কৃষ্ম তাকে অনেক অনুরোধ করেছে—সেসব কি রাধা ভুলে গেছে? যমুনা পারাপার, দই এর ভারবহন ইত্যাদি করেও রাধাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যৌবন গর্বে সে আঘাতের পর আঘাত করেছে। যার জন্য রাধার মুখও দেখতে সে চায় না। বড় ঘরের বৌ হয়ে কেন সে কৃষ্মের ভজনা করতে এসেছে? রাধার বিগত কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। ঘরে গিয়ে স্বামীকে সেবা কর। অনুনয়ের দরকার নেই। কৃষ্ম বৃন্দাবন যাচ্ছে. রাধার যৌবনকে কৃষ্ম তুচ্ছ মনে করে। একথা জেনে রাধা যেন ঘরে ফিরে যায়।

পদ নং ২৬

বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) কৃষ্ণ ত্রিভুবনের অধিকারী। সে হিরণ্যকসিপুকে হত্যা করেছে। কংসবধের জন্য গোকুলে এসেছে। মধুসূদন যেন তাকে সঙ্গে নেয়। নানা রতি দিয়ে রাধার হৃদয় জয় করতে ব্যাকুল করতে বলেছে। অনেক কষ্টে দেখা পেয়েছে। কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। এসব ভেবে কদমতলায় রাত্রিযাপন করেও আশাহত হয়েছে। অপরিণত বয়সের কর্মের জন্য রাধা অনুতপ্ত। বিরহের আগুন তার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। 'হে কৃষ্ণ, জোড় হাতে প্রার্থনা করছি—আমার সব দোষ খণ্ডন করো।'

পদ নং ২৭

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের উত্তরদান) লোকে অপবাদ দেবে তাই রাধা যেন কৃষ্ণের কাছে না আসে। ভাগ্নেকে অবৈধপ্রেম নিবেদনে কলিযুগের চিহ্ন আছে। কৃষ্ণ পরনারী হরণ করে না। সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী রাধার সঙ্গে তার মিলন ঠিক নয়। তার সঙ্গে রঙ্গরস (ধামালী) করতে নিষেধ করেছে। সতীত্বের দোহাই দিয়ে গজমতিহার ফিরিয়ে দিয়েছিল রাধা। সতীত্বের বড়াই করেছিল। তাই কৃষ্ণের ব্যঙ্গোক্তি—'তোমার নূতন যৌবন পুঁটলি বেঁধে রাখো।' নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করার কথা বলেছে।

পদ নং ২৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) রাধাকে ত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নবাণে কৃষ্ণকে জর্জরিত করে নিজের কথা বলতে গিয়ে রাধা কিভাবে পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছে সেকথা বলে। নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে দয়া করতে বলেছে। আত্মীয়স্বজন নয়, কৃষ্ণই তার একমাত্র গতি। অতি যত্নে সজ্জিত হয়ে সে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সন্ধানে এসেছে। সে কৃষ্ণের যোগ্যা। রাধা আলিঙ্গন করে। তার যৌবন যেন নিষ্ফল না হয়।

পদ নং ২৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্ণের উত্তর) মনকে উর্ধে স্থাপন করে কৃষ্ণ দিনরাত যোগধ্যান করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে তাই সুন্দরী রাধিকাকে দূরে থাকতে বলেছে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী, তাকে পাবার মিথ্যা লোভ যেন না করে। যোগমার্গে পৌঁছে জ্ঞানবাণের দ্বারা সে মদনবাণকে ছিন্ন করেছে। রাধার যৌবনে সে আর ভোলে না। কৃষ্ণের দেহ এখন বিকারশূন্য। সমস্ত সংসার তার কাছে অসার মনে হয়।

কবির বক্তব্য ঃ নাগরশ্রেষ্ঠ দেবচক্রপাণি রাধাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে ধ্যানে মগ্ন হ'ল।

পদ নং ৩০

বঙ্গালবরাড়ী (রাগঃ) রূপকং

(প্রথম দু'চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) দীর্ঘক্ষণ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের অমধুর কথাবার্তা শুনে জগৎ মনোরমা রাধা করুণ সুরে কথাগুলি বলে।)

(রাধার করুণ উক্তি) সে দুঃখিনী বালিকা। মল্লিকা ফুলের মতো কোমল। মদনবাণে বিদ্ধ করে কৃষ্ণ যেন তাকে না মারে। পায়ে ধরে নারীবধের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্ণকে তার দশা দেখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কৃষ্ণের ধ্যানই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। অভাগিনী রাধা সারারাত কৃষ্ণের প্রেমের জন্য জেগে কাটিয়েছে। অভাগী অনেক কষ্টে কৃষ্ণের দেখা পেয়েছে—এ যেন গত জন্মের পুণ্যের ফল। তার প্রতি কৃষ্ণ যেন সদয় হয়। আলিঙ্গন দান করে জীবনরক্ষা করে।

পদ নং ৩১

ভৈরবীরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

(কৃষ্ণের রাধার প্রতি উক্তি) নিজেকে রঘুবংশ প্রধান শ্রীরাম বলে পরিচয় দিয়ে রাবণ বধের কাহিনী কৃষ্ণ বলে। বংশগৌরব অনুসারেই পরস্ত্রী সে গ্রহণ করে না। পাপকর্মের নিবারক কর্তা কৃষ্ণ, অপর দিকে নির্লজ্জ রাধিকা। তাকে কৃষ্ণের আশা ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩২

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) নানা তপস্যার ফলেই রাধা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছে। তাই সে ঘরে ফিরে যাবে না। যোগিনী হয়ে কৃষ্ণের সেবায় রত থাকবে। বিরহের আগুনে দগ্ধ রাধা কৃষ্ণকে প্রাণে না মারার জন্য অনুরোধ করেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কৃষ্ণধ্যানে রাধা মগ্না। সে কৃষ্ণ ভক্ত অনাথ নারী। একদিন তার প্রতিই ছিল কৃষ্ণের একান্ত অনুরাগ। আজ কোন্ লজ্জায় তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছে।

পদ নং ৩৩

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের উক্তি) যৌবনে হৃদিচাঞ্চল্যের কথা বলে বর্তমানে মনকে নিবৃত্ত করে কৃষ্ণ পাপমুক্ত। কৃষ্ণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের নিরঞ্জন কায়াধারী। তাকে কামবাণে আকুল হয়ে চাওয়া বৃথা আশা। বিগত দিনের দুর্ব্যবহার কৃষ্ণ ভোলেনি। তাই রূঢ়ভাবেই কৃষ্ণের কাছ থেকে সে যেন সরে যায়। কৃষ্ণের আশা ত্যাগ করে রাধাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩৪

কহুরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

(নাট্যরসে ভরা রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ হে-কৃষ্ণ, নাবালিকা অবস্থায় আলিঙ্গান জানতাম না। শরীর জীর্ণ হচ্ছে। দিন-রাত একাকার। তোমাকে ছাড়া গতি নেই। কৃষ্ণ আমাকে আদেশ করো।

কৃষ্ণ ঃ আমার পিতা বাসুদেব—গোকুলে ঘর। গোপজনেরা আমাকে ভালভাবে জানে। তারা সব শুনলে লজ্জা পাবে। তোমাকে প্রয়োজন নেই। অকারণে আমার কাছে এসেছ।

রাধা ঃ স্ত্রীজাতি নিকৃষ্ট। তাদের নানা দোষ। তাই রাগ করা ঠিক নয়। তোমার বিরহে আমার প্রাণমন আকুল। নিষ্ঠুর হয়ো না।

কৃষ্ণ ঃ সতী সব শুনলাম। পাপ-পুণ্যের কথা শোনো। পুণ্যে স্বর্গলাভ আর পাপে নরকবাস।

রাধা ঃ তুমি দেবকীর পুত্র। কংসের শত্রু। গোপীর কাছে বাল-চন্দ্র। আমি বিরহিনী নারী। তোমাকে ছাড়া আমার গতি নেই।

কৃষ্ণ ঃ চন্দ্রাবলী, আমি দেববনমালী। আমার মা যশোদা, মামা আইহন, তুমি আমার মামী।

রাধা ঃ আমাকে নিরাশার কথা শুনিও না। আমাকে কাছে ডেকে নাও। তুমি আমার পতি শ্রীনিবাস। অনেক পুণ্যফলে তোমার চরণ-ভজনার সুযোগ পেয়েছি।

পদ নং ৩৫

শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) বিগত দিনের যমুনা পারাপার, দধিভার বহন, দুঃসহ মদনবাণের কথা মনে পড়ে। রাজ্য জুড়ে কলঙ্ক। এতদিনে রাধা-বিরহের কথা জানছে। যৌবনগর্বে সে কৃষ্ণকে চিনতে চায়নি। সে এখন রাধার মুখদর্শন করবে না। রাধার জন্য সে মহাদানী হয়েছে। কিন্তু সে রতির জন্যও কুমতি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন ধর্মবন্ধ। রাধার প্রতি তার কোনো অনুরাগ নেই।

পদ নং ৩৬

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) 'হে কৃষ্ণ, কোন্ অপরাধে আমাকে ত্যাগ করছো?' যৌবন উদ্ভিন্ন লগ্নে তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। সীতার দুঃখকাহিনী তুলে ধরে স্বপ্নে, জ্ঞানে, মনে দিনরাত বসে রাধা কৃষ্ণধ্যানে মগ্না। কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রাণ যায়। সে মদনে ব্যাকুল। তাই আকুলপ্রার্থনা—হে হরি প্রাণ রক্ষা করো। একবার তুমি আমি বৃন্দাবনে যাই।'

পদ নং ৩৭

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) অতীতের কথা তুলে ধরে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম টুটেছে। তার কাছ থেকে মন সরে গেছে বলে। রাধাকে স্থান পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে বলেছে. নিজের বংশপরিচয় দিয়ে পুরুষের প্রেমের দিক তুলে ধরে যমুনার তীরে ব্যর্থ আশার কথা, লোকের উপহাসের কথা বলে স্পষ্টভাবে বলে—'তোমাতে মন নিবারণ করলাম। আমার আশা ছেড়ে দাও।'

পদ নং ৩৮

ললিত রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) বসন্তকালের প্রাণ মাতানো পরিবেশে রাধার আক্ষেপ—'এই নবযৌবন কি করে প্রাণ পাবে? কৃষ্ণ মিলনে দেহ আকুল। তাকে ত্যাগ করা কৃষ্ণের উচিত নয়।'

সে নিজেকে মাতুলানী পরিচয় দিতে চায় না। সে কৃষ্ণের প্রেমিকা—সবাই তা জানে। অতীত ভুলে গিয়ে যৌবনে সে বুঝেছে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই। তাকে ত্যাগ করলে সাগরের জলে দেহত্যাগ করবে। কিংবা বিষ খেয়ে

মরবে। গদাধর যেন তাকে দয়া করে। তা না হলে নারীবধের অপবাদ তাকে বহন করতে হবে। রাধার বিনীত নিবেদন 'হে কৃষ্ম, আমার সব ধর্ম নষ্ট হলো। এখন প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো তোমাকে বঞ্চনা করবো না।'

পদ নং ৩৯

দেশবরাড়ী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীত রাধাকে কৃষ্ম কত মিনতি করেছে অথচ রাধা বাপ-মাকে গালি দিল। রাধার মায়ার ফাঁদে কৃষ্ম পা দেবে না। পাপের দ্বারা কোনো কাজ সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম চিন্তা করে কৃষ্ম দেহকে শুদ্ধ করেছে। যোগধ্যানে মগ্ন। সে আর রাধার প্রেমে ভুলবে না। তাই সে যেন তার আশা ত্যাগ করে।

পদ নং ৪০

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) তিন ভুবন কৃষ্মের অধিকারে। মৃত রাধাকে মেরে তার কি লাভ? দুর্মতি বলে সে কৃষ্মের কথা শোনেনি। তার উচিত ফল পেয়েছে। তবে কৃষ্মের প্রেমে সে গর্বিতা। পূর্বে জানলে যশোদার কাছে সব খুলে বলতেন না। বিরহজ্বালা আর সহ্য হয় না. তাই এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে বিরহ জ্বালা ঘোচানোর জন্য রাধিকা করুণ আবেদন করেছে—'তোমার প্রসাদে বিরহ ঘুচে যাক। কটাক্ষ করেও আমাকে আশা দাও।'

পদ নং ৪১

দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) ভ্রমরে গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতানে বন-প্রান্তর মুখরিত। রাধার প্রাণ মদনবাণে ক্ষত-বিক্ষত নারী বধের ভয় কেন? 'কৃষ্ম নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করো।' রাধার কাছে কৃষ্ম প্রাণস্বরূপ জগন্নাথ। কৃষ্মহারা রাধিকার জীবন বৃথা। দয়া করে সে যেন রাধাকে কুঞ্জবনে নিয়ে যায়। সে দয়াভিক্ষা চায়। শেষ নিবেদন—'হে শ্রীনিবাস, আমাকে মেরো না।'

পদ নং ৪২

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়ঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীতের কথা বলে কৃষ্ম রাধাকে ছলনাময়ী, চতুরা, রঙ্গিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি বলেছে। প্রিয় বলেও রাধা তাকে দয়া করেনি। তার দেওয়া পান ফুল প্রত্যাখ্যান করেছে। রাধা কথা রাখেনি। বড়াইকে মেরেছে। এখন বড়াইর আদেশ মতো কৃষ্ম রাধার কাছে যাবে, অন্যথার মিলন সম্ভব নয়।

(কবির বিবৃতি) শেষ কথা বলে কৃষ্ম নীরব হয়।

পদ নং ৪৩

কোড়া - (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া

(পদের প্রারম্ভিক সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

কৃষ্মের কথা শুনে রাধা বড়াইর কাছে গিয়ে যাতে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন কথা বললো।

মূল পদে (বড়াইর উদ্দেশে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) -

অন্ধকার রাত। রাধার পাশে কৃষ্ম নেই। রাধা বিরহে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্মকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাতের স্বপ্ন বৃত্তান্ত তুলে ধরে রাধা বলে— 'কৃষ্মকে কোলে করে শুয়েছি। জেগে দেখলাম বালগোপাল নেই।' তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। রাধা নিরাশ্রয়ের চিত্র একে একে তুলে ধরে কৃষ্মকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গানের কথা বলে। অমূল্যরত্ন নিয়ে 'কৃষ্মকে একবার আমার কাছে এনে দাও'। বড়াইর পা ধরে এই মিনতি করেছে রাধা। তা না হলে তার বেঁচে থাকা দায় হবে।

পদ নং ৪৪

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অতীতের কথা বলে বড়াই এখন বৃদ্ধ বলহীন, চলতে পারে না তার পক্ষে কৃষ্মকে খুঁজে আনা সম্ভব নয়। রাধাকে সে বলে, 'এখন ঘর ছেড়ে যাও। আমাকে অনুরোধ করো না।' কৃষ্ম রাধার প্রতি রুষ্ট হয়েছে। এজন্মে সে আর তার কাছে আসবে না। কৃষ্মকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা কৃষ্ম অন্য নারীর পাশে রঙ্গরসে মেতে আছে, সে কথা বলে।

পদ নং ৪৫

রামগিরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) অপরিণত বয়সে শ্রীকৃষ্মকে অপমানের কথাগুলি একে একে তুলে ধরে রাধার মন এখন বালগোপালে মজেছে। তাই বড়াইকে শুভযাত্রা করে কৃষ্মের কাছে শীঘ্র যেতে বলেছে। রাত-দিন কৃষ্মের জন্য তার মন উতলা। রাধা নিজেকে হতভাগিনী মনে করে নিজের কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে রাধা তার রূপ যৌবনকে কৃষ্মের জন্য গচ্ছিত রাখলো। কৃষ্মের বাঁশি শুনে, কোকিল কূজন মুহূর্তে দখিনা বাতাস রাধার দেহে আগুন জ্বালে। সে লজ্জাকে এক পাশে রেখে শ্রীনিবাসের আশ্রয় নিল তার শেষ অনুরোধ —'এখন কৃষ্মকে এনে দাও।'

পদ নং ৪৬

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অহংকারে রাধা কৃষ্মকে তুচ্ছ করতে পারেনি। সে বুদ্ধিহীনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। রাধার প্রতি কৃষ্মের প্রচণ্ড ক্ষোভ। বড়াই কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কৃষ্ম সবিনয়ে কতবার বড়াইকে পাঠিয়েছে, কিন্তু রাধা তার কোনো সম্মান দেয়নি। ছলে বলে কি করে আর তুষ্ট করা যায়? কৃষ্ম অত্যন্ত চালাক। 'তুমি আমার প্রাণ, নাতনী, তোর দুঃখ সইতে পারি না। কোথায় কৃষ্মকে খুঁজে পাবো?

পদ নং ৪৭

পাহাড়ী আরাগঃ ।। প্রকীণ্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

(পদের প্রথম দু'চরণ সংস্কৃতের বাংলায় ভাষান্তর) বৃন্ধার কথা শুনে মদনশরকাতরা(রাধা) কৃষ্মকে পাবার আশায় সখীদের কাছে বললো।)

মূল পদের বক্তব্য। (রাধা ও বড়াইর উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কবির বিবৃতি)

কৃষ্ম রাধার হৃদয় চন্দন। বড়াইকে তার অনুরোধ—'ও বড়াই, নিজেই তার সন্ধান করো।'

কবির বর্ণনা ঃ রাধার অনুনয়ে বড়াই চিন্তান্বিত।

বড়াই ঃ তুমি আমি দুজনে মিলে বৃন্দাবনে সন্ধান করি। তাহলেই চক্রপাণিকে পাবো।

কবির বর্ণনা ঃ দুজনে মিলে কৃষ্ণকে খুঁজলো। না পেয়ে কাঁদতে লাগলো—নারদ মুনির দর্শন। তাঁকে প্রণাম করে জোড়হাতে রাধার প্রার্থনা।

রাধা ঃ হে মুনিবর, জগন্নাথ কোথায়? আমার জীবন-যৌবন-ধন-বেশভূষা কি হবে? কৃষ্ণকে না পেলে যোগিনী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো।

কবির বর্ণনা ঃ নারদ যোগাসনে বসে জানলেন নাগর কদমতলায় বসে আছে।

নারদ ঃ 'চলো সবাই কদমতলায় যাই। কুসুম শয্যায় বসে আছে কৃষ্ণ। সেখানে গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

কবির বর্ণনা ঃ নারদের কথা মত গিয়ে কৃষ্ণকে পায়। দূর থেকে দেখেই রাধার মূর্চ্ছা। বড়াই ভৃঙ্গারের জল চোখে ছিটিয়ে রাধার চেতনা ফেরায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে বড়াইর পা ধরে বলে 'ও বড়াই, আমার কণ্ঠরুদ্ধ, চলতে পারছি না।'

বড়াই ঃ সে রাধাকে আনন্দে পথ চলতে বলে। তার জন্য প্রাণ দিতেও সে প্রস্তুত।

রাধা ঃ বড়াইকে কৃষ্ণের চরণে তার দুঃখের কথা নিবেদন করতে বলে।

কবির বর্ণনা ঃ এই কথা শুনে বড়াই কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সব বললো।

পদ নং ৪৮

দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি) রাধার গলার হার এখন ভার হয়েছে। দুর্বলতায় পথ চলতে পারে না। চন্দনাদি তার দেহে জ্বালা ধরায়। চাঁদের আলো যেন আগুন। কৃষ্ণের বিরহ আগুনে রাধা দগ্ধ। কৃষ্ণের দর্শনেই সে জীবন ফিরে পাবে। সজল নয়নে সে ওদিক এদিক চেয়ে থাকে। সবকিছুই তার কাছে তপ্ত। মানসিক ভারসাম্য নেই। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো রেগে যাচ্ছে। মদনশরে বিদ্ধ হয়ে রাধা আর কৃষ্ণের পাশে যেতে পারছে না।

পদ নং ৪৯

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

(কৃষ্ণের উদ্দেশে বড়াইর উক্তি) রাধা চাঁদ ও চন্দনের নিন্দে করে, মলয়পবন বিষসম, কুসুমশথ্যা মদনশয্যা তার কাছে। রাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গান পাবার জন্য ব্রত করছে। বিরহজ্বালায় দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের শরণ নিচ্ছে। তার অন্তরে কৃষ্ণ সর্বদা বিরাজমান। রাধাকে দেখে মনে হয় সে যেন রাহুগ্রস্ত। সখীগণ তাকে ঘিরে রেখেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে নেই। তাই কৃষ্ণকে বলে—'দয়া করে তাকে আলিহগন দাও।'

পদ নং ৫০

মালবরাগঃ ।। রূপকং।। কাব্যোক্তি প্রকীণ্ণক।। লগনী।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

এখনো কি তুমি অন্য নারীকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে চাও। হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন দেব রাধিকার পীড়া উৎপাদন করছে।

(বড়াই ও কৃষ্মের কথাবার্তা—কবিতা বিবৃতি)

বড়াই ঃ চন্দ্রাবলী রাধা, তোমার বিরহে মৃতপ্রায়, ননীর মতো তার দেহ রস-সমুদ্রপূর্ণ যৌবনে তার রতি ভোগ কর দামোদর। বিলম্ব করো না, রাধার দুঃখ সহ্য করা যায় না।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্মের মুখ চুম্বন করে মাথায় হাত বুলিয়ে, হাতে ধরে মিনতি মাখা সুরে আগু-পিছু সব বুঝিয়ে বলে।

বড়াই ঃ হে কৃষ্ম, কথা শোন। রাধাকে তুষ্ট করো।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনে মুচকি হাসি হেসে বললো—'মনোহর বেশে সে আমার পাশে বসুক। মধুর কথা বলুক।

কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্মের সব কথা বড়াই রাধাকে বলে। কথা শুনে সেই মুহূর্তে রাধার কাছে এক যুগ মনে হয়েছে।

পদ নং ৫১

ভৈরবীরাগঃ ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ) মাধবের কথামত খুশি হয়ে বড়াই রাধার মনোহর বেশ রচনা করলো।

(কবির বিবৃতি) শিবের মতো খোঁপা, খোঁপায় চাপা ফুল, সিঁথিতে সিঁদুর গলায় গজমোতি হার, মাঝে মণি, হারের দুদিক যেন সুমেরু শিকরের দুই স্রোত। যত্ন করে রাধাকে সাজালো. হাতে সোনার চুড়ি, কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, পায়ে সোনার মল, নানা অলঙ্কারে পায়ের আঙ্গুল সজ্জিত, মুখরঞ্জন ইত্যাদি নানা সাজে রাধা কৃষ্মের পাশে গেলো। তাকে দেখে কৃষ্ম চঞ্চল হয়ে উঠলো।

পদ নং ৫২

কোড়াদেশরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ) মদনজ্বরাতুরা বেশভূষায় সজ্জিতা রাধাকে দেখে হরি ক্রমশ এই রূপে কেলিবিলাসে মগ্ন হলেন।

পাদের মূলবক্তব্য ঃ এই কবিতায় রাধা-কৃষ্মের মুরতি-সম্ভোগ চিত্র চিত্রিত। নারী-পুরুষের আদিম মিলন লীলার অনবদ্য বাস্তব চিত্র।

পদ নং ৫৩

শ্রীরামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(রাধার উক্তি ও কবির বিবরণ) রাধা রতিসুখভোগ করে শ্রীকৃষ্মের পা ধরে বলে যে, তাকে ছাড়া রাধার আর কোনো গতি নেই। কৃষ্মের ঊরুতে শুয়ে সে সুখনিদ্রা কামনা করে।

(কবির বিবৃতি) রাধার কথামৃত কৃষ্ম সব করলো নব কিশলয়ে বিছানা পাতা হ'ল। শীতল বাতাস বইলো। চারদিক কলগীতিতে মুখর। রাধা ঘুমে বিভোর। এই অবস্থায় রাধাকে ত্যাগ করে বড়াইকে সম্বোধন করে কৃষ্ম বললো—

পদ নং ৫৪

কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্মের বড়াইর প্রতি বক্তব্য) বড়াইর কথা কৃষ্ম পালন করেছে। এবার বিদায়প্রার্থী। রাধার সঙ্গে বিলাসের কথা বলে—আন্তরিকভাবে—'তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে যত্নে রেখো নিজের মনে করে।'

সে মথুরায় চলে যাচ্ছে। ঘুমের ভান করে বড়াইকে রাধার পাশে শুতে বলে।

(কবির কথা) নাগর ধীরে ধীরে ঊরু থেকে রাধার মাথা নামায়। জেগে রাধা কৃষ্মকে দেখতে পায় না। বড়াইকে জাগিয়ে বলে—

পদ নং ৫৫

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি) এখনই কদমতলায় কৃষ্ম ছিল। তার ঊরুতে রাধা গুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সে চলে গেছে। রাধার আর্তনাদ—'বড়াইগো, কৃষ্মের বিরহে আমি জীবন্মৃত। তুমি মধুসূদনকে এনে দাও।'—প্রাণপতি আনবার জন্য বারবার অনুরোধ। কাল ঘুমের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে কৃষ্ম ছাড়া তার সবই যে ব্যর্থ সেকথাও বলে। রাধা বিষপানে আত্মহত্যা করতে চায়। দূতীকে পায়ে ধরে অনুরোধ—'এই বারের মতো আমার আশা পূর্ণ করো।

পদ নং ৫৬

দেশাগরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(বড়াইর রাধিকার প্রতি উক্তি) এইমাত্র কৃষ্ম কদমতলায় ছিল। সে রাধার সঙ্গে কেলিবিলাসে মগ্ন ছিল। 'রাধা তুমি বুদ্ধিহীনা—নিজেই বনমালীকে ছেড়েছো। বড়াই জানে না কৃষ্ম কোথায় গেছে। কত কষ্টে মিলন ঘটালেন, আর রাধা অঘোরে ঘুমিয়ে তাকে হারালো। পুরুষ জাতি কপট। নানাভাবে নারীর মন ভোলায়। কৃষ্ম কুঞ্জে কুঞ্জে রতিভোগ করছে। রাধাকে কদমতলায় থাকতে বলে—নিজে সন্ধানে গিয়ে কৃষ্ম ধরে আনার কথা বলে।

পদ নং ৫৭

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(প্রথম চার চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

রাধাকে বড়াই বলছে—একা একা বনে বনে ঘুরে সে ক্লান্ত। কৃষ্মকে পেলো না বলে দুঃখ। (রাধা বলে)—বৃদ্ধে, তোমার কথা শুনে আমার মণনপ্রাণ ব্যাকুল। সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) প্রথম প্রহরে আশা ছিল কৃষ্ম ফিরে আসবে। এজন্য নিজে খোঁজ করেনি। নিজের দোষেই উচিত ফল পেয়েছে। একা একা কি করে কুঞ্জে দিন কাটবে? তাকে ছেড়ে হরি কোথায় গেল? কোন্ নারীকে নিয়ে কৃষ্ম সুখরতি ভোগ করছে? ঘন ঘন কোকিল ডাকছে। তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ম নাম উচ্চারণ করে কাঁদছিল। চার প্রহর এমনি করেই কাটলো। কী করে তার জীবন থাকবে?

পদ নং ৫৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্ক।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) তার শুভদিন যে নারী নিয়ে কৃষ্ম সুখরতি ভোগ করে। সে এখন কদমতলায়, যমুনার তীরে গবাদি নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। তার দেখা পেলে কি বলবে? সব শিখিয়ে দিতে বলে।

(কবির বিবৃতি) বড়াইর কথা শুনে রাধা সানন্দে বললো—

পদ নং ৫৯

মল্লার রাগঃ ।। কু (২২১/১) ডুক্ক।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) 'বড়াই যমুনার দিকে ভালভাবে খোঁজো। বকুলতলায়, নিকুঞ্জবনে, বনের বড় বড় গাছে উপরে সন্ধান করো।' তাকে পেলে যেন বলে গোয়ালিনী একাকী বনে আকুল হয়ে আছে। শিশুদের খেলার জগতেও খোঁজ করতে বলে। নারী পুরুষের অঙ্গীভূত। শিব-গৌরী তার দৃষ্টান্ত. এসব কথা বলে শ্রীকৃষ্মকে রাধার কাছে এনে দিতে অনুরোধ জানায়।

পদ নং ৬০

ধানষীরাগঃ ।। একতালী।।

(কবির বিবৃতি) রাধিকার কথা মতো বড়োই বৃন্দাবন যাত্রা করে একাকী। কৃষ্মকে বনে বনে অনুসন্ধান করে। যমুনার তীরে না পেয়ে বকুলতলায় যায়। সেখানে না পেয়ে গাছের ডালে। কোথাও না পেয়ে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বনে একাকী ঘোরার সময় বড়াই ভয় পায়। বহুদিন বাদে রাধার কাছে ফিরে এসে বলে—কৃষ্মের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পদ নং ৬১

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ক্লান্ত হয়ে রাধা কৃষ্মের ঊরুতে শয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল. জেগে দেখে কৃষ্ম নেই। কোথায় গেল প্রাণ যায়। 'বড়াই তার সন্ধান বলো। তোমার সঙ্গে সেখানে যাবো।' রাধা কি অপরাধ করেছে যে, সে তার উপর এতো রুষ্ট। কৃষ্মের কথা মনে পড়তে রাধার দেহ চেতনহীন হয়ে পড়ছে। কৃষ্মপ্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিধাতা রাধার প্রতি বিরূপ। রাধার আক্ষেপ—'এই বিরহে সে আর কতদিন বেঁচে থাকবে? বড়াইর কাছে উপদেশ চেয়েছে এবং কৃষ্ম কোন্‌দিকে গেছে তা জানতে চায়।

পদ নং ৬২

গুজ্জরী রাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়ায়ির উক্তি)

বনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে এসেছে আরো দেরী করতে বড়াইর ভয় হচ্ছে। রাধাকে চঞ্চল হতে বারণ করে মন স্থির করতে বলে। ঘরে ফিরতে চায়। কৃষ্মকে পরে এনে দেবে বলে আশ্বাস দেয়। তার উপদেশ-মনস্থির কর, ঘরে ফিরে চল'। কান্না থামাতে বলেছে। কৃষ্ম আপনা থেকেই ফিরে আসবে বলে আশার বাণী শুনায়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

পদ নং ৬৩
মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) রাধা কৃষ্ণের মিলন তৃষ্ণায় অতিকষ্টে কালযাপন করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্বন্ধে বৃদ্ধা (বড়াই) কে এই কথা বললো।

(বড়াইকে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) কদম ফুলে ডাল নুয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ এখনও গোকুলে এলো না। সে বলেও গেল না। শৈশবের প্রেম নষ্ট হলো। বিষ মাখা শরের আঘাতে হরিণী যেমন ছটফট করে রাধারও তেমনি অবস্থা। পুণ্যবতী গোয়ালিনীরা সুখে আছে। যত দুঃখ রাধার। জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এলো। শ্যামল মেঘে আকাশ ঢাকা, তবু কৃষ্ণ এলো না।

পদ নং ৬৪
শ্রীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(সংস্কৃত দু'চরণের ভাষান্তর) চতুরা রাধা, মেঘাচ্ছন্ন ৪টি মাস কাটাও, কারণ এখন আমার যাবার মতো শক্তি নেই।

(রাধার উক্তি) আষাঢ়ে মেঘ ডাকছে। মদনবাণে রাধা বিধ্বস্ত। যেখানে কৃষ্ণ আছে জানলে সেখানেই সে যেতো। কি করে ৪ মাস কাটাবে? বর্ষণমুখর শ্রাবণে তার চোখে ঘুম আসে না। পুষ্পবাণ আর সহ্য হয় না। তাই আকুলতা—'বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন করিয়ে দাও।' প্রাণীজগতে মিলন আনন্দ এখন কৃষ্ণকে না দেখতে পেলে বুক ফেটে যাবে। কাশফুল ভরা আশ্বিনে কৃষ্ণকে না পেলে রাধার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

পদ নং ৬৫
মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ)

খেদ করো না কল্যাণী রাধা, মন ধীরস্থির রাখো। কৃষ্ণ এসে তোমাকে স্পর্শ করবে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) আকাশের চাঁদ বড়াই হাতে তুলে দেবে এই আশ্বাসে রাধা পাগল হয়েছে। স্বামীকে সে অবজ্ঞা করেছে। লজ্জার মাথা খেয়েছে। কৃষ্ণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল। বড়াইকে, কৃষ্ণকে রাধা ভালভাবে জেনেছে। বড়াইর কথায় প্রেমের ডালি উপহার দিয়ে এখন হতাশায় ভুগতে হচ্ছে। প্রেম বাড়িয়েছে, তবু কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারল না। মরীচিকার মতো সব সুখভোগ মিলিয়ে গেল। দিনে দিনে মদন জ্বালায় জর্জরিত। কৌতুকে প্রণয় বেড়েছিল কিন্তু তা শেষ হবার উপক্রম। বড়াইর কথায় রাধার মন শান্ত হচ্ছে না। কৃষ্ণকে সে কিভাবে পাবে? তাই আবার কৃষ্ণের উদ্দেশে যাবার জন্য বড়াইকে অনুরোধ করেছে।

পদ নং ৬৬
আহের রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।। লগনী ।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ ।।

[সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ]

হে রাধা, কৃষ্ণের উদ্দেশ জানলেই কি, আর না জানলেই বা কি, কারণ এখন যেতে আমি অসমর্থ। (রাধা ও বড়াইর মধ্যে কথাবার্তা)

রাধা ঃ বড়াই এসো। কথা রাখো, সোনার আংটি হাতে পরে তুমি যাও, মিনতি করি, জগন্নাথকে এনে দাও।

বড়াই ঃ তুমি নির্লজ্জ। চুপ থাকো। কোথায় তাকে পাবো? পাপিষ্ঠা লজ্জা হয় না। তার মন তুষ্ট করতে বলেছিলাম তা করোনি। কৃষ্ম আমার কথা রেখেছে।

রাধা ঃ অতো নিষ্ঠুর কথা বলোনা। বার্ধর্ক্যের জন্যই তোমার এতো রাগ।

বড়াই ঃ কটুকথা বলো না। আদেশ দাও — কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে?

রাধা ঃ আজ আমার শুভদিন। যেখানে কৃষ্ণ ঘুরে বেড়ায় সেখানে সেখানে যাও।

বড়াই ঃ আমার হাঁটার শক্তি নেই। তবে অনুমান কৃষ্ণ মথুরায় গেছে।

রাধা ঃ তোমার যুক্তিতেই প্রাণেশ্বর মথুরায় গেছে। তাকে এনে দাও—তা না হলে আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী হবে।

বড়াই ঃ মথুরানগরে যাবো। আমার সামনে সত্য করে বলো—আর কখনও গালমন্দ করবে না?

রাধা ঃ মাথায় হাত দিয়ে সত্যি করছি আর কোনোদিন দুঃখ দেবো না। আমার কপালে যা আছে মেনে নেবো। তুমি একবার তার কাছে যাও।

বড়াই ঃ তোমার কথায় মথুরায় যাচ্ছি। তাকে পেলে আনবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

পদ নং ৬৭

পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ)

বৃন্ধা মথুরায় গিয়ে মধুসূদনকে বললো বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণার্থী। একথা শুনে নাগর হরি রাধার প্রতি রেগে কথাগুলি বলে।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) রাধা চরিত্রহীনা। তাকে দেখলে ভয় হয়। প্রত্যেক গোপীই মন্দ। তাকে কিজন্য যেতে বলা হচ্ছে? রাধার জন্য কৃষ্ণ কি না করেছে। বড়াইর কথা রাধা রাখেনি। তাই কৃষ্ণ তার মুখ দেখতে চায় না। কথা বাড়িয়ে কাজ কি। ‘বড়াই—তুমি ঘরে ফিরে যাও।’

পদ নং ৬৮

গুজ্জরী রাগঃ ।। কুডুক্ক ।।

(কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি)

কৃষ্ণের চরিত্র বোঝা ভার। না চাইতে পাওয়া অমৃত গ্রহণ করছে না কেন? রাধা আর কোনো দিন কটুবাক্য বর্ষণ করবে না। সে বিরহে ব্যাকুল। এখন তাকে ত্যাগ করা ভালো নয়। নানা উপমা দিয়ে উত্তম জনের ও অধম জনের প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে। রাধা ঘরে বসে আর কৃষ্ণ মথুরা নগরে। মাঝে বড়াই আকুল হয়ে যাওয়া-আসা করছে।

পদ নং ৬৯

বিভাষ রাগঃ ।। কুড়ুক্ক ।।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

বড়াইকে আর অনুরোধ করতে নিষেধ করে রাধা কত দুঃখ দিয়েছে সে সব তুলে ধরে। তাই রাধার জন্য কোনো অনুরোধ না করে কৃষ্ণ তাকে ফিরে যেতে বলেছে। কৃষ্ণের শেষ কথা এই ধন, রাজ্য সব ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করতে পারি না। গোকুল ছেড়ে মথুরায় এসেছি কংস বধের জন্য।

(এরপর পুঁথি খণ্ডিত)

৪২.৪.৪ চরিত্র চিত্রণ

(১) রাধা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে কবি প্রথমে গ্রাম্য বালিকারূপে চিত্রিত করেছেন। রাধার পিতৃকুল, স্বামীর কুল নিয়ে গর্ব করতে দেখা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাধার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই ক্রম বিকাশ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস চরম দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বারো বছর থেকে চোদ্দ বছর—মোট এই দুই বছরে রাধার মানসিক বিবর্তনের রূপরেখাটি কবি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করেছেন। কাব্যের প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্প বয়স্কা অশিক্ষিতা গোপ বালিকা রূপে রাধাকে পাওয়া যায়। কবি ঘটনাকৌশলের আবর্তে সহজ-সরল-মূঢ় গ্রাম্য বালিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বেলে 'বংশী খণ্ড' থেকে যেভাবে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে রাধাকে 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে অনন্ত প্রেমের রাজ্যে নিয়ে গেছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমনটি দুর্লভ। সর্বশেষ খণ্ডে ৬৯টি পদে বিরহ কাতরাহত রাধা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বড়াইর কাছে কৃষ্ণকে এনে দেবার জন্য রাধার হৃদয় ক্রন্দন গভীর মর্মস্পর্শী হয়েছে। মদন জ্বালায় জর্জরিত রাধা অপরিণত বয়সের কৃতকর্মের জন্য মানসিক দিক থেকে যেমন লজ্জিত হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণের কাছে দেহ-মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে বিগত দিনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত। রতিসুখ লাভ করে, রাধার যৌবনকে জাগ্রত করে যেভাবে কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গেছে, তার জন্য রাধা নিজেকেই বার বার দোষী সাব্যস্ত করে মিলনসুখী মন নিয়ে বিরহের আর্তিকে প্রকাশ করেছে। কবির রাধা 'তিন ভুবন জনমোহিনী।' গ্রাম্য বালিকার চিত্তে কাম ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ ঘটিয়ে কবি রাধা-বিরহ খণ্ডে রাধাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার সঠিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে ড. সুকুমার সেনের ভাষায়। তিনি বলেছেন—".......সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বত রসিকচিত্তবলভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হয়েছে তাহা জানিতেও পারি না।" মূলতঃ 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্যেই বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীমতী রাধিকার 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা'র বীজ কবি বপন করেছেন।

কৃষ্ণ ঃ কৃষ্ণ চরিত্রটি অমার্জিত গ্রাম্য গোঁয়ার জাতীয় যুবকের আদলে রচিত। তার সংলাপ সর্বত্র মার্জিত নয়। গ্রন্থের 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে হঠাৎ কৃষ্ণের যোগ সাধনার কথাটি কিছুটা খাপছাড়া মনে হয়। 'অহোনিশি যোগ ধেয়াই' (পদ-২৯) এবং 'নানাতপবলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী'। (পাদ-১২)—যোগসাধনা, যোগ-যোগিনীর সাজার কথা আছে। 'রাধা-বিরহ' অংশে কৃষ্ণকে অনেক অমধুর কথা বলতে দেখা যায়। তার ঔদ্ধত্য, বিশ্বাসঘাতকতার রূপের পাশাপাশি বাগাড়ম্বরও লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ নানাভাবে রাধাকে অপদস্থ করে তার উদ্দেশ্যে অনেক অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছে। তবে ৫৪ সংখ্যক পদে বড়ায়ির প্রতি কৃষ্ণের 'আর একটি কথা বড়াই শোনো, তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে অত্যন্ত যত্নে রেখো নিজের মনে করে'।—এই উক্তিটির মধ্যে কৃষ্ণের রাধার প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়—যা সমগ্র চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিক্রম।

বড়াই ঃ এই চরিত্রটি ‘টাইপ’ চরিত্র। জ্যোতিরীশ্বরের ‘বর্ণ রত্নাকর’ এ যে কুট্টনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি যেন বড়াই। তবে কাব্যের প্রথম দিকে কৃষ্ণের দূতীরূপিণী বড়াইয়ের মধ্যে কুট্টনীর যে ছায়া সম্পাত ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে ‘রাধা-বিরহ’ অংশে বড়াইর হৃদয়-গভীরে রাধার জন্য মাতৃহৃদয়ের কোমল মধুর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। রাধার হৃদয়জ্বালা নিবারণের জন্য বড়াইর আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় “গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী, কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড়মা, রাধার জন্য আসি যাই করি মোর আকুল পরাণ’—তাহার অন্তরের কথা।”

নারদ ঃ নারদ মুনির চরিত্রটি নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উপকরণ হিসাবেই স্থান পেয়েছে। এই চরিত্রের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই।

৪২.৪.৫. প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে প্রকৃতিচিত্র ও তার ভূমিকা অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যদিও তখন আধুনিক যুগের মতো প্রকৃতি কাব্যসাহিত্যে নিজস্ব সত্তায় উদ্ভাসিত হয়নি। কাব্যখানির জন্মলগ্নে, কাব্যের নায়ক কৃষ্ণের জন্মকালেই প্রকৃতি দিয়ে আরম্ভ। এরপর রাধা-কৃষ্ণের দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির নানা রূপ-রসের তুলনা, নানা ফুলের বর্ণনা রয়েছে। তবে এগুলি প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের গভীর একাত্মতার চিত্রও আছে। বংশী খণ্ডে এবং রাধা-বিরহ অংশে প্রকৃতি ও মানুষ একান্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। ‘আমের শাখে মুকুল ধরেছে, মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, ডালে ডালে কোকিলের কুহুতান—বিরহকাতর হৃদয়ে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ লাগছে।’—এখানে রোমান্টিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায়—নায়িকার দুঃখ বিবরণ আমরা ‘বারোমাস্যা’য় পাই। বড়ু চণ্ডীদাস ‘রাধা-বিরহ’ অংশে রাধা ‘চৌমাসিয়া’ বিরহের গীত গেয়েছেন। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারমাসের বাংলার প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার মদনজ্বালায় জর্জরিত হৃদিবেদনা একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ় মাসের নবমেঘের গর্জন, শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা, ভাদ্রের মেঘে ঢাকা অন্ধকার পরিবেশ, আশ্বিনের মেঘোন্মুক্ত নির্মল আকাশ ইত্যাদির সঙ্গে রাধার বিরহ আর্তি একাত্ম হয়েছে। প্রকৃতি চিত্রের প্রেক্ষাপটে রাধার অশ্রুবর্ষণ, নিদ্রাহীনতা, পুষ্পশরের জ্বালা, প্রকৃতির বুকে প্রাণীদের মিলনোৎসব, কাশফুলের সৌন্দর্য—সবের মধ্যে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার বেদনা-আর্তি ঘনীভূত রূপ পেয়েছে। ‘চৌমাসিয়া’ তে প্রকৃতির সঙ্গে রাধার অন্তরের অনুভূতি নিবিড় ঐক্য লাভ করেছে। প্রকৃতির বাহিরের রূপ ও তার অন্তরশক্তির মেলবন্ধন চিত্র প্রকাশে বড়ু চণ্ডীদাস সার্থক। কবি বিরহ ও মিলনকে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। এককথায় ‘রাধা-বিরহ’ অংশে প্রকৃতি ও মানব একাত্ম হয়ে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।’

৪২.৪.৬ নাট্যগুণ

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আগাগোড়া নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত আখ্যান কাব্য রূপে সুচিহ্নিত। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সার্থক মিলন ঘটেছে। ‘নাট্যগীত পাঞ্চালী’ রূপে কাব্যখানি সার্থক। নাটক ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান গতিময় সাহিত্য শাখা। এই কাব্যের মূলত কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনী উক্তি-প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ‘তামুবুল খণ্ড’ থেকে ‘যমুনা খণ্ড’ পর্যন্ত যে গতিবেগ দেখা যায়—‘রাধা-বিরহে’র দু-একটি পদ বাদ দিলে সেই গতি অনেকটা মন্থর। রাধার আর্তি ও হাহাকার ও বড়াইর সান্ত্বনাই এই অংশে প্রাধান্য

পেয়েছে। রাধা ও বড়াইর উক্তি দু-একটি পদে কৃষ্ণের উক্তি এই অংশে আছে। পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ এই কাব্যকে 'নাট্যগীতি কাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'রাধা-বিরহে'র মধ্য দিয়েই কাব্যের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। একদিন না বুঝে গর্বভরে যে রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখান করেছিল সেই রাধাই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কৃষ্ণকে পেতে চায় তার কণ্ঠে ধ্বনিত করুণরসস্নাত বাণী। যন্ত্রণাবিদ্ধ রাধার কাতরোক্তি বড়ই মর্মস্পর্শী ও নাট্যরসে ভরা।

৪২.৪.৭ কাব্য মূল্যায়ন

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যখানি অবিমিশ্র লোকজীবন তন্ময় কাব্য। লোক জীবন আশ্রিত কাব্য। ভাষাভঙ্গিমা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর সংহত রূপ ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এক অনন্য কাব্য। এই কাব্যের ছন্দ অনেকটাই পয়ার জাতীয়। কিন্তু, এই পয়ার ছন্দে ধ্বনি প্রবাহ সংহত নয়, অনেকটা আলগা। ত্রিপদী ও সুষম নয়। তবে পয়ারের চারটি ছত্র নিয়ে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে 'চউপঈ' জাতীয় স্তবক গঠনের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। গীতিকবিতা সুলভ সুর মূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'বংশী খণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' খণ্ডে এর পরিচয় আছে। 'রাধা বিরহ' অংশে রাধার নীরব বেদনার হাহাকার অনন্ত বিরহ-বেদনার ব্যাকুল বাণীকেই ফুটিয়ে তুলেছে। গীতিধর্মিতার লক্ষণ 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধা-বিরহ' অংশের প্রতিটি পদেই লক্ষ্য করা যায়। রাধার বেদনার্তি অনন্ত বেদনায় সংহত হয়েছে—

> "আল হেরি বড়ায়ি
> কাহ্নাঞিঁ মোরে আনিআঁদে।
> আল পরাণের বড়ায়ি
> কাহ্নাঞিঁ মোকে আনিআঁদে।।

রাধার অন্তর্ভেদী বেদনা দুটি চরণের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির সার্থক ব্যবহারে, লৌকিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগে, নাট্যগুণের ছোঁয়ায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি সাহিত্যগুণে মণ্ডিত।

লোকমুখের ভাষা অর্থাৎ মাটির সম্পদকে (Product of the soil) বড়ু চণ্ডীদাস অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্য লৌকিক প্রেমের কাব্য—সেই কাব্যের ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতনভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুগ ভাষাকে এড়িয়ে তিনি লোকমুখের ভাষাকেই তাঁর কাব্যের প্রধান সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ জীবনের কথাবার্তা, নর-নারীর তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাটি, গালি-গালাজের ভাষা অবিকল ভাবে কবি তুলে ধরেছেন এই ভাষার মাধ্যমে। গ্রামীণ প্রবাদ ভাণ্ডারের অনেক সম্পদ এই কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে।

রাধিকার 'মোর'মন যেন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণি'র মত বহু উপমাতে লৌকিক জীবনরস দান করেছেন কবি। কয়েকটি সার্থক প্রবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল—

(১) 'পাত পাতি আঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।'
(পাত পেতে কৃষ্ণ ভাত দেওনা কেন?)

(২) 'যেখানে সূচী না জা এ। তথা বাটিআবহার্ত্র।।
(ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়।) ইত্যাদি।

এই কাব্যে বহু শব্দ ও বাক্য আছে যেগুলি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম। যেমন—'সুখান ডালেতে বসি কাক কাঢ়ে রাত্রে' 'মাঙ্গে সুরতি।'—'সুখান', কায়ে রাত্রে, 'মাঙ্গে' ইত্যাদি শব্দগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শৃঙ্গার রসের কাব্য হয়েও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' হাস্যরস উপেক্ষিত হয় নি। 'নারদ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক নারদকে শ্রোতা ও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতেই কবি নারদকে ভাঁড় রূপে চিত্রিত করেছেন। জন্মখণ্ড থেকে শুরু করে 'রাধা-বিরহ' পর্যন্ত হাস্যরস প্রবহমান। 'রাধা-বিরহ' অংশে যখন দেখি কামুক কৃষ্ণ সাধুর মতো কথা বলে—

'এবে-দেহে মোর নাহি বিকার।
আমার দেখীল সব সংসার।।'

কৃষ্ণ চরিত্রের এই অসঙ্গতিপূর্ণ কথার মধ্যেই হাস্যরসের বীজ লুকানো আছে। কবি সচেতনভাবেই গুরুগম্ভীর রসের পাশাপাশি লঘু হাস্যরসকে স্থান দিয়ে কাব্যখানিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছেন।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার যেখানে শেষ সেখান থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার যাত্রা শুরু।

৪২.৪.৮ 'রাধাবিরহ' অংশ কি প্রক্ষিপ্ত?

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মোট তেরোটি খণ্ডের মধ্যে এক থেকে বারো অংশ বিভিন্ন নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে। একমাত্র 'রাধা-বিরহ' অংশে এই শব্দটি নেই। এছাড়াও আরো কিছু কিছু তথ্য থেকে এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তাঁর মতে '.......বড়ু ও বাসলী যে সব ভণিতায় নেই, সেই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত।' পরবর্তীকালে বিমানবিহারী মজুমদার 'রাধা-বিরহ' অংশকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তিগুলি হ'ল—

(১) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দ থাকলেও শেষ অংশটিতে 'খণ্ড' শব্দ নেই।

(২) পূর্বের ১২টি খণ্ডে বড়াইর যে ভূমিকা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, 'রাধা-বিরহ' অংশে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগাগোড়া কৃষ্ণের দূতী হয়ে কাজ করেছে বড়াই। অর্থাৎ কুট্টনীর ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শেষ খণ্ডে রাধার প্রতি মমতাময়ী রূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই অংশ বড়াই যেন কৃষ্ণকে চেনেই না।

(৩) 'রাধা-বিরহে'র পূর্বে অন্তত ৫ বার রাধা-কৃষ্ণের রতিসম্ভোগ ঘটেছে। শেষ অংশে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই।

(৪) ভাষাগত দিক থেকেও পার্থক্য আছে। শেষ অংশের ভাষা পূর্বের অংশগুলির ভাষার চেয়ে আধুনিক।

(৫) পটভূমিকার দিক থেকেও কোনো মিল নেই।

(৬) 'রাধা-বিরহে'র ৮টি ভণিতায় যা আছে তা পূর্ব খণ্ডগুলির ভণিতায় নেই। যেমন 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।'

এই মতের সমালোচনা ঃ লিপিকরের ভুলবশত 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নাও হতে পারে। কৃষ্ণকে বড়াই মোটেই চেনেনি—এযুক্তি মানা যায় না। কারণ 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর নির্দেশেই রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছে। কবি হয়তো শ্রোতাদের কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতেই এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। বড়াইর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বড়াইর চরিত্রের মূল রূপ শেষ অংশেও বজায় আছে আর তার স্নেহশালিনী রূপের উদ্বোধন ঘটেছে, 'বংশী খণ্ডে'ই। পাঁচবার রাধাকৃষ্ণের

মিলনের ব্যাপারটি বড়াই গোপন রাখতে বলেছিল। তাছাড়া এই অসামাজিক মিলনের গোপনীয়তা মনস্তত্ত্বসম্মত। ভাষাগত বিচারেও অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। 'রাধা-বিরহ' অংশের ভাব ও সুর, হৃদয়-আর্তির সঙ্গে যুক্ত। যার ফলে এই অংশের ভাষায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিষয় ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু 'ভণিতা'কে অবলম্বন করে অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা ঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কাব্য গঠনের দিক থেকে, স্থান-কালের পারম্পর্য বিচারে, বয়স অনুসারে রাধার চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে, চরিত্রের ক্রমপরিণতির বিচারে এবং কবির ক্রমবিকশিত প্রতিভার স্তর উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি 'রাধা-বিরহ' অংশটি প্রক্ষিপ্ত নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি বিচার করলে দেখা যায় কাহিনী, আঙ্গিক, চরিত্র, ভাব-ভাষা সবদিক থেকেই শেষ অংশটির সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডের গভীর যোগসূত্র আছে। রাধা চরিত্রের ক্রমপরিণতিদানেও এই অংশের প্রয়োজন ছিল। 'বংশীখণ্ডে' কাব্যের সমাপ্তি ঘটলে কাব্য কাহিনী খণ্ডিত হতো এবং রাধাকেও অসম্পূর্ণভাবে পাঠক পেতো।

৪২.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

কাহ্নাঞিঁ—কানাই	পরসরস—স্পর্শরস	ক্ষণে—কখনো
তোহ্মে—তোমাকে	তেকারণে—সেইজন্য	আপণেঞি—নিজেই
এবেঁ—এখন	ঝালিয়ার—মরীচিকার	পুছহ—জিজ্ঞাসা করছো
তেজিতেঁ—ত্যাগ করতে	আয়াসেঁ—আরামে	উপেখিআঁ—উপেক্ষা করে
ভাঁগিল—ভাঙল	তেজিলো—ত্যাগ করলো	মতি ভোলে—মতিভ্রমে
রাহী—রাধা	জিবোঁ—জীবিত	থুইআঁ—রেখে
বিথর—বিস্তৃত	ভৈল—হ'ল	শরণ-ভৈলোঁ—আশ্রয় নিলাম
বুলিআঁ—বলে	লএঁ্রা—নিয়ে	তুষিলেঁ—তুষ্ট করলে
নঠী—নষ্ট	পাএঁ্রা—পাইব	সিয়ানে—সেয়ানা, চালাক
কৈলোঁ—করিল	তোক্ষেঁ—তুমি	ভাণ্ডী—ভোলানো।
ঠাঁঠী—ঠেঁটা, প্রগলভ	আণ—আনো	তভোঁ—তবু
রতনমুদড়ী—সোনার আংটি	এড়িএঁ্রা—ছেড়ে, এড়িয়ে	সমানে—সম্মানে
নিকুপেঁ—চুপ করে	চুম্বিআঁ—চুম্বন করে	মতিমোষেঁ—মতিভ্রংশে
লাগ—নাগাল	লুনী—ননী	কথাঁ—কোথায়
কেঁমতে—কেমন করে	মনসিজশর—মদনশর, মদন শয্যা	পরসাঁদে—প্রসাদে
তিলাঞ্জলী—জলাঞ্জলি	তরাসিত—ভীত	তিরীবধ—স্ত্রী-বধ

আবথা—অবস্থা	নিফলে—নিষ্ফলে	কিকে—কিজন্য
দূতর—দুস্তর	বাত্র—বাতাস	সংপুণ—সম্পূর্ণ
ভজিলোঁ—ভজনা করলাম	বিদার—বিদীর্ণ	আমরিষে—রাগ করে
জীএঁ—জীবনরক্ষা কর	মুন্ডিয়া—মুণ্ডণ করে	লৈলোঁ—নিল
ধেআনে—ধ্যানে	পরতয়—প্রত্যয়, বিশ্বাস	দুঅজ—দ্বিতীয় প্রহর
পুছিএঁ—জিজ্ঞাসা করে	মৌহারী—মনোহর	তিঅজ—তৃতীয় প্রহর
গিআ—গমন করে	সহিলোঁ—সহ্য হলো	চউঠ—চতুর্থ প্রহর
অথবেঁথে—ব্যস্ত-সমস্ত	কুয়িলী—কোকিল	বাসলী—শক্তিদেবী, কালী
মুরুছা—মূর্চ্ছা	উতাপঠ—ব্যথিত	বিহাণে—বিহণে, ছাড়া

(ঞ) শব্দার্থসহ ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ

অশঙ্কেত (সঙ্কেত)—সঙ্কেত > অশঙ্কেত—'অ'-অর্থহীন, আগম

আওর (আর, অপর) অপর > অবর > আওর > আওর (তদ্ভব শব্দ)

আইল (এলো) আগত + ইল (অতীত কাল অর্থে)

অছিদরী (ধূর্ত) আ + ছিদর + ঈ (স্ত্রী লিঙ্গে)

আনপাণি—(অন্নপানীয়)—আণ + পাণী

অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী

আন্ধারী—(অন্ধকার) আন্ধার + ঈ প্রত্যয়।

অন্ধকার > আন্ধার

আহ্মা—(আমাদিগকে) অস্মাকম্ > অম্হাকম

অমহাআঁ > আম্হা > আহ্মা।

আল (ওলো—স্ত্রীলোকের নিজ লিঙ্গের প্রতি সম্বোধন)

হলা > হালো > আলো, আল

আশো আস (আশ্বাস)—আশ্বাস > আশোয়াস স্বরভক্তি + 'এ' বিভক্তি।

উপজিব—(উৎপন্ন হবে) উপজ + ইব (ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি)

উড়ী (উড়ে)—উড্ড + উড়। উড় + ঈ = উড়ী।

এড়িএঁ (ত্যাগ করে) এড় + ইএঁ = এড়িএঁ (অসমাপিকা ক্রিয়া)

কাহ্ন (কৃষ্ণ) কৃষ্ণ > কণহ > কাণহ, কাহ্ন।

কাটিল (অতিবাহিত হলো কিংবা কেটে গেছে)

কর্তিত > কট্টিঅ > কাটি। কাটি + ইল (<ইল্ল)

ঘাঅত (ঘায়ে) ঘাঅ + ত = কাটিল (সপ্তমী বিভক্তি)

চউঠ (চার) চউট্ঠ> চউঠ

চাহিআঁ (খোঁজ) —চাহ্ + ইয়াঁ। চক্ষেতে > চখখতে > চাখ > চাহ। (ইয়াঁ—অসমাপিকা অর্থে)

ছারেঁখারেঁ—(অধঃপাতে) ক্ষারখার > ছারখার।

'ছার' হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত + এ, 'খার' হচ্ছে (শৌরসেনী প্রাকৃত) + এ = ছারেঁ খারেঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন) দূতর—(সীমাহীন) দুস্তর > দুত্তর > দূতর।

থল — (স্থল) স্থল > থন (বর্ণলোপ)।

দহ — (হ্রদ) হ্রদ > হদ > দহ (বর্ণ বিপর্যয়)।

ঝি— (কন্যা) দুহিতা > ধিতা > ধিআ > ঝিআ > ঝি।

ততোঁ — (তবুও)—তবু + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)।

বাত (খবর) বার্তা > বাত্তা > বাত।

বালী — (বালিকা) —বালিকা > বালিআ > বালী।

ভকতী — (ভক্তি) ভক্তি > ভকতি, ভকতী (স্বরভক্তি)।

লাগ— (নাগাল) —লগ্ন > লগ্‌গ > লাগ।

শিসতে— (সিঁথিতে) —শিয় + তে (অধিকরণে)।

সুরুজ (সূর্য)—সূর্য > সুরুজ (স্বরভক্তি)।

সোয়াথ (স্বস্তি)—স্বস্থ > সুঅথ > সোয়াথ।

সিঅল, সিয়ল (শীতল) —শীতল > সিঅল, সিয়ল।

৪২.৫ সারাংশ

এই এককে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'রাধাবিরহ' অংশের মূল পদগুলি, তার সহজ সরল ব্যাখ্যা, চরিত্র আলোচনা, প্রকৃতি ও তার প্রভাব, নাট্যগুণ, কাব্য, মূল্যায়ন, প্রক্ষিপ্ত কিনা তার বিচার, শব্দার্থ ও ভাষাগত টীকা বিস্তৃতভাবে আছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে সমগ্র কাব্যখানি সম্পর্কে যে মোটামুটি ধারণা ও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধির জন্যই কাব্যের শেষ অংশের আলোচনা।

মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ অংশ 'রাধাবিরহ' অংশের মূল কাহিনীতে রাধার বিরহ বেদনা চরম রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এর শুরু 'বংশী খণ্ডে'। রাধার তেরো থেকে পনেরো বছর অর্থাৎ দু'বছরের জীবনবৃত্তান্ত সমগ্র কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে পূর্ণযৌবনা রাধার অতৃপ্ত যৌন-বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ রাধার দেহে মনে রতিসুখের আগুন জ্বেলেই রাধার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কৃষ্ণকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে রাধা আকুল হয়ে বারবার বড়াইকে অনুরোধ করেছে কৃষ্ণের সঙ্গে তাকে মিলিত করার জন্য। নাবালিকা অবস্থায় কৃষ্ণের প্রেমকে প্রত্যাখান করার অনুশোচনার পাশাপাশি প্রায়শ্চিত্তের জন্যও রাধা প্রস্তুত। বড়াই রাধার তৃষ্ণা মেটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী। কদমতলায় কৃষ্ণের শর্ত অনুযায়ী রাধার আগমন। মিলনরাত্রিযাপন। তারপর অজান্তে মথুরায় গমন। রাধা ঘুম থেকে জেগে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে আনবার জন্য। কিন্তু রাধার বিরহ বেদনার কথা শুনেও রাধার প্রীতিবোধের অভাব, বাক্যজ্বালা ইত্যাদির জন্য কৃষ্ণ রাধার কাছে আর ফিরে যাবে না বলে। প্রসঙ্গক্রমে মথুরায় কংসবিনাশের জন্য এসেছে এ তথ্যও বড়াইকে বলে। এই পর্যন্তই কাহিনী রয়েছে। এর পরই পুঁথি খণ্ডিত। সুতরাং পরে কি ঘটেছিল তা আমাদের অজানা।

'রাধাবিরহ' অংশ ৬৯টি পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের শিরোনামে রাগাদির উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের শেষেই কবির ভণিতা আছে। অধিকাংশ পদে 'বাসলীভক্ত চণ্ডীদাস' ভণিতায় থাকলেও অন্ততঃ আটটি পদের ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' কিংবা অন্তত বড়ু চণ্ডীদাস' ইত্যাদি দেখা যায়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিমানবিহারী মজুমদার এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করলেও তাঁরা যে সব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা সর্বগ্রাহ্য নয়।

'রাধাবিরহে'র রাধার যেখানে শেষ—বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। রাধার ক্রমবিবর্তিত রূপের সার্থক পরিণতি এই অংশে ঘটেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আলোর প্রতীক। আদি মধ্যযুগের এই কাব্যে লৌকিক কৃষ্ণ-রাধাকেন্দ্রিক কাহিনীতে অশ্লীলতা থাকলেও 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে তার নামমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ড থেকেই কাহিনী নতুনপথে অগ্রসর হয়েছে। 'রাধা-বিরহ' অংশটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কৃষ্ণমিলন পিপাসু রাধার বিরহ আর্তির মধ্যে অনন্ত প্রেমের সুরভি লুকোনো আছে। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর চরিত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন পদে বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি, রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি, কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর, বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের নানা উক্তির মধ্য দিয়ে নাট্যসংলাপের মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। ছোটো-ছোটো সংলাপের মধ্য দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানসিক সঙ্কট প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসকে নিয়ে কবি রাধার 'চৌমাসিয়' লিখেছেন। এই চার মাসের প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয় আর্তি একাকার হয়েছে। এই অংশে গীতিধর্মিতা লক্ষণীয়। গীতিকবিতাসুলভ সুরমূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও প্রায় প্রতিপদে আছে। লোকভাষার ব্যবহারে হাস্যরস পরিবেশনে যথার্থ অলঙ্কার সজ্জায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি রাধার অন্তর্ভেদী বিরহ আর্তিতে অংশটি করুণ রসে ভরা। দুরূহ শব্দাদির সহজ অর্থ ও বিভিন্ন শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা দেওয়া হলো। এর সাহায্যে পদগুলির অর্থ অনুধাবন সহজ হবে।

৪২.৬ অনুশীলনী

১। নিচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিনা ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন (√) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রাচীন যুগের।	☐	☐
(খ) বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য ১৩টি খণ্ডে রচিত।	☐	☐
(গ) 'রাধা বিরহ' অংশটি কাব্যের প্রথম খণ্ডে আছে।	☐	☐
(ঘ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শুধু কৃষ্ণ ও রাধার চরিত্র আছে।	☐	☐
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি লৌকিক ভাষায় লিখিত।	☐	☐
(চ) বড়ু চণ্ডীদাস মনসাদেবীর সেবক ছিলেন।	☐	☐
(ছ) 'রাধা-বিরহ' অংশে মোট ৬৯টি পদ আছে।	☐	☐
(জ) রাধা-বিরহ অংশটি সম্পূর্ণ।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে যথাযথ শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) রাধা বিরহ অংশ ——— ——— ভরা।

(খ) 'রাধা বিরহ' অংশে বড়াই ——— ——— রূপে চিত্রিত।

(গ) নারদ চরিত্র ——— সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) কৃষ্ণের ——— সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(ঙ) 'রাধা-বিরহ' অংশ ——— ও ——— একাত্ম হয়েছে।

(চ) 'রাধা-বিরহে'র ——— সমাপ্তি, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ———।

(ছ) 'রাধা বিরহে' রাধার প্রেম ———।

(জ) বাসলী দেবী হলেন ——— বা ———।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

কুয়িলী, সংপুন, গিআঁ, তোহ্মে, জিবোঁ, ভৈল, পুছহ, লুনী, তিয়জ, আন্ধারী।

৪। ভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

আঅর, উপজিব, আহ্মা, আনপানি, কাহ্ন।

৫। 'রাধা-বিরহ' অংশের রাধা চরিত্রটি সহজ ভাষায় ছ'টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

....

....

....

....

....

....

৬। 'রাধা-বিরহ' অংশটি কেন অন্যান্য খণ্ডের চেয়ে পৃথক? এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যে আপনার মতামত জ্ঞাপন করুন।

....

....

....

....

....

৭। 'রাধা-বিরহে'র 'চৌমাসিয়া' অংশটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় ৬টি চরণে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

৪২.৭ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ভুল।

২। (ক) বিরহ আর্তিতে (খ) মমতাময়ী জননী (গ) হাস্য, (ঘ) যোগসাধনা, (ঙ) প্রকৃতি, মানুষ, (চ) যেখানে, সেখানে শুরু, (ছ) অনন্ত, (জ) শক্তিদেবী কালী।

৩। কোকিল, সম্পূর্ণ, গমন করে, তোমাকে, জীবিত, হ'ল, জিজ্ঞাসা কর, ননী, তৃতীয় প্রহর, অন্ধকার।

৪। অপর > অবর > আঅর > আঅর > (তদ্ভব শব্দ), উপজ + ইব, (ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি), অস্মাকম্ > অম্হাকম > অম্হাআঁ > আম্হা > আহ্মা, আন্ + পাণী, অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী। কৃষ্ম > কণহ > কাণহ্, কাহ্ন (তদ্ভব)

৫। শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের বংশীখণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত রাধা ছিল অশিক্ষিতা গোপকন্যা। কিন্তু রাধা-বিরহ খণ্ডে অনন্তপ্রেমের পূজারিণী হয়েছে। কৃষ্মকে পাবার জন্য বড়াইর কাছে রাধা যে বিরহ বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছে তা বড়ই মর্মস্পর্শী। মদনজ্বালায় জর্জরিতা রাধার হৃদয়দ্বন্দ্বটি সার্থকভাবে প্রকাশ পাবার জন্য চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে। নিজেকে দোষী মনে করে মিলনমুখী একাগ্রতায় রাধা তার হৃদয় আর্তিকে প্রকাশ করেছে। বৈষ্মব পদাবলীর রাধার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্য।

৬। 'শ্রীকৃষ্মকীর্তন' কাব্যের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে, কিন্তু 'রাধা-বিরহ' অংশে 'খণ্ড' শব্দটি নেই। কাব্যের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র বড়াই। অন্যান্য খণ্ডে তাকে কুট্টিনী রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশে সে স্নেহশীলা মাতৃ-রূপিণী। বিভিন্নখণ্ডে কমপক্ষে পাঁচবার রাধা-কৃষ্মের রতি-সম্ভোগের চিত্র আছে, কিন্তু এই অংশে তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। অন্যান্য খণ্ডে আর্থিক ব্যাপারে 'কড়ি' শব্দটি থাকলেও, এই অংশে 'সোনা'র কথা আছে। ভণিতার ক্ষেত্রেও কয়েকটি পদে ভিন্ন-বিশেষণ বা নামপদ পাওয়া যায়।

৭। বড়ু চণ্ডীদাস প্রকৃতিকে মানুষের জীবনছন্দ থেকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখেননি। 'চতুর্মাস্যা' বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে রাধার হৃদয় ভাবনার সুর একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ়ের মেঘগর্জন শুনে কৃষ্মবিরহে রাধার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা, শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় চারদিক মুখর, কিন্তু রাধার চোখে ঘুম নেই। ফুলশরের জ্বালায় তার প্রাণ যায় যায়। ভাদ্র মাসে আকাশ মেঘে ঢাকা, প্রকৃতির বুকে মিলনানন্দে বিভোর ময়ূরী, দাদুরী, ডাহুকী। সেই মুহূর্তে কৃষ্মের কথা রাতদিন ভেবে ভেবে রাধার বুক ভেঙে যায়। আশ্বিনে মেঘোন্মুক্ত আকাশ, দিকে দিকে কাশফুলের মেলা অথচ কৃষ্ম ফিরে এলো না—একথা ভেবে রাধার হৃদয় আর্তি দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

৪২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আদি মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

৩। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত — ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন। (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ)

একক ৪৩ ❑ বৈষ্ণবপদ—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

গঠন

৪৩.১ উদ্দেশ্য
৪৩.২ প্রস্তাবনা
৪৩.৩ মূলপাঠ
৪৩.৪ মূল পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও কাব্য মূল্যায়ন।
৪৩.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ।
৪৩.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও তাঁদের কবিকৃতি আলোচনা
৪৩.৭ অনুশীলনী
৪৩.৮ উত্তরমালা
৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চিরন্তন রূপরেখাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির নানা দিক জেনে এই চারজন কবির সৃষ্টি সম্পদের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, যথা—গৌরাঙ্গ বিষয়ক, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদির মূল তথ্য ও রস ব্যঞ্জনা আস্বাদন করে প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—এই তিনটি স্তরের কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদন সম্পর্কে ধারণা ও তার রূপদানের ক্ষেত্রে যে তারতম্য আছে তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব কবিগণ—'দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়রে দেবতা।' কিভাবে করেছেন—বিভিন্ন পদের ভাববস্তু জেনে বুঝতে পারবেন।
- ব্রজবুলি ভাষা, অলঙ্করণ মণ্ডণকলা, ছান্দসিক প্রকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের মৌলকত্ব কোথায় এবং কোন্ পদে কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা অর্জন করবেন।

- চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের মিল কোথায়? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর রসবিচার ও বিভিন্ন কবির পদ মূল্যায়ন করে আপনারা নিজের ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্যরস ও কবিকৃতি সম্পর্কে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৩.২ প্রস্তাবনা

চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' ও 'ভাবোল্লাস ও মিলন', বিদ্যাপতির 'মাথুর' ও 'প্রার্থনা', জ্ঞানদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ' ও 'রূপানুরাগ, এবং গোবিন্দদাসের 'অভিসার' ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পর্যায় থেকে মোট ৮টি পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক কবির পরিচিতি ও তাঁদের পদগুলির কাব্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পদের বহু শব্দের শব্দার্থও দেওয়া হয়েছে। পদগুলি দু'তিনবার পাঠের পর, আলোচনা ও শব্দার্থ ভালোভাবে শিখে আপনারা প্রতিটি পদের ভাববস্তু ও কবিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। পদাবলীর বিভিন্ন স্তরের পদগুলির ভাব-ভাবনা, রস-ব্যঞ্জনার দিকগুলিও স্পষ্ট অনুধাবন করে নানা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারবেন।

চণ্ডীদাস - ১

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গোঁ
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গোঁ
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করলি গোঁ
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গোঁ
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গোঁ
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে কবি মনে পাসরা না যায় গোঁ
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।।

ভাবোল্লাস ও মিলন

২

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার।।
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িল বসিল তায়।।
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল।।

বিদ্যাপতি - ২

১

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছেঁ গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

২

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- বসরঙ্গে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা।।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা।।

জ্ঞানদাস - ৩

১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্য্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার।।
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে, ভেজাই আগুনি।।

গোবিন্দদাস — ৪

অভিসার

১

কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর' — এই পঞ্চরসের প্রকাশ থাকলেও মূলত 'মধুর' রসের ধারায় দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহের নানা সুরে ঝঙ্কৃত পদগুলি কেন হৃদয়স্পর্শী তা বুঝতে পেরে প্রতিটি পদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসকে কেন সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি বলা হয়, জ্ঞানদাস কেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, বিদ্যাপতি কেন ঐশ্বর্যের ও সুখের কবি, গোবিন্দদাস কেন 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহ্নিত—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও আপনারা পাবেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য ও চিরন্তনতার ভিত্তি কি? তার সন্ধানও এই এককের বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে এবং আলোচনার নানা ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নির্দিষ্ট পদকর্তাদের পদগুলি ভালোভাবে পাঠ করুন এবং তার সঙ্গে কাব্য মূল্যায়ন অংশ অনুধাবন করুন।

৪৩.৩ মূলপাঠ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দুটি করে নির্বাচিত পদ

৪৩.৪ মূলপাঠের সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন

— চণ্ডীদাসের পদ —

পূর্বরাগ (১ নং)

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম........"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কবি শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের এই পদটি 'শ্রবণজাত' পূর্বরাগের অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সঙ্গীত মূৰ্চ্ছনাময় নাম শ্রবণ করে আকুল হয়েছেন। তাঁর মর্ম লোকে সঞ্চারিত হয়েছে এমন এক ভাব বিহ্বলতা যা তিনি আগে অনুভব করেন নি। শ্যাম নামে যে এত মধু — তা রাধিকার কাছে ছিল অজ্ঞাত। শ্যাম-নামে বিমুগ্ধা রাধা সারাক্ষণ আপনমনেই উচ্চারণ করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। নাম জপ করতে করতে রাধার দেহ-মন অবশ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুল বাসনা রাধাকে করে তুলেছে পাগলিনী। যার নাম শ্রবণেই হৃদয় এমন উদ্বেল, তাঁর অঙ্গের স্পর্শে না-জানি কি অনির্বচনীয় সুধা লুকিয়ে আছে? শ্রীকৃষ্ণের বসতি কোথায়? তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্তি কীরূপ? এসব ভেবে শ্রীরাধিকার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা করাই হয়তো কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। চণ্ডীদাসের মতে কুলগরবিনী ও যৌবন গরবিনী নারীরা নিরুপায় ভাবেই তাঁদের জীবন-যৌবন কুলমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। তাই শ্রীরাধিকার উদ্বেগ ও উপায়ন্তর বিহীনতাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস এই পদটিতে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের উদ্বেগ দশাটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "চণ্ডীদাস প্রেমকে জগত বলিয়া জানিয়াছেন।"— মন্তব্যটি যথার্থ। চণ্ডীদাসের কাছে জগৎ প্রেমময়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা প্রেম-সর্বস্বা। সখীদের সঙ্গে দিনকাটানোর মুহূর্তে শ্রুতিপথে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশমাত্রই সেই নামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় মন আবিষ্ট হয়। হৃদয়ের গভীরে দেখা দেয় নব-অনুরাগরঞ্জিত পূর্বরাগের ভাবব্যাকুল ঢেউ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁর মন হয় উতলা। নিরলঙ্কৃত ভাষায় ভগবৎ প্রেমের ভাব-ব্যঞ্জনা বাস্তব জীবন আঙ্গিনার ছোঁয়ায় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাবের প্রগাঢ়তায় ও রচনা নৈপুণ্যে পদটি নিঃসন্দেহে রস-সমৃদ্ধ হয়েছে।

"নাম-পরতাপে যার ঐছন করলগো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

পদ্যাংশে কবি মনস্তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করে রাধার উপায়ন্তর বিহীনতার রূপটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত করেছেন। ভক্ত তার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পমের জন্য প্রস্তুত। ভগবৎ প্রেম ব্যাকুলতার উজ্জ্বল নিদর্শন এই পদটি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। বাস্তব জীবনে শুধু নাম শুনেই প্রেম উৎপন্ন হয় না। এছাড়া নামে মাধুর্য ভগবৎ প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ। "জপিতে জপিতে নাম'— অর্থাৎ নাম জপের উল্লেখ আছে।

এর মধ্যেও ভগবৎ প্রেমেরই নির্দেশ রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ পরতাপে — প্রতাপে, নাম-পরতাপে — নামের প্রতাপে বা শক্তিতে বা প্রভাবে।

ঐছন — এইরূপ, যাচায় — সেধে দান করে,
পাসরিতে — ভুলতে, ধরম — ধর্ম, কৈছে — কেমন করে।

চণ্ডীদাসের পদ (২ নং)

ভাবোল্লাস ও মিলন

“সই, জানি, কুদিন সুদিন ভেল।.......,”

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার পর ভাব-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের শুভমুহূর্ত আসন্ন — এই আশায় শ্রীরাধিকার মন প্রাণ পুলকবন্যায় ভেসে গেছে। সখীদের ডেকে রাধিকা বলেছেন যে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিন শেষ হয়ে সুদিন ফিরে আসছে। মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে শীঘ্রই ফিরে আসবে তা তাঁর অদৃষ্টই যেন বারবার বলছে। মিলন আনন্দের স্বপ্নে বিভোর রাধার চুল স্ফূরিত হচ্ছে, বসন উড়ছে, যৌবন পুলকবন্যায় ভাসছে। রাধার বাঁ চোখ নাচছে—আনন্দে গলার হার দুলছে। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমন বার্তা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাধা খাবার দেয়। এতদিন কাকেরা খাবার খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আজ অন্য ছবি। রাধার ডাকে কাকেরা মনের আনন্দে তাঁর কাছে উড়ে এসে বসেছে। মুখের পান আপনা-আপনি খসে পড়ছে। দেবতার মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল পড়ছে। চণ্ডীদাস বলেন—সব দিক থেকেই শুভ, বিধাতা অনুকূল হয়েছেন।

‘‘ভাবোল্লাস ও মিলন’ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিদ্যাপতি চিহ্নিত হলেও এই পদে চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন প্রত্যাশাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলসূচক লৌকিক বিশ্বাসের এক একটি দৃষ্টান্তের মালা গেঁথে শ্রীরাধিকার ভাব সম্মিলনের মানসিক প্রস্তুতি ও আশার আনন্দ রসঘন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার অন্তরে চির প্রশান্তির পূর্ব পর্বটি প্রকাশ পেয়েছে। ভণিতায় চণ্ডীদাস দীর্ঘ বিরহকাতরা শ্রীরাধার প্রত্যাশা বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যই শুভদিনের আগমনবার্তা ও বিধাতার আনুকূল্যের কথা বলেছেন। নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্যই চণ্ডীদাসের পদগুলির লাবণ্য। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। ‘মাথুর’ পর্যায়ে চণ্ডীদাসের লেখনীতে বিচ্ছেদের বেদনার চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক গভীরতর প্রেম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিরই ক্রম-পরিণত প্রকাশ ঘটেছে এই পদে। বিরহের দহন জ্বালা সহ্য করে চিরন্তন বাঙালি নারীর মতো সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপিনী রাধা এই পদে আশার প্রদীপ জ্বেলে মিলনোন্মুখ হয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ সই — সখি (সম্বোধন)। ভেল — হ’লো। কপাল কহিয়া গেল — অদৃষ্ট যেন বলে গেল। চিকুর ফুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফূরিত হচ্ছে। তাম্বুল — পান, বিহি — বিধি, পিয়া — প্রিয়া। তুরিতে ত্বরিতে — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

— বিদ্যাপতির পদ —

মাথুর - (৩)

“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।”

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহিনী রাধিকা তাঁর বিরহ বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন। কৃষ্ম দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন। তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহ আর্তি। পূর্ণ বর্ষাকাল — ভাদ্রমাস। রাধার গৃহ মন্দির শূন্য। আকাশ মেঘে ঢাকা। সর্বদা মেঘের গুরু গরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রিয়তম কাছে নেই, হয়েছেন সুদূর প্রবাসী। কামদেবের বাণে তাঁর দেহ আজ জর্জর। মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে, ভেকেরা মত্ত, ডাহুকী, কলরবে মুখর। প্রকৃতি জগতের এই আনন্দরসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দিক-দিগন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার রাত — আকাশের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক। কবির প্রশ্ন, কৃষ্মবিহীন শ্রীরাধিকার রাত কাটবে কী করে?

এই পদটিতে বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুরে-ছন্দে, ভাবে বর্ষা প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে শ্রীরাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা নেই, আছে রসাবেশ। হৃদয়ের বেদনাকে কবি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতেই কবি বর্ষা দিনের মত্ততাকে পটভূমিকায় রেখেছেন। বিদ্যাপতির চরমরূপ দক্ষতার প্রকাশ এই পদে আছে। মদনের বাণে শ্রীরাধিকার হৃদয় জর্জরিত। শেষ চরণে কবি-প্রশ্ন করেছেন—

‘কৈ ছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।’

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনের প্রাধান্যই দেখা যায়। শ্রীরাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শব্দের ঐশ্বর্যে ও ভাবের মাধুর্যে পদটি সার্থক।

শব্দার্থ ঃ ওর — সীমা। বাদর — বাদল, বর্ষা। মাহ — মাস, ঝম্পি — ঝাঁপিয়া। গরজন্তি — গর্জন করছে। সন্ততি — সতত। বরিখন্তিয়া — বর্ষণ করছে। পাহুণ — প্রবাসী। কুলিশ — বজ্র। দাদুরী — ভেক, ব্যাঙ। অথির — অস্থির। বিজুরিক পাঁতিয়া — বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি বা সারি। গোঙায়বি — কাটাবি। রাতিয়া — রাত্রি।

বিদ্যাপতির পদ — ২ নং

।। প্রার্থনা।।

“তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমনী সমাজে।”

সার-সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরে বৃষ্টির ধারা পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুত্র-মিত্র-স্ত্রী পরিবৃত সংসারও ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরই একমাত্র চিরন্তন। কিন্তু বিদ্যাপতি সেই শাশ্বত ঈশ্বরকে ভুলে ক্ষণকালের সংসারেই নিমগ্ন থেকেছেন। মায়াময় সংসারের মোহে আবদ্ধ থেকেই কবি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির ভাবনা — তিনি আজ কোনো কাজে লাগবেন ঈশ্বরের? তাঁর চোখের সামনে ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার। তিনি বুঝতে পেরেছেন দীন দয়াময় ভগবানই একমাত্র মুক্তিদাতা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন—ঈশ্বরই তাঁকে দেখাবে প্রকৃত মুক্তির পথ।

কবির সমগ্র জীবন কেটে গেছে চেতনাহীন অবস্থায়। অর্দ্ধেক জীবন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, অজ্ঞানতায় শৈশবকাল, যৌবনে নারীসঙ্গ লাভের নেশায়, আর জরা ব্যাধিতে বার্দ্ধক্যকাল কাটানোর ফলে ঈশ্বরের ভজনার সময় কবি পাননি। স্রষ্টা ব্রহ্মারও মৃত্যু লয় আছে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি-অনন্ত। সমুদ্রের বুকে ঢেউ যেমন জাগে এবং সমুদ্রের বুকেই তা বিলীন হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের মধ্যেই তার বিলয়। সেইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানই একমাত্র গতি, মুক্তিদাতা। কবির আত্ম বিশ্লেষণের পর ঈশ্বরের কাছে তাঁর করুণ প্রার্থনা—ভগবান যেন তাঁকে মুক্তি পথের যাত্রী করেন।

'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি তুলনারহিত। এই পদে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মায়া মোহে সারা জীবনে যে ভাবে দিন অতিবাহিত করেছেন তার জন্য কবি অনুতপ্ত। মরুময় জীবনে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সুগভীর বিশ্বাস জন্মেছে তারই ঐকান্তিক নিবেদন—

'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।"

হতাশার হাহাকারের পাশাপাশি ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী কবি ভক্তি বিনম্রচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরেরই পদতলে। পরিশুদ্ধ আত্মনিবেদনের সুরে পদটি স্নাত। রূপ, মোহ, তৃষ্মা, প্রেম সব মিথ্যা। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা উপাচার এই দার্শনিক ভাবনায় উত্তরণে পদটি সুসমৃদ্ধ। পদলালিত্য, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদি গুণে পদটি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ তাতল — উত্তপ্ত, সৈকত — বালু।

সুত-মিত-রমণী সমাজে — পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী-সমাবেশে বা সঙ্গে। তোহে — তোমাকে। বিসরি — বিস্মৃত হয়ে। বিশোয়াসে — বিশ্বাস। আধ-জনম — অর্ধেক জন্ম। নিন্দে — নিদ্রায়। জরা — বার্দ্ধক্য। চতুরানন — যাঁর চার মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা। তুয়া — তোমার। সমাওত — প্রবেশ করে। ভণয়ে — বলে।

জ্ঞানদাসের পদ

।। প্রেম বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ।।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস এই পদটিতে শ্রীকৃষ্মের প্রেমের রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ শ্রীরাধিকার মর্ম ব্যথাকে আক্ষেপানুরাগের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কৃষ্মপ্রেম লাভ করে সুখে দিন কাটাবার আশায় শ্রীরাধিকা তৈরী করেছিলেন যে স্বপ্নের ঘর তা চরম হতাশার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কৃষ্মপ্রেমের অমৃতসাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেলেন বিষ। শ্রীরাধিকা জানেন না তাঁর কপালে কী আছে? স্নিগ্ধ চাঁদের আলো তার কর্ম দোষে পরিণত হয়েছে সূর্যের প্রখর রৌদ্রে, উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি পড়েছেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীদেবীর করুণা চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে চরম দারিদ্র্য। অবহেলায় মণি- মাণিক্য সব হারিয়েছেন। নগর পত্তন করেছেন, মাণিক্য লাভের আশায় সমুদ্রবন্ধন করেছেন, কিন্তু কপাল দোষে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, মাণিক্য হারিয়ে গেছে। পিপাসা নিবারণের জন্য মেঘের কাছে জল চেয়ে তাঁর

ভাগ্যে জুটেছে বজ্র। এই বজ্রপতনই যেন তাঁর ভাগ্যলিপি। জ্ঞানদাসের মতে, কৃষ্ণপ্রেম-মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই বেদনা কণ্টকিত।

এই পদটির রচয়িতাকে ঘিরে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস দুই কবির নামই গবেষকগণ চিন্তা ভাবনা করে পদটি যে জ্ঞানদাসেরই রচনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন।

ভাবের অনন্যতায় ও প্রকাশের শিল্পীত সুষমায় পদটি অতুলনীয়। চিরন্তন ভাগ্যহীনার চিরহতাশার বেদনা কবি অনুপম ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

পদের সূচনায় এই চিরন্তন আশাহত জীবনের হৃদয়স্পর্শী বেদনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিষম-অলঙ্কারের সুখ—দুঃখ (অনল) অমিয় — গরল এই বৈষম্যই আলঙ্কারির সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে। অপূর্ব প্রয়োগে শ্রীরাধার দীর্ঘ শ্বাসভরা হাহাকার ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষার পারিপাট্যের পাশাপাশি বিষম অলঙ্কার সংযোজনায় কবির প্রকাশ ক্ষমতার কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

শব্দার্থ ঃ উচল — উঁচু। আনলে — অনলে, আগুনে। অচল — পর্বত। লছমী — লক্ষ্মী। বেঢ়ল — ঘিরে ধরলো। পিয়াস — তৃষ্ণা। বজর — বজ্র। সেবিনু — সেবা করলাম। হেলে — অবহেলায়। জলদ — মেঘ। ভানু — সূর্য। অমিয় — অমৃত। মরণ অধিক শেল — মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

জ্ঞানদাসের পদ (২ নং)

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের—
প্রকৃতপক্ষে 'রূপানুরাগের' পদ
"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

রূপানুরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। কৃষ্ণের গুণে তাঁর মন বিভোর। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে। কৃষ্ণ প্রেমের জন্য রাধার প্রাণ-মন অস্থির। মনের বাসনা, পূরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুধা রূপসুধা পান করে রাধার হৃদয় আকাঙ্খা তৃপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর শরীরের স্পর্শ লাভের জন্য রাধার দেহ মন উদ্বেলিত। সখীদের নিয়ে এমনকি গুরুজনদের সঙ্গে থাকার সময়েও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দেহ-মনকে পুলকবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সকলের সামনে তার জন্য অপদস্থ হতে হয় — এই ভেবে পুলক প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে চোখের জল অবিরল ধারায় বয়ে যাবার জন্য সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাধার এই অবস্থা দেখে ঘরের লোকজন কানাকানি করে।

কৃষ্ণের রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই পদটিতে। যথাযথ ভাষার ব্যবহারে অনন্ত বাসনার তীব্র হাহাকার প্রতি চরণে ধ্বনিত হয়েছে। ভাব ও ভাষার গাঢ় বন্ধতায় পদটি সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস গভীর অনুভূতির মর্মস্পর্শী গীতিকার।

কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অন্তরতম প্রাণবেদনার সফল চিত্রকর। এর প্রমাণ পদটিতে আছে। অলংকারের সার্থক ব্যবহারে কবি রাধার ব্যাকুল হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। কবির প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। প্রাণ তন্ময় হয়েও জ্ঞানদাস-গুরুর মতো আত্মহারা নন। প্রকাশভঙ্গির আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর আছে। হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার'। এখানে রাধার হাসি মধুর ধারার সঙ্গে তুলনা করে সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ আঁখি ঝুরে — চোখের জল পড়ে। আরতি নাহি টুটে — আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না। দরশ — দর্শন। পরশ — স্পর্শ। পহু — প্রভু। গুরু — গরিবত মাঝে — গুরু ও পূজনীয়দের মধ্যে। পরসঙ্গে — প্রসঙ্গে। লাজ — লজ্জা। পরকার — প্রকার। ভেজাই —জ্বালিয়ে দিলাম।

গোবিন্দদাসের পদ - (১নং)

।। অভিসার ।।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সংকেত স্থানে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিসারের পথ, দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝেতে জল ঢেলে মেঝে কাদা করে তাতে কাঁটা পুঁতে পায়ের নূপুর দুটিকে কাপড়খণ্ড দিয়ে বেঁধে পায়ের আঙ্গুল চেপে চুপি চুপি চলার অভ্যাস করছেন। রাধার ঈশ্বর সাধনার এ যেন গোপন মহড়া। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্ধকার পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন। বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পথে সাপের ভয় আছে। সাপের দংশন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কঙ্কন বন্ধক রেখে সাপুড়ের কাছে সাপের মুখবন্ধনের কৌশল জেনে নিয়েছে। গুরুজনদের কথা তিনি শুনতে পান না। এককথা শুনে উত্তর দেন অন্যকথা। আত্মীয় পরিজনের কথা শুনে মুগ্ধার মতো শুধা হাসেন। রাধিকার এই মানসিক অবস্থার একমাত্র সাক্ষী গোবিন্দদাস কবিরাজ।

'অভিসার' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্করণের চাতুর্যে, রসের নিবিড়তায় ও অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে পদটি অতুলনীয়। এই পদে কবির সখ্যভাবের সঙ্গে সম্ভোগভাবও যুক্ত হয়েছে। চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। রাধিকার অভিসারের দুস্তর পথ অতিক্রমের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এর সঙ্গে দুঃখজয়ের সাধনা পদটি সমৃদ্ধ।

শব্দার্থ ঃ কণ্টক — কাঁটা। গাড়ি — প্রোথিত করে। কমলসম— পদ্মের মতো। মঞ্জীর — নূপুর। চীরহি — বস্ত্রে। গাগরি-বারি — কলসীর জল। পীছল — পিচ্ছিল। দূতর — দুস্তর। পন্থ — পথ। যামিনী — রাত্রি। ভামিণী — রমণী। পয়ানক — কাটানোর। আশে — আশায়। কর-কঙ্কন — হাতের কাঁকন। ভূজগ — সাপ, পরমান — প্রমাণ।

গোবিন্দদাসের পদ — (২ নং)

।। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ।।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

গোবিন্দদাস রচিত এই পদটিতে শ্রীচৈতন্য দেবের কৃষ্ণ ব্যাকুলিত দেহ-মনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীরাধিকার মতো চৈতন্যদেবের দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে। বর্ষার জলে যেমন গাছ সজীব হয়, ফুল ফোটে, তেমনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল চৈতন্যদেবের শরীর যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভের জন্য রোমাঞ্চিত। কদম ফুলের মতো চৈতন্যদেবের পুলকিত দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসৃত হচ্ছে, তা যেন 'ভাবকদম্ব।' নটবর গৌর কিশোরের রূপমাধুর্য দৃষ্টি নন্দন। কবির কল্পনায় তা যেন যমুনা তীরের স্বর্ণতরু, যা ভাবাবেগে সঞ্চরণশীল। তাঁর গতিময় শ্রীচরণ পদ্মতলে ভক্ত ভ্রমরগণ প্রেমে ভক্তিতে আকুল হয়ে গুঞ্জরণ করছে। চৈতন্যদেবের শ্রীচরণকমলের সৌরভে বিমুগ্ধ দেব-দানবেরা রাত-দিন তাঁর প্রতি আত্মভোলা হয়ে ধাবিত হচ্ছে। চলমান, 'সোনার কল্পতরু (অর্থাৎ প্রেমামগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করে প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেননি বলে কবির অশেষ অনুতাপ।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও বিদ্যাপতির শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ কবি-কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোবিন্দ দাস যে পাদমঞ্জরী উপহার দিয়েছেন তা শিল্পরস ও লালিত্যে অনুপম। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুস্নাত ভাব-বিহ্বল-নৃত্যরস মূর্তিকে কবি "অভিনব হেম কল্পতরু" রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভক্তিনম্র রূপ বিকশিত ভাব কদম্ব রূপে চিহ্নিত। বৈষ্ণব ভক্তদের গুঞ্জনমুখর ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চলপদ পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিটি উপমা সার্থক। পদের ভণিতায় কবির গভীর হৃদিবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথাহত প্রাণে কবি দূর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ নীরদ — মেঘ। স্বেদ-মকরন্দ — ঘামরূপ ফুলমধু। পেখলুঁ — দেখলাম। নটবর — শ্রেষ্ঠ নর্তক। হেমকল্পতরু — কল্পিত সোনার গাছ। তাকর — তাঁর।

৪৩.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ

গোবিন্দদাসের 'গৌরাঙ্গাবিষয়ক' পদটি বাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদসমূহে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্নস্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই ভগবৎলীলার নানাস্তর এই এককে সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে প্রতিটি স্তরের তত্ত্বগত দিক তুলে ধরা হলো।

চণ্ডীদাসের ১নং পদ 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—'পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের। যে রতি সঙ্গামের পূর্বে স্পর্শ ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগে চরম আস্বাদ হয়, পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেছেন। এই দর্শন ও শ্রবণ নানা ভাবে হয়, যেমন—

১। দর্শন—(ক) সাক্ষাৎ দর্শন, (খ) চিত্রপট দর্শন, (গ) স্বপ্নে-দর্শন।

২। শ্রবণ—(ক) বংশীধ্বনি শ্রবণ, (খ) বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, (গ) দূতীমুখে শ্রবণ, (গ) সখীমুখে শ্রবণ, (ঙ) গুণিজনের কাছে শ্রবণ।

পূর্বরাগের দশ দশার কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন—দশাগুলি হলো—(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্যা, (৪) তাণব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ এবং (১০) মৃত্যু।

চণ্ডীদাসের পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। শ্যামনাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগ (Love at first sight) উৎপন্ন হয়েছে। কবি সহজ সরল ভাষায়-রাধার আকুল প্রাণের বার্তা তুলে ধরেছেন পদটিতে। পূর্বরাগের ধ্যানমগ্ন চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয়-আর্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বরাগের উদ্বেগ দশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের ২ নং পদটি 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের। 'সই, জানি কুদিন-সুদিন ভেল।'—এই পদটিতে মিলনানন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে যে মিলন এবং রাধিকার মনে সেই মিলনজনিত অনির্বচনীয় ভাবের উল্লাস - তাকেই — 'ভাবোল্লাস' রূপে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘ বিরহের পরে এই মিলনান্দ। তবে এ মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাববৃন্দাবনের মিলন। রাধিকা আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন শীঘ্রই সুদিন ফিরে আসবে। সংস্কারের নান চিত্রের সাহায্যে কবি রাধার প্রত্যাশিত আনন্দ মধুর মিলন মুহূর্তটিকে এঁকেছেন।

মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির ১ নং পদটি 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' 'মাথুর' পর্যায়ের। 'মাথুর'কে প্রবাস বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশ-দেশান্তরের দূরত্বকে প্রবাস বলে। ভাবী, ভবন, ভূত—এই তিন ভাগে প্রবাসকে ভাগ করা যায়। সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার সংবাদ শুনে 'ভাবী' বিরহ স্মরণ করে রাধার হৃদয় গভীরে যে বিরহের কল্পনা তাকে 'ভাবী বিরহ' এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে রাধা যে বিরহ ভোগ করেন তাকে 'ভবনবিরহ' এবং কথা দিয়েও ফিরে না আসার যন্ত্রণাকে 'ভূতবিরহ' রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রবাসজনিত বিরহের দশ দশা-চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাণব (কৃশতা), মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

বিদ্যাপতির পদটিতে বিরহিণী রাধিকা তাঁর রিবহ আর্তি প্রকাশ করেছেন প্রিয়সখীর কাছে। বর্ষাকালের মিলন-মধুর-মুহূর্তে-রাধিকার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের হাহাকার। রূপদক্ষ বিদ্যাপতি আনন্দ মধুর প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অন্ধকারাচ্ছন্ন উদাসভাব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাপতির ২ নং পদটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। রাধা-কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের লীলা—এই প্রার্থনা পর্যায়ে কোথাও মুখ্যস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যান্য স্তরের পদে কবির হৃদয়ানুভূতি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে পল্লবিত হলেও বিদ্যাপতির এই পদে কবির হৃদয় আর্তি ভক্তিরসকে অবলম্বন করে বাধাবন্ধহীন ভাবে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেছে। প্রার্থনা বিষয়ক-পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যগুলি সাজিয়েছেন। সারা জীবনের ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপথগামিতা সব কিছু তুলে ধরে জীবন সায়াহ্নে ভগবানের চরণ-প্রাপ্তিই যে মুক্তির একমাত্র পথ—এই উপলব্ধির জগতে পৌছেছেন।

জ্ঞানদাসের ১ নং পদটি প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ। এখানে কবি শ্রীরাধিকার হৃদয় আর্তিকে বিষম অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনকে মধুময় করতে যা যা চেয়েছেন কপালদোষে তার বিপরীত ফল পেয়েছেন। শ্রীরাধিকার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পদটির পরতে পরতে আছে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা হলো, প্রেমের উৎকর্ষ এবং এই প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এই মূল তত্ত্বটিই আক্ষেপানুরাগ নামে চিহ্নিত। রূপ গোস্বামীর মতে আট রকমের আক্ষেপ আছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, (২) নিজের প্রতি আক্ষেপ, (৩) সখীর প্রতি আক্ষেপ, (৪) দূতীর প্রতি আক্ষেপ, (৫) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, (৬) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, (৭) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং (৮) গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

জ্ঞানদাসের এই পদে শ্রীরাধিকা নিজের প্রতি ও বিধাতার প্রতি আক্ষেপকেই প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসের ২নং পদটি 'রূপানুরাগে'র পদ। কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী শ্রীরাধিকার মন-প্রাণ অস্থির। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর দেহের স্পর্শ পাবার জন্য রাধা তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে হারিয়ে ফেলেছে। এইজন্য তাকে ঘিরে নানা কানাকানি। ভাব ও ভাষায় পদটি সুসমৃদ্ধ।

গোবিন্দদাসের ১ নং পদটি 'অভিসার' পর্যায়ের। 'পূর্বরাগে' যে প্রেমের সূচনা 'অভিসারে'র ক্ষুরধার পথে সেই প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে যাত্রাকেই অভিসার বলা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চান। রূপ গোস্বামীর মতে ছয় প্রকার অভিসারিকার। উল্লেখ আছে। যথা—(১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তিমিরাভিসারিকা, (৩) লজ্জালীনা অভিসারিকা, (৪) নিঃশব্দাভরণা অভিসারিকা, (৫) কৃতাবগুণ্ঠিতা অভিসারিকা, (৬) স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা অভিসারিকা।' পীতাম্বর দাস অভিসারকে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মতা, সঞ্চরা।

তামসী ও বর্ষা অভিসারের প্রস্তুতি রয়েছে, গোবিন্দদাসের পদে। শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সাধনার গোপন মহড়া দেখা যায়। অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের চমকদমক, বজ্রপাত, সর্প দংশনের ভয় ইত্যাদির কথা মেনে রেখে সব কিছুকে জয় করে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে তার জন্যই রাধিকার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। কবি রাধার দুঃখ জয়ের সাধনার চিত্রটিকে শিল্প সৌন্দর্য দান করেছেন।

গোবিন্দদাসের ২নং পদটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। একই অঙ্গে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমাজে পূজিত। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গোবিন্দদাস পদটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাননি বলে পদটিতে আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল গৌরাঙ্গদেবের ভাববিহ্বল মূর্তিটি কবি সার্থক উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। পদটি শিল্পরস ও লালিত্যে মধুর।

৪৩.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

১। চণ্ডীদাস ঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পদাবলীর মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কারের পর 'চণ্ডীদাস' সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। আজও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। তবে দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা—এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক গবেষকগণ আজও একমত হতে পারেননি।

পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। বীরভূমের নান্নুর বা নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। বাশুলী পূজারী চণ্ডীদাস গ্রামবাংলার ভোগ-বিলাসহীন অকৃত্রিমভাবে তন্ময় কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। মিলনেও তাঁর সুখ নেই। তিনি শত দুঃখকে সহ্য করেছেন। কবি সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধা আত্ম নিবেদিতা—'যোগিনীপারা'। তাঁর কাব্য সম্ভার নিরাবৃত প্রাণের শান্ত-কোমল স্নিগ্ধতায় ভরা। বাঙালির প্রাণের কবিরূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত। বিলাস-ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও তিনি যাননি। তিনি বিরহ-বেদনার শান্ত রসের আত্মনিমগ্ন কবি। পূর্বরাগ অনুরাগ থেকে শুরু করে ভাবোল্লাস মিলন পর্যায় পর্যন্ত চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেন কবি সরস্বতীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—"যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ।" প্রেমের প্রগাঢ় রূপ চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনীতে রাধা ও কৃষ্ম 'পরাণে পরান বান্ধা আপনি আপনি।' মিলনমুহূর্তেও হারাই হারাই ভাব।

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

লৌকিক জীবনে এই প্রেম দুর্লভ।

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের পদ মর্মস্পর্শী বেদনায় স্পন্দিত। নৈশ-বর্ষাভিসারের

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।"

পদটিতে কবি কৃষ্ম-ব্যাকুলতা ও প্রেম ব্যাকুলতাকে একাকার করে রাধার হৃদয় বেদনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'আক্ষেপানুরাগে'র পদগুলিতেও কবির ভাব-নিবিড়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস সুদূর বৈরাগ্যের মোহিনী মায়ায় সংযতবাক্, আত্মসমর্পণী ভাব রসে নিমগ্ন।

'ভাবোল্লাস'-এর পদে—'সহ্য করিবার কবি' রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত।

পদাবলীর প্রতিটি পর্যায়ের পদেই চণ্ডীদাসের হাতে শ্রীরাধিকা বাঙালি নারীর চিরন্তন সহিষ্মুতার মূর্ত প্রতীকরূপে সু-অঙ্কিত।

২। বিদ্যাপতি ঃ বংশগত সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি রূপে বহু গ্রন্থাদি লিখলেও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর বৈষ্মবপদগুলির জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে চির আসন লাভ করেছেন। কবি 'অভিনব জয়দেব' 'মৈথিল কোকিল' নামে চির পরিচিত। তাঁর হাতে রাধা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে যৌবন লগ্নে পূর্ণ লীলাময়ী রূপ লাভ করেছেন। পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নবানুরাগের চাপল্য। বিদ্যাপতি ঐশ্বর্যের কবি, সুখের কবি। রূপানুরাগের পদে তিনি দেহ-সম্ভোগের কবি হয়েছেন। রূপ ও ভাবে রাধাকে বিদ্যাপতি যেভাবে সাজিয়েছেন—তা তুলনারহিত।

অভিসারের যাত্রায় তাঁর রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্যোতি ও অলঙ্কারের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'মাথুরে' রাধিকার করুণ আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাবোল্লাস' ও 'মিলনে' বিদ্যাপতির হাতে রাধার ভাবাকুতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অপার্থিব ভাব-সম্মিলনের নিদর্শন।

"আজু রজনী হাম ভাগেপোঁ হায়লুঁ"—পদটি।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলঙ্কারের মণ্ডনকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি অতুলনীয়। তাঁর মতো রস-নিপুণ স্রষ্টা বিরল।

৩। জ্ঞানদাস ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনবৃন্দের মধ্যমণি—কবি জ্ঞানদাস। আনুমানিক যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পদে কবির জন্ম। তিনি 'খেতুরী' উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। কবি নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংযত হৃদয় রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর রূপানুরাগের পদগুলি হৃদয়-স্পন্দিত অনুভূতিতে ও ভাব-ব্যাকুলতায় গাঢ়বন্ধ। 'রূপোল্লাসে'র

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

পদটি স্মরণীয়। আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রীরাধার হৃদয় বেদনা ও প্রেম তন্ময়তা কবির লেখনীতে আধুনিক কালের সীমাকে স্পর্শ করেছে। রূপমুগ্ধতা ও শ্রীরাধিকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশে কবির চিত্র প্রতীক ও আবেগ অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে।

৪। গোবিন্দদাস ঃ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য—'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—গোবিন্দদাস মহাজনরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির অতুলনীয় কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি বিদ্যাপতির ভাব-ভাষাকে আত্মস্থ করে অভিনব গীতি ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পদ বাক্‌মূর্তি ও আবেগে অনন্য। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অভিসারে'র পদে গোবিন্দদাস সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলপাট।।'

পদটি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার চিরকালের সম্পদ হয়েছে। ভাব-মাধুর্য ও হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্যে তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪৩.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর শেষে .... পৃ .... উত্তর সংকেত মিলিয়ে নিন।

১। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন ঃ

(ক) গোবিন্দদাস —————— নামে পরিচিত।

(খ) বিদ্যাপতি অভিনব —————— রূপে চিহ্নিত।

(গ) জ্ঞানদাস —————— ভাবশিষ্য।

(ঘ) বিদ্যাপতি —————— ভাষায় পদ রচনা করেছেন।

(ঙ) অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ————।

২। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) চণ্ডীদাস —
(১) সুখের কবি
(২) দুঃখের কবি
(৩) নৈরাশ্যবাদী কবি
(৪) আশাবাদী কবি

(খ) 'কবিরাজ' উপাধিধারী হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) গোবিন্দদাস
(৪) জ্ঞানদাস

(গ) 'প্রার্থনা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) জ্ঞানদাস
(৪) গোবিন্দদাস

৩। 'ব্রজবুলি' ভাষা সম্পর্কে ৪ লাইনে আপনার বক্তব্য লিখুন।

....

....

....

....

৪। 'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।'

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশটি ৪টি চরণে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

৫। 'তুয়া বিনা গতি নাহি আর'

কে? কোন্ পর্যায়ে? কার কাছে এই আবেদন করেছেন?

....

....

....

৬। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।"

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশে কোন্ জীবনরস প্রকাশ পেয়েছে?

....

....

....

৭। নীচের শব্দগুলির শব্দার্থ লিখুন।

ঐছন, পাসরিতে, ভেল, ওর, পাহুন, অথির, তাতল, অমিয়, চীরহি, পরমান।

৪৩.৮ উত্তরমালা

১। (ক) দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, (খ) জয়দেব, (গ) চণ্ডীদাসের, (ঘ) ব্রজবুলি, (ঙ) গোবিন্দদাস।

২। (ক) ২, (খ) ৩, (গ) ২

৩। ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপভ্রংশ ভাষা থেকে জাত। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলির প্রধান উপাদান মাগধী অপভ্রংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। সুতরাং উপাদানের দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দী তথা শৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে গঠিত।

৪। অংশটি চণ্ডীদাসের লেখা। পদ্যাংশটি 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের কৃষ্ণের নাম শ্রবণে রাধা দিশেহারা। কি করবেন—তার ভবিষ্যৎ কী—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন—এই সব চিন্তায় রাধা রমন ব্যাকুল হয়েছে। কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চান কিন্তু তা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

৫। এই অংশটির রচয়িতা 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি। অংশটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। ভগবানের কাছে কবি এই ঐকান্তিক করেছেন।

৬। পদ্যাংশ বিদ্যাপতির লেখা। পদ্যাংশটি 'মাথুর' পর্যায়ের। বিরহ-বেদনা দগ্ধ রাধার জীবনের করুণরস এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৭ এইরূপ, ভুলে যেতে, হলো, শেষ, প্রবাসী, অস্থির, উত্তপ্ত, অমৃত, বস্ত্রখণ্ড, প্রমাণ।

৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন,

(২) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— শশীভূষণ দাশগুপ্ত,

(৩) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রদাস বসু

(৪) বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)—

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রীসুকুমার সেন,

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী,

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী,

সম্পাদিত ৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

একক ৪৪ ❑ রামায়ণ — অরণ্যকাণ্ড — কৃত্তিবাস ওঝা

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য

৪৪.২ প্রস্তাবনা

৪৪.৩ মূলপাঠ—অরণ্যকাণ্ড—কৃত্তিবাস

৪৪.৪ সারাংশ

৪৪.৫ সার সংক্ষেপ

৪৪.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ

৪৪.৭ অরণ্য কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ

৪৪.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

৪৪.৯ অনুশীলনী

৪৪.১০ উত্তরমালা

৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করিলে আপনি—

- কৃত্তিবাসের বাঙলা ভাষায় অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'র—সাতটি কাণ্ডের অন্যতম 'অরণ্যকাণ্ড' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানতে পারবেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য ছ'টি কাণ্ড সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি জানবেন।
- অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সব কিছু জেনে—এই খণ্ডের যে কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কল্পনাশক্তি, গল্পরসবোধ, বাঙালির হৃদিরসজাড়িত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা, সহজ সরল ভাষার প্রকাশ-নৈপুণ্য ইত্যাদি দিক থেকে কবির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কাব্যকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে কেন ভাবানুবাদ বলা হয় তারও পরিচয় পাবেন।
- বাল্মীকির রামায়ণের বাঙলা ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থাদির মধ্যে কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদিও জানতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালী’র ‘অরণ্যকাণ্ড’ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই কাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

(১) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণের দ্বারা সংবর্ধনা।

(২) বিরাধের সীতাহরণ।

(৩) বিরাধের রাম-লক্ষ্মণ হরণ।

(৪) বিরাধ সম্পর্কে নানাকথা এবং বিরাধ বধ।

(৫) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, ইন্দ্রদর্শন ও শরভঙ্গের আগুনে প্রবেশ।

(৬) নিশাচরগণের অত্যাচারের কথা শুনে রামচন্দ্রের আশ্বাসদান এবং সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা।

(৭) সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রামচন্দ্রদের অভ্যর্থনা ও বাক্য বিনিময়।

(৮) দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের আশ্রম দর্শনের জন্য রামের ইচ্ছা।

(৯) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ-সম্বন্ধে সীতাদেবীর কথা।

(১০) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ সম্পর্কে রামের বক্তব্য।

(১১) পঞ্চাপসর সরোবরের কথা, অগস্ত্যমুনির আশ্রমের নানা কথা, ইযমাবাহের আশ্রমও অগস্ত্যমুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের যাত্রা।

(১২) অগস্ত্যের অতিথি ও আপ্যায়ন ও অস্ত্রপ্রদান।

(১৩) পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা।

(১৪) জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী বনে প্রবেশ।

(১৫) লক্ষ্মণের পঞ্চবটীবনে আশ্রম তৈরী ও সেখানে তিনজনের অবস্থান।

(১৬) শীত-ঋতুর বর্ণনা।

(১৭) লক্ষ্মণের কাছে শূর্পনখার আগমন ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের প্রস্তাব।

(১৮) লক্ষ্মণের দ্বারা শূর্পনখার নাক-কান ছেদন।

(১৯) শূর্পনখার অনুরোধে খরের রাক্ষস প্রেরণ।

(২০) রামের রাক্ষস বধ।

(২১) খরের কাছে শূর্পনখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা।

(২২) খরের ক্রোধ ও যুদ্ধ যাত্রা।

(২৩) রাক্ষসগণের অত্যাচার, উৎপাত।

(২৪) দলবল সহ খরের আগমন।

(২৫) রামচন্দ্রের সঙ্গে খরের যুদ্ধ বর্ণনা।

(২৬) চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ।

(২৭) রামের ত্রিশিরা বধ।

(২৮) খরের পরাজয়, নিধন এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা রামের সংবর্ধনা।

(২৯) অকম্পনের লঙ্কায় গমন, রামের বীরত্ব কাহিনী, বর্ণনা, রাবণের মারীচ অশ্রমে গমন ও ফিরে আসা।

(৩০) শূর্পনখার লঙ্কায় গমন।

(৩১) রাবণকে শূর্পনখার ভর্ৎসনা।

(৩২) সীতাকে হরণের জন্য শূর্পনখার উৎসাহ দান।

(৩৩) রাবণ-মারীচ সংবাদ।

(৩৪) মারীচের কাছে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা।

(৩৫) মারীচ ও রাবণের পারস্পরিক ভর্ৎসনা ও রাবণের আদেশ দান।

(৩৬) সোনার হরিণের রূপ ধরে মারীচের দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ।

(৩৬) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৭) মারীচ বধ।

(৩৮) সীতা-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৯) ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন রাবণ-সীতার কথোপকথন, সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ।

(৪১) রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ—জটায়ুর পরাজয়।

(৪২) সীতাকে নিয়ে রাবণের আকাশপথে গমন।

(৪৩) সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ।

(৪৪) সীতার মনোরঞ্জনের নানা চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে অশোক কাননে সীতাকে বন্দী করে রাখা।

(৪৫) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৪৬) সীতাহারা রামের বিলাপ।

(৪৭) বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের কাতরতা।

(৪৮) রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবোধ দান।

(৪৯) জটায়ুর কাছ থেকে সীতাহরণের সংবাদ প্রাপ্তি।

(৫০) জটায়ুর মৃত্যু ও সৎকার।

(৫১) কবন্ধের সঙ্গে দেখা—তার বাহু ছেদন—লক্ষ্মণের পরিচয় দান।

(৫২) কবন্ধ-রাম সংবাদ এবং কবন্ধের দ্বারা সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ ও তার বাসস্থান নির্দেশ করে কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

(৫৩) রাম-শবরী সংবাদ ও শবরীর স্বর্গ গমন।

(৫৪) রাম-লক্ষ্মণের পম্পা দর্শনে গমন ও রামের বিলাপ।

অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাসের ক্রম-পরম্পরার যেন বৈচিত্র্য তেমনি নিবিড় ঐক্য দেখতে পাবেন। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনের মধুর ও বিরহ রূপটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের পাশাপাশি স্নেহ-ভালোবাসা নিবিড় রূপটি আকর্ষণীয়। প্রকৃতি চিত্রণে খণ্ডটিতে ভিন্নস্বাদ-সৃষ্টি হয়েছে। বাল্মীকির 'শূরধর্মী' কাব্য কৃত্তিবাসের হাতে কিভাবে 'গৃহধর্মী' হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ 'অরণ্যখণ্ড'টি। রামের প্রেম-করুণাঘন মূর্তি, লজ্জানম্রবধূরূপী সীতা ও সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়। 'বাঙালির জাতীয় কবি' রূপে চিহ্নিত কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র অনন্য খণ্ড হল 'অরণ্যখণ্ড।' এই খণ্ডের ঘটনা ধারার সারাংশ পরের এককে আপনারা পাবেন। সেই সারাংশে প্রস্তাবনায় চিহ্নিত ঘটনাধারার সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। কৃত্তিবাসের কল্পনা শক্তি, ঘটনা বিন্যাস, ভাষা ও ছন্দ শৈলী, অলঙ্কার প্রয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়েও আপনারা সমৃদ্ধ হতে পারবেন।

৪৪.৩ মূল □ পাঠ অরণ্যকাণ্ড

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দু মানন্দদং।
বৈরাগ্যাম্বুজ ভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিবৌ স্বেশম্ভবং শঙ্করং।
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্।।
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌ ভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তুণীরভারং বরম্।।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।
সীতালক্ষ্মণংসংযুতং পথিগতং রামানিরামং ভজে।।

চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অযোধায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিনজন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভালমন্দ যখন যে রামের জিজ্ঞাসে।।
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাম রঘুমণি।।
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা।।
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।।
যদি কোনো বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।।

যে মন্ত্রণা করিতে ছিলেন রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।।
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর।।
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে।।
যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে।।
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গয়ে কলসী।।
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ।।
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্যবনে কেমনে রহিবে তিন জন।।
সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবে রাম রাক্ষস সমাজে।।
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে।।
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।।
স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর।।
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত
মুনিপত্নির নিকট সীতার জন্মাদি কথন
এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ বধ।

আমা নিতে ভরত আইল পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।।
চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর।।
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে।।
কতদূর যান তারা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম।।
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ।।
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।।
আপনার পত্নী ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।।
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াচে কেশ।।
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।।
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।।
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে।।
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলে গুণে শীলে।
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়।।
সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল শ্যাম।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি।।
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।

আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি দারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা।।
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহু মূল্য ধন।।
তুষ্ট হ'য়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী।।
জানকী বলেন দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।।
একদিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে।।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে।।
অযোনি সম্ভবা মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।।
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।।
দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী।।
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা।।
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন।।
প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে।।
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে।।
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে।।
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর এল রাজার কুমার।।
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া।।
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন।।
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।।
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।।
ধনুকের শব্দে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে কাঁপিল সর্ব্বজনা।।
শিরে পঞ্চঝুঁটিরাম বিক্রম বিস্তর।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার।।
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে।।
রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সম্বাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে।।
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম ঊর্ম্মিলার সহ।।
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল।।
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামীরাম।।
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতুষ্ট হইলেন মুনির গৃহিণী।।
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর।
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর।।
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কঙ্কন।
নূপুরে শোভিত হয় কমল চরণ।।
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়।।
প্রদোষ হইল গত প্রবেশ রজনী।

রামের নিকটে যান শ্রীরাম রমণী।।
উমা রামা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক দূহিতা নিরুপমা।।
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী।।
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেক মুনির চরণ।।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী।।
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
জনক তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন।।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।
বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সম্মান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান।।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জনে মনসুখে করেন ভ্রমণ।।
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ।।
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত।।
রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।
শিরে দীর্ঘজটা কাটা দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায়।।
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংস ভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।
মেঘের গর্জ্জনে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ।।
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকে অন্তরীক্ষে।।
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন।।
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে।।
বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোনজন।।
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয় কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার।।
দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি বদন।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জন।।
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা।।
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মম ভয় করি কারে।।
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।

সীতারে খাইবে আজ দারুণ রাক্ষসে।।
লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে।।
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে।।
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান।।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।।
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে।।
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যগ্রতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা।।
যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি।।
শাপে মুক্ত করিলা আমার এই শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর।।
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যার পতি।
তোমা পরশিয়া হয় শাপ অব্যাহতি।।
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে এই আমার দুর্গতি।।
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর।।
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রণস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে।।
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।।
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর।।
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপে বিমোচন।।
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়ালে পাইব নিষ্কৃতি।।
লক্ষ্মণের উদ্‌যোগে দানব দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে।।
রাম দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন।

শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পাড়ে শরভঙ্গ নিকেতন।।
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন।।
তপের প্রতাপ যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল।।
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেইস্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে।।
হেনকালে উপনীত তথআ শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ।।
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে।।
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথের ত্বরা।।
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায়।।
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্‌জন।।
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার।।

শুনি মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ।।
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর।।
তবস্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান।।
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর।।
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে।।
অনাথ ছিলাম বলে হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ।।
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস।।
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ।।
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ।।
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে।।
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগণমণ্ডল।।
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনিবর সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন।।
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধতুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে।।
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার।।
গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্যফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।।
রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমণান্তর পঞ্চবাটীবনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষাস বধ।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খান কেহ উপবাসী।।
অনাহারে কেহ বা বরিষা চারিমাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।।
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে।।
মুনিগণে দেখিয়া উঠিল রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড় হাত।।
মুনিরা করেন স্তুতি রামেরে গোচর।
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর।।
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবে রাক্ষস সংহার।।
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন দরশনে করেন গমন।।
ধনুকে টঙ্কার দিলে রামরঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির।।
বনে প্রবেশে রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান।।
রাক্ষসের সহ কেন করহ বিষাদ।
অকারণ প্রাণীবধে ঘটিবে প্রমাদ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান।।
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে।।
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়গ রাখে একজনে।।
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্যধন।
তেঁই যত্নে খড়গ খানি রাখেন ব্রাহ্মণ।।

এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে।।
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সে খড়েগর চোটে লয় পক্ষীর জীবন।।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে।।
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।
সরলা জনকবালা কহিল এমতি।
বুঝান প্রবোধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি।।
কনক কমলমুখী জনক কুমারী।
আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি।।
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে।।
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর।।
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত শুনি কেন মুনি।।
মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী।।
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরিগণে যথা মুনিবর।।
আইল অপ্সরিগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে।।
সেই স্থান খ্যাত পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া।।
নৃত্য-গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা।।
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম।।
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী।।
কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশমাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস।।
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন।।
একদিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ।।
সুতীক্ষ্ম মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।।
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পুরাও মনস্কাম।।
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া কর বাস তাঁর তপোবনে।।
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন।।
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে।।
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি।।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।।
এই বনে ছিল এক দুর্জ্জয় রাক্ষস।
তারে বধি মুনি করিলেন এ নিবাস।।
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হ'য়ে রাক্ষসে মারেন কি প্রকার।।
শ্রীরাম বলেন ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর।।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে।।
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।।
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
মেষ মাংস দিয়া তারে করায় ভোজন।।

ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বল যবে ডাকে।।
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে।।
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিল আপনি।।
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষ মাংস মোরে আজি করাও ভোজন।।
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস।
কহিল কতেক মুনি খাবে মেষ মাংস।।
বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়র কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে।।
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিলা ইল্বল তার পাশে।।
গঙ্গাদেবী ব'লে মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে।।
মুনি বলে বহু দিন মম উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়বের মাস।।
গঙ্গাস্নান করি মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে।।
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক।।
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে।
ইল্বল বলিল এস বাতাপি বাহিরে।।
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ হাতী।
ইল্বল মারিতে যুক্তি করে মহামতি।।
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে।।
সেই কথা পাসরিল রাক্ষস আপনা।
মুনি বাতকর্ম্ম করে যেমন ঝঞ্জনা।।
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে।
এই মত মুনি দুই রাক্ষসের মারে।।
এই মত মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা করিলেন মহাশয়।।

রামায়ণ।

আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে।।
যাইতে ছিলেন রম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এই আইল বাহিরে।।
তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।
আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ।।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন।।
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত।।
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে।।
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনে ভ্রম দূরে যায়।।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।।
গোলোক ছাড়িয়া হে করিলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ।।
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।।
পথশ্রান্ত আছে রাম করাও ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন।।
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন।।
করিয়া প্রভাত কৃত্য শ্রীনন্দনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।

আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন্ স্থানে।।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।।
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য শোভে বন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দিব্য ধনুর্ব্বাণ।
রামেরে অগস্ত্য মুনি করিলেন দান।।
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর।।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি।।
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত।।
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন।।
পক্ষীরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই।।
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার।।
আইস আইস রাম কীতা ল'য়ে ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে।।
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটি দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম আপন প্রধান।
কোন স্থানে বান্ধি ঘর কর সন্নিধান।।
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে।।
নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল।।
শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর।।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নি পূজা করি হইলেন গৃহবাসী।।
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।।
জটায়ু বলেন রাম আসিহে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন।।
এত বলি পক্ষীরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে।।
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে।।
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া।।
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্ন সুলভ গোদাবরীর জীবন।।
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গাগণ সহ পরিহাস।।
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে।।
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহি কোন ক্লেশ।।
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী।।
রহেন এরূপে পঞ্চবটি তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন।।
রাবণের ভগ্নি সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।

শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে।।
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান।।
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি।।
জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র ধার্ম্মিক শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মাচারিণী।।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা।।
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী।।
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ।।
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস।।
বহুদূর নহে তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে।।
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার।।
সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়।।
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী।।
শুনিয়া আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয়।।
পরমাসুন্দরী তুমি লোকে নিরূপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা।।
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়।।
লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণ ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী।।
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই মনে বাঞ্ছা হয়।।
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা।।
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন।।
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি।।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।
তথা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার।।
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী।।
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ।।
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ।।
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত।।
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী।।
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসের সহিত করিব পরিহাস।।
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর।।
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে যে বড় গুণী।।
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ।।
লক্ষ্মণ কনক বর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।

তোমা হেন রূপবান পাব কোন্ স্থলে।।
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ।।
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা।।
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর।।
শুনহ সুন্দরী তুমি আমার বচন।
শ্রীরামের সন্নিধানে করহ গমন।।
উপহাস না বুঝে বচন মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়।।
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।।
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসের ডরে।।
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা।।
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ।।
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান।।
খান্দা নাকে খান্দা কানে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে।।
সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে।।
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি।।
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি।।
দূষণ খরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যার নিরূপণ।।
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে।।
বসি তবে সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে।।
মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী।।
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ।।
গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।।
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি।।
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাক্ খাক্ তাহার শোণিত।।
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান।।
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।।
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগান্তর।।
সকলে আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন।।
ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে।।
এইমত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর।।
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ।।
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।

কোন্ মুখে বলিস না করি অপরাধ।।
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।।
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস।।
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল।।
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেণ সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ।।
নেউটিয়া বাণ এল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।।

খর দুষণের যুদ্ধে আগমন।

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়ে খরের সম্মুখে।।
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দজন।
অবশ করিল না সাধিল প্রয়োজন।।
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান।।
প্রবল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি।।
রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল।।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
অস্ত্র শস্ত্র যাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর।।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দ তেজে।।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।।
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনসুখে।।

শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দূষণ ও খরের মৃত্যু।

শ্রীরাম বলেন শুন সৈন্যের কলকলি।
সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী।।
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর।।
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর।।
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রাম।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন তখন।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ।।
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।।
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ।।
দূষণের বচন শুনিয়া রাম হাসে।
রাক্ষস হাজার খর সহিত আইসে।।
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী।।
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।।
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া।।

সন্ধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান।।
দুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধার।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর।।
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে।।
জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে।।
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।
মার মার বলিয়া পলায় কতগুলি।।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে।।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্ত ময়।
আপনা আপনি লড়ে নাহি পরিচয়।।
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার।।
সকল পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে।।
আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশ সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে।।
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।।
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই শূল অন্যথা কে করে।।
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে।।
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান।।
দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইল বীর নেত্র জলে তিতে।।
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইল আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।।
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর।।
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার।।
কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হাতেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।।
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর প্রাণ।
মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ।।
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন।।
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার।।
ত্রাস বুঝি খরের এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান।।
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হ'য়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর।।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জলস্থল ছাইল গগণ।।
নানা অস্ত্র দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আস।।
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন।।
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পুরেন রঘুবর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পুরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ।।
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড।।

অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া।।
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে।।
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।।
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগণমণ্ডলে।।
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষে যোড়ে।।
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার।
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর।।
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে বীর চাহে চারিভিতে।।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়ে।।
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে।।
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুইচির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে।।
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ।
আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে সুখী।
মহেন্দ্র তোমায় তুষ্ট তব রণ দেখি।।
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোক পাল আসি করেন স্তবন।।
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে।।
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ।।
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।
তাঁহারে কহেন রাম রণ বিবরণ।
দেখি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ।।
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে।।
রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার।
নাক কান কাটা তার বিভৎস আকার।।
যার কাছে যার রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায়।।
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি।।
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।
হেনকালে সুর্পণখা দিল দরশন।।
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি।।
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্র দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।।
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার।।
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন।।
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ।।
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ।।

সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন।।
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন্ মুনি।
সঙ্গে করি ল'য়ে ভ্রমে সুন্দরী রমণী।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল।।
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির।।
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী।।
সীতার রূপের সম আর নাই নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি।।
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।।
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে।।
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সেই সীতা শোকানলে।।
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে।।
যুক্তি করে রাবণ আসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে।।
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে।।
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ।।

আরদিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।।
আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ।।
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে।।
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বন্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য।
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর।।
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন।।
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।।
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া।।
তপ করি বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ।।
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।।
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি।।
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইলা মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে।।
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান।।
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে।।
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর।।
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিলা রাম একেশ্বর।।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই।।
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমায় ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক।।

সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কান।
হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান।।
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ।।
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার।।
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন।।
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি।।
তাহারে হরিব করি তোমার সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়।।
আবোধ রাবণ একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি।।
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কী রহিবে লঙ্কাপুরী।.
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।।
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ।।
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা।।
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।।
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ।।
কুমন্ত্রীর বচনে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে।।
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমন মজিবে তব দোষে।।
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রাম পুত্রশোকে।।
সীতা বিনা রামের অন্যে না যায় মন।
সীতার শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ।।
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে।।
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মন শ্রীরামের দেবী।।
রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে।।
পর-স্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা কিছু নাহি দেখি।।
রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি।।
মারীচ বলেন মৃগবেশে যার তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে।।
কার্য্য সিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিও রামের নিকটে।।
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে।।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা।।
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম।।
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা।।
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা আনিয়া সীতারে।।
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরাম তোমায় দেখি অনেক অন্তর।।
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি।।

ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্গ লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তব শ্রীরামেরে ডরি।।
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ।।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশর।
সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।।
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে।।

রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান।

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ।।
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্ম্মতি।।
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।।
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি।।
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার।।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি।।
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন।।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পুর।।
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিশ্চয়।।
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।।
হ'রেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার।।
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার।।
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।।
সাগরের দর্প কর সাগরে কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।।
আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি পরে পুরীজনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়।।
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর।।
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন।।
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।
হরিতে গেলাম সীতা না হরিলাম তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়।
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ।।
রাজা পাত্রে করে যুক্তি হ'য়ে এক মতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি।।
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড।।

—০—

মারীচের মৃগরূপ ধারণ।

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ চরিত্র।।
সূর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কাণ দুটি।।
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুইজনে।।

মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে।।
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি খর দেখিতে সুন্দর।।
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিম্বকি গলে যেন দিবাকর।।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন নিশাকর।।
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা।।
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলী।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী।।
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল অরণ্য কাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়া মৃগ করিল গমন।।
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।।
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।।
রাক্ষসের বংশ, ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে।।
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ।।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।।
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।।
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখি বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।।
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা কর্ম্ম।
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলী।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী।।
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার।।
ভালমতে ইহা আমি করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।।
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলেন সকলি সে ঘটে।।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কেন কর ভাই স্থির।।
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধ পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি।।
সাথি থাকে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন।

মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন।।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি।।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।।
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হ'য়ো সাবধান।
বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে।।
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ।।
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর।।
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে।।
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ।।
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।।
মারীচ সশঙ্ক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে।।
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে বহুদূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর।।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে পলায় অন্তরে।।
প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান।।
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপত মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন।।
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী।।
ঐষিক বিশিখ রাম পুরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজ বজ্রের সমান।।
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে।।
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।।
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ।।
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি।।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।।
মারীচের বুকে বাণ কসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ বধ গায় অরণ্যেতে।।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।।
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ।।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে।।
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ।।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন।
তুমি কি জাননা সীতা ধনুক ভঞ্জন।।
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী।।

কারে রাখি তোমার নিকট কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে।।
তাহা না মানেন সীতা হ'য়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।।
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার কাছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে সড় আছয়ে তোমারি।।
মনের বাসনা কী সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কী রামের কর হেলা।।
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন।।
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর।।
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে।।
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেক লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তার পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা।।
আমাকে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী।।
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।।
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।।
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ।।
ভিক্ষা ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।।
পরমাসুন্দরী সীতা বচন মধুর।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর।।
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে।।
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা।।
সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে।।
বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।।
পরিচয় দেয় সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেবিল যেন মধুর বচনে।।
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ পুত্রবধূ রামের বনিতা।।
রহ দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ।।
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে।।
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধরি শিখা।
কি জাতি কি না ধর কেন কর ভিক্ষা।।
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি।।
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে।।
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন।।
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে চলে যাই নিজ নিকেতন।।
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান।।

শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী।।
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ।।
রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে।।
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি।।
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কী বলিবে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখন মত ঘটিবেক তথা।
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।।
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় একি বিপরীত।।
দুরাচার দূর হ'রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।।
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।।
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন।।
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন।।
ইন্দ্রের অমরাবতী যিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী।।
তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী।
সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।
তুমি অন্ন দিলে পাবে অন্য সব রাণী।।
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।
সুবর্ণ মাণিক্যময় রবে তব স্থান।।
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে।।
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পবান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞান।।
অল্প বুদ্ধি যে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগ যুগে চিরজীবী আমি দশানন।।
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ বচনে।
রাবণেরে গালি দেয় আসে যত মনে।।
অধর্ম্মিষ্ঠ অগণ্য অধর্ম্ম দুরাচার।
করিবেন রাম তোমার সবংশে সংহার।।
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন।।
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোকে দেখি অনেক অন্তর।।
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।।
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ।।
করে দুষ্ট কুড়িপাটী দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
কিগুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন।।
দেখিবে কেমনে করি তোমারে পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন।।
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলে বেটা আমার কারণ।।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন।।
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি।।
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার।।
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর কর পরিত্রাণ।।
অত্যন্ত চিন্তিত সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন।।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইল বলিয়া দেখে চারিভিতে।।
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।।
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।।
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।।
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির।।
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্‌জন।।
জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর।।
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়।।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর।।
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট।।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস তুই পাপী দুরাচার।।
কোন্ দোষে হরিলি রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী।।
সুর্পনখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কাণ কাটে তার সেই অপরাধে।।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
হরিলি তাঁহার বধূ নাহি কোনো ডর।।
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী।।
আকাশে উড়িয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।।
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।।

অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে।।
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে।।
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত।।
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।।
যুঝে পক্ষীরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস।
বলহীন পক্ষীরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন।।
আরবার রাবণ সীতারে তুলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।।
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর।।
রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ।।
অতঃপর পক্ষীরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ।।
দুইজনে ঘোর রবে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।।
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কার করিতে নারিল নিবারণ।।
রাবণের মুকুট সে রত্নের নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।।
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশমাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা।
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড।।
পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ।।
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে।।
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।।
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তাহা পক্ষীর পরাণে।।
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর।।
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুইপাখা কাটে।।
ভূমিতা পড়িয়া পক্ষী করে ছট ফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট।।
আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন।
রাবণের হাতে পাছে আমার মরণ।।
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন।।
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ।।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিও তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর।।
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী।।
জটায়ু বলে সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ।।
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিকেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে।।
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে।।
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল।।

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী।।
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে।।
রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লণ্ড ভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড।
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে।।
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগণ।।
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী।।
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈল যেন বহে গঙ্গাধারা।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।।
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অভাগীরে দেহ দেখা আসি এইক্ষণ।।
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।।
নল নীল গবাক্ষ পবন নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন।।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।।
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।।
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ।।
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান।।
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে।।
সীতা লৈয়া দক্ষিণদিকে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন।।
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার।।
জটায়ুর ভ্রাতষ্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ।।
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সে দিন সেইক্ষণে।
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে।।
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তার আচ্ছাদন করে।।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎ কায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়।।
জটায়ুর ভ্রাতষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি।।
পাকসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করয়ে ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর গগন।।
পাকসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে।।
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন।।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিরিবারে দুই ঠোঁট মেলে।।
রথ মধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারী হত্যা করি হব কি নারকী।।
রথ খান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া।।
লঙ্কায় বসতি আমার নাম যে রাবণ।
তোমার করিনা কোন্ শত্রু আচরণ।।

করিয়াছে রাঘব আমারে অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।।
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষীরাজ মানি পরাজয়।।
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ।।
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা।।
দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস।।
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম করিবেন পার।।
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়।।
রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিল অন্তর।।
শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।।
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
এতেক যুঝির রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা আছি যত জনে।।
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পার থাক সতর্ক অন্তর।।
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তোসবারে যারে স্থানান্তরে।।
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে।।
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ।।
সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন।।
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে।।
চারিদিকে সাগর তার মধ্যে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করে রাখিব তোমার সে সবারে।।
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার।।
তোমার সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা ল'য়ে যাই অন্তপুরী।।
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিও মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।।
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে।।
রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়িগণ।।
সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগণে।।
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন।।
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে।।
সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে।।
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস।।

জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ।।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক কানন।।
বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে।।
সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।
শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ।।
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয়।।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্র লোচন হইলেন সেইক্ষণে।।
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন।।
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে যায় তৃষ্ণা আর ক্ষুধা।।
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে।।
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কী হইবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার।।
মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধা ফল।।
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর।।
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
অরণ্যেতে গান রামশোকের নিদান।।

স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ।

—০—

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল কত দেখেন গোচরে।।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর।।
মারীচের আহ্বানে কী লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে।।
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।।
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় যে ভাই হারালাম জানকী।।
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য ধন।।
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে।।
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।

দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কতমত কত নিশাচর।।
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।।
এই বনে দুষ্টগণ রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।।
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা।।
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।।
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।।
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে।।
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে।।
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।।
উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।।
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ রাখিব না আর।।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুইবীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্যপশু পাখী।।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন।।
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে।।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছে কি লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।
বুঝি কোনো মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল গরাস।।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কী আপন দুহিতা।।
রাজ্যহীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।।

আমার সে রাজ লক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ঠ সিদ্ধ এত দিনে।।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।।
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।।
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।।
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে।।
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ।।
দেখিল যে পড়ে আছে ভগ্নরথ চাকা।
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা।।
রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে আর তার কাঁঠি।।
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।
এখানে সীতারে করহ অন্বেষণ।।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া রাখিল পর্ব্বত চন্দ্রমুখী।।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান।।
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিদ্যমান।।
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোনোমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে।।
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লয়ে অন্তরীক্ষে গেল কোনো জন।।
নানামতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।।
ধনুক দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্য্যে।।
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।।
লক্ষ্মণ চরণ ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি।।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর।।
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যেরে নাহি বধি।।
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার।।
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।।
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদনদী দেখি আর গিয়া সরোবর।।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন।।
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে।।
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক।।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ।।
যেখানে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে।।
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।।
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য-বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।।
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমে চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।।
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তার প্রাণ।।
পক্ষীরূপে আছিলি রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব একবাণে তোরে যমঘর।।
সন্ধান পুরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে।।
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ।।
দু ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলে ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে।।
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়।।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন।।
ইতঃস্তত ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ।।
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এইক্ষণ।।
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়।।
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ।।
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।।
কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে।।
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা।।
সংহারিলা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ।।
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীর।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে।।
বিশ্বশ্রবা পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।।
কোনো চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।
তব পাদদোক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের সঙ্গে।।
মৃত্যু কালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করিল গমন।।
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ।।

—o—

জটায়ু উদ্ধার

শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ।।
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ।।
তবেত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি।।

তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষীরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ।।
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ।।
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
অরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন।

রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।।
বাহিরেতে ছিলেন রাম বরঞ্চ সুস্থ।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত।।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী তীরেতে ত্যজিব এ জীবন।।
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে।।
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস।।
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইলেন ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ।।
রজনী প্রভাত হ'ল উদিত অরুণ।
সীতার উদ্দেশে রাম চলেন দক্ষিণ।।
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে।।
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন।।
বিষম কুশের বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি না জানি কি হয়।।
দুই ভাই পাশাপাশি বনে প্রবেশয়।
পথ আগুলিয়া রাখে অতি ভীমকায়।।
পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা।।
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুইজন।।
কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবে নিস্তার।।
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়।।
লক্ষ্মণ বলেন ভাই বুদ্ধি কেন্ ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি।।
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম।।
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি।।
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা।।
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন।।
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন জাতি।।
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্ব কথা কবন্ধের হইল স্মরণ।
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর।
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।।
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ।।
যখন হবেন বিষ্ণু রাম অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার।।

আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত।।
বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে।।
গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ।।
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ।।
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর।।
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন।।
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন।।
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।
যাবৎ আমার তনু না হয় সৎকার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার।।
রাক্ষস শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবেত বলিতে পারি ইহার যুকতি।।
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী।।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার।।
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন।।
পুরুষ বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।।
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমুকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে।।
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবেশ।।

প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী তীর।।
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিনী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে।।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী।।
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন।।
প্রবেশ করেন রাম মাতঙ্গ আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে।।
শবরী আনন্দ ভরি ধরিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে।।
মাতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল।।
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি।।
শবরী যখন পাবে রাম দরশন।
তখনি হইবে তব শাপ বিমোচন।।
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি।।
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাষ্ঠে।।
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিত্রে রাম চমকিত মন।।
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার।।
যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়।।
শ্রীরাম প্রসাদে তার পাপ নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস।।
শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।

৪৪.৪ সারাংশ

কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের নাম ‘অরণ্যকাণ্ড’। ‘বালকাণ্ড’ ও ‘অযোধ্যাকাণ্ডে’র পর এই কাণ্ডটি বিন্যস্ত। দেবর্ষি নারদের নিকট বাল্মীকির রামচরিত শ্রবণ দিয়ে বালখণ্ডের শুরু। দশরথের অযোধ্যায় আগমন ও মঙ্গালাচারণ, ভরতের মাতুলালয়ে গমন এবং রাম-লক্ষ্মণের পৌর কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কাণ্ডের সমাপ্তি। ‘অযোধ্যাকাণ্ডে’র শুরু রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার জন্য দশরথের সঙ্কল্প এবং শেষ রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের প্রস্থান, রামচন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ ও রাত্রিশেষে গহন কাননে প্রবেশ। ‘অরণ্যকাণ্ডে’ এই গভীর বনে প্রতিকূল অনুকূল পরিবেশে রামচন্দ্রের কর্মকাণ্ড, প্রকৃতি বর্ণনা ও মিলন-বিরহের নানা চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। চিত্রকূট পর্বতে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাতের জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

‘অরণ্যকাণ্ডে’র প্রারম্ভের এই অংশে রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং চিত্রকূট পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অবস্থানের কথা আছে। এই পর্বতে বহু মুনির বাস। তাদের কানাকানি শুনে রামচন্দ্র এর কারণাদি জানতে চায়। বৃদ্ধমুনি সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলেন। রাবণের খর ও দূষণ নামে দুই দুষ্ট নিশাচর তাঁদের সাঙ্গা-পাঙ্গা নিয়ে এই আশ্রমে প্রায়ই উপদ্রব করে। তারা যজ্ঞ নষ্ট করে, ফল-মূল কেড়ে খায়। তাদের এই অত্যাচারের জন্যই এ বন ত্যাগ করে অন্য বনে চলে যাবার পরামর্শ করছে। সীতাদেবী রূপবতী। রাক্ষসবেষ্টিত এই বনে তাকে রামচন্দ্র কী করে রাখবে? বৃদ্ধমুনি রামচন্দ্রের বিপুল শক্তির কথা জানেন, তবু বন ছেড়ে যাবার আগে এই বনে রামচন্দ্রকে সাবধানে থাকবার কথা বলে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনিগণ তাঁদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ির দিকে রওনা হন। মুনিগণ চলে যাবার পর নির্জন বনে কী করে তিনজন বাস করবেন তার চিন্তায় মগ্ন হন।

“অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ।” এই অংশে অযোধ্যা থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব বেশি নয়। ভরতের ভ্রাতৃভক্তিও অসীম, যে-কোনো সময় সে আবার এসে যেতে পারে, হৃদয় দুর্বল হতে পারে—ইত্যাদি ভেবে চিত্রকূট ত্যাগ করে রামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। অনেক পথ হেঁটে তারা উপস্থিত হন অত্রিমুনির আশ্রমে। মুনির চরণ বন্দনা করে তাঁর কাছে সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন—‘পালন করহ যেন আপন দুহিতা’। মুনিপত্নীকে দেখে সীতার মনে হলো তিনি যেন ‘মূর্তিমতী-করুণা’। সীতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলে মুনিপত্নী তাঁকে দু’হাতে আশীর্বাদ করেন। রাজ ঐশ্বর্য ও রাজকুলের মর্যাদা সব কিছু ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে আসার কথা বললে পতি ভক্তিই যে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, পার্থিব জগতের অন্য কিছুই কাম্য নয়। আজীবন পতিভক্তি যাতে অটুট থাকে সে কথা বলেন। সীতার কথায় তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নী সীতাকে অলঙ্কারাদিতে সাজিয়ে সমাদরে কাছে বসিয়ে তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে চান। মেনকাকে দেখে জনক রাজার বীর্য মাটিতে পড়ে। মাটির অভ্যন্তরে তার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙলের ফলায় সে দিবালোকে আসে। রাজা নিজের কন্যা মনে করে আমাকে সাদরে ঘরে নিয়ে যায়। এই সময় দৈববাণীতে রাজা সব কিছু জেনে এবং ঐ বাণী অনুসারে তার নাম রাখেন সীতা। প্রধান দেবীর স্নেহ-মায়ায় সীতা বড় হন। যে হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তার গলায় বরমাল্য অপর্ণ করবে সীতা—এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে। পিতার আদেশে রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন সীতা। আর ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। কুশধ্বজের দুই কন্যার সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুনি গৃহিণী সব শুনে আনন্দিত হয়ে সীতার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। বিচিত্র অলঙ্কারে তাঁকে সজ্জিত করেন। মুনির আশ্রমে পরমানন্দে রাত কাটে। পরের দিন সকালে স্নান করে তিনজন মুনির চরণ বন্দনা করেন। সেই সময় অত্রিমুনি সেই স্থানে রাক্ষসদের ভয়ানক উৎপাতের কথা বলে

তাঁদেরকে দণ্ডকারণ্যে থাকতে বলেন। মুনিকে প্রণাম করে তিনজন দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। এই বনের প্রাকৃতিক শোভায় তিনজন বিমোহিত। ফল-পুষ্প-গন্ধে ভরা ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জনে চারদিক মুখর। নানারঙ-বেরঙের পাখীর কলকাকলি চারদিকে। সরোবরে পদ্মফুলের মেলা। এই বনে অনেক মুনির বাস। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। ফলমূল আহার করে পুনরায় তিনজন বন দেখতে বেরোয়। হঠাৎ সামনে এক দুর্জয় রাক্ষসকে দেখতে পায়। তার রক্তচোখ, রাঙা মুখ, মাথায় দীর্ঘ জটা, গোটা শরীরে কাটার দাগ, দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, কাঁধে পচা মাংসের বোঝা—তার দুর্গন্ধে সবাই পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মেঘের মতো গর্জন করে। এই বিকট রাক্ষসের নাম 'বিরাধ'। এই রাক্ষস সীতাকে কোলে তুলে নেয় এবং তর্জন-গর্জন শুরু করে। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকে আজ সে ভক্ষণ করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রীরামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে রাক্ষসকে তার পরিচয় দিতে বলেন। সে বলে তার পিতার নাম 'কাল'। সে বহুমুনিকে ভক্ষণ করেছে, আজ তাদের পালা। রামচন্দ্র দিশাহারা। রাক্ষসকে বধ করার জন্য লক্ষ্মণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এরপর রাক্ষসের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সবশেষে 'ঐষিকবাণ' নিক্ষেপ করে 'বিরাধে'র দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন রামচন্দ্র। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে থাকে রক্তাক্ত খণ্ডিত রাক্ষসের দেহ। মাটিতে পতিত সীতা মূর্চ্ছা যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিরাধ রামের বাণের স্পর্শে শাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে—এজন্য রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পূর্ব জীবন-কথা বলেন। কুবের শাপেই তার এই অবস্থা। তার নাম কিশোর। সে কুবেরের চর ছিল। একদিন নারীদের মাঝে কুবের তাকে নিয়ে যায়। তাকে দেখে নারীগণ লজ্জিত হয়। ধনেশ্বর কুবের সেই মুহূর্তে তাকে অভিশাপ দেয় 'দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর'। পরে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কুবের বলেন যে শ্রীরামের শরেই তার শাপমুক্তি ঘটবে। রামচন্দ্রকে দর্শন করে তার শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিরাধ তার দেহকে অগ্নিতে দাহ করতে বলে। লক্ষ্মণের উদ্‌যোগের দানবের দেহ পুড়ে ছাই হল এবং বিরাধ দিব্য দেহ ধারণ করে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গারোহণ করে।

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন ঃ চৌদ্দজন বীর রাক্ষসকে শ্রীরামের তীরে নিহত হতে দেখে ভয়ে সূর্পণখা খরের কাছে গিয়ে সব জানায়। খর উত্তেজিত হয়ে বলে, 'ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ" চৌদ্দ হাজার নিশাচরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে স্বর্ণরথে চড়ে খর-দূষণ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এক গুহায় রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়ে রাম একাই বিশাল রাক্ষস দলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলে এই যুদ্ধ দেখে। রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলে রাক্ষসগণ। খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়ের দেহ রক্তাক্ত। সহস্রবাণ, গন্ধর্ব অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা শত শত রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। বাকী শুধু খর ও দূষণ। শূলের দ্বারা রাম দূষণের দুই হাত কেটে ফেলে। তারপর দূষণের মৃত্যু হয়। দূষণের ও অন্যান্য বীর রাক্ষস সৈন্যদের মৃত্যু দেখে খর সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামচন্দ্রের উপর। নানা অস্ত্র ও তীরের দ্বারা রাম একে একে খরের হাতে ধনুর্বাণ ও তার রণধ্বজ পতাকাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং রথের আটটি ঘোড়াকে নিহত ও সারথীর মুণ্ডকে ছেদন করে। এরপর খর গদাযুদ্ধ শুরু করে, ত্রিভুবনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিবাণের দ্বারা খরের গদা ধ্বংস হয়। শেষ অস্ত্রহীন খর তীক্ষ্ম দাঁত দিয়ে রামচন্দ্রকে কামড় দিতে গেলে ঐষিক বাণের দ্বারা খর ধরাশায়ী হয়। চোদ্দ হাজার রাক্ষস সহ খর-দূষণের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য দেবগণ তুষ্ট হন। রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে সীতার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যায়। রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখে সূর্পণখা ভয়ে ও দুঃখে লঙ্কায় পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সব কিছু খুলে বলে। সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার কথাও বলে। সীতার রূপ সৌন্দর্য, সে রাবণের কাছে তুলে ধরে। রাবণই তার উপযুক্ত বলে রাবণকে উত্তেজিত করে। সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণকে ধোঁকা দিয়ে সীতাকে হরণ করে আনবার জন্য পরামর্শ দেয়। সুন্দরী সীতার কথা রাবণ মনে মনে ভাবতে থাকে এবং কিভাবে তাকে হরণ করা যায় তার চিন্তায় মগ্ন হয়।

'সীতাহরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ'— অংশে দেখা যায় পুষ্পক রথে চড়ে রাবণ মারীচের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। রাবণকে দেখে মারীচ ভয় পায়। দণ্ডকারণ্যে নিশাচর রাক্ষসদের রামচন্দ্র কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে সে সব খুলে বলে। ভাই-দূষণ-খরও বেঁচে নেই। বলশালী মারীচ থাকতে এ কলঙ্ক রাবণ সহ্য করতে পারছে না। সূর্পণখার নাক-কান কেটে দেবার জ্বালাও প্রকাশ করে। চরম বিপদে পড়েই রাবণ মারীচের শরণাপন্ন হয়েছে। তাই প্রতিশোধের জন্য সীতা হরণের কথা তুলে ধরে। মারীচ এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না, বরং সীতাকে হরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে রাবণের বংশ ধ্বংস হবে—এই ভবিষ্যৎবাণীও করে। রাবণ তাতে কর্ণপাত না করে মারীচকে সোনার হরিণের বেশ ধারণ করতে বলে। কিন্তু মারীচ এর ভয়ংকর ফলাফলের কথা তুলে ধরে সীতার প্রতি লোভ পরিত্যাগের জন্য রাবণকে অনুরোধ করে। কিন্তু তার পরামর্শে কর্ণপাত না করে রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়।

'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান'—অংশে বারংবার মারীচ সীতাহরণ থেকে রাবণকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সৎ পরামর্শ দিলে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করবে বলে গর্জন করে। শুধু তাই নয় 'দেব পঞ্চানন'ও যদি নিষেধ করেন রাবণ তাও গ্রাহ্য করবে না বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং মারীচকে মায়ামৃগ সেজে রামকে কুটীর থেকে বনের গভীরে আনতে পরামর্শ দেয় এবং রামহীন শূন্য কুটীর থেকে সে সীতাকে হরণ করবে বলে জানায়। সীতাহরণ অত সহজ নয়। রামচন্দ্রকে মায়ায় বুলিয়ে আনলেও লক্ষ্মণ সীতাকে পাহারা দেবে। লক্ষ্মণ থাকা অবস্থায় সীতা হরণ অসম্ভব। এই সব প্রতিকূল অবস্থার কথা জেনে শুনেও সীতাহরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে বলে মারীচ এই কুকর্ম থেকে রাবণকে নিরস্ত করার জন্য সুমন্ত্রণা দেয়।

'মারীচের মৃগরূপধারণ'—অংশে দেখা যায় সূর্পণখা রাবণকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে যায় মারীচ সহ। সেখানে মারীচকে মৃগরূপ ধারণের নির্দেশ দিলে নিরূপায় মারীচ বিচিত্ররূপে স্বর্ণছটায় দেহকে সজ্জিত করে। তার নয়ন লোভন স্বর্ণরূপ দেখে রাবণ আনন্দিত হয়।

'মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ'—অংশে দেখা যায় রাবণ অরণ্য মধ্যে লুকিয়ে আছে আর বনভূমি আলোকিত করে স্বর্ণ মৃগরূপী মারীচ রাম-সীতার সামনে হাজির। রাক্ষসবংশ ধ্বংস ও দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই যেন বিধাতার নির্দেশেই এই স্বর্ণ মৃগের নির্মাণ। সীতা এই হরিণকে চায়। তার সোনার চর্মে উপবেশনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মায়াবী রাক্ষসদের কথা লক্ষ্মণ তুলে ধরে। মায়ার জাল বিস্তার করে তাদের সর্বনাশের জন্য এই মায়ামৃগের আগমন ঘটেছে বলে লক্ষ্মণ সংশয় প্রকাশ করে। সব কিছু শুনেও রামচন্দ্র সীতার মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য মৃগ হত্যার জন্য বের হন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে সীতা রক্ষার দায়িত্ব দেন। মারীচের উভয়সংকট। তার মৃত্যু হয় রাম নয় রাবণের হাতে। তবে রামের হাতে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সে। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। মারীচের মায়ারূপ ধরতে পেরে রাম 'ঐষিক বিশিষ্ট' বাণ নিক্ষেপ করে। আহত মারীচ মৃত্যুর আগে রামের কণ্ঠস্বর নকল করে লক্ষ্মণকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু বরণ করে। রামচন্দ্র সমগ্র ছলনা বুঝতে পেরে কুটীরের দিকে দ্রুত গমন করেন।

'রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ'— অংশে রামের কণ্ঠস্বর শুনে সীতা দেবর লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে যাত্রার জন্য করুণ মিনতি করে। লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না, রামচন্দ্রকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বলাতে দিশেহারা সীতা কটু বাক্য প্রয়োগ করে।

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।

আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।" —লক্ষ্মণ ভাই এর উদ্দেশ্যে না গেলে সীতা আত্মহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়। মন না মানলেও সীতার দুঃখ-বেদনা বুঝতে পেরে গণ্ডী কেটে তার বাইরে যাতে সীতা না যায় তার নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই সুযোগের তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ কুটীর দ্বারে হাজির। সীতার রূপ মাধুর্যে রাবণ মুগ্ধ। রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এলে ফলমূল দিয়ে অতিথি সৎকারের কথা সীতা বলে। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়ও দেয়। ভণ্ড তপস্বীরূপী রাবণ সীতাকে কুটীরের বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে বলে। প্রভুর আদেশ ছাড়া সীতা বাইরে আসতে অস্বীকার করলে ধর্ম-কর্মের কথা বলে সীতাকে প্রলুব্ধ করে। সহজ সরল মনে সীতা লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে ফল তপস্বীকে দিতে গেলে রাবণ তার হাত ধরে ফেলে এবং স্বমূর্তি ধারণ করে। সীতা রাবণকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। রাবণ তার মনোবাসনার কথা বললে সীতা তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। এদিকে ভীষণ রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে জোর করে সীতাকে রথে ওঠায় অসহায় সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, বনের গাছ-পালার উদ্দেশ্যে তার করুণ আবেদন— তার এই অসহায় অবস্থার কথা যেন রামকে তারা জানায়। দুচোখে অশ্রুবন্যা। দ্রুতগতিতে রথ ধাবিত। আকাশ পথে জটায়ু পাখী পথ রোধ করে। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের মহাযুদ্ধ শুরু। বত্রি হাজার বাণে ক্ষতবিক্ষত জটায়ু তবু প্রাণপণে যুদ্ধ করে। 'অর্দ্ধচন্দ্র' বাণে তার দুটি পাখা বিচ্ছিন্ন হয়। সীতা তাকে রাবণের এই কুকর্ম বার্তা পৌঁছে দিতে বলে। জটায়ু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

'তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।'

আকাশ পথে যাবার সময় সীতা তার দেহের অলংকারদি মাটিতে ছড়িয়ে দেন। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর উদ্দেশ্যে সীতার কাতর বাণী ধ্বনিত।

পথিমধ্যে জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র 'সম্পাতিনন্দনে'র সঙ্গে দেখা। দুই পাখা দিয়ে সে রাবণের রথকে ঢেকে দেয়। সে জানতে পারেনি জটায়ুর অন্তিম দশার কথা। রাবণ তাকে সূর্পণখার কথা, খর-দূষণের হত্যার কথা বলে। সীতা হরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে সুপার্শ্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। অসীম সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাবণ সীতাকে অশোক কাননে বন্দিনী করে রাখে। সীতার দুঃখে দেবগণ দুঃখিত। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র অশোক কাননে গিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেয়—

'সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।'

সীতাকে পরমান্ন দিয়ে এবং প্রতিদিন সুধা ফল দিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন ইন্দ্র। অশোক কাননে একাকী বন্দিনী সীতা—আর পঞ্চবটী বনে সীতাশূন্য কুটীরের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠায় রামচন্দ্রের যাত্রা।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'-

হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে পথে অমঙ্গালের নানা চিহ্ন দেখে রামচন্দ্রের মনে জেগেছে নানা চিন্তা। মারীচের কপট আহ্বানে লক্ষণ কি সীতাকে একলা রেখে রামের খোঁজে বের হয়েছে? সীতাকে দেবতাগণ যেন রক্ষা করেন। বিধাতা কি দুঃখের উপর দুঃখ দিবে? ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে রাম যখন দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। সীতাকে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যে একা রেখে লক্ষ্মণের আগমনে সীতার জীবনে নেমে এসেছে

দুর্যোগ। একথা নিশ্চিতভাবে ঝুঁকি দেওয়ামাত্র একদিকে কর্মফল অন্যদিকে লক্ষ্মণকে বুদ্ধিনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন রাম। মারীচের মৃতদেহ দেখিয়ে দুইভাই অতিদ্রুত কুটীর দ্বারে উপস্থি হলেন। 'সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।' কোনো উত্তর না পেয়ে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত প্রায়। পাগলের মতো দুই ভাই তন্ন তন্ন করে বনে, গোদাবরী তীরে সীতাকে খুঁজে বেড়ান। সীতাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে শ্রীরামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখেন। বনের পশু-পাখি, বনের মুনি-ঋষিগণ এসে তাঁকে প্রবোধ দেন। তাঁর মুখে শুধু 'সীতা, সীতা'। সীতার শোকে অস্থির রামচন্দ্রকে ভাই লক্ষ্মণ ভূমি থেকে তুলে কোলে নেন। ভাই-এর উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আর্তনাদ—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।"

রামচন্দ্রের মনে হয়—হয়তো সীতা মুনিপত্নীদের কাছে গেছেন, হয়তো গোদাবরী তীরের কমল কাননে লুকিয়ে আছেন, হয়তো বা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। অথবা মা বসুন্ধরা রাজ্যহারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সীতাকে নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখছেন। তাঁর জীবনে সীতাই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র 'মনীহারা ফণী।' ভাই লক্ষ্মণের কাছে তার কাতর আবেদন—যে করেই হোক সে যেন সীতাকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর জীবন বাঁচায়। সীতাহীন তপোবন শূন্যময়। পশু-পাখি-বৃক্ষ সবাইকে ডেকে ডেকে সীতার অনুসন্ধান করার সময় সীতার ভূষণ ও অলংকারাদি, রথের চূড়া, চাকা ইত্যাদি দেখে সেই স্থান ভালভাবে দেখবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলে। সামনে সুউচ্চ পর্বতের আড়ালে সীতা থাকতে পারে ভেবে রামচন্দ্র ধনুর্বাণে পর্বতকে ধূলিসাৎ করতে চাইলে লক্ষ্মণ তা বারণ করে। সীতাহারা পাগল প্রায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ নানাভাবে প্রবোধ দিতে গেলেও শোকাকুল রামচন্দ্র তার কথা শুনতে চান না। সীতার জন্য সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্যোগ নিলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত করে। একের অপরাধে অন্যে কেন ধ্বংস হবে? অনেক বোঝানোর পর দুই ভাই মিলে সীতার অনুসন্ধানে পথ চলতে শুরু করেন। পথে নদী-গিরিকে সীতার খোঁজ দেবার জন্য রামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে অনুরোধ জানায়। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছে নিশাচর রাক্ষস পাখীর বেশ ধরে সীতাকে ভক্ষণ করেছে। তাই তাকে হত্যা করার মূহুর্তে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত জটায়ু রামচন্দ্রকে বলে। শূন্য কুটীর পেয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় চলে গেছে। জটায়ু রামচন্দ্রের আশায় বহুক্ষণ তার রথের গতিপথ আটকে যুদ্ধ করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। দশরথ জটায়ু মিত্র নিজের পরিচয় দিলে রামচন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং রাবণ কেন সীতাকে হরণ করলো সেকথা শুনতে চান। চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ, সূর্পণখার নাক-কান কাটার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সমুদ্রতীরে লঙ্কায় মহাতেজস্বী লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে নিয়ে গেছে। তবে জটায়ু রামকে চোখের জল মুছে চিন্তা দূর করতে বলে। স্পষ্টভাবে আশার বাণী শুনায়—

"কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।"

তারপর শ্রীরামচন্দ্রের চরণামৃত মুখে নিয়ে সব দোষকে নাস করে জটায়ু পরলোকগমন করে। রাম-লক্ষ্মণ তার বন্দনা করেন। দিব্যরথে জটায়ু স্বর্গারোহণ করে।

জটায়ু উদ্ধার'—অংশে পিতৃতুল্য জটায়ুর শবদেহের সৎকার এবং গোদাবরীর জলে রাম-লক্ষ্মণ তর্পণ করেন। রামচন্দ্রের দর্শনেই জাটায়ুর স্বর্গবাস হলো।

'কবন্ধ ও শবরীর স্বর্গে গমন'— রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসেন শূন্য কুটীরে। রামচন্দ্র শূন্য ঘরে কেঁদে কেঁদে সারা—চোখে তার ঘুম নেই. ভোর হতেই দু-ভাই সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কুশ বনে ভয়ংকর নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা দেয়। এক বিদ্ঘুটে বিশালদেহধারী কবন্ধ তাঁদের পথ আটকায় এবং দুজনকে ভক্ষণ করবে বলে জানায়। কবন্ধ তাঁদের পরিচয় জানতে এবং কেন এই বনে প্রবেশ করেছে তা জানতে চায়। এ সবের কোনো উত্তর না দিয়ে দু-ভাই কবন্ধের দুই হাত কেটে ফেলে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তাদের পরিচয় আবার জানতে চায়। লক্ষ্মণ নিজেদের বংশ পরিচয় ও বনে আসার কারণ বলার পর কবন্ধের পূর্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। তার নাম ছিল কুবের। রূপের অহংকার তার ছিল। মুনির শাপে তার রূপ নষ্ট হয়। তবে বিষ্ণুর অবতার রামের বাণস্পর্শে আমার মুক্তি ঘটবে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বজ্রাঘাত করলে তার হাত ছাড়া অন্য অঙ্গাগুলি উদরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার গতিশক্তি নেই। দুইহাতই একমাত্র সম্বল। তবে রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে আজ ধন্য। রামচন্দ্র তার কাছে সীতার সংবাদ জানতে চাইলে তার দেহের সৎকার আগে করতে বলে। দুই ভাই মিলে সযত্নে কবন্ধের দেহ সৎকার করলে আগুনের ভিতর থেকে অদ্ভুত আকারের জীব আকাশে উঠতে উঠতে দেবমূর্তি ধারণ করে রামের উদ্দেশ্যে বলে তাঁরা যেন ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের কাছে যায়। রামচন্দ্রকে দর্শনের ফলে কবন্ধের স্বর্গবাস হয়। কুশবনে রাত কাটিয়ে দু-ভাই ভোরবেলা পম্পা নদীতীরে যান। সেখানে পক্ষী-পক্ষিণী, মৃগ-মৃগী, রাজহংস-রাজহংসী মিলনান্দে বিভোর। এদের মিলন মধুর জীবন দেখে রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র রূপ নেয়। তিনি মৃগ পাখীদের ডেকে ডেকে সীতা কোথায় জানতে চান। দুঃখ-দহন জর্জরিত মন ও দেহ নিয়ে পম্পাতে স্নান ও তর্পণাদি করে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র যাত্রা করেন। মাতঙ্গ আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র শবর-শবরীর আনন্দ আর ধরে না। এতদিন ধরে তারা মাতঙ্গ মুনির সেবা করেছে। মুনি বৈকুণ্ঠধামে চলে যাবার আগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে আসবেনই বলে গেছেন। শ্রীরামের দর্শনের পর শবরীর শাপমোচন হবে। সে নিজেই অগ্নিকুণ্ড রচনা করে সে তাতে প্রবেশ করে। শ্রীরামের প্রসাদে শবরীর স্বর্গধামে যাত্রা। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস অরণ্যখণ্ডের সমাপ্তিতে লিকেছেন—

"শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।'

৪৪.৫ সার সংক্ষেপ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৭টি কান্ডে সমাপ্ত। কাণ্ডগুলি হলো—আদি কাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। অরণ্যকান্ডে 'চিত্রকূট পর্বতে' শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান'—দিয়ে শুরু এবং 'অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ', শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন, ' 'দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমনান্তর, পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষস বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধে আগমন,' শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসহ দূষণ ও খরের মৃত্যু,' 'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান,' মারীচের মৃগরূপ ধারণ,' 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'—এই কয়েকটি ঘটনা চিত্রের সন্নিবেশ দেখা যায়। এই খন্ডের সার সংক্ষেপ হল—চিত্রকূট পর্বতে রাম-সীতা লক্ষ্মণের অবস্থান। মুনিদের কাছে রাক্ষসদের উৎপাত সম্পর্কে নানাকথা শ্রবণ। রাম-সীতা লক্ষ্মণেব প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে এবং সাবধানে থাকবার পরামর্শ দিয়ে মুনিদের বনত্যাগ। রামচন্দ্র গভীর ভাবনায় ভাবিত। এরপর অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের

গমন। সেখানে মুনিপত্নী সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করেন। সীতার কাছ থেকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে সীতাকে সস্নেহে কোলে তুলে নেন। অভিশপ্ত বিরাধের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিরাধের রামের হাতে মৃত্যুতে অভিশাপ মোচন ও তার স্বর্গারোহণ। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন। তাঁকে দেখে মুনি খুবই তুষ্ট। রামচন্দ্রের হাতে ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দিয়ে মুনির স্বর্গারোহণ। দীর্ঘ দশবছর বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পঞ্চবটী বনে আগমন। বনে ভ্রমণকালে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। ইল্বল-বাতাপি এই দুই মায়াবী রাক্ষসের জীবনবৃত্তান্ত ও মৃত্যুকাহিনী রামচন্দ্র শোনেন। অগস্ত্যমুনি তাঁকে গোদাবরী নদীতীরে সুশোভিত পঞ্চবটী বনে বাস করতে বলেন। অগস্ত্যমুনির আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পথে জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের দেখা। এই জটায়ু তাঁদের পঞ্চবটী বনে নিয়ে যায়। এই বনের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। লতা-পাতা দিয়ে কুটীর নির্মাণ। পঞ্চবটীবনে তিনজনে সুখে দিনযাপন করছিলেন। হঠাৎ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার আবির্ভাব। প্রথমে রামকে পতিরূপে পাবার জন্য তার অনুনয় বিনয়। পরে লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাবার জন্য শত চেষ্টা। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাক্ষসী সীতাকে গিলে খেতে যায়। তখন লক্ষ্মণ তীর নিক্ষেপ করে তার নাক কান কেটে দেয়। ক্রোধে দিকহারা হয়ে সূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে বলে। সুর্পণখার অবস্থা দেখে তার কান্নাকাটি শুনে দুই রাক্ষস সেনাপতি রাম-লক্ষ্মণকে হত্যার জন্য ছুটে যায়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। চোদ্দশ রাক্ষস সৈন্য ও খর-দূষণ প্রচণ্ড যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সূর্পণখার রাবণের কাছে গমন। প্রেম প্রত্যাখ্যান ও নাক-কান কেটে দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্পণখা সীতার রূপ-মাধুর্য তুলে ধরে রাবণকে কামনা বাণে বিদ্ধ করে সীতাদেবীকে হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় রামচন্দ্রের হাতে চোদ্দহাজার রাক্ষস ও খর-দূষণের মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। রাবণ-সূর্পণখার প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সীতাহরণের ব্যাপারে মারীচের কাছে যায়। মারীচ তাকে এই কু-পথে যেতে শত বারণ করে, অনেক সুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু রাবণ সব যুক্তি নস্যাৎ করে সীতাহরণের ব্যাপারে অটল থাকে এবং এই কাজে মারীচ সম্মত না হলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়। মারীচ বাধ্য হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে। সোনার হরিণ দেখে সীতা প্রলুব্ধ হয় এবং রামচন্দ্রকে এই মৃগ ধরে আনতে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় সীতা ও লক্ষ্মণকে সাবধান করে। মায়াবী মারীচের রামের মতো কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ শুনে সীতা-লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে পাঠায়। লক্ষ্মণের সীতাকে একাকী রেখে যাবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু সীতার নানা কটূক্তি শুনে গণ্ডী এঁকে তার বাইরে যেতে সীতাকে বারণ করে। লক্ষ্মণ চলে যাবার পর, তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ও অভিনয়। তার অভিনয়ে ভুলে এবং গার্হস্থ্য ধর্মরক্ষা করার জন্য গণ্ডী পেরিয়ে ভিক্ষা দান। মূহুর্তে সীতাকে অপহরণ করে রাবণের আকাশপথে গমন। সীতার বক্ষভেদী আর্তনাদ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত গাছপালা পশু-পাখী সকলের উদ্দেশ্যে তার আকুল আবেদন—তারা যেন এই দুঃসংবাদ রামচন্দ্রকে দেয়। পথে জটায়ুর সঙ্গে তুমল যুদ্ধ। রক্তাক্ত জটায়ু পাখীর অবরোধ চূর্ণ। রক্তাক্ত জটায়ুর কাছ থেকেই রামচন্দ্র সীতাহরণের ঘটনা জানতে পারে। সীতাহীন শূন্য কুটীরে এসে রামচন্দ্রের বিলাপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস-বনানী-বেদনা-বিধুর। পাতি-পাতি করে পর্বতের গুহাদি, গোদাবরীর তীরভূমি, বনভূমি খুঁজে খুঁজে রামচন্দ্র দিশেহারা। হঠাৎ কবন্ধের সঙ্গে দেখা। তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটান রামচন্দ্র। আগুনে তার দেহদাহের পর আগুনের শিখা থেকে আকাশে এই অভিশপ্ত মুক্ত রাক্ষস চলে যাবার সময় রামচন্দ্রকে ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলে। তার সাহায্যেই সীতা উদ্ধার হবে। এই ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এরপর রাম-লক্ষ্মণ কুশের বনে প্রবেশ করে। পম্পা নদীতে স্নান করে দুই ভাই মাতঙ্গ আশ্রমে যান। সেখানে রামদর্শনে শবরীর শাপমুক্তি ঘটে। আর দুই ভাই সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শবরীর মুক্তি ও শ্রীরামচরিত্রের গুণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি।

৪৪.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ

(ক) প্রকৃতি চিত্র ঃ কোমল পেলব শস্য-শ্যামল বাংলার প্রকৃতি চিত্র বাংলা সাহিত্যে যুগে নানারূপ যুগে বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীনযুগে চর্যাপদে, আদি মধ্যযুগে কৃষ্ম কীর্তনে এবং অন্ত্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য শাখায়, বৈষ্ম্ব পদাবলীতে ও মঙ্গলকাব্য ধারায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আপনারা কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' এই প্রকৃতি চিত্রের মনোরম রূপ দেখতে পাবেন। আদি কবি মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে প্রকৃতি বর্ণনায় বিস্তৃতি দেখা যায়। অনুবাদক কৃত্তিবাস মূল মহাকাব্যের মতো প্রকৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য বৈভব রূপ তুলে না ধরলেও এই খণ্ডের কয়েকটি অংশে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শকে সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই অংশের কয়েকটি স্থানের প্রকৃতি চিত্রণের রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি প্রেমিক কৃত্তিবাসকে আপনারা চিনতে ও জানতে পারবেন।

দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা ঃ অত্রিমুনির কণ্ঠে শোনা যায়—

"অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান.
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।"

এই অতিরম্য স্থান' অংশটির মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস আমাদের হৃদয় গভীরে দণ্ডকারণ্য বনভূমির সৌন্দর্যের প্রতি ঔৎসুক্য বোধ জাগ্রত করেছেন।

অত্রিমুনির চরণধূলি নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দণ্ডক কাননে প্রবেশ করেন। আগে রাম, মধ্যে সীতা ও পশ্চাতে লক্ষ্মণ। অরণ্য ভূমি ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ। এ সবের গন্ধে বনভূমি আমোদিত। অবাধ উন্মুক্ত বনে ময়ূর-ময়ূরী প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেকাধ্বনিতে চারদিক মুখর। ফুলের মধু আহরণের জন্য ভ্রমরের দল গুঞ্জনে বনভূমি ভরিয়ে দিয়েছে। রঙ-বেরঙের নানাপাখী গাছের ডালে ডালে বসে, এদিক-ওদিক উড়ে বনভূমিকে মধুর কলরবে মুখর করে তুলেছে। বনের সরোবরে অগণিত পদ্মফুল যেন হাসিরাশির খেলা বসিয়েছে। এই বনের জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, ফলগুলি রমণীয় শুধু নয়—উভয়ই সুস্বাদু।

বাল্মীকির রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের তাপসগণের আশ্রমের পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে মহাকবি প্রকৃতির স্পর্শ এনেছেন। এছাড়া বনমধ্যে প্রবেশের পর বনানীর দৃশ্য সজ্জায় হরিণ, বাঘ, ভালুকের অবাধ বিচরণ ছিন্ন তরুগুল্ম, ঝিল্লিরব এনে শঙ্কার ভাব জাগিয়েছেন। এই সব বর্ণনা অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই।

পঞ্চবটী বন ঃ 'পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।' রামচন্দ্রের এই সুখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পঞ্চবটী বনের প্রকৃতি চিত্র। এই অংশে গোদাবরী নদী ও তার তীর বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতির কোলে নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ থাকবার জন্য মনস্থ করেন।

গোদাবরী নদীর দুই তীর 'শ্বেত-পীত-লোহিত' ইত্যাদি নানারঙের পাথরে ভরা। সূর্যের আলোয় এইসব পাথর থেকে নানারঙ ঠিকরে বের হয়। কুটীরের খুব কাছে বিস্তৃত ঘাট। ঘাটটি নানা ফুলে সুসজ্জিত। ফুলের মধু পানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ছুটে আসে। তাদের গুঞ্জন ধ্বনিতে পরিবেশ মুখর। কুটীরের দ্বার প্রান্তেও নানাফুলের ডালি। সবুজ লতাপাতা ঘেরা কুটীরটি মনোহর।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে. হেমন্তকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না

স্নাত বন হিমে ম্লান হয়েছে। এরূপ প্রকৃতির বিপরীত-চিত্র সীতার মধ্যে মহাকবি দেখেছেন। বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য, সোনার ধান কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শীতকালীন প্রকৃতি দৃশ্য অনুপম। এমনটি কৃত্তিবাসের লেখায় নেই।

পম্পা নদী ঃ কুশবনে রাম-লক্ষ্মণ প্রবেশ করে ভোর হতেই দু-ভাই পম্পা নদীতীরে উপস্থিত। সেখানে—

‘কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।’

এই অংশে কৃত্তিবাস পম্পানদীতে অনাবিল প্রকৃতির বুকে অনাবিল মিলন আনন্দের চিত্রের পাশাপাশি সীতা-হারা রামচন্দ্রের বিরহ বেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈসাদৃশ্য চিত্রকল্প এখানে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছে তা কাব্যগুণে ভরা।

বাল্মীকির বর্ণনায় পম্পা সরোবর স্বচ্ছ স্ফটিকের রূপ পেয়েছে। নদীটিতে শত শত পদ্মফুল বিকশিত, দুই তীরে কোমল বালুকারাশি, মাছ ও কচ্ছপ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর বুকে নানারঙের জলজ ফুল। নদীর দুই তীর তিলক, অশোক, বকুল প্রভৃতি গাছে ভরা। সখীর মতো লতা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। মালতী, কুন্দ, অশোক, কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের গাছ। আমগাছগুলি মুকুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি জগত মধুর মিলনের কেন্দ্রস্থল।

(খ) যুদ্ধ বর্ণনা ঃ কৃত্তিবাসের ‘অরণ্যখণ্ডে’ বহু যুদ্ধের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ‘বিরাধ বধ’, ‘খর-দূষণের যুদ্ধ’ রাবণের সঙ্গো জটায়ুর যুদ্ধ’—বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রতিটি যুদ্ধে কৃত্তিবাস ভিন্ন স্বাদে বীর রসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাণ্ডটিতে যুদ্ধের ঘনঘটা থাকলেও বৈচিত্র্যের জন্য একঘেয়েমি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পটভুমিকায় যুদ্ধগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

বিরাধ বধ ঃ দণ্ডকারণ্যের অত্রিমুনির আশ্রমে আহারাদি শেষে মুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মনের আনন্দে দণ্ডাকারণ্যে ভ্রমণকালে বিকট আকৃতির দুর্জয় রাক্ষস বিরাধের উপস্থিতি। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

“রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ’রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।”

এখানেই শেষ নয়, মাথায় লম্বা জটা, অস্থিসার দেহে দুর্গন্ধ, কণ্ঠে মেঘের গর্জন ইত্যাদি। এই বর্ণনায় প্রতিপক্ষ বিরাধের ভয়ংকরতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। এই রাক্ষস হুঙ্কার ছাড়ে—

“..........আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।”

বহু মুনিকে বধের কথা বলে সে বীভৎস রস সৃষ্টি করেছে। সীতাকে বগলদাবা করে নেয়। দুই ভাইকে আক্রমণের জন্য ছুটে আসে। শ্রীরামচন্দ্র বিরাধের মূর্তি ও হুঙ্কার শুনে ভয় পান। লক্ষ্মণ তাঁকে সাহস জোগায়। রামচন্দ্র প্রথম সাত বাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাতে রাক্ষসের কিছুই হয় না। বিরাধ বিশাল জাঠা গাছ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে

ছুঁড়ে দেয়, তা দেখে রাম একটি তীর নিক্ষেপ করে। তাতে জাঠা গাছ খান খান হয়। নিশাচরের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সে আকাশে উঠে যায়। রামচন্দ্র ‘ঐষিক বাণ’ নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে রাক্ষস ভূমিতে পতিত হয়। তার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত। গোটা দেহ রক্তাপ্লুত। এখানেই যুদ্ধ শেষ। পরবর্তী কাহিনী শাপমুক্তির কাহিনী।

শিহরণ জাগানো যুদ্ধ বর্ণনা সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। রাক্ষসের ভীষণ রূপ বর্ণনায় শব্দ চয়নের যথার্থতা লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ভীত হওয়ার কার্য-কারণও রয়েছে সীতাদেবীর কবলে পড়ার মধ্যে। লক্ষ্মণের সাহসিকতা, দাদাকে উদ্বুদ্ধ করার বর্ণনায় লক্ষ্মণের চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।

খর-দূষণের যুদ্ধ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে খর-দূষণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে আছে। সূর্পণখার কাছে রামকর্তৃক চোদ্দজন রাক্ষসের মৃত্যুর কথা শুনে খরের গর্জন—

“............দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।”

এরপর খর ও দূষণ চোদ্দ হাজার নিশাচর রাক্ষস সহ রাম-লক্ষ্মণকে শায়েস্তা করে সূর্পণখার মনের জ্বালা জুড়াতে যাত্রা করে। আটঘোড়ার রথে চড়ে খরের যুদ্ধ যাত্রা। দূষণের গর্জন—‘রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ’ রাক্ষস সৈন্যের কোলাহল শুনে রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সীতাদেবীকে সরিয়ে নেবার কথা লক্ষ্মণকে বলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করে। এবার যুদ্ধ শুরু। একদিকে রামচন্দ্র একাকী অন্যদিকে চোদ্দহাজার রাক্ষস। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলেই এই যুদ্ধ দেখতে আসে। দূষণের হুংকার, অন্যদিকে রামচন্দ্রের মৃদু হাসি। হাজার হাজার রাক্ষস রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলেছে। কবির দৃষ্টিতে এ দৃশ্য বর্ণিত—

‘‘বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।”

খর ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু। খর ও রামচন্দ্র উভয়েই একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। দু’জনেই বাণে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত। ‘সহস্রবাণে’র আঘাতে ছয় হাজার রাক্ষস মারা যায়। একমাত্র জীবিত খর। দূষণ এই দৃশ্য দেখে শ্রীরামের প্রতি মহাশূল নিক্ষেপ করে। রামচন্দ্রের বাণে শূলসহ দূষণের দুহাত ছিন্ন হয়। রক্তাক্ত দূষণ মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং “জ্বালায় দূষণ ত্যজিল পরাণ।”

দূষণের মৃত্যুর পর খর ভেঙে পড়ে। তার দুচোখ জলে ভরা। প্রতিশোধের জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। খর ও রামচন্দ্রের যুদ্ধ কৃত্তিবাসের ভাষায়—

“রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।”

উভয়ে উভয়ের প্রাণ হরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শরভঙ্গের কাছ থেকে, ধনুর্বাণ রামচন্দ্র পেয়েছিলেন। বাণ নিক্ষেপ করে খরের ধনুককে রামচন্দ্র টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অন্য আর একটি ধনুক নিয়ে খর একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। নানা অস্ত্রে দশ দিক ঝলসিত। অগস্ত্যমুনি প্রদত্ত ধনুকের সাহায্যে রাম পুনরায় খরের ধনুর্বাণ কাটেন। তার রণধ্বজ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করেন। একে একে খরের রথের সারথি ও রথের আটটি ঘোড়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খর মন্ত্রপূতঃ গদা নিয়ে ধেয়ে যায়। গদার আগুন নেভানোর জন্য রামচন্দ্রের

বাণ নিক্ষেপ। তবু

"অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।"

শেষে অগ্নিবাণের দ্বারা এই আগুন নেভে। এরপর বাণে বাণে খরের শরীর হয় জর্জরিত। তার হাতে আর কোনো অস্ত্র না থাকাতে শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খর রামচন্দ্রকে কামড়াতে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণে'র দ্বারা খরকে দ্বিখণ্ডিত করে। খরের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় দেখা যায়—

"বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।

বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে ঐষিকবাণের আঘাতেও পর্বতসম বিপুল খরের দেহ খণ্ডিত হয়ে ভূতলে লুটায়।

খরের সঙ্গো রামচন্দ্রের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রোমাঞ্চকর করে কৃত্তিবাস রামের বীর্য মহিমাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, উৎকণ্ঠা, গতি অক্ষুণ্ণ রেখে রামচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

জটায়ুর সঙ্গো রাবণের যুদ্ধ ঃ আকাশপথে সীতাকে হরণ করে রাবণ যখন রথেই লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবিত তখন সীতার বক্ষভেদী আর্তিতে আকাশ বাতাস বেদনায় ম্লান। রাবণের রথ যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত ঠিক সেই সময় 'গরুড় নন্দন' জটায়ু সীতার বুক ভাঙা কান্না শুনে আকাশে উড়ে চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। তারপর রাবণের রথকে চিনতে পেরে জটায়ু—

"দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণের গালি দিয়া মারে পাখসাট।।"

তার পাখার ঝাপটানিতে রাবণ দিশেহারা। জটায়ু পাখী সীতা হরণের অপরাধের জন্য রাবণকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দেয় এবং তীব্র ঘৃণায় বলে—

"কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।"

একদিকে পাখার আঘাত অন্যদিকে গালা-গালি দিয়ে রাবণকে জর্জরিত করে। তুমুল যুদ্ধ চলে। জটায়ু ছোঁ মেরে রাবণের পিঠের মাংস খুবলে নেয়। নখের আঁচড়ে ও ঠোঁটের কামড়ে রাবণের রথ ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা সে সারথির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রণধ্বজা টুকরো টুকরো হয়। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ নিরুপায় হয়ে সীতাকে ভূমিতে রেখে আকাশে উঠে। জটায়ু শ্রান্ত-ক্লান্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই দেখে রাবণ ভগ্ন রথকে আবার নূতন করে সাজায় এবং সীতাকে পুনরায় রথে তুলে নেয়। তা দেখে জটায়ু দ্বিতীয়বার রাবণের সঙ্গো 'মহাযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধ ভয়ংকর। পরের জন্য জটায়ু কেন প্রাণ দিচ্ছে—একথা বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করলে ঘোর যুদ্ধ বেধে যায়। জটায়ু ঠোঁট দিয়ে রাবণের রাজমুকুট খান খান করে, তার মাথার চুল উপড়ে নেয়। এতে—

'নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড'।

রাবণ জটায়ুর উদ্দেশ্যে বত্রিশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু সে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যায়। রামচন্দ্রের জন্য সাহসে ভর করে জটায়ুর লড়াই স্মরণীয়। রাবণ 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণে' তার দু'পাখা

কেটে ফেলে। জটায়ু মাটিতে পড়ে ছট্ ফট্ করতে থাকে। তার ব্যথায় সীতা ব্যথিত আর রামচন্দ্রের ভয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত রাবণ তড়িঘড়ি রথ নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করে।

পাখীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধকে কৃত্তিবাস ভিন্ন রসে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচনা করেছেন। অন্যান্য যুদ্ধে-শূল, গদা ও নানা বাণের ব্যবহার দেখেছি কিন্তু প্রতিপক্ষ ভিন্ন জাতীয় বলে কবি জটায়ুর তীক্ষ্ম ঠোঁট, বিশাল পাখা, নখ ইত্যাদিকে যুদ্ধাস্ত্র রূপে ব্যবহার করে এই যুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন। একের পর এক যুদ্ধ বর্ণনায় ঘটনা ধারা যাতে শিথিল না হয়, পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত না হয়, একঘেয়েমি দেখা না দেয়, এইজন্যই যুদ্ধটি এতো আকর্ষণীয়। জটায়ুর বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভূমিকাও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) চরিত্র চিত্রণ ঃ কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মহামুনি বাল্মীকির মূল রামায়ণের কাহিনীকে অতি-সংক্ষেপে লিখেছেন। বাঙালি জনগণের উপযোগী করে, পাঁচালীর ঢঙে এই গ্রন্থ রচিত। যার ফলে তাঁর হাতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে। মূল রামায়ণের চরিত্র বাঙলার কোমল-পেলব মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অরণ্যখন্ডে'র বিভিন্ন মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। আপনারা 'মূলপাঠ' পড়ে এবং এই অংশটি চর্চা করে যে-কোনো চরিত্র সম্পর্কেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে পারবেন। নিম্নে বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ মূল রামায়ণে বাল্মীকিমুনি রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্রকে বীররসে মন্ডিত করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে চরিত্রটি ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। অরণ্যখন্ডে রামের ভক্তের ভগবানরূপের পাশাপাশি বীরত্বের মহিমাতেও উজ্জ্বল হয়েছে। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র এই খন্ডে ভ্রাতৃভক্তরূপে যেমন সুচিহ্নিত, তেমনি পত্নীর প্রতি প্রেমে-আদর্শ পতিরূপে চিত্রিত। ভক্তি নম্র রামচন্দ্র প্রয়োজনে যে রুদ্রমূর্তিও ধারণ করতে পারেন তার পরিচয় আছে। 'সীতাহারা' রামচন্দ্রের আকুল বিলাপ পাঠকের চোখে জল আনে।

অরণ্যখন্ডের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় ও বিরহ যন্ত্রণায় চরিত্রটি বাস্তবধর্মী হয়েছে। চিত্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভীতত্রস্ত মুনিদের কানাকানিতে বুদ্ধিদীপ্ত রামচন্দ্র তাঁদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই দৃঢ় চিত্তে বলেন—

> "যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
> আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।"

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের বিপদে প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহান আদর্শ লক্ষণীয়। মুনিগণের চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাওয়া, নির্জন বনভূমিতে রূপবতী সীতাকে নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন—সে গভীর চিন্তায় রামচন্দ্র মগ্ন হন। এই চিন্তার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে অনুধ্যানী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট বেশী দূর নয়। যে-কোনো সময় ভ্রাতৃভক্ত ভরত এসে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষার আদর্শভূমিকা টলাতে পারে একথা ভেবে তিনি চিত্রকূট ত্যাগ করে সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার মধ্যে আমরা রামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। অত্রিমুনির আশ্রমে তাঁর ভক্তি বিনম্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দন্ডকারণ্যে প্রকৃতি প্রেমিক রামচন্দ্রকে আমরা পাই। বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বীরত্বের পাশাপাশি, সীতার বিপদ আশঙ্কিত ভাবনা রামচন্দ্রের চরিত্রটিকে বীর্যবত্তা ও প্রেম

আলিম্পনে শৌর্য ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে লক্ষ্মণকে উপদেশ দেবার মধ্যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রের আগমন মূহুর্তে লক্ষ্মণকে দূরে থাকতে এবং পঞ্চবটী বনে স্বর্ণমৃগ ধরে আনার সময় লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর নির্দেশ—

'যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।"

এছাড়া সীতার আশাপূর্ণ করার জন্য ধনুর্বাণ হাতে বনে গমন ইত্যাদির মধ্যেও পত্নীর প্রতি অনন্ত ভালোবাসার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

সূর্পণখার রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম নিবেদন কালে রামচন্দ্রের চরিত্রে রস রসিকতা ফুটে উঠেছে। রামের জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য যখন সূর্পণখা নাছোড়বান্দা তখন পরিহাস ছলে রামচন্দ্র বলেন—

"আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে বড় গুণী।।"

তিনি আরো বলেন—

"লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরমসুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।"

এইরূপ টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে রামচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয় মধুর চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়েছে।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিপাল ও সীতার অন্বেষণ' পর্বে আশঙ্কাকুল রামচন্দ্রের রূপের পাশাপাশি লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর আকুল প্রশ্ন—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

কর্মযোগী রামচন্দ্র হয়েছেন অদৃষ্টবাদী। পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ রামচন্দ্রের আদর্শ পতিসত্তাকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছে। তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে 'সীতা-সীতা' করে পাগল পারা হন। তাঁর বুক ভাঙা কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদতে থাকে। মুনিগণ ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁর মুখে শুধু 'সীতা'। ভাইকে বলেন—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।"

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাতর রামচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গভীর পত্মী প্রেম। স্ত্রীর প্রতি রামচন্দ্রের অনন্ত প্রেম কবি প্রস্ফুটিত করতে লিখেছেন—

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

অরণ্যখণ্ডের এই অংশটিতে প্রেম ভীরু কোমল মধুর রূপটি কৃত্তিবাস করুণ রসের ধারায় স্নাত করে বীর

রামচন্দ্রকে সার্থক প্রেমিকরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শুধু চোখের জলের বুক ভাসিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। সীতা উদ্ধারের জন্য মন প্রাণ দৃঢ় করে এগিয়ে গেছেন। শবরীকে শাপমুক্ত করে ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

সার্বিক বিচারে চরিত্রটি কোমলে কঠোরে আকর্ষক হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য ও মাধুর্য একাকার হয়ে গেছে। বীরত্ব, প্রেম, পরিহাসরসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রটি নিঃসন্দেহে 'অমৃতের ভাণ্ড'।

সীতা ঃ কৃত্তিবাসের হাতে সীতা চরিত্রটি সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূর রূপ লাভ করেছে। স্বামীর বনবাসী জীবনের সঙ্গিনী হয়ে সুখে-দুঃখে স্বামীর সম ভাগী হয়েছেন। বাঙলার কোমল-পেলব মাটির গন্ধ চরিত্রটিকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। পতিভক্তির আদর্শ সীতার জীবনের পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়া।

'অরণ্যকাণ্ডে' সীতা ছায়ার মতো রামের সঙ্গে বনে বনে ঘুরেছে। অত্রিমুনি আশ্রমে মুনিপত্নীর স্নেহ ভালোবাসায় উদ্বেল সীতার জন্মবৃত্তান্ত পরিবেশন স্নিগ্ধ মধুর। দশবছর নানা বনে ঘুরে পঞ্চবটী বনে এসে সীতা স্বামীকে অনুনয়ের সুরে বলেন—

"সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।"

স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করেই সীতা কথাটি বলেছেন। স্বামী ভক্তির পবিত্রতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। খর-দূষণের যুদ্ধে রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে—

"জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

স্বর্ণমৃগ দেখে মধুর বচনে সীতা রামকে অনুরোধ করেন—

"এই মৃগ চর্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।"

পত্নীর আশা পূরণে রামচন্দ্রের হরিণ শিকারে যাত্রা এবং মারীচের নকল আর্ত কণ্ঠস্বরে ভীত চকিত সীতার লক্ষ্মণের প্রতি করুণ আবেদনের মধ্যে শুচীশুভ্র প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শূন্য ঘরে সীতাকে একাকী ফেলে সে যেতে অস্বীকার করলে সীতা জ্ঞান শূন্যা হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের মনে সড় আছয়ে তোমারি।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সীতার হীনমন্যতার পরিচয় থাকলেও গভীর ভাবে যদি ঘটনার পরিবেশ ও পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তাই সীতাকে পেয়ে বসেছিল। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে চরম আঘাত না দিলে সে ভ্রাতৃ আদেশে অটল থাকবে এতে রামচন্দ্রের চরম বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সীতা কথাগুলি বলেছেন। এসব তাঁর মুখের কথা মনের কথা নয়।

অতিথি পরায়ণ সীতা আতিথ্য নিষ্ঠার জন্যই লক্ষ্মণের আদেশ অমান্য করে গণ্ডীর বাইরে এসে রাবণের হাতে

বন্দিনী হন। অনেকে একে হঠকারী বলে চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তার আদর্শেই সীতা এমনটি করেছেন। রাবণ সীতাকে আকাশ পথে নিয়ে যাবার দৃশ্যে হীনমন্ন রাবণের প্রতি সীতার তীব্র ঘৃণা ও স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছে। গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আবেদনে আমার স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাতুরা সতি-সাধ্বী-মহিয়সী নারীর রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। পথ রেখা ধরে রামচন্দ্র যাতে অনুসন্ধানী হতে পারেন তার জন্য সীতা তাঁর গায়ের গহনাদি পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের শত প্রলোভন সীতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কণ্ঠে এক বাণী—

"রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।"

এই অংশেই সীতার পতিব্রত্যের নৈষ্ঠিক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অশোককাননে বন্দিনী সীতা নীরব নিথর।

"সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।"

বিরহ অনলে সীতা চরিত্রটি প্রেম পবিত্ররূপ ধারণ করেছে।

লক্ষ্মণ ঃ শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাসী জীবনে ছায়াসঙ্গী ছিল লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসের হাতে 'অরণ্যখণ্ডে' লক্ষ্মণ শুধু রামচন্দ্রের ছায়া নয় কায়ারূপও ধারণ করেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে দুর্বল অসহায় রামের মনে শক্তি ও আশা স্বপ্ন জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, ভ্রাতৃভক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীতার কটূক্তির প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজেকে সংযমের শাসনে বেঁধে সীতার নিরাপত্তা বিধানে কার্পণ্য করেনি। ধীর-স্থির অটল-স্বল্পভাষী লক্ষ্মণের চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস দু-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

দণ্ডকারণ্যের পথে আগে রাম মধ্যে সীতা ও পিছনে লক্ষ্মণ পথ চলছে। তিনজনে প্রকৃতির কোলে আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় ভীষণ রাক্ষণ বিরাধের আগমন। সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সে ভক্ষণ করতে চায়। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকেও সে হত্যা করতে উদ্যত। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে রাম ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের সামনে সীতাকে রাক্ষস গিলে খাবে অথচ নিরুপায়ভাবে তা দেখতে হবে এই ভাবনায় রাম যখন দিশেহারা, তখন লক্ষ্মণ দাদার মনোবল ফেরাতে—

"লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।"

লক্ষ্মণের এই উদ্দীপন মন্ত্রেই রামের শৌর্য-বীর্যের জাগরণ ঘটে। সুতরাং চরম সঙ্কট মূহুর্তে লক্ষ্মণকে আমরা দৃঢ়চেতা যুবকরূপে দেখতে পাই। অগস্ত্য মুনির লক্ষ্মণ সম্পর্কে মন্তব্য—

"দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।"

লক্ষ্মণ চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন। রাম-সীতার সুখ-দুঃখের সমঅংশভাগী সে। আত্মসর্বস্বতার কোনো মলিনতা চরিত্রটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। লক্ষ্মণের পরামর্শেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করেন। দাদার স্বপ্নকে সে একদিনে সুন্দর কুটীর তৈরী করে সার্থক করে। তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ। কুটীর সম্পর্কে কবির 'মনোহর' শব্দটি এবং 'পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি'—এই বর্ণনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

খর-দূষণের সঙ্গো যুদ্ধে রামচন্দ্রের সহযোগী যোদ্ধার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে লক্ষ্মণ। 'ভয়' শব্দটি তার চরিত্র অভিধানে লেখা নেই। পরিহাস করে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বল্লে সূর্পণখা তার দিকে ধাবিত হয়ে শৃঙ্গার রস ঢেলে দেয়।

লক্ষ্মণ নিজেকে 'শ্রীরামের দাস' বলে তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্পনণখা বাড়াবাড়ি করে সীতাকে গিলে খেতে গেলে রামের ইঙ্গিতমাত্র বাণ দিয়ে তার নাক কান কেটে দেয়। একদিকে ভ্রাতৃভক্তি অন্যদিকে দুষ্টকে শায়েস্তা করা —দুটি কাজ লক্ষ্মণ করে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে।

মারীচের ছলনায় ভুল বুঝে সীতা লক্ষ্মণকে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও রুচিহীন ইঙ্গিত করলেও—

"লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।"

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের নিষ্পাপ চরিত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গো অঙ্কন করেছেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও কর্তব্য কর্মে তার অবহেলা নাই। তাই সীতাকে সাবধান করে গণ্ডী একে দিয়ে যায়। এর মধ্যে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা না বুঝে পরিস্থিতি অজ্ঞাত থাকার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে একাকিনী ফেলে আসার জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করলেও সে নিরুত্তর থাকে। বুক ভরা জ্বালা নিয়েও তার কর্তব্য জ্ঞান ও সংযমের জন্য চরিত্রটি আদর্শস্থানীয় হয়েছে। কবন্ধের দুই-হাত ছিন্ন করার ব্যাপারে লক্ষ্মণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার আহ্বানেই কবন্ধ মুক্তি পাবার পর সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের কাছে তাদের যাবার নির্দেশ দেয়।

সুতরাং লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস স্বল্প স্থানের মধ্যে রেখেও অসামান্য করে তুলেছেন। ভ্রাতৃভক্তি, বৌদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, চরম বিপদে স্থির থেকে বুদ্ধি দান, সাহসীও সংযমী ভূমিকা পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হয়েছে।

রাবণ ঃ কৃত্তিবাসের অরণ্যকাণ্ডের শেষের দিকে আমরা লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখতে পাই। সূর্পণখা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি দৈহিক কামনা-বাসনা-সঘন প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক, কান কেটে দিলে খর-দূষণকে উত্তেজিত করে চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আতঙ্কে দিশেহারা প্রতিশোধের শেষ অস্ত্র হিসাবে সূর্পণখা রাবণকে বেছে নেয়।

রাবণ-রাজ সভায় আসীন। বিভৎস মুখ নিয়ে সূর্পণখা রাবণকে প্রথমে গালাগালি দেয় তারপর রামের বন গমন ও রাক্ষসদের হত্যার বিবরণ দিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করে—

"রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।"

এখানেই শেষ নয়। সীতার সৌন্দর্য্যের কাছে স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী, মেনকা, রম্ভাও হার মানে। শেযে রাবণের কামনা আগুন জ্বালতে বলে—

"তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।"

সূর্পণখার দুরবস্থায় রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সে 'সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে'। এই একটি চরণেই কৃত্তিবাস কামুক রাবণের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। রূপবতী সীতাকে তার চাই। মনে মনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মারীচের কাছে সূর্পণখার নাক কান কাটার কথা বলে সীতাহরণের জন্য মারীচকে হরিণ সেজে রামকে মায়াজালে জড়িয়ে ফেলতে

বলে। মারীচ তাকে অনেক সুমন্ত্রণা দেয়, এমনকি এই কু-কর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হবে এমন কথাও বলে। কিন্তু রাবণ সব মন্ত্রণা নস্যাৎ করে মারীচকে তার আজ্ঞা পালন করতে বলে নতুবা তার মৃত্যু অনিবার্য একথাও বলে।

নিরুপায় মারীচ রাবণের নির্দেশে সোনার হরিণ সাজে, সীতাকে প্রলুব্ধ করে, রামকে কুটীর থেকে অরণ্যে আনে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সীতাকে প্রতারিত করে লক্ষ্মণকেও কুটীর ছাড়তে বাধ্য করে। রাম-লক্ষ্মণ শূন্য কুটীরে একা সীতা। তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ মিষ্টি মধুর কথায় সীতার মন ভেজায়। নিজের কথা বলে ভিক্ষা চায়। সীতা ইতস্ততঃ করতে থাকলে তার বজ্র নির্ঘোষ—

"................... ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।"

আতিথেয়তার ধর্ম নষ্ট হবে বলে লক্ষ্মণের কথা উপেক্ষা করে গণ্ডী পেরোতেই ছদ্মবেশী রাবণের আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাসের ভাষায় 'রাবণ পাতকী'। সীতার মনহরণের জন্য স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের জগতকে তার সামনে তুলে ধরে নির্লজ্জের মতো বলে—

"সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।"

সূর্পণখা দাদার কামুক চরিত্রের যে আভাস দিয়েছিল তা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় রাবণের এই নগ্ন ইচ্ছার মধ্যে। জটায়ু পাখী সীতা হরণের জন্য রাবণের উদ্দেশে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সুচতুর রাবণ নিজের কামাগুণের কথা চেপে সূর্পণখার প্রতি রাম-লক্ষ্মণের নৃশংস ব্যবহার, খর-দূষণের নিষ্ঠুর মৃত্যু ইত্যাদির কথা অনুনয়ের সুরে বলে, পক্ষীরাজের কাছে পরাজয় মেনে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে কোনোক্রমে ভাঙ্গা রথ নিয়ে লঙ্কায় আসে। সীতার সঙ্গে, জটায়ুর সঙ্গে রাবণ যে অভিনয় করেছে তাতে তার চাণক্যীয় কূট-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। চতুর কামুক রাবণ অশোক কাননে সীতাকে বন্দিনী রেখে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কৃত্তিবাসের হাতে রাবণ পাপিষ্ঠ, ছল-চাতুরী পূর্ণ কামুক রূপেই চিহ্নিত।

সূর্পণখা ঃ পঞ্চবটী বনে সূর্পণখার আবির্ভাব। 'মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী'—রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপজ মোহে তাকে জীবনসঙ্গী করে ভোগসুখে মগ্ন হতে চায়। সীতা লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়ে এবং বনবাসী হওয়ার কারণ জানিয়ে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে এড়াতে চায়। খর-দূষণ দুই ভাই এর কথা বলে সে নগ্নভাবে রামচন্দ্রকে প্রস্তাব দেয়—

"সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমাসহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।"

শুধু তাই নয় সীতাকে ভক্ষণ করে একা রামের সঙ্গিনী হবে বলে। রামচন্দ্র কৌতুক বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলে সে নির্লজ্জের মতো তাকে বলে—

"তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।"

কৃত্তিবাস দেহ সম্ভোগী সূর্পণখার চরিত্রটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। কামনা-বাসনার স্বপ্ন ব্যর্থ হলে—নাক,

কান কাটা গেলে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সে খর-দূষণকে যুদ্ধে পাঠায়। তাদের মৃত্যুর পর রাবণকে নরমে-গরমে, চোখের জলে নানা অভিনয় করে সীতা হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় নিজের কামাগ্নিকেই সে ছড়িয়ে দেয় রাবণের চিন্তায় ভাবনায়।

সুতরাং দেখা যায় সূর্পণখা চরিত্রটি অরণ্যকাণ্ডে সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। স্বাধীন প্রেম শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ। কিন্তু সূর্পণখার নগ্ন প্রেম নিবেদন ঘৃণার্হ। লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। লঙ্কাপুরী যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তার মর্ম মূলে সূর্পণখার কামনার অনল অন্যতম। সে এই অনলই প্রজ্জ্বলিত করেছে রাবণের হৃদয়ে।

মারীচ ঃ 'অরণ্যখণ্ডে' মারীচের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও দুঃখ দুই-ই জাগে। সুবিবেচক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নিরুপায় মারীচ করুণার পাত্র। সীতাহরণের কামনা পূর্ণ করতে রাবণ মারীচের গুণগানে মুখর হলেও সে তার প্রস্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন করেনি। ন্যায়-অন্যায় বোধে চরিত্রটি উদ্দীপিত। সে স্পষ্ট ভাষায় রাবণকে সুমন্ত্রণা দিয়ে বলে—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।"

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'—রাবণ নাছোড়বান্দা। সে মারীচকে কু-কর্মে সহযোগী হতে বলে, না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য বলে ভয় দেখায়। কিন্তু মারীচ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তবে এই মৃত্যু রাবণের হাতে নয় রামচন্দ্রের হাতেই তার কাম্য। তাই আমরা শুনতে পাই মারীচের মর্ম কথা।

"বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।

পাপ-পুণ্য বোধ চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা দান করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে রাবণের নির্দেশ মেনে ছলা-কলা নিতে হয়েছিল, যার পরিণামে সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ ও লঙ্কাপুরী ধ্বংস। মারীচের আত্মত্যাগ যেন লোভ ও পাপের উচিত ফল প্রাপ্তির নির্দেশক। মারীচের শত ছলা-কলা, সীতার অপহরণ ইত্যাদির জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে মারীচকে দায়ী বলে মনে হলেও কৃত্তিবাস মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মারীচকে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

৪৪.৭ অরণ্যকাণ্ডের বিশেষ-বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ

(ক) অত্রিমুনি পত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন, (খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ, (গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা, (ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

এই অংশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রন্থের 'অরণ্যখণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এই অংশগুলি পাঠ করলে অন্যান্য প্রধান বা অপ্রধান অংশগুলি ও মূল-পাঠ দু-তিনবার পাঠ করে আপনারা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজের ভাবনা ও প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য অংশগুলি বিশ্লেষণ করা হল।

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন ঃ

চিত্রকূট ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে সমাদরে স্থান পাবার পর মুনি,

সীতাদেবীকে তাঁর পত্নী গৌতমীর হাতে সমর্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতার মনে হয় 'মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'

সীতাকে প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ করে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সস্নেহে মধুর কথা বলতে শুরু করেন।

সীতাদেবীর ভাগ্যপ্রসন্ন। পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই রাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্র বহু তপস্যা করে এমন স্ত্রী লাভ করেছেন। রাজ সম্পদের মোহত্যাগ করে সীতা স্বামী সঙ্গিনী হয়ে বনবাসিনী হয়েছেন। সীতার গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে করলে, সীতা বিনয়ের সঙ্গে বলেন—

'ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।"

স্বামী ভক্তির পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে মুনিপত্নী আনন্দে আত্মহারা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে আদরে আলিঙ্গন করে সীতাকে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

স্বর্গের অপ্সরা মেনকা আকাশপথে যাবার সময় তার বস্ত্র উড়ে যায়। তার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে জনক রাজার কামনাবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তার বীর্যের স্খলন হয়। সেই বীর্য মাটিতে পড়ে এবং তা থেকেই সীতার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙ্গলের ফলায় সীতার দেহ সূর্য্যের আলোতে আসে। নিজের কন্যা অনুমান করে জনক রাজা তাকে কোলে স্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয়। এই দৈববাণীতে সীতার জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পারেন। লাঙ্গলের মুখে জন্ম বলে নাম রাখলেন সীতা। আনন্দে আত্মহারা রাজা দীন-দুঃখীদের অকাতরে ধন দান করেন। রাজমাতার স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবের ধনুকে গুণ পরাতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। রাজার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেরো লক্ষ রাজকুমার এসে উপস্থিত। কিন্তু সবাই ধনুক দেখে ভয় পায় এবং মনের দুঃখে স্থান ত্যাগ করে। জনকরাজা দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতি। শ্রীরামচন্দ্র বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পরাতে গেলে শিবধনুক ভেঙ্গে যায়। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরই মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে রাম-সীতা ও কুশধ্বজের দুই মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূর্বকথা শেষ করে বিনয় নম্রভাবে সীতা বলেন—

"ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।"

সীতার কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিপত্নী সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেন আর তার সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে নববেশে নবরূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীর কথোপকথনে আমরা অত্যন্ত আপনজনের হৃদি বিনিময় দেখি। রাজদুহিতা রাজপত্নীর বনবাসিনী মূর্তি গুরু পত্নীকে ব্যথা দেয়—এজন্যই তিনি তাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই মুনি পত্নীকে সীতার করুণারূপিনী মনে হওয়ায় প্রাণখুলে তিনি তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সীতার বনবাসিনী রূপ দেখে মুনিপত্নীর কথায় বেদনা প্রকাশ পেলে সীতা তার পতিভক্তির প্লাবনধারায় সে বেদনা দূর করে দেন। উভয়ের কথোপকথন যেমন আন্তরিক তেমনি হৃদিরসে জারিত।

(খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ ঃ পঞ্চবটী বনে দীর্ঘদিন বাস করে সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে অগস্ত্যমুনির নিকট যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুনি পিপ্পলী বনে গিয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অগস্ত্যের তপোবনে গিয়ে বাতাপি ও

ইল্বল রাক্ষসকে অগস্ত্য মুনি কিভাবে বধ করেছিল সে কাহিনী শুনায়। তারপর মুনির দ্বারা তাঁরা তিনজন উপস্থিত হন। রামের কথা শুনে মুনি শিষ্যকে শীঘ্র তাঁদের ডেকে আনতে বলে। তিনজন অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করে। গোলোক ছেড়ে রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন। তাঁর আর কি ইচ্ছা তা মুনি জানতে চান। শ্রান্ত বনবাসীদের ভোজনে তৃপ্ত করে। তিনদিন সেখানে তাঁর থাকার পর চতুর্থদিন ভোরে রামচন্দ্র অগস্ত্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে গোদাবরী তীরে থাকতে বলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত 'দিব্য ধনুর্ব্বান' প্রদান করেন। রামচন্দ্রকে 'সোনার টোপর' ও 'বস্ত্র রত্ন' দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। অগস্ত্য মুনির আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর নির্দেশেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা অগস্ত্যমুনির তপোবন ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নদীর তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই অংশে রামচন্দ্রের ভগবৎরূপ অগস্ত্যমুনি জানতে পারেন। পিতৃসত্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যাতে নির্ভাবনায় আনন্দে থাকতে পারেন তার জন্যই মুনির 'দিব্য-ধনুর্ব্বান' দান এবং গোদাবরী নদীর রমণীয় তীরে কুটীর নির্মাণ করে বসবাসের নির্দেশ দান।

(গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা দান ঃ

সূর্পণখার কাছে সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে রাবণ কামনার আগুনে জ্বলে সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য চায়। কিন্তু মারীচ স্পষ্টভাবে বলে—

'সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর'

রাবণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় রাবণ ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে বলে—

'আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।'

রাবণ নিজের প্রতাপের কথা সদম্ভে ঘোষণা করে এবং রামচন্দ্রকে হীন মনুষ্যজাতিরূপে তাচ্ছিল্য করে। মারীচের কাছে রাবণ জোরের সঙ্গে বলে—

"ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পূর।"

বারণের কু-প্রস্তাব ও তাকে হত্যা করার হুমকী অগ্রাহ্য করে মারীচ বলিষ্ঠভাবে পরিণাম সম্পর্কে বলে—

'সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।' রাবণ জীবনে অনেক নারীকে হরণ করেছে, কিন্তু সীতাকে হরণ করলে তার আর নিস্তার নেই। শুধু রাবণ নয়, লঙ্কাপুরীর সকলের জীবনও হবে সংশয়। একজনের স্ত্রীকে এনে সকল নারীর মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই মারীচ রাবণকে সীতার লোভ ত্যাগ করার কথা বলে লঙ্কাপুরীতে ফিরে যেতে বলে। রামচন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে আগে মারীচের মৃত্যু হবে কিন্তু সীতা হরণের পর রাবণ ও লঙ্কাপুরীর সকলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করে রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে বনে আনতে পারবে, কিন্তু সীতাকে রক্ষার জন্য দেবর লক্ষ্মণ কুটীরে থাকবে। লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে কারো সাধ্য নেই সীতাকে হরণ করে। সুতরাং মারীচের সুমন্ত্রণা দান—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।"

শুধু তাই নয় মারীচ শেষবারের জন্য বলে যে তার মন্ত্রণা উপেক্ষা করে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করে তবে মারীচের ভবিষ্যৎবাণী তাকে স্মরণ করতেই হবে। অর্থাৎ তার ও দেশবাসীর মহা সর্বনাশ ঘটবে।

মারীচ যুক্তিসহ মানবিক সুমন্ত্রণাই দিয়েছে রাবণকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে রাবণের কু-পরামর্শে ভীরু কাপুরুষের মতো তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি। বরং সীতার লোভ ত্যাগ করে, ভবিষ্যৎ এর সর্বনাশের কথা ভেবে যাচ্ছে রাবণ কু-ইচ্ছা দমন করে তার জন্যই তাকে এই সৎ পরামর্শ দান। এর মধ্য দিয়ে মারীচের নির্ভীক আদর্শবাদী চারিত্রিক মাধুর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে'র শেষ অংশটি 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ' রূপে চিহ্নিত।

ধনুর্বাণ হাতে রামচন্দ্র কুটীরে যাত্রা করেন। পথে অমঙ্গলের বহু চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে। মারীচের রামকণ্ঠের আহ্বানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে? যদি আসে তবে সীতার কি হবে?—এইসব চিন্তায় মগ্ন অবস্থাতেই পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই রামচন্দ্রের প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাঁর কণ্ঠে মহা বিপদের সংকেত—

"মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।"

ভাই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের বক্ষভেদী বিলাপ—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

দুরন্ত রাক্ষস পরিবৃত্ত এই গভীর বনে মুনি ঋষিগণ সর্বদা শঙ্কাতুর। লক্ষ্মণ সব জেনে শুনেও যে কাজ করেছে তার ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বার বার দোষারোপ করতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে রামচন্দ্র দ্রুত কুটীরের দিকে গমন করেন। কুটীর দ্বারে পৌঁছে তার বুক ফাটা "সীতা-সীতা" ডাক। কোনো উত্তর নেই। কুটীর সীতা শূন্য দেখে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র কিভাবে বাঁচবে—সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ করবে ইত্যাদি বিলাপ করতে থাকেন। বন-গুহা, তরুমূল তন্ন তন্ন করে খুঁজে সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র চোখের জলে বুক ভাসান। তাঁর কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদে। সীতার শোকে রাম অস্থির। তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি-পত্নীর কাছে, গোদাবরী তীরে খুঁজতে বলে।

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতাবিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

ফণী ছাড়া সাপের জীবন যেমন ব্যর্থ, তেমনি সীতাহারা রামচন্দ্রের জীবনও অন্ধকার। লক্ষ্মণ ভাই-এর প্রতি তাঁর করুণ আবেদন—

"দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।"

পথে সীতার অলঙ্কারাদি, রাবণের রথচূড়ার অংশাদি দেখে ঐ স্থানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বলেন রামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপে বন-বনানী বেদনায় দীর্ণ। হঠাৎ সামনে আহত জটায়ু পাখীর সঙ্গে দেখা, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তার নির্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মূল লক্ষ্য সীতা উদ্ধার।

এই অংশে পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সীতাহারা রামচন্দ্রের বিলাপ করুণ রস ধারায় স্নাত।

৪৪.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দুশো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গানে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং তার অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই পশ্চিমবঙ্গাকে তুর্কি শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কি শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে—এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য ও অন্তর্শায়ী বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৬৯ খ্রিঃ — ১৪৭৩ খ্রিঃ) হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রিঃ — ১৫০০ খ্রিঃ) এবং তার পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৮ খ্রিঃ — ১৫৩২ খ্রীঃ)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন "এ বঙ্গের অলঙ্কার" কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি ঃ কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হল।

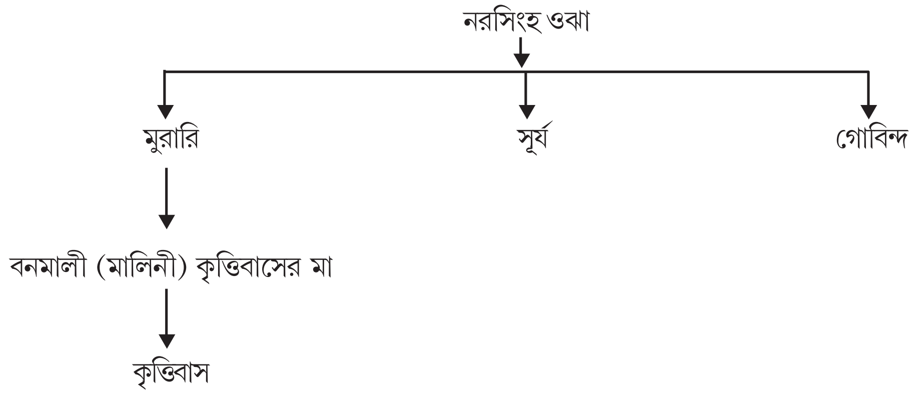

কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।।"

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তেরশ কুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ -এর ১৬ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২ - ১৪৩৩ খ্রিঃ কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা ক রলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দন জলে অভিষিক্ত করেন। মাল্যভূষিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন কিন্তু অবাক কাণ্ড লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথায় উল্লেখ করেন নি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজ গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিঃ। যদি কবির জন্ম ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গল বিবৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইতি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস, মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হন, সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।"

কাব্য পরিচিতি ঃ পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য', 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'লঙ্কা' ও 'উত্তরা'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরল উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে

সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কৃত্তিবাসের হতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল পেলব মাখানো বাঙালি চরিত্রের মতো হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন 'মূর্তি' কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্যে দিয়ে অভিমানক্ষুব্ধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী' কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কেমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজন রসিকতা, আলস্য পরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষ্যণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিল—মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাপড় ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধুর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ :

"প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।"

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠী পূজা', তোরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর, করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্র বধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে। সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরস ভরায় গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মতো চিরকাল আস্বাদন করবেন।

কৃত্তিবাসের নামে এমন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে

১৮০২ খ্রিঃ — ১৮০৩ খ্রিঃ -এর মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০ খ্রিঃ — ১৮৩৪ খ্রিঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

৪৪.৯ অনুশীলনী

১। নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৫টি খণ্ডে লিখিত।	☐	☐
(খ) রামচন্দ্র পম্পা নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করেন।	☐	☐
(গ) রামচন্দ্রকে দিব্য ধনুর্বান প্রদান করেন অগস্ত্যমুনি।	☐	☐
(ঘ) যুদ্ধে খর-দূষণের হাতে রামচন্দ্র পরাজিত হন।	☐	☐
(ঙ) মারীচ রাবণকে সুমন্ত্রণা দেয়।	☐	☐
(চ) রামচন্দ্র সূর্পণখার নাক-কান কাটে।	☐	☐
(ছ) রামচন্দ্র আগে পঞ্চবটী বনে পরে চিত্রকূটে যান।	☐	☐
(জ) রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ঘটে।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) কৃত্তিবাসের কাব্য ——— গ্রন্থ।

(খ) অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতি চিত্র ———।

(গ) রামচন্দ্রের বিলাপ অংশে ——— রস প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) রাবণ চরিত্রটি ———।

(ঙ) সীতা ——— বাঙালি বধূ হয়েছেন।

(চ) জটায়ু ——— যুদ্ধ করে।

(ছ) খর ও দূষণ রাবণের ———।

(জ) সীতা ——— রাজের কন্যা।

(ঝ) রামচন্দ্র ——— ভেঙে সীতাদেবীকে বিবাহ করেন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লিখুন।

(ক) 'শূন্য বনে কেমনে রহিব তিন জন'।
কে, কোন, বনের কথা বলেছেন? 'তিনজন' কে কে?

(খ) 'মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'
কে, কোথায়, কাকে দেখে একথা ভেবেছিলেন?

(গ) "নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।"
এই প্রকৃতি চিত্র কোথাকার?

(ঘ) 'মেঘের গর্জন যেন ছাড়ে সিংহনাদ।'
এখানে কার গর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ঙ) অগস্ত্যমুনি কোন্ দুই রাক্ষসকে নিঃশেষ করে?

(চ) কোন মুনির আশ্রমে রামচন্দ্র ইন্দ্রের ধনুর্বাণ পান?

(ছ) 'সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।'
কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?

(জ) 'রণধ্বজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।'
কেস কার রণধ্বজ ভাঙে এবং কেন?

(ঝ) 'সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।'
কে, কখন, কার কাছে একথা বলেছেন?

৪। নীচের কাব্যাংশগুলির ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখুন।

(ক) 'দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।"

(খ) 'দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান।।"

(গ) "পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরী তীর।।"

৫। ৩.৬ একক পাঠ করে নীচের চরিত্রাদির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১০ টি বাক্যে প্রকাশ করুন।
শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, রাবণ।

৬। অনুবাদক কৃত্তিবাসের কবি পরিচিত ও অনূদিত রামায়ণ কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার দিকটি নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ১০ টি বাক্যের মধ্যে।

৭। জটায়ুর সঙ্গো রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

৪৪.১০ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক।

২। (ক) অনুবাদ, (খ) মনোহর, (গ) করুণ, (ঘ) দেহভোগী, (ঙ) সর্বংসহা, (চ) বীরের মতো, (ছ) দুই ভাই, (জ) জনক, (ঝ) হরধনু।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর সূত্র ঃ (ক) রামচন্দ্র, চিত্রকূট পর্বত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। (খ) সীতা দেবী, অত্রিমুনির আশ্রম, মুনিপত্নী। (গ) দণ্ডাকারণ্যের, (ঘ) বিরাধ, (ঙ) বাতাপি ও ইল্বল। (চ) শরভঙ্গমুনির আশ্রম, (ছ) মারীচ, রাবণ, সীতাহরণ ষড়যন্ত্র মুহূর্ত, (জ) জটায়ু, রাবণ, সীতাহরণের জন্য, (ঝ) রামচন্দ্র, শূন্য কুটীর, লক্ষ্মণের কাছে।

৪। ব্যাখ্যার সংকেত সূত্র ঃ

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবী মুনিপত্নীকে দেখে অভিভূত হন। তাঁর সৌম্য-স্নিগ্ধ মধুর করুণা নিষিক্ত চেহারা ও মাতৃসম ব্যবহার দুর্লভ। আলোচ্য গুণাবলীর দ্বারা মুনিপত্নী যেন করুণামূর্তি লাভ করেছেন। প্রীতি প্রেম করুণা রূপিনী মুনিপত্নী সীতার কাছে সর্ব শ্রদ্ধেয় রূপে দেখা দিয়েছেন।

(খ) আলোচ্য কাব্যাংশটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের 'অরণ্যকাণ্ডে'র বিরাধ বধ অংশ থেকে উদ্ধৃত। এখানে কবি বিরাধের ভয়ংকর মূর্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। অত্রিমুনির আশ্রমে যাবার পর মুনির নির্দেশ রামচন্দ্র দণ্ডক কাননে গমন করেন। সেই বনে বিরাধ রাক্ষসের বাস। এই রাক্ষসের আকৃতি বিরাট। বিশাল শক্তিধর। কবি তার উচ্চতা ও দৈহিক শক্তিকে পর্বতের তুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো। শক্তির মদমত্ততা ও চেহারার ভয়ংকরতা আলোচ্য অংশে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) কুটীরে সীতা দেবীকে না দেখে রামচন্দ্র দিশেহারা হন। ভআই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি গাছের তলা তন্ন তন্ন করে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ান। গোদাবরী তীরের স্মৃতিমধুর স্থানগুলি ব্যাকুল হয়ে সীতার অনুসন্ধান করেন। অজানিত আশঙ্কায় রামচন্দ্রের ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ রূপটি আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। রামচন্দ্র ঃ বাল্মীকি মুনি রামচন্দ্রকে বীরচরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁকে ভক্তের ভগবানরূপে চিত্রিত করলেও অরণ্যখণ্ডে আমরা তাঁকে বীর ও প্রেমিকরূপে পাই। ভ্রাতার প্রতি অসীম স্নেহ, সীতার প্রতি অনন্ত প্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুনিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সূর্পণখার সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর রস-রসিক মনের পরিচয় পাই।

রামচন্দ্রের পত্নী-প্রেম রোমান্টিক মাধুর্যে ভরা। গোদাবরী তীরের কুটীরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রের আকুল-ব্যাকুল আর্তি করুণ-সুন্দর। চরিত্রটি কোমলে-কঠোরে, শৌর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ। রামচন্দ্রের চরিত্রে বাঙালি জীবনছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। সর্বগুণে ভরা চরিত্রটি সত্যই 'অমৃতের ভাণ্ড।'

(ঘ) **সীতা ঃ** কৃত্তিবাস সীতাদেবীকে সর্বংসহা বাঙালি গৃহবধূরূপে অঙ্কিত করেছেন। বিনয়নম্রা, ভক্তিস্নাতা সীতা অনন্যা। পতিভক্তির আদর্শ সীতাকে অনন্ত প্রেমের পূজারিণী করেছে। পতির জীবন আশঙ্কায় আকুল সীতা লক্ষ্মণকে অনেক কটুকথা বললেও পতিব্রত্যের উজ্জ্বল আলোতেই তা ভাস্বর হয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ আতিথেয়তায় উদ্দীপ্ত হয়েই তাঁকে বিচ্ছেদের দহন জ্বালা সইতে হয়েছে। রাবণের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে চরম বিপদ মুহূর্তেও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

একদিকে রাবণের প্রতি ধিক্কার অন্যদিকে পতিমিলনের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ। পথে প্রান্তরে গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে ফেলার মধ্যে তা দেখা যায়। অশোক কাননে শোকানলে দগ্ধ হয়ে সীতার প্রেম পবিত্র রূপটি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রাবণ ঃ লঙ্কেশ্বর রাবণের চরিত্রটি কৃত্তিবাস রূপমোহগ্রস্ত বিবেকশূন্য, ভোগবাদীরূপে অঙ্কন করেছেন। ভগিনীর নাক-কান কেটে ফেলার জন্য সে মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেই তার ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে। সীতা হরণের কথা শুনে মারীচ রাবণকে অনেক সুপরামর্শ দেয়, এমন কি এই অপকর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু পাপী দেহলোভী রাবণ তাতে কর্ণপাত করে নি। বরং তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। এতেই প্রমাণিত যে চরিত্রটি অত্যন্ত নীচুস্তরের। ছল-চাতুরীতেও সে ওস্তাদ। মারীচকে সোনার হরিণের ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ, তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ, অতিথি সৎকারের ঐতিহ্য ইত্যাদি কূট-কৌশল অবলম্বনেও সে পারদর্শী। জটায়ু পাখীর কাছে সূর্পণখার প্রসঙ্গ এনে ক্ষমাপ্রার্থীর অভিনয় করে। চতুর, কামুক রাবণ চরিত্রটি কৃত্তিবাস সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাড়ী করেন। কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ও মাতা মালিনী। কবির দেওয়া জন্মবৃত্তান্তের নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। ১৪৩২ — ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদী সম্মত নয়। নানামুনির নানামত থাকা সত্ত্বেও কবি রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর আদেশকে পাথেয় করে বাল্মীকির প্রসাদে তিনি 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে সুপ্রচারিত।

সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনী অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সংগত। তাঁর রচিত গ্রন্থের ৭টি কাণ্ড হলো—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা। মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ কবি যেমন বাদ দিয়েছেন, তেমনি পুরানো উপাখ্যান থেকে অনেক সরস কাহিনী যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যখানি গল্পরসে জম-জমাট। কৃত্তিবাসের হাতে রামায়ণের বলিষ্ঠ মহাকাব্যিক চরিত্র কোমল-মধুর-বাঙালি চরিত্র হয়েছে। অরণ্যখণ্ডের রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরিত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতে বীরধর্মী কাব্য হয়েছে 'গৃহধর্মী।' কৃত্তিবাসের রামায়ণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালির হৃদয়ের কাব্য হয়েছে। এইজন্যই সমালোচকের ভাষায় তাঁর কাব্য হয়েছে "বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

৭। 'অরণ্যখণ্ডে' বিরাধ বধ, খর-দূষণের যুদ্ধ ইত্যাদি থাকলেও জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধটি প্রাণস্পর্শী হয়েছে। রাবণ সীতাকে চুরি করে আকাশ পথে যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় জটায়ু পাখী তার দীর্ঘ দুই পাখা দিয়ে রথের গতিতে বাধা দেয়। সীতার করুণ কান্না শুনে 'গরুড়নন্দন' আকাশে পাখা মেলে চারদিক দেখতে থাকে। রাবণকে চিনতে পেরে তার পথ আটকে দেয়। কবির ভাষায়—'দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।' সীতাকে হরণ করার জন্য জটায়ু ভীষণ ক্ষুব্ধ। বৃদ্ধ না হলে বোঁটা থেকে ফলকে যেমন ছিঁড়ে ফেলে তেমনি সে রাবণের মাথা তীক্ষ্ম ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো। এরপর জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। 'পাখসাট' মেরে 'আঁচড়ে কামড়ে' সে রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। তারপর তীব্র বেগে ছোঁ মেরে রাবণের পীঠের মাংস খাবলে নেয়। রথের সারথীর মুণ্ড ঠোঁট দিয়ে ছিন্ন করে। রথের ধ্বজাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে জটায়ু গাছের ডালে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু। রাবণ ও জটায়ুর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

“অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ।”

মত্ত হাতী যেমন মাহুতের অঙ্কুশকে অগ্রাহ্য করে, উন্মত্ত হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে—ঠিক তেমনি দুই জনে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে। রাবণের সোনার মুকুটটিকে জটায়ু খান খান করে দেয়। শিবের দয়ার জন্য রাবণের দশমাথা ছিন্ন করতে না পারলেও জটায়ু তার মাথার চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়ে ফেলে। দুই দুই বার যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে রাবণ সীতাকে ভূমিতে রেখে ভাঙা রথ নিয়েই খুব উঁচুতে উঠে বত্রিশ হাজার বাণ জটায়ুর দিকে নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপর ‘অর্দ্ধচন্দ্রবাণ’ দিয়ে জটায়ুর দুটি পাখা কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বৃদ্ধ জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন তাতে গা শিউরে উঠে। রাবণের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে ও সীতা উদ্ধারের জন্য বিনা অস্ত্রে শুধু পাখা, নখ ও ঠোঁট দিয়ে জটায়ু যেভাবে রাবণকে পর্যুদস্তু করেছে, তার কাছে রাবণের বত্রিশ হাজার বাণ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধের রূপটি অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। কবির রাবণের প্রতি ঘৃণা ও জটায়ু পাখীর প্রতি মমত্ববোধে—এই যুদ্ধে জটায়ুর সাহসিকতা—বীরের মতে প্রাণত্যাগ বীররসে মণ্ডিত হয়েছে।

৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক—

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়) — সুকুমার সেন।

২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস — ক্ষুদরাম দাস।

একক ৪৫ চৈতন্যভাগবত — বৃন্দাবনদাস — আদিখণ্ড — দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়।

গঠন

৪৫.১ উদ্দেশ্য

৪৫.২ প্রস্তাবনা

৪৫.৩ মূলপাঠ—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস। (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)

৪৫.৪ সারাংশ

৪৫.৫ সারসংক্ষেপ

৪৫.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও কবিকৃতি

৪৫.৭ নবদ্বীপ চিত্র

৪৫.৭.১ সমাজ চিত্র

৪৫.৮ চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪৫.৮.১ বাল্যলীলা (৪র্থ অধ্যায়)

৪৫.৯ ব্যাখ্যা-টীকা-শব্দার্থ

৪৫.১০ অনুশীলনী

৪৫.১১ উত্তরমালা

৪৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- বাংলা ভাষায় অনূদিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'—এর আদিখণ্ডের মোট ১২ টি অধ্যায়ের মধ্যে যে কটি অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা বর্ণিত হয়েছে সে কটি অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন। তাছাড়া কাব্যখানির আদি-মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা আপনাদের জন্মাবে।
- অনুবাদক হিসাবে বৃন্দাবনদাসের কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করবেন।
- বৃন্দাবনদাসের স্বচ্ছ লৌকিক দৃষ্টি, ঈশ্বরের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষরূপে এঁকেছেন তার পরিচয় পাবেন।
- সমসাময়িক—সামাজিক পরিবেশের চিত্র এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিশেষ করে হোসেন শাহের প্রথম বিশ বছরের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদানও পাবেন।
- ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রের পরিচয় পাবেন।

- ভক্তির আতিশয্য এবং অলৌকিকতায় গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবন দাস পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে যে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তারও প্রমাণ পাবেন।
- চৈতন্য ভাগবত শুধু চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর তালিকা না হয়ে কেন জীবনাচরণের সঙ্গে দিব্য ভাব জীবনের অধিকারী, নর দেবতার জীবনকাহিনী হয়েছে, সে সম্পর্কে নানা তথ্যাদি পাবেন। যার সাহায্যে নিজেদের ভাষায় নানা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন।
- আদিখণ্ডের চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতির নানা দিগন্ত আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হলো। তা থেকে শ্রীচৈতন্যের লীলাবিষয়ক নানাদিক যেমন পাবেন তেমনি নবদ্বীপের চাল-চিত্রও জানতে পারবেন।
- বাঙলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে রচিত চৈতন্য কাব্যগুলি। অবতার রূপে পূজিত চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে কয়েকখানি সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ ও নাটক, স্তোত্রকাব্য রচিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদাবলীও রচনা করেছেন। এসব বাদে চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে বাঙলা সাহিত্যের সুপরিচিত গ্রন্থাদি হলো—বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয়। তবে আলোচ্য পাঠে সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও চৈতন্য জীবনী গ্রন্থাদির প্রেরণাদাতা বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাব্যাংশের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪৫.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর 'আদিখণ্ডে'র নবদ্বীপলীলা অংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। আদিখণ্ডের ঘটনাবিন্যাস নিম্নরূপ—

১। প্রথম অধ্যায় — মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র বর্ণন।
২। দ্বিতীয় অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র জন্মবর্ণন।
৩। তৃতীয় অধ্যায় — নামকরণ ও চাপল্যবিলাসাদি বর্ণন।
৪। চতুর্থ অধ্যায় — শৈশব ক্রীড়া বর্ণন।
৫। পঞ্চম অধ্যায় — শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস বর্ণন।
৬। ষষ্ঠ অধ্যায় — প্রভুর উপনয়ন ও পাঠাভ্যাসাদি বর্ণন এবং শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থযাত্রাদি কথন।
৭। সপ্তম অধ্যায় — ঈশ্বর পুরী মিলন।
৮। অষ্টম অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বর্ণন।
৯। নবম অধ্যায় — দিগ্‌বিজয়ী বিমোচন।
১০। দশম অধ্যায় — বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় বর্ণন।
১১। একাদশ অধ্যায় — শ্রী হরিদাস মহিমাবর্ণন।
১২। দ্বাদশ অধ্যায় — গয়াভূমি গমন বর্ণন।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' তিনখণ্ডে রচিত— ১। আদিখণ্ড, ২। মধ্যখণ্ড, ৩। অন্ত্যখণ্ড।

আদিখণ্ড — শ্রীচৈতন্যদেবের গয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, মধ্যখণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণে পরিসমাপ্তি, অন্ত্যখণ্ডে গৌড়ীয় ভক্তদের মিলন ও গুন্ডিচাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণিত। আদি ও মধ্যখণ্ডটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হলেও অন্ত্যখণ্ডটি যেন হঠাৎ থেমে গেছে। কাব্যখানির এটি একটি ত্রুটি।

তবে আদিখণ্ডের নবদ্বীপে গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা সহজ সরল পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরলীলার বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস বাস্তবতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন তেমনটি অন্য কোনো চৈতন্যজীবনীকার দিতে পারেননি।

চৈতন্যদেবের জীবনের অধিকাংশ উপাদান গুরুনিত্যানন্দ দাসের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেও আলোচ্য পাঠের চৈতন্যের বাল্য-কিশোরলীলার নানা তথ্যাদি গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে হয়তো বৃন্দাবনদাস শুনেছিলেন বলে অনেক গবেষকের ধারণা। তাছাড়া মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কাব্য—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্' যা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত কাব্যগ্রন্থের ভাগবতলীলার প্রভাবও নবদ্বীপ লীলা অংশে দেখা যায়। তাছাড়া এই অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবত থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম থেকে শৈশবের ক্রীড়াদি বর্ণিত আছে। এই বর্ণনার মধ্যে চৈতন্যের লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্র, ঐতিহাসিক নানা তথ্যাদির সঙ্গে অলৌকিকতার সমন্বয়ও দেখতে পাবেন। মধ্যযুগের দলিলরূপে চৈতন্য ভাগবত চিহ্নিত। তিনটি অধ্যায় পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা ও তৎকালীন সমাজ জীবনের চালচিত্র নিয়ে ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৫.৩ মূলপাঠ ঃ চৈতন্যভাগবত — আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম বর্ণন

জয় জয় জয় প্রভু শ্রীগৌরাসুন্দর।
জয় জগন্নাথ পুত্র মহামহেশ্বর।। ১
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ।। ২
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিল চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।। ৩
পুন ভক্ত সঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার।। ৪
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ।। ৫
অবিজ্ঞাত তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত।। ৬
ব্রহ্মাদির স্ফূর্তি হয় কৃষ্ণর কৃপায়।
সর্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়।। ৭

তাতাহি শ্রীভাগবতে (২। ৪। ২২)—
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্।। ১

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে ।। ৮
তবে যবে সর্বভাবে লইয়া শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।। ৯

তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিল সর্ব অবতারস্থিতি।। ১০

হেন কৃষ্ণচন্দ্র দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার।। ১১
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণঅবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা।। ১২

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।২১)
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবান্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্
ত্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।। ২

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার।। ১৩
তথাপি শ্রীভাগবত গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে।। ১৪

তথাহি শ্রীগীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি
ভগবদ্বাক্যম্ (৪।৭-৮)—
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থ নমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৩
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৪

ধর্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রভাবতা বাড়ে দিনে দিনে।। ১৫
সাধুজনরক্ষ বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে।। ১৬

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।। ১৭
কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।। ১৮
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার।। ১৯

তথাহি ভাগবতে (১১।৪।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদ্বীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।। ৫
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ৬

কলিযুগে সর্বধর্ম হরিসংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।। ২০
কলিযুগে সংকীর্তনধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্বপরিকরে।। ২১
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্বপরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতর। ২২
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ।। ২৩
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভায়।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার।। ২৪
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারে চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।। ২৫
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন।। ২৬
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।। ২৭
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ২৮
সব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে।। ২৯

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত।। ৩০
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণব অবতার।। ৩১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।। ৩২
চাটিগ্রামে হৈল ইহাঁ সভার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।। ৩৩
রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্।। ৩৪
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ।। ৩৫
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম।। ৩৬
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন।। ৩৭
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল।। ৩৮
তিরোতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস।। ৩৯
গঙ্গাতীরে পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে।। ৪০
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে।। ৪১
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিৎ।। ৪২
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বাৎসল্য হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।। ৪৩
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার।। ৪৪
শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ।। ৪৫
যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে।। ৪৬
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়।। ৪৭
অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।। ৪৮
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন।। ৪৯
নবদ্বীপে হইবে প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।। ৫০
নবদ্বীপ হেন গ্রামে ত্রিভুবনে নাঞি।
যদি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ৫১
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।। ৫২
নবদ্বীপে সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।। ৫৩
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ।। ৫৪
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।। ৫৫
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।। ৫৬
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।। ৫৭
রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে।। ৫৮
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।। ৫৯
ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।। ৬০
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন্ জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।। ৬১

ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।। ৬২
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।। ৬৩
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে।। ৬৪
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন।। ৬৫
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি।। ৬৬
অতি বড় সুকৃতী যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।। ৬৭
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।। ৬৮
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।। ৬৯
কেমতে এ জীব সব হইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার।। ৭০
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।। ৭১
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন।। ৭২
সভে মিলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ।। ৭৩
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য।। ৭৪
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।। ৭৫
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার।। ৭৬
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।। ৭৭
হুংকার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।। ৭৮
প্রেমের হুংকার তথা শুনি কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে হইলা সাক্ষাৎ।। ৭৯
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য।। ৮০
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়।। ৮১
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।। ৮২
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।। ৮৩
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।। ৮৪
কৃষ্ণশূন্য মঙ্গালে দেবের নাহিক সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় সুখ।। ৮৫
স্বভাবেহ অদ্বৈতের কারুণ্য হৃদয়।
জীবে উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।। ৮৬
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।। ৮৭
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞিং।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞিং।। ৮৮
আনিব বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব নাচাইব সব জীব উদ্ধারিয়া।। ৮৯
নিরবধি এইমত সংকল্প করিয়া।
সেবেন কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হৈয়া।। ৯০
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার।। ৯১
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দির হৈল চৈতন্যবিলাস।। ৯২
সর্বকাল চারি ভাই গাই কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান।। ৯৩

নিগূঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিল সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়।। ৯৪
শ্রীচন্দ্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস।। ৯৫
একত্রে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার।। ৯৬
সভেই স্বধর্মপর সভেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কেন না জানয়ে আর।। ৯৭
সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহো না জানেন সব নিজ অবতার।। ৯৮
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার।। ৯৯
কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্তন।। ১০০
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়।
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায়।। ১০১
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন।। ১০২
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে।। ১০৩
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণব গণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।। ১০৪
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্তন।। ১০৫
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবের হাসে।। ১০৬
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে।। ১০৭
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ কবিরেক গ্রামের উৎসাদ।। ১০৮
মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ অ্যাখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ায়।। ১০৯
কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে।। ১১০
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যাথা যবনে গ্রাম করিবে কবল।। ১১১
এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ।। ১১২
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে।। ১১৩
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।। ১১৪
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া।। ১১৫
যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে।। ১১৬
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস।। ১১৭
এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।। ১১৮
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া।। ১১৯
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন।। ১২০
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহো কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে।। ১২১
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুখে।। ১২২
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবততিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ।। ১২৩
ঈশ্বরআজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।। ১২৪
মাঘ মাসে শুক্লত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে।। ১২৫

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা-ব্যজ।। ১২৬
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণপ্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যনন্দ নাম।। ১২৭
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন।। ১২৮
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল।। ১২৯
যে পতিতজন নিস্তার করিতে।
অবধূত বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে।। ১৩০
অনন্তের প্রকাশ হৈলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতীর্ণ যেন মতে।। ১৩১
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো ধর্ম্মেতে তৎপর।। ১৩২
উদার চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা।। ১৩৩
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র।। ১৩৪
তান পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা।। ১৩৫
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সভে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ।। ১৩৬
বিশ্বরূপমূর্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। ১৩৭
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্তি।। ১৩৮
বিষ্ণুভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল-ভবিষ্য আচার।। ১৩৯
ধর্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিঞা অন্তরে।। ১৪০
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান।। ১৪১
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথমিশ্র শচী শুনে।। ১৪২
মহাতেজমূর্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লিখিতে না পারে অন্য জানে।। ১৪৩
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্ম শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।। ১৪৪
অতি মহা গোপ্য হয় এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা।। ১৪৫
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি মতি।। ১৪৬
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার।। ১৪৭
জয় জয় বেদ ধর্ম সাধু বিপ্র পাল।
জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল।। ১৪৮
জয় জয় সর্বসত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর।। ১৪৯
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ।। ১৫০
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র।। ১৫১
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে।। ১৫২
তথাপিহ দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হই আসি বধে তা সভারে।। ১৫৩
এতেক কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন।। ১৫৪
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্তে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার।। ১৫৫
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি।। ১৫৬
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি।। ১৫৭

কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম স্থাপ ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি।। ১৫৮
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম।। ১৫৯
স্রুক্ স্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া।। ১৬০
দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে।। ১৬১
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা করে মহারাজরূপে অবতরি।। ১৬২
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ গোপ্য সংকীর্তন ধর্ম।। ১৬৩
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার।। ১৬৪
মৎসরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্মরূপে তুমি সব জীবের আধার।। ১৬৫
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার।। ১৬৬
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার।। ১৬৭
বালি ছল অপূর্ব বামনরূপ হই।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।। ১৬৮
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধর রূপে কর অনন্ত বিহার।। ১৬৯
বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম করল প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ। ১৭০
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কর তত্ত্বজ্ঞান।। ১৭১
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান।। ১৭২
সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলে বহু রঙ্গে।। ১৭৩
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি।। ১৭৪
সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম ভক্তির প্রচার।। ১৭৫
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্বদাস।। ১৭৬
যে তোমার পাদপদ্মধ্যান নিত্য করে।
তা সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।। ১৭৭
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্মল।। ১৭৮
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস।। ১৭৯

তথাহি পদ্মপুরাণে—
পড্ভ্যাং ভূর্মোদশো দৃগ্ভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্যতে রাজন্
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ।। ৭

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষ্যৎ হইয়া।
করিয়া কীর্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।। ১৮০
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইয়া বেদ গোপ্য বিষ্ণুভক্তি।। ১৮১
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি।। ১৮২
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সভে ইহার কারণ।। ১৮৩
যে তোমার নামে প্রভু সর্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।। ১৮৪
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সভার দেখিতে ভাগ্য হয়।। ১৮৫
এত দিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে যে চির অভিমত।। ১৮৬

যে তোমারে যোগেশ্বর সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে।। ১৮৭
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচীজগন্নাথ গৃহে যথা অবতার।। ১৮৮
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে।। ১৮৯
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।। ১৯০
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল।। ১৯১
সংকীর্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার।। ১৯২
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়।। ১৯৩
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।। ১৯৪
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরি বোল হরি বোল বলি সবে ধায়।। ১৯৫
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়।। ১৯৬
অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।। ১৯৭
সভে বোলে আজি বড় বাসিয়া উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।। ১৯৮
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন।। ১৯৯
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন।
সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ।। ২০০
হরি বোল হরি বোল এই সভে শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।। ২০১
চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।। ২০২
হেনই সময়ে সর্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।। ২০৩

ধানশী

রাহুকবলইন্দু পরকাশ নামসিন্ধু
কলিমর্দন বান্ধে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ ভুবন চতুর্দশ
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।। ১।। ২০৪
হে মাই হে মাই দেখত গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক শোক সব নাশল
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ।।২।। ২০৫
দুন্দুভি বাজে শতশঙ্খ গাজে
বাজয়ে বেণু বিষাণা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিত্যানন্দ ঠাকুর
বৃন্দাবনদাস রস (গুণ) গানা।।৩।। ২০৬

ধানশী

জিনিঞা রবিকর অঙ্গ মনোহর
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহি বিচারি।। ধ্রু।। ২০৭
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে
চৌদিকে শুনিঞা উল্লাস।
এক হরিধ্বনি আব্রহ্ম ভরি শুনি
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ।। ১।। ২০৮
চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর
দোলয়ে তাঁহা বনমাল।
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল।। ২।। ২০৯

দেখিয়া চৈতন্য ভুবনে ধন্য ধন্য
উঠয়ে জয় জয় নাদ
কোই নাচত আনন্দ গায়ত
কলি হৈলা হরিষে বিষাদ।।৩।। ২১০
চারিবেদ শির মুকুট চৈতন্য
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিতাই ঠাকুর
বৃন্দাবনদাস (তছু পদে) গানে।।৪।।২১১

পাঠমঞ্জরী (একপদী)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশদিক উঠিল আনন্দ।। ধ্রু।। ২১২
রূপে কোটি মদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা।।১।। ২১৩
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি।।২।২১৪
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগমন লোভে।। ৩।। ২১৫
দূরে গেল সকল আপদ্।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ্।। ৪।।২১৬
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান।। ৫।। ২১৭

নটমঙ্গাল

চৈতন্য অবতার শুনিঞা দেবগণ রে
উঠিল পরম মঙ্গাল রে।
সকল তাপ হব দেখি শ্রীমুখচন্দ্র
আনন্দে হইল বিহ্বল রে।। ধ্রু।। ২১৮
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সভেই নবরূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহো নাহি পারি রে।। ১।। ২১৯
দশদিগে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি এক ঠাঞি কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে।। ২।। ২২০
শচীর অঙ্গানে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।। ২২১
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহো নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।। ৩।। ২২২
কেহো পঢ়ে স্তুতি কাহারো হাতে ছাতি
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহো পুষ্প বরিষে
কেহো নাচে গায় বায় রে।।৪।।২২৩
সকল শক্তি অঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ড কিছুই না জানী রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবনদাস (রস) গান রে।। ৫।। ২২৪

মঙ্গাল (পঞ্চম রাগ)

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গাল জয়ধ্বনি
গায় মধুর বিশাল রে।
বেদের অগোচর আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে।। ধ্রু।। ২২৫
আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গাল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজে রে।
বহুত পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য পরকাশ
পাওল নবদ্বীপমাঝে রে।। ১।। ২২৬
অন্যোন্যে আলিঙ্গান চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহো নাহি মান রে।

নদীয়া পুরন্দর জনম উল্লাসে
আপন পর নাহি জান রে।। ২।। ২২৭

(গৌরাঙ্গসুন্দর)

ঐছন কৌতুকে আইলা নবদ্বীপে
চৌদিকে শুনি হরি নাম রে।
পাইয়া গোরা রস বিহ্বোল পরবশ
চৈতন্য জয় জয় গান রে।। ৩।। ২২৮
দেখিল শচী গৃহ গৌরাঙ্গসুন্দর
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষরূপ ধরি গ্রহণ ছল করি।
বোলায় উচ্চ হরি নাম রে।।৪।। ২২৯
সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ প্রভু জান
বৃন্দাবনদাস রস গান রে।। ২৩০

(একপদী)

(প্রেমধন রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার।।) ২৩১

হেনমতে প্রভুর হৈল অবতার।
আগে হরিসংকীর্তন করিয়া প্রচার।। ২৩২
চতুর্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া।।২৩৩
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান।। ২৩৪
দশদিগে পূর্ণ হই ওঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি।। ২৩৫
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ।। ২৩৬
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আথেব্যাথে নারীগণ জয়কার করে।। ২৩৭
ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন।। ২৩৮
শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর।। ২৩৯
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে।। ২৪০
বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তা পাছে।। ২৪১
মহা জ্যোতিবিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে।। ২৪২
লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা।। ২৪৩
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।। ২৪৪
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম করয়ে কথন।। ২৪৫
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহ হইতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন।। ২৪৬
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব জগত উদ্ধার।। ২৪৭
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন।। ২৪৮
সর্বভূত দয়ালু নির্বেদ দরশনে।
সর্ব জগতের প্রীতি হইবে ইহানে।। ২৪৯
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।। ২৫০
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম। ২৫১
ভাগবত ধর্মময় ইহান শরীর।
দেব দ্বিজ গরু পিতৃ মাতৃভক্ত ধীর।। ২৫২

বিষ্ণু যেন অবতারী লওয়ায়েন ধর্ম।
সেইমত এ শিশু করিব সর্ব কর্ম।। ২৫৩
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে আখ্যান।। ২৫৪
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান্।।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম।। ২৫৫
হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান।।২৫৬
ইহানে বলিব লোকে নবদ্বীপচন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ। ২৫৭
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস।। ২৫৮
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বোল বিপ্রে দিতে চাহ দান।। ২৫৯
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্র কান্দে।। ২৬০
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি।। ২৬১
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সভে করেন মঙ্গাল।। ২৬২
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গা সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার।। ২৬৩
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্রে হইল ভালমতে।। ২৬৪
দেবমাতা সব্য হাতে ধান্য দুর্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে চিরায়ুঃ
চিরকাল পৃথিবীতে করল প্রকাশ।
অতএব চিরায়ুঃ বলিয়া হৈল হাস।। ২৬৬
অপূর্ব সুন্দরী সব শচীদেবী দেখে।
বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো নহি আইসে মুখে।। ২৬৭
শচীর চরণ ধুলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন।। ২৬৮
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে। ২৬৯
না কেবল শচী গৃহে সর্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহন না যায়।। ২৭০
কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোকে হরি হরি ধ্বনি করে।। ২৭১
জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন কেহো মর্ম নাহি জানে।। ২৭২
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা।। ২৭৩
পরম পবিত্র তিথি মুক্তিস্বরূপিণী
যহিঁ অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।। ২৭৪
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।। ২৭৫
সর্বযাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।। ২৭৬
এতেক এ দুই তিথি করলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।। ২৭৭
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র।। ২৭৮
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।। ২৭৯
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে।। ২৮০
আদিখণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যদি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর।। ২৮১
এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।। ২৮২
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলান তারা লেখি।। ২৮৩
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।। ২৮৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।। ২৮৫
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-
জন্মবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায় ঃ ২

তৃতীয় অধ্যায়

নামকরণ ও চাপল্যবিলাসাদিবর্ণন।

জয় জয় কমল নয়ান গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ।। ১
হেন শুভদৃষ্টি প্রভু করহ আমায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়।। ২
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী গৃহে দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ।। ৩
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।। ৪
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।। ৫
যত আপ্তবর্গ আগে সর্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সভে থাকি বালক আবরে।। ৬
বিষ্ণুরক্ষা কেহো কেহো দেবীরক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পঢ়ি ঘর কেহো চারিদিক বেঢ়ে।। ৭
তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।। ৮
পরম সংকেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন।। ৯
সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ
কৌতুক করয়ে সে রসিক দেবগণ।। ১০
কোনো দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাম্ভায়ে।
দেখি সভে বোলে এই চোরা যায়ে।। ১১
নরসিংহ নরসিংহ কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি।। ১২
নানা মন্ত্রে দশদিগ কেহো বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে ।। ১৩
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বোলে এই জাতহারিণী পলায়।। ১৪
সভে বোলে ধর ধর এই চোরা যায়।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহো ডাকয়ে সদায়।। ১৫
কোনো ওঝা বোলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিয়া নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল।। ১৬
সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে।। ১৭
বালক উত্থান পর্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন।। ১৮
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তরে গেলা ষষ্ঠী স্থান। ১৯
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নার গণ।। ২০
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।
সভারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান।। ২১
বালকেরে আশিসিয়া সর্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ।। ২২
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।। ২৩
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন। ২৪
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।। ২৫
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে।। ২৬
জানিঞা প্রভুর চিত্ত সর্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি।। ২৭
আনন্দে করয়ে সভে হরি সংকীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন।। ২৮

এইমতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে।। ২৯
যে সময় যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে।। ৩০
বিচারিয়ে সকল ফেলায় চারিভিতে
সর্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে।। ৩১
জননী আইসে হেন জানিঞা আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে। ৩২
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সর্বদ্রব্য গড়াগড়ি যায়।। ৩৩
কে ফেলিল সর্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাতের সহিত দেখে ভাঙা দধি দুগ্ধ।। ৩৪
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে।। ৩৫
সর্ব পরিজন আসি মিলল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহো নাহি আর।। ৩৬
কোহো বোলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে। ৩৭
শিশু লঙ্ঘিবার না হইয়া ক্রোধমনে।
অপচয় করিয়া পলাইল নিজ স্থানে।। ৩৮
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ।। ৩৯
দৈব অপচয় দেখি দুইজন চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে।। ৪০
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নামকরণের কাল হৈল সম্মুখ।। ৪১
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান।। ৪২
বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সভে সিন্দুরভূষণ।। ৪৩
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বলে আর।। ৪৪
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি।
শেষ যে জন্মায়ে তার নাম সে নিমাঞি।। ৪৫
বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার।। ৪৬
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে।। ৪৭
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।। ৪৮
অতএব ইহান শ্রী বিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান।। ৪৯
নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকি সর্বজন।। ৫০
সর্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে।। ৫১
দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল।। ৫২
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিয়া করিলেন উপনীত।। ৫৩
জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় করহ সত্বর।। ৫৪
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।। ৫৫
পতিব্রতাগণে জয় দেই চারিভিত।
সভেই বোলেন বড় হইব পণ্ডিত।। ৫৬
কেহ বোলে শিশু হৈব পরম বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব।। ৫৭
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর।। ৫৮
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে। ৫৯
প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্তন।। ৬০

শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে।। ৬১
নিরবধি সভার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান। ৬২
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে।
বেদশাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে।। ৬৩
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্তন।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।। ৬৪
জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।। ৬৫
পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে। ৬৬
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়।। ৬৭
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া।। ৬৮
আথেব্যথে সভে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে।। ৬৯
গরুড় গরুড় করি ডাকে সর্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন।। ৭০
প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।
পুন ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন।। ৭১
ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে।। ৭২
কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পঢ়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।। ৭৩
কেহো বোলে বালকের পুনর্জন্ম হৈল।
কেহো বোলে জাতিসর্প তো না লঙ্ঘিল।। ৭৪
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সভে আনেন ধরিয়া।। ৭৫
ভক্তি করি যে এ সব বেদ গোপ্য শুনে।
সংসার ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে।। ৭৬

এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ।। ৭৭
জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ।। ৭৮
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।। ৭৯
আজনুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর।। ৮০
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর।। ৮১
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়।। ৮২
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত।। ৮৩
কানাকানি করে দোঁহে নির্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।। ৮৪
হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমায় ঘরে হেন গুণবন্ত।। ৮৫
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি।। ৮৬
তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবত না শুনে। ৮৭
ঊষঃকাল হইতে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়া সভে করে সংকীর্তন।। ৮৮
হরি বলি নারীগণে দেই করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী।। ৮৯
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীয় কোলের উপর।। ৯০
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ।। ৯১
হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন।। ৯২

নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।। ৯৩
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়।। ৯৪
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জনে না চিনে সেই দেই ততক্ষণ।। ৯৫
সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।। ৯৬
যে সকল স্ত্রীগণ গায়েন হরিনাম।
তা সভারে আনি সব করেন প্রদান।। ৯৭
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ। ৯৮
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।। ৯৯
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনি চুঁরি করে।। ১০০
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙে যার ঘরে কিছুই না পায়।। ১০১
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।। ১০২
দৈবযোগে কেহ যদি পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে।। ১০৩
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার।। ১০৪
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহো সভে করেন পিরীত।। ১০৫
নিজ পুত্র হইতেও সভে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব চিত্তবৃত্তি হরে।। ১০৬
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়।। ১০৭
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।। ১০৮
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলংকার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার।। ১০৯
বাপ বাপ বলি এক চোরে লৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোরে বলে।। ১১০
ঝাটি ঘরে আইস বাপ বোলে দুই চোরে।
হাসি বোলে প্রভু চল চল যাই ঘরে।। ১১১
আথেব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লই যায়।। ১১২
অর্বুদ অর্বুদ লোক কেবা কারে চেনে।
মহাতুষ্ট চোর অলংকার দরশনে।। ১১৩
কেহো মনে ভাবে মুঞি নিমু তার বালা।
এইমতে দুই চোরে খায় মনকলা।। ১১৪
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে।। ১১৫
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেই করে।
আর জন বোলে এই আইলাঙ ঘরে।। ১১৬
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়। ১১৭
কেহো কেহো বোলে আইস আইস বিশ্বম্ভর।
কেহো ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চস্বর।। ১১৮
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।। ১১৯
সভে সর্বভাবে গেলা গোবিন্দ শরণ।
প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন ভবন।। ১২০
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ ঘর আইল নিজ ঘর জ্ঞানে।। ১২১
চোর দেখে আইলাঙ নিজ মর্মস্থানে।
অলংকার হরিতে হৈলা সাবধানে।। ১২২
চোর বলে নাম বাপ আইলাঙ ঘর।
প্রভু বলে হয় হয় নামাও সত্বর।। ১২৩
সেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাথ।। ১২৪

মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘরজ্ঞানে।। ১২৫
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে।। ১২৬
সভার হৈ অনির্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হৈল যেন সঙ্গ।। ১২৭
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে।। ১২৮
গণ্ডগোলে কে কাহার অবধান করে।
চারিদিকে চাহি চোর পলাইল ডরে।। ১২৯
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেলকি বা দিলা কোন জনে।। ১৩০
চণ্ডী রাখিলেন আজি বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হই দুই চোর কোলাকুলি করে।। ১৩১
পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান।। ১৩২
এথা সর্বগণে মনে করেন বিচার।
কে আলি দেখ বস্ত্র শিরে বান্ধি ভার।। ১৩৩
কেহো বোলে দেখিলাঙ লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন দিগে করিলা গমন।। ১৩৪
আমি আনিঞাছি কোনো জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে।। ১৩৫
সভে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞি।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন ঠাঞি।। ১৩৬
প্রভু বোলে আমি গিয়াছিলাঙ গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে।। ১৩৭
তবে দুই জন আমা কোলে ত করিয়া।
কোন পথে এইখানে থুইল অনিঞা।। ১৩৮
সভে কহে মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথ আপনি।। ১৩৯
এই মত বিচার করেন সর্বজনে।
বিষ্ণু মায়ামোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।। ১৪০
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।। ১৪১
বেদগোপ্য এ আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে।। ১৪২
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে।। ১৪৩
একদিন ডাকি বলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর।। ১৪৪
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে।
রুনুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়ে। ১৪৫
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চর্তুদিগে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।। ১৪৬
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর।। ১৪৭
কি অদ্ভুত দুইজনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে।। ১৪৮
পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গৃহের মাঝেতে।। ১৪৯
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন।। ১৫০
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল নয়ন।। ১৫১
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর।। ১৫২
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননি।
ঘৃত পরমান্ন দিয়া বান্ধহ আপনি।। ১৫৩
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান।। ১৫৪
বুঝিলাঙ তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএল শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি।। ১৫৫
এই মতে দুইজনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে।। ১৫৬

আরো এককথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ সুত।। ১৫৭
পর সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যটন।। ১৫৮
ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন।
গোপাল নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন।। ১৫৯
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে।। ১৬০
কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্যতেজ অতি অনুপাম।। ১৬১
নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে।। ১৬২
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার।। ১৬৩
অতিথি ব্যভার ধর্ম যেন মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়।। ১৬৪
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।। ১৬৫
সুস্থ হই বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তানে তবে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর।। ১৬৬
বিপ্র বোলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপ মাত্র পর্যটন করি।। ১৬৭
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন।। ১৬৮
বিশেষ ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য।। ১৬৯
বিপ্র বোলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার।। ১৭০
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে।। ১৭১
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণের করিতে নিবেদন। ১৭২
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ১৭৩
ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। ১৭৪
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।। ১৭৫
ধূলাময় সর্ব অঙ্গ মূর্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর।। ১৭৬
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে।। ১৭৭
হায় হায় কবি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে।। ১৭৮
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরাসুন্দর।। ১৭৯
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে।। ১৮০
বিপ্র বোলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য।
কোন জ্ঞান বালকের মারিয়া কিবা কার্য।। ১৮১
ভালমন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে।। ১৮২
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া দীরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফূরে।। ১৮৩
বিপ্র বোলে মিশ্র দুঃখ না ভাবিও মনে।
যে দিনে যে হৈবে তাহা ঈশ্বর সে জানে।। ১৮৪
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার।। ১৮৫
মিশ্র বোলে মোরে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
আরবার পাক কর করি দেঙ স্থান।। ১৮৬
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুন পাক কর তবে সন্তোষ আমার।। ১৮৭
বলিতে লাগিলা তবে ইষ্টবন্ধুগণ।
আমা সভা চাই তবে করহ রন্ধন।। ১৮৮
বিপ্র বোলে যেই ইচ্ছা তোমা সভাকার।
করিব রন্ধন সর্বথায় পুনর্বার।। ১৮৯

হরিষ হইয়া সভে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সভে ততক্ষণে।। ১৯০
রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে।। ১৯১
সভেই বোলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল।। ১৯২
রন্ধন ভোজনে বিপ্র করেন যাবত।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবত।। ১৯৩
তবে শচী দেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া।। ১৯৪
সব নারীগণ বোলে কেমনে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই।। ১৯৫
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে।। ১৯৬
সভেই বোলেন অয়ে নিমাঞি ঢাঙ্গাতি।
কি করিবে এবে যে তোমার গেল জাতি।। ১৯৭
কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাইল জাতি রাখিব কেমনে।। ১৯৮
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল।। ১৯৯
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়ে।
এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চাহে।। ২০০
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহো হেন মায়া তান।। ২০১
সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন।। ২০২
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দসাগর মাঝে ডোলে।। ২০৩
সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদেন। ২০৪
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর।। ২০৫
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে।। ২০৬
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে।। ২০৭
হায় হায় করিয়া উঠিলা বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা এক বড়।। ২০৮
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরের লই যায় ধাওয়াইয়া।। ২০৯
মহাভয়ে প্রভুপ লাইয়া এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জগর্জ করে।। ২১০
মিশ্র বোলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য।
তোর মতে পরম অবুধ আমি আর্য।। ২১১
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে।। ২১২
সভে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে এড় আজি মারিব উহারে।। ২১৩
সভেই বোলেন মিশ্র তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার।। ২১৪
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে।। ২১৫
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়।। ২১৬
আথেব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন।। ২১৭
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যে দিনে যে হৈব তাহা হইবারে চায়।। ২১৮
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্মকথা কহিল তোমারে।। ২১৯
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেঁট করিয়া ভাবেন মহা দুখ।। ২২০
হেনেই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন মহা জ্যোতির্ধাম।। ২২১

সর্ব অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা।। ২২২
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
মূর্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ।। ২২৩
সব শাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়।। ২২৪
দেখিয়া অপূর্ব মূর্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হই একদৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন। ২২৫
বিপ্র বালে কার পুত্র এই মহাশয়।
সভেই বোলেন এই মিশ্রের তনয়।। ২২৬
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন।। ২২৭
বিপ্রেরে করিল বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার। ২২৮
শুভদিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে রয়।। ২২৯
জগতে শোধিতে সে তোমার পর্যটন।
আত্মানন্দ পূর্ণ হইয়া করহ ভ্রমণ।। ২৩০
ভাগ্যে বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার। ২৩১
তুমি উপবাস বা করিবা যার ঘরে।
সর্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে।। ২৩২
হরিষ পাইলু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইলুঁ বড় এ সব শ্রবণে।। ২৩৩
বিপ্র বোলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে।। ২৩৪
বনবাসী আমি অন্ন কোথাই বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই।। ২৩৫
কদাচিত কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন।। ২৩৬
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটি কোটি করিলুঁ ভোজনে।। ২৩৭
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে।। ২৩৮
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত।। ২৩৯
বিশ্বরূপ বোলেন বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয়।। ২৪০
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ।। ২৪১
যতেক আপনে যদি নিরালস্য হইয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া।। ২৪২
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সুখ।। ২৪৩
বিপ্র বোলে রন্ধন করিলুঁ দুই বার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার।। ২৪৪
তেঞি বুঝলাঙ আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি কেনে করহ যতন।। ২৪৫
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে।। ২৪৬
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করি তথাপিহ সিদ্ধ নয়। ২৪৭
নিশাও প্রহর দেড় দুইও বা ধায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে জুয়ায়।। ২৪৮
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
এইমত কিছুমাত্র করিব আহার।। ২৪৯
বিশ্বরূপ বোলেন নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ।। ২৫০
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সভে করিতে রন্ধন।। ২৫১
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর।। ২৫২
সন্তোষে সভেই হরি বলিতে লাগিলা।
স্থান উপস্কার সভে করিতে লাগিলা।। ২৫৩

রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেইক্ষণে।
আথেব্যথে স্থান উপস্করি সর্বজনে।। ২৫৪
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্বজন।। ২৫৫
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যে ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার দুয়ারে।। ২৫৬
সভেই বোলেন বান্ধ বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর।। ২৫৭
মিশ্র বোলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সভে বাহিরে আছয়।। ২৫৮
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বোলেন চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেলা কিছু আর না জানে নিমাঞি।। ২৫৯
এইমতে শিশু রাখিয়াছে সর্বজন।
বিপ্রেরো হইল কথোক্ষণেকে রন্ধন।। ২৬০
অন্ন উপস্কার করি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি করিতে লাগিলা নিবেদন।। ২৬১
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ২৬২
নিন্দা দেবী সভারেই ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়। ২৬৩
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন। ২৬৪
বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়।
সভে নিদ্রা যায় কেহো শুনিতে না পায়।। ২৬৫
প্রভু বোলে অরে বিপ্র তুমি ত উদার।
আমা ডাকি আন কি দোষ আমার।। ২৬৬
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।। ২৬৭
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি।। ২৬৮
সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গধা পদ্ম অষ্টভুজ রূপ।। ২৬৯

এক হস্তে নবনীত আর হাতে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।। ২৭০
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলংকার।। ২৭১
নবগুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে।। ২৭২
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল।। ২৭৩
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর।। ২৭৪
অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে।। ২৭৫
গোপযোগী গাবীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তাই দেখে পরতেকে।। ২৭৬
অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন।। ২৭৭
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তখন অঙ্গের উপর।। ২৭৮
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড় না স্ফুরে বচন।। ২৭৯
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে।। ২৮০
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন মহানদী বহে।। ২৮১
ক্ষণেক ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন।। ২৮২
দেখিয়া বিপ্রের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিয়া উত্তর।। ২৮৩
প্রভু বোলে শুন শুন অরে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর।। ২৮৪
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে।। ২৮৫

আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি।
দিখা দিলাঙ তোমারে না স্মর তাহা তুমি।। ২৮৬
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে।। ২৮৭
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে।। ২৮৮
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই মোর অন্ন দেখাইলোঁ এইরূপ।। ২৮৯
এতেক আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্যে মোর না দেখে প্রকাশ।। ২৯০
কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিব সর্বথা।। ২৯১
যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার।। ২৯২
সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইনু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।। ২৯৩
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু প্রতি ঘরে ঘরে।। ২৯৪
কথোদিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা।। ২৯৫
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজঘর।। ২৯৬
পূর্বমত শুতিয়া থাকিলা শিশু ভাবে।
যোগনিদ্রা প্রভাবে কেহো নাহি জাগে।। ২৯৭
অপূর্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হইল সকল কলেবর।। ২৯৮
সর্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন।। ২৯৯
নাচে গায়ে হাসে বিপ্র করয়ে হুংকার।
জয় বালগোপাল বলয়ে বার বার।। ৩০০
বিপ্রের হুংকারে সভে পাইলা চেতন।
আপন্য সংবরি বিপ্র কৈলা আচমন।। ৩০১
নির্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর।। ৩০২
সভারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বর চিনিঞা সভে পাউক মোচন।। ৩০৩
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্রঘরে।। ৩০৪
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু জ্ঞান।
কথা কহি সভেই পাউক পরিত্রাণ।। ৩০৫
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে।। ৩০৬
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে।। ৩০৭
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতিদিনে।। ৩০৮
বেদ গোপা এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা। ৩০৯
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যাহে শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।। ৩১০
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার।। ২২
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।। ২৩
অসম্ভব্য শুনিয়া জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ।। ২৪
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সভে বোলে দিব বাপ সংবর ক্রন্দন।। ২৫
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন।
জগন্নাথ মিশ্র সনে অভেদ জীবন।। ২৬
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।। ২৭
দুই বিপ্র বোলে মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমন বুদ্ধি কভো নাহি শুনি।। ২৮

কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর।। ২৯
বুঝলাঙ এ শিশু পরম রূপবান।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান।। ৩০
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।। ৩১
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার।। ৩২
দুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার।। ৩৩
কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়।
(যারে কৃপা হয় তানে সেই সে জানয়।।) ৩৪
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে শুনি।। ৩৫
হেন প্রভু বিপ্রশিশু রূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে।। ৩৬
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার।। ৩৭
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়।। ৩৮
হরি হরি হরিষে বোলায় সর্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্তনে।। ৩৯
কথো ফেলে ভূমেতে কথো বা কারো গায়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়।। ৪০
যে প্রভুর সর্ববেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে।। ৪১
ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর।। ৪২
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন্ জনে।। ৪৩
অন্য শিশু দেখিলে করায় কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে বাজয়ে কোন্দল।। ৪৪
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভুবলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে।। ৪৫
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন প্রণালীর বিন্দু শোভে মনোহর।। ৪৬
পঢ়িয়া শুনিঞা সর্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে।। ৪৭
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি।। ৪৮
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।। ৪৯
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তহি আসি।। ৫০
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা সনে।। ৮১
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল।। ৮২
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয় বাণী।। ৮৩
নিমাই আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া।। ৮৪
শচীর চরণধূলি লই সভে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে।। ৮৫
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে।। ৮৬
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জে গর্জে সদম্ভ বচনে।। ৮৭
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সভারে।
ভালমতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবারে।। ৮৮
এই ঝাট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে।। ৮৯

ক্রোধ করি যখন চলিয়া মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর।। ৯০
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ববালকের মধ্যে অতি মনোহর।। ৯১
কুমারিকা সভে বোলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইসেন পলাহ সত্বর। ৯২
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পালাইলা ব্রাহ্মণ কুমারী সব ডরে।। ৯৩
সভারে শিখায়ে মিশ্র স্থানে কহিবারে।
স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার। ৯৪
এই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমারাও আছি এই তাহার লাগিয়া।। ৯৫
শিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর।
গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিয়া মিশ্রবর। ৯৬
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়ে।। ৯৭
মিশ্র জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কতি গেলা।
শিশুগণ বোলে আজি স্নানে না আইলা। ৯৮
সেই পথে গেলা ঘর পঢ়িয়া শুনিঞা।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া।। ৯৯
চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ গর্জ করে বড় লাগ না পাইয়া।। ১০০
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলায়ে আসিয়া।। ১০১
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বোল পাছে তারে। ১০২
আরবার যদি আসি চপলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচর। ১০৩
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে। ১০৪
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে থাকে।
কি করিবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ রোগ শোকে।। ১০৫

তুমি যে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন।। ১০৬
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তভু তারে থুইবাঙ হৃদয় উপরে।। ১০৭
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এই সব জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ।। ১০৮
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে।। ১০৯
মিশ্র বোলে সেহো পুত্র তোমার সভার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার।। ১১০
তা সভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হই কুতূহলী।। ১১১
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেথে মোহন পুঁথি যেন শশধর।। ১১২
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর সঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।। ১১৩
জননি বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাঙ সিনান করিতে।। ১১৪
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত।। ১১৫
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল কিবা বিপ্রগণে।। ১১৬
লিখন কালীর বিন্দু আছে সর্ব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে।। ১১৭
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর।। ১১৮
সেই আলিঙ্গণে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্রদরশনে।। ১১৯
মিশ্র দেখে সর্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত।। ১২০
মিশ্র বোলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেনে স্নান করিবার।। ১২১

বিষ্ণু পূজা সজ্জ কেনে কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার।। ১২২
প্রভু বোলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সকল শিশু গেল আগুয়ানে।। ১২৩
এ সকল লোকের তারা করে অব্যভাব।
না গেলে সভে দোষ কহেন আমার।। ১২৪
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সভার অব্যভার।। ১২৫
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা স্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে।। ১২৬
বিশ্বম্ভর দেখি সভে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরি।। ১২৭
সভেই প্রশংসে ভাল নিমাঞিঃ চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রভুর।। ১২৮
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে।
এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে।। ১২৯
যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে।। ১৩০
সেইমতে অঙ্গে ধূলা সেইমত বেশ।
সেই পুথি সেই বস্ত্র সেইমত কেশ।। ১৩১
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর।। ১৩২
কোন্ মহা পুরুষ বা কিছুই না জানি।
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি।। ১৩৩
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহ পূর্ণ হৈল দোঁহে কিছু নাহি আর।। ১৩৪
যেই দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে।। ১৩৫
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কহে।
ততো এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়ে।। ১৩৬
শচী জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ পুত্ররূপে যাঁর।। ১৩৭
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায়।। ১৩৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।। ১৩৯
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শৈশবক্রীড়া
বর্ণনাং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।। ৪।।

৪৫.৪ সারাংশ

বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এর প্রথম অধ্যায়ে ‘মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র’ বর্ণনা আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জন্ম বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণন’ বিবৃত হয়েছে। এই অধ্যায় থেকেই জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর পুত্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপধামে জন-জীবনে যে প্রেম-ভক্তি-রসধারার প্লাবন বয়ে যায়, তার চিত্র উদ্ভাসিত।

শচীদেবীর গৃহ হয়ে ওঠে “আনন্দের ধাম”। শিশু গৌরাঙ্গ কাঁদলেই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যনারায়ণের আবির্ভাব ঘটেছে। নানাস্থান থেকে ভক্তগণ ছুটে আসেন সেখানে। নবদ্বীপ হল সবার মিলনস্থল। বৃন্দাবনদাসের ভাষায়—

“নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি।।’ঞ্চ

নবদ্বীপের আন্তঃসম্পদ তুলনাহীন। পবিত্র গঙ্গা বয়ে গেছে এর পাশ দিয়ে। তার একঘাটেই লক্ষ লক্ষ লোক-জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্নান করে পবিত্র হন। মহা পণ্ডিতদের সমাবেশ ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীগণ সেখানে উপস্থিত হন। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলে। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপ প্লাবিত হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপ সংকীর্তনে মুখর। ঠিক সেই পুণ্যলগ্নেই শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্মমুহূর্তে শচীদেবীর ঘরে আনন্দ-কলরবে মুখর। নানাদ্রব্য দিয়ে নবজাত শিশুকে নারীগণ আশীর্বাদ করেন। চৈতন্যের কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলে হরিধ্বনি দেয়। হরিসংকীর্তনের শচীদেবীর গৃহ মুখর। শ্রীকৃষ্ণের মতোই নবজাত শিশুর আচার-আচরণ। ঘরের জিনিস সব ওলোট-পালোট। ‘ভাতের সহিত দেখে ভাঙা দধি দুগ্ধ।’ চৈতন্য তখন ৪ মাসের শিশু। ঘরের এই অবিন্যস্ত অবস্থা দেখে নানা জনে নানা কথা বলে। পণ্ডিতগণ বিশ্বম্ভর আর পতিব্রতাগণ নিমাই নামে চৈতন্যদেবের বাল্য নাম ঠিক করেন। নামকরণের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন। শিশুর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিসংকীর্তন শুরু।

দিনে দিনে শচীনন্দন বেড়ে ওঠেন। তার ভয় ডর নেই। সাপ দেখলেই তাকে ধরে। কুণ্ডলী পাকানো সাপের উপর নির্ভয়ে শিশু শুয়ে থাকে। তার রূপ সৌন্দর্য্য চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়। গৌরবর্ণ, কমল রূপ নয়ন, অরুণ-অধর-সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিতামাতা বলাবলি করে—“কোন্ মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।” হরিধ্বনি শুনলেই শিশু হাসে আর নাচে। ভোরবেলা থেকেই নারীগণ শিশুকে ঘিরে সংকীর্তন করে। ঘরের বাইরে গিয়ে যে যা দেয় তাই সে আনন্দে খায়। সবাই বালকের বুদ্ধি দেখে হতবাক্। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের বেলায় বালক ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ায় এবং চুরি করে নানা জিনিষ খায় এবং কারো ঘরে কিছু না পেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে ফেলে। একদিন রাতে দুই চোরের চৈতন্যকে অপহরণের বৃত্তান্তে দেখা যায়—তাদের কাঁধের উপর বসে চৈতন্য হাসছে—মানুষজন তাকে ‘বিশ্বম্ভর’ ‘নিমাই’ বলে ডাকাডাকি শুরু করে। চোরেরা নিজেদের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যাবার বদলে নিয়ে আসে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। বাবার কোলে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিধ্বনি ওঠে। দুই চোর এই ঘটনায় অবাক হয়ে সবকিছু ভেল্কি মনে করে পালিয়ে যায়। সকলে সমবেত হয়ে ঘটনার

কথা জানতে চায় আর শ্রীচৈতন্য সব বৃত্তান্ত জানায়। সকলে দৈবের মায়া ভাবে। পিতা জগন্নাথ একদিন পুত্রকে তাঁর বই আনতে বলেন। চারদিকে রুনুঝুনু বাজনা অথচ চৈতন্যের পায়ে নূপুর নেই। পুত্র বই পিতাকে দিয়ে খেলতে যায়। ঘরের মধ্যে 'অপরূপ পাদচিহ্ন'। সেই সব পাদপদ্ম দেখে পিতা-মাতা বিস্মিত।

এক কৃষ্ণভক্ত তীর্থ পর্যটনে বের হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য দান না করে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। দেশভ্রমণ করতে করতে তিনি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত। তাঁর কণ্ঠে শুধু 'কৃষ্ণ' নাম। পরম আতিথেয়তায় তাঁকে বরণ করেন জগন্নাথ। কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ নিজ হাতে রান্না বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করে ধ্যানমগ্ন হন। ঠিক সেইসময় তাঁর সামনে উপস্থিত 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'। সে তাঁর নিবেদিত অন্ন থেকে হাসিমুখে একগ্রাস অন্ন মুখে তুলে নেয়। এ দেখে জগন্নাথ মিশ্র রেগে চৈতন্যকে মারতে যান। চিত্রবর তাঁকে নিরস্ত করেন। জগন্নাথ মিশ্র পুনরায় রান্নার আয়োজন করেন। শচীদেবী পুত্রকে নিয়ে অন্য বাড়ী চলে যান। কোথাকার ব্রাহ্মণ তাঁর কুলশীল জানা নেই। তার অন্ন গ্রহণে চৈতন্যের জাত গিয়েছে বলে অভিযোগ করলে হেসে চৈতন্য বলে— 'আমি যে গোয়ালা'। তার মর্মকথা কেউ বুঝতে পারে না—সে সকলের কোলে কোলে আছে আর হাসছে। ব্রাহ্মণ রান্না শেষে পুনরায় ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনে মগ্ন ঠিক সেইসময় চৈতন্য কোল থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একমুঠো অন্ন তুলে মুখে দেয়। ব্রাহ্মণ 'হায়-হায়' করতে থাকে, আর জগন্নাথ মিশ্র লাঠি হাতে পুত্রকে তাড়া করে উত্তম মধ্যম দেবার জন্য। সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে অবোধ শিশুকে মেরে কি হবে বলে নিরস্ত করতে চায়। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বলেন—

"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তাহা হইবার চায়।।"

এরপর বিশ্বরূপ ভগবানের জ্যোতিতে চারদিক উজ্জ্বল হয়। অতিথি ব্রাহ্মণ নিজেকে ধন্য মনে করেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে আবার রান্না করতে বলেন। দু'বার রান্না করে আর তিনি অন্নপাক করতে চান না—ফলমূল খেয়ে দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের চরণ ধরে অনুরোধকে উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি পুনরায় রান্না শুরু করেন। শিশু গৌরাঙ্গকে ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। এবারও ব্রাহ্মণ অন্ন নিবেদন মুহূর্তে দেখেন শচীনন্দন সামনে। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপ তার মধ্যে দেখে—

"পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে।"

গৌরাঙ্গের পা ধরে ব্রাহ্মণ কাঁদতে থাকেন আর জন্ম-জন্মান্তরের একান্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা আশীর্বাদের কথা বলে গৌরাঙ্গ তাঁর পরিচয় দান করে। সকলে 'জয় বালগোপাল' ধ্বনি তোলে।

চতুর্থ অধ্যায় 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' নামে চিহ্নিত। এই অংশে 'হাতে খড়ি' থেকে শুরু করে পিতার কাছে ছলপড়া পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র দেখা যায়। 'হাতে খড়ি' কে শ্রীচৈতন্য অন্যান্য খেলার মতই একরূপ খেলা মনে করে। বর্ণমালা পড়তে পড়তে পাখির পাখা, আকাশের চন্দ্র-তারা পাবার জন্য বায়না ধরে। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে কিছুতেই শান্ত হয় না। কিন্তু অবাক 'হরিনাম' শুনলেই শিশু আর কাঁদে না। তাই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন শুরু করে। কিন্তু একদিন এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেদিন হরিনাম শুনেই বালক নিমাই কাঁদতে থাকে। সবাই কান্না থামানোর জন্য এটা ওটা দিতে চায় কিন্তু কান্না কিছুতেই থামে না। নিমাই বলে—

"............. যদি মোর প্রাণরক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ।।"

তাই করা হলো। পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের নৈবেদ্য যদি সবাই গ্রহণ করে তবেই নিমাই শান্ত হবে। সকলে সেই নৈবেদ্য এনে দেবে বললে নিমাই-এর কান্না থামে। শিশুর কথা শুনে দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ অবাক হয় এবং বলেন—

'এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

দুই পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করে গৌরাঙ্গের আনন্দের আর সীমা নেই। গঙ্গাতে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্নান করতে গিয়ে তাঁর কত না কাণ্ড কারখানা। জলের বুকে লুকোচুরি খেলা, জল ছিটিয়ে সন্ন্যাসীদের ধ্যান ভঙ্গ করা, পূজার আগেই বিষ্ণু পূজার প্রসাদ হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাওয়া, স্নানার্থীদের বস্ত্রাদি এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা ইত্যাদি দস্যিপনায় সবাই অস্থির। আবালবৃদ্ধ-বণিতা শচীমাতার কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে নানা নালিশ জানায়। মা নিমাইকে বেঁধে রাখবে বলেন আর পিতা রাগে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু নিমাই-এর কোনো দেখা নেই। বাল্য-লীলায় চৈতন্যের চঞ্চল ও অশান্ত রূপ ব্যাখ্যায় বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

" নানা ক্রীড়া করে কেহোনা পারে বুঝিতে।"

হাতে মুখে কালি মেখে হাতে বই নিয়ে নিমাই বাড়ি ফেরে। সকলের অভিযোগের কথা পিতা বললে শান্ত সুরে সে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" তার উপস্থিত বুদ্ধি, বন্ধু বাৎসল্যে ভরা এই অধ্যায়টি নিমাই এর বিস্ময়কর চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে পিতা-মাতা দিশেহারা। তাঁরা মনে মনে ভাবেন—

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রী বিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ম জন্মিলা মোর ঘর।।"

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চতুর্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

৪৫.৫ সার-সংক্ষেপ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়টির সারাংশে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই অংশে তিনটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপের মধ্য দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মবর্ণনা থেকে শৈশবক্রীড়া বর্ণনা পর্যন্ত নানা কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এই অংশ পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার পরিচয় পাবেন।

নবদ্বীপ ধামের কীর্তি গাথার মধ্য দিয়ে অদ্বৈত আচার্যের প্রেম ভক্তির ধারাস্নাত রূপ তার বিরোধিতার নানা কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শচীমাতার গর্ভে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম। নবদ্বীপধাম হরিধ্বনিতে মুখর।

নবজাত শিশুর নামকরণ সকলের আশীর্বাদ দান, জগন্নাথ মিশ্রের 'আনন্দধাম' কে ঘিরে ভক্তির প্লাবনধারা বয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নামকরণ ও চাপল্যাবিলাসাদি বর্ণিত হয়েছে। নবজাত শিশুকে পন্ডিতগণ ‘বিশ্বম্ভর’ আর পতিব্রতাগণ ‘নিমাই’ নাম রাখেন। ৪ মাসের শিশুকালেই নিমাই-এর আচার আচরণে কৃষ্ণসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সকলেই শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। শিশুর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। সাপের সঙ্গে অবহেলাভরে খেলা করে। তার কুণ্ডলীর উপর নিশ্চিন্তে ঘুমায়। ঘরের জিনিষ চুরি করে খায়। কারো বাড়ীতে খাবার কিছু না পেলে ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে চুরে ফেলে। রাত-দিনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার বুদ্ধি দেখে সবাই অবাক। এই অধ্যায়ে অলৌকিক দুটি ঘটনার কথা আছে। একটি হলো দুই চোরের নিমাইকে নিয়ে পলায়নের কথা। অপরটি তীর্থ পর্যটনকারী কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের কথা। দুটি ঘটনাতেই নিমাই-এর রহস্যময় লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘বাল গোপাল’ রূপী নিমাই-এর শৈশবচিত্র রোমাঞ্চকর ও রহস্যময়। চতুর্থ অধ্যায়ে “শৈশব ক্রীড়াবর্ণন’ অংশে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র আছে। ‘হাতেখড়ি’ অংশে চৈতন্যের ছেলেমানুষির সঙ্গে ‘হরিনামে’র প্রতি গভীর আসক্তি বিস্ময়কর। এই অংশে পন্ডিত জগদীশ ও পন্ডিত ভাগবতের একাদশী উপবাসের নৈবেদ্যকে ঘিরে শিশু নিমাই-এর কর্ম-কাণ্ড-অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার। গঙ্গার বুকে স্নানাদির বর্ণনায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিমাই-এর জল ক্রীড়া, নিমাই-এর নানা কৌতুককর কর্মকাণ্ড, দস্যিপনা ইত্যাদির চিত্র আকর্ষণীয়। চঞ্চল, অশান্ত, উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন হরিনামে বিভোর-সন্তানকে ঘিরে পিতা-মাতার ভাবনা এই যে তাদের পুত্র হয়তো শ্রীকৃষ্ণের মায়ারূপ ধারণ করে তাঁদের ঘরে এসেছেন।

৪৫.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিত ও কবি কৃতিত্ব

১৪৮৬ খ্রিঃ ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্ম। পন্ডিতগণ ‘বিশ্বম্ভর’, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ ‘গোরা’ গৌরাঙ্গ এবং অদ্বৈত আচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবী ‘নিমাই’ নামে চৈতন্যদেব চিহ্নিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয়েছিল—‘কৃষ্ণচৈতন্য’ সংক্ষেপে ‘চৈতন্য’। ঈশ্বরের অবতাররূপী চৈতন্য পূর্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে স্মরণীয়। পায়ে হেঁটে ভারতভ্রমণ, নীলাচলে শেষ জীবন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটানো ইত্যাদি ভাবতন্ময় জীবনকে ঘিরে একই অঙ্গে রাধা কৃষ্ণের মিলন রূপ ভক্তবৃন্দের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। মাত্র আট চল্লিশ বছর বয়সে ১৪৫৫ খ্রিঃ তাঁর তিরোভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও বাঙলা ধর্ম,সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে আপনারা ‘বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস’ অংশে অনেক তথ্য জেনেছেন। এই অংশে অবতারকল্প শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাররূপে বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও তাঁর কবিকৃতিই আলোচনার বিষয়। তবে তা আলোচনার পূর্বে চৈতন্যদেবের জীবনীকে ঘিরে সংস্কৃতে ও বাঙলা ভাষায় অন্যান্য যে সমস্ত জীবনচরিত লেখা হয়েছে তার তথ্যাদি প্রদত্ত হলো।

চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর জীবনকে নিয়ে পদ, গান, কবিতা ও নাট্যরচনা শুরু হয়। অদ্বৈত আচার্য এর পথ প্রদর্শক। তবে চৈতন্যের জীবনকাহিনী শ্লোকসূত্রে প্রথম গেয়েছিলেন মুরারি গুপ্ত তারপর স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাই সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত রচনা করেছিলেন। পরমানন্দ দাস রচনা করেন—‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক। তবে বাঙলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ হলো বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ যা পরে চৈতন্য ভাগবত’ নামে খ্যাত।

কবি পরিচিতি ঃ চৈতন্য জীবনীধর্মী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের কাব্যই সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও কাব্যগুণান্বিত। বাঙলা দেশে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী ও তথ্য প্রচারিত হয়েছে, তার অধিকাংশই ‘চৈতন্য ভাগবত’ থেকে গৃহীত।

বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য গ্রন্থে নিজের কথা বিশেষ কিছু বলেননি। চৈতন্যের এক আদি ও মুখ্য ভক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁরা ছিলেন চার ভাই। শ্রীবাস জ্যেষ্ঠ। তাঁর এক ছোট ভাইয়ের কন্যা 'নারায়ণী' বৃন্দাবনদাসের মা। মাতৃ পরিচয় ছাড়া আর কোনো জীবনী তথ্য কবি দেননি। পিতার নামও নেই। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে কবির জন্ম হয়েছিল, এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁর পূর্বসূরী সম্বন্ধে শুধু বলেছেন—

"বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।"

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ অনুচর ছিলেন। নিজেকে তিনি নিত্যানন্দের 'সর্বশেষ ভৃত্য' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের অনুমতি পেয়েই তিনি চৈতন্যজীবনী কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

"আন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে
চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।
অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান।"

চৈতন্যের জীবনী কাহিনী বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্যের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

পণ্ডিতগণের অনুমান ১৫১৯ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। কবি অল্প বয়সেই নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেনুর গ্রামে কবির শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের জন্য বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যলীলায়ব্যাস' বলে সম্মানিত হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম কবিকে আলোচ্য সম্মানে ভূষিত করেন। বৃন্দাবনদাস প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে কাব্যখানি ভূষিত করেন। কিন্তু প্রায় একই সময়ে কবি লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস) চৈতন্যমঙ্গল' নামে একখানি কাব্য লেখেন। দুটি কাব্যের নাম এক হলে ভবিষ্যতে গোলমাল হবার সম্ভাবনা দেখে মা নারায়ণী বোধ হয় পুত্রকে কাব্যের নাম বদল করার নির্দেশ দেন। বৃন্দাবনদাসও মায়ের কথামত গ্রন্থের নাম বদলিয়ে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যমত হলো 'চৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে বলে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কাব্যখানির নামকরণ করেন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। এই অনুমানটি অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

'চৈতন্যভাগবতের'র রচনাকাল নির্দেশ করা সহজ নয়। ১৫৩৩ খ্রিঃ, ১৫৪৮ খ্রিঃ, ১৫৭৪ খ্রিঃ ইত্যাদি নানা গবেষক বিভিন্ন খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প কিছুদিনের মধ্যে কাব্যখানি রচিত হয়েছে। ১৫৪২ খ্রিঃ পরে কাব্যখানির রচনা সমাপ্ত হয়। এরচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য কোনো যুক্তিসংগত সন-তারিখ পাওয়া যায় না।

কাব্য পরিচিত ও কবিকৃতি ঃ বৃন্দাবনদাস তিনখণ্ডে কাব্যখানিকে বিন্যস্ত করেছেন। আদিখণ্ড (পনেরো), মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ), অন্ত্যখণ্ড (দশ) মোট একান্নটি অধ্যায়ে এই সুবৃহৎ জীবনীকাব্য সমাপ্ত। তবে চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অন্ত্য খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। কবি যেন হঠাৎ কাব্যের সমাপ্তি রেখে টেনেছেন। কাব্যটির এটি একটি বিশেষ ত্রুটি বলেই চিহ্নিত।

শ্রীচৈতন্যের বাল্য-কৈশোর লীলা এই এককে আলোচিত। এই পর্যায়ের চৈতন্যলীলা সম্পর্কে নানা তথ্যাদি কবি বোধ হয় গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। তবে কাব্য পরিকল্পনায় তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার লীলা প্রসঙ্গাদিও কবিকে প্রভাবিত করেছিল।

সহজ, পরিচ্ছন্ন, সর্বজন চিত্তাকর্ষী জীবনীকাব্যরূপে এর মূল অপরিসীম। অবশ্য কবি অধিকাংশ স্থানে অলৌকিক বাতাবরণের অন্তরালে চৈতন্যলীলা অনুসরণ করেছেন বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনী ও চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপরন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা বলে কবি কোনো কোনো জায়গায় চৈতন্যবিরোধীদের প্রতি কটূক্তি করেছেন। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও। এই জীবনী কাব্যে জীবনকথা, চৈতন্য ধর্মসম্প্রদায় ও চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তির কথা কবি যে রকম সরলভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার বর্ণনায় কবি যে ধরনের বাস্তবতা, সরলতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য কোনো চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। শ্রীচৈতন্যের মানবমূর্তি ও ভাবমূর্তির ভারসাম্য রক্ষায় কবির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব তারিফযোগ্য। বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুন বেদনার আবেশ ব্যাকুলতা, চৈতন্যের শৈশবকালের চাপল্যের চিত্র প্রকাশে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাপুরুষের ভাগবত জীবনালেখ্য হয়নি। কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দিক থেকে বৃন্দাবনদাসের কাব্যখানির মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

সুরে, তালে আবৃত্তি ও গান করবার উদ্দেশ্যেই কাব্যখানি লেখা হয়েছিল। এজন্য মাঝে মাঝে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি পদে ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার কবি করেছেন।

সে যুগের প্রচলিত ধুয়া-গানও কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। ছেলে-ভুলানো ছড়া জাতীয় পদও পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের সংস্কৃত জ্ঞান অগাধ ছিল। তিনি ভাগবতগ্রন্থ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থও গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এর প্রমাণ গ্রন্থের বহু শ্লোকে পাওয়া যায়। চৈতন্য নিত্যানন্দকে কবি কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গণ্য করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় ভালোবাসা ও বিশ্বাস যে ছিল তার পরিচয় কাব্যগ্রন্থে আছে। এই ভক্তি ও বিশ্বাস এবং ভালোবাসার একনিষ্ঠ কাব্যখানি কোমল মধুর ও রসাপ্লুত হয়েছে। চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা কবি প্রত্যক্ষ না করলেও তিনি চৈতন্যদেবের যে চিত্র এঁকেছেন তা জীবন্ত ও সত্যরূপ পেয়েছে। তাঁর হাতে চৈতন্যদেব রক্তমাংসে গড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক মানুষ হয়েও প্রকৃতিগত দিক থেকে 'অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, অতন্ত হৃদয় গ্রাহী মানুষ' হয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ। সূক্ষ্ম তুলির টানে বৃন্দাবনদাসের শিশু চৈতন্যের মনোরম বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

বাঙলা জীবনী সাহিত্য রচনার পথ প্রদর্শক হিসাবে বৃন্দাবনদাস চিরস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকৃত।

৪৫.৭ নবদ্বীপ চিত্র

'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে নবদ্বীপধামের সামাজিক অবস্থা জীবন্তরূপে বৃন্দাবনদাস অঙ্কন করেছেন। আদিখণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আপনারা পাঠ করলেই চৈতন্যের বাল্য লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্রের নানারূপরেখা করতে পার। এই অংশে তথ্যসহ সমাজচিত্রের তথ্যাদি দেওয়া হলো।

কলিযুগে এই জ্ঞানপীঠরূপিনী নবদ্বীপধামে চৈতন্যের আবির্ভাব। বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন চট্টগ্রামের, রাঢ় অঞ্চলের, শ্রীহট্টের, উড়িষ্যার এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকেও বহু ভক্তজন এই নবদ্বীপধামে মিলিত হতেন। নবদ্বীপের উজ্জল চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন—''নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।' এখানেই কবি থামেননি। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—'সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম, পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর'দেব প্রমুখ জ্ঞানী গুণীর অবস্থানের পাশাপাশি প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ 'ভবরোগবৈদ্য, 'শ্রীমুরারীও এখানে বাস করতেন। চট্টগ্রাম থেকে চৈতন্যবল্লভ দত্ত যেমন আসেন, তেমনি বুড়ন থেকে হাজির হন ভক্ত হরিদাস। রাঢ় অঞ্চলের এক চাকা গ্রাম থেকে আসেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। গঙ্গাতীরে ভক্তিপ্রাণা ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটত। সেখানে পবিত্রতার আলো বিকিরণ হত, নবদ্বীপে অবতাররূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটবে—এই ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে জড়ো হয়েছিলেন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ।

নবদ্বীপে পাশ দিয়ে পবিত্র গঙ্গানদী বয়ে চলেছে। তাতে বহু ঘাট। এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে। কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব সামাজিক, ধর্মীয় বাধা ব্যবধান দূর করে গঙ্গার পূণ্য সলিলে অবগাহন করে দেহ মনকে পবিত্র করে। বিদ্যার দৈবী সরস্বতীর সস্নেহ দৃষ্টিপাত ঘটেছে নবদ্বীপে। যার ফলে এখানে মহা পণ্ডিতদের সমাবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনি বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপেও নবদ্বীপ সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপকের যেমন সীমা-সংখ্যা নেই, তেমনি পাঠার্থীরাও সীমাহীনতা নবদ্বীপকে করেছে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্রস্থল হলেও ভক্তি রসের ধারা তখনও প্রবাহিত হয়নি। আমরা জানি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এ তিনের যোগফলেই মানুষ পূর্ণ হয়। প্রাক্ চৈতন্য যুগে নবদ্বীপে 'ধর্মকর্ম' ছিল, কিন্তু ভক্তি ছিল না। মঙ্গলচণ্ডীর গীত নবদ্বীপকে মুখর করে তুলত। কেউ কেউ 'বিষহরি'র পূজাও করত। এইসব পূজা পার্বনে দেব-দেবীর নানা প্রতিমা বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হতো। পুত্র কন্যার বিবাহে আড়ম্বরের ঘাটতি ছিল না। বিষয়-বাসনাযুক্ত মানুষেরা ভক্তিহীনভাবে দিন যাপন করতো। শাস্ত্র অধ্যয়নই একমাত্র কর্ম ছিল কিন্তু যুগধর্ম ব্যাখ্যান বা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন তখন নবদ্বীপে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। গঙ্গাস্নানের সময় শুধু কেউ কেউ 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করত। গীতা-ভাগবত যে সব পণ্ডিত জানতেন বা পড়তেন, তারা শুধু রসশূন্য তত্ত্বকথাই শোনাতেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র ভক্তিরস ছিল না। এককথায় তৎকালীন নবদ্বীপের সংসার ছিল ভক্তিহীন। তবে ভক্তিরস পিপাসু যারা ছিলেন তারা মনে মনে দুঃখ পেতেন।

নবদ্বীপবাসী যখন বিষয়-বাসনা সুখে মগ্ন ঠিক সেই মুহূর্তেই বৈষ্ণব সমাজের অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব নবদ্বীপে। তিনিই প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে যুক্ত করে 'কৃষ্ণপদ ভক্তিসার'—তত্ত্বটি প্রচার করেন। গঙ্গাজল ও তুলসীর মঞ্জুরী দিয়ে রাতদিন কৃষ্ণের সেবা করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভক্তিযোগশূন্য নবদ্বীপের জন্য মনে দুঃখ পান। তৎকালীন যুগে মদ-মাংস যজ্ঞ পুজাও হতো, কেউ বা নানা উপাচারে বাশুলী দেবীর পূজাও করত। রাতদিন চলতো নাচ, গান ও বাজনার মত্ততা। কেউই কৃষ্ণনাম শুনতে চাইতো না। এই বিষয় বাসনাযুক্ত, অধঃপতিত নবদ্বীপবাসীর উদ্ধার চিন্তায় অদ্বৈত মহাপ্রভু গভীর ভাবনায় মগ্ন হন। তিনি প্রথমে সংকীর্তনের মাধ্যমে মৃত জীবনে আনতে চাইলেন নূতন ভক্তির প্রাণবন্যা। শ্রীকৃষ্ণের পূজা পার্বন একাগ্রচিত্তে করে তিনিই নবদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে চৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপে এরপর পণ্ডিত শ্রীবাসের মন্দিরে 'চৈতন্য বিলাস' স্থাপিত হয়। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণনাম শুরু করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। একদিকে শুরু হয় সংকীর্তন অন্যদিকে পাষণ্ডের দল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু করে। শ্রীবাস নিজের ঘরে বসে কৃষ্ণনাম করেন। ব্রাহ্মণের দল আশঙ্কায় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর সংকটে আবর্তিত হয়েও জোরালো কণ্ঠে বলেন—

"শোনো শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।।"

শুধু কথা হয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু। নিজের মন্দিরেই কৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন, আর ভক্তিযোগের কথা শোনেন। ভাগবতের এইসব পরম ভক্তগণ নবদ্বীপ ধাম ঘুরে ঘুরে ভক্তির প্রচার করেন। ভক্তিযোগের কথা শুনে কেউ কেউ আবেশে বিহ্বলিত হন, আবার কেউ কেউ বহমান স্রোতের বিরোধিতার জন্য দুঃখ পান। নানাদিক থেকে বাধা আসে। তবু ভক্তিবাদীরা নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন। এরপরই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপধাম প্লাবিত হয়। এই প্লাবন ধারার মধ্য দিয়েই মাতা শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম।

ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণে মত্ত বিষয় বাসনাযুক্ত নবদ্বীপের সামাজিক অবিন্যস্ত অবস্থার মধ্যেই কীভাবে অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলেছিল, তার স্পষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করলেই আপনারা জানতে পারবেন। নবদ্বীপের সমাজচিত্রটি যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক ধারাতেও স্নাত। সাহিত্য-সমাজের প্রকৃত দর্পণ। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে তারই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব শক্তি, সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও জনচিত্ত মুগ্ধ করার শক্তি যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন সামাজিক প্রথা, সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব—ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনুপুঙ্খ বাস্তব পরিচয় দানের সুনিপুণ দৃষ্টি ও দক্ষতা ছিল। এসবের জন্যই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের কাছে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে মূল্যবান গ্রন্থ বলে সমাদৃত। তাঁর আদিখণ্ডটি সম্পূর্ণ নবদ্বীপকে ঘিরেই রচিত।

৪৫.৭.১ সমাজচিত্র

রাসলীলাকে ঘিরে গোপীসমাজে অনন্ত প্রেমের বন্যা বয়ে যেত। প্রথমদিকে জগতের উৎপত্তি স্থিতিলয়ের তত্ত্ব রয়েছে। আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কবি তিনখণ্ডের মূল বিষয়বস্তুকে সূত্রাকারে তুলে ধরে মুখবন্ধের সূচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই কৃষ্ণের অবতাররূপী শ্রীচৈতন্যের কলিযুগে আবির্ভাব এবং হরি সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে গৌরচন্দ্রের অবতার রূপটি তুলে ধরেছেন। নবদ্বীপ চিত্রের মধ্যে এর আলোচনা কিছুটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চৈতন্যের জন্ম মুহূর্ত থেকে সমাজ জীবনের চিত্রও খুবই আকর্ষক।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধাম সংকীর্তনের মুখর। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই হরধ্বনিতে মেতে পুষ্পবৃষ্টি করছে— সেই আনন্দ-রস-ঘন মুহূর্তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মানুষের খুব অনুরাগ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহা জ্যোতির্বিদদের গণনায়—

"লগ্নে যত দেখি বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তারে দিতে নাহি সীমা।।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে বিদ্যা
অল্পেই হইব সর্বগুণের নিধান।।"

চৈতন্যের জন্ম লগ্নে ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। এছাড়া তৎকালীন সমাজে জাত-পাত, শৈব-বৈষ্ণব, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সম্প্রীতি ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসিত হিন্দুধর্মের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর প্রতি চলত ধর্মের নামে নানা অত্যাচার। এর ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে আত্মসম্মানের পথ বেছে নেয়। মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুদের প্রায়ই বিরোধ লাগতো। এই ধর্মীয় নগ্ন দ্বন্দ্ব অভিঘাতের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপনের জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব। চৈতন্যের জন্মলগ্নেই নিবিড় ঐক্যের সুর সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা দ্বেষ পূর্ণ সমাজে মুসলমানগণ 'যবন' নামে ঘৃণার পাত্র ছিল।

শুভদিনে মৃদঙ্গ, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। ধানদূর্বা দিয়ে নবজাত শিশুর 'চিরায়ু' কামনা করা হতো। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মকে ঘিরে সমগ্র নদীয়া জেলাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সংস্কার বলে নিত্যানন্দের জন্মলগ্ন 'মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী' আর গৌরচন্দ্রের জন্ম লগ্ন 'ফাল্গুনী পৌর্ণ-মাসী'। এই দুই তিথিকে সবাই পুণ্য বলে মনে করত। এই দুই তিথিকে ঘিরেই শুভকর্ম সম্পাদন হত।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'হাতে খড়ি' দেবার চিত্র। শিক্ষা আরম্ভের মুহূর্তে হাতে খড়ি দেবার কথা তৎকালীন সমাজে ছিল—সেই ধারা আজও বহমান। নৃত্যচর্চা, একাদশীর উপবাস পালনের কথাও আছে। গঙ্গায় স্নান নবদ্বীপের এক বিশেষ আকর্ষ। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের পূজারীরা শিবলিঙ্গ, গীতা, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা গঙ্গার তীরেই করত। শিশু বিশেষ করে কিশোরদের গঙ্গা বক্ষ ছিল জল কেলির পরম আকর্ষণ স্থল। যজ্ঞাদির ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পিতা-মাতা-সন্তানের কল্যাণ কামনায় আগ্রহী ছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৌরাঙ্গের 'যজ্ঞ স্বপ্নে'র চিত্রটি তার সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণকে বলা হতো 'দ্বিজ'। পৈতা ধারণ উপলক্ষে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করার রীতি ছিল। নবদ্বীপ তখন অধ্যাপক মণ্ডলীর জ্ঞানতীর্থ ছিল। ব্যাকরণ, শাস্ত্রাদি এককথায় জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ। গঙ্গা স্নান শেষে পবিত্রচিত্তে পঠন-পাঠন চলতো। গুরুগৃহে পঠন-পাঠন—এককথায় নবদ্বীপে তখন যে টোল ছিল সেই টোলেই বিদ্যাচর্চা চলত।

মধ্যযুগীয় ট্র্যাডিশনে দৈবস্বপ্ন দেখা, বরমাগা ইত্যাদি দেখা যায়। বৃন্দাবনদাসের কাব্যেও এই ধারা বহমান। জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্ন দেখা ও বরমাগা এর দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে নিমাই-এর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের চিন্তা স্বপ্নে দেখে জগন্নাথ মিশ্রের মানসিক অবস্থা এবং সহধর্মিণী শচীর কাছে তা বর্ণনার মধ্যে আমরা বিস্তৃতভাবে পাই। সন্তান-সন্ততিকে ঘিরে তৎকালীন পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। কিন্তু সেই পুত্রের সন্ন্যাসী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা তৎকালীন পিতৃ-মাতৃ-সর্বস্ব স্নেহ ভীরু সংসার জীবনের চিত্রটি বৃন্দাবনদাস সযত্নে তুলে ধরেছেন। ফুলের মালা, চন্দন ইত্যাদি ছিল তৎকালীন যুগে পবিত্রতার প্রতীক।

"দিব্যমালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গা স্নান করি চাঞ পূজিবারে।।"

গৃহ বধুরা মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে ঘরে যেত তার প্রমাণও আছে। গৌরাঙ্গদেবের কলস ভেঙে ফেলার দৃষ্টান্ত তার সাক্ষ্য বহন করে। ঘরে শিকা টাঙানো থাকতো, তার উপরে তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য ইত্যাদি রাখা হত। গৌরাঙ্গদেবের ঘরে 'লঙ্কাকাণ্ড' দৃশ্যে তা বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ্মীপূজা, বেদপাঠ ঘরে ঘরে হতো। তৎকালীন সমাজে অলৌকত্বের ছাপ ছিল। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় নূপুরের শব্দ, পায়ের ছাপ, গঙ্গা পূজার শেষে গৌরাঙ্গের দুইতাল সোনা মাকে এনে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ মাথা মুণ্ডণ করে পৈতা ধারণ করে প্রকৃত 'দ্বিজ' হতো। শাস্ত্র পাঠ ঘরে ঘরে হত। তৎকালীন

সমাজ জীবনে পুত্রকন্যাদির অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে সবাই মত্ত থাকত। কেউ কৃষ্ম নাম করতো। না। মাঠে মাঠে গোরু চরাত, শিশুরা ধনুকের বাণ মেরে তার পেড়ে তা মনের আনন্দে খেতো। তীর্থযাত্রা তখন আকর্ষণীয় ছিল। বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কাশী ইত্যাদি স্থানে তীর্থযাত্রায় সবাই যেতো। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সমাজে পরনিন্দা পরচর্চাও ছিল। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন সমাজ জীবনের অনেক খণ্ড খণ্ড চিত্র আমরা পাই। তবে প্রতিটি চিত্রই বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত, যার ফলে চৈতন্যের ভাবলীলা স্ফুরণে এই জীবন্ত সমাজচিত্র নানাভাবে সাহায্য করেছে। ভাববাদী ভক্তিবাদী কবি বৃন্দাবনদাসের বাস্তববাদী দৃষ্টি ভঙ্গির প্রমাণ আমরা আদিখণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে পাই। আপনারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করে তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা তথ্য জানতে পারবেন। এখানে সেই তথ্যগুলিই সন্নিবেশিত হল। এই অংশটি পাঠ করে নবদ্বীপ ও এই শহরকে কেন্দ্র করে নদীয়া জেলার সমাজ জীবনের কথা জেনে নিজের ভাষাতেই সবকিছু লিখতে পারবেন।

৪৫.৮ শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ "মিশ্র পুরন্দর" বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন। মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ-শচীদেবীর সংসার মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। বড় ছেলে বিশ্বরূপ। তারপর কয়েকটি সন্তানের জন্ম মুহূর্তে মৃত্যু। শেষে বারো বছর পরে ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রিঃ) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্ম মুহূর্তে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে, গঙ্গাতীরে স্নানার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন। নবদ্বীপের পথ ঘাট শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতেও হরি সংকীর্তনের মুখর। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় চৈতন্যের জন্ম বর্ণনা আপনারা পাবেন। চৈতন্যের জন্ম লগ্নের বার্তার বর্ণনায় দেখা যায়—

"গৌরচন্দ্র আর্বিভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।"

শ্রীচৈতন্যের গায়ের রঙ ছিল খুব ফর্সা। তাঁর দেহকান্তির জন্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তার নাম রাখে "গোরা"- "গৌরাঙ্গ", আর অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম দেন "নিমাই"। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'বিশ্বরূপে'র সঙ্গে মিল রেখে চৈতন্যের ভালো নাম রাখা হয় "বিশ্বম্ভর'।

শৈশব ঃ মাতার প্রবল স্নেহ, পিতার কিছুটা শাসনের মধ্য দিয়ে সাধারণ ছেলের মতোই চৈতন্যের শৈশব অতিবাহিত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচীদেবীর চোখের মণি হয়ে দাঁড়ায় চৈতন্য। অজানিত আশঙ্কায় পিতা-মাতা চৈতন্যকে টোলে পাঠাতে চাননি। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে হার মানতে হয়। মেধাবী চৈতন্য অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় পারদর্শী হন। তার জ্ঞান-যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পিতার মৃত্যু চৈতন্যের সংসারের দিকে মন দিয়ে যোল-সতেরো বছর বয়সেই নিজেই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সহধর্মিণীরূপে নির্বাচন করে ঘরে আনেন। টোল খুলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াতেন। সুদর্শন, চরিত্রবাণ, পণ্ডিত চৈতন্য নবদ্বীপবাসীর হৃদয় জয় করে নেয়। অদ্বৈত আচার্যের মতো বহু প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ চৈতন্যকে স্নেহাদৃত ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। চৈতন্যের সাথী-সঙ্গীরা তার আনুগত্য স্বীকার করতো। চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ে তার পরিচয় আছে। চৈতন্যদেব কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাঙলাদেশে) যান। প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের সঙ্গে তার সেখানেই মিলন ঘটে। পিতৃ সম্পত্তি দেখাশুনা করে অর্থাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যুর ঘটনা শুনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত

পান। এরপর থেকেই শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যের যাতায়াত এবং কীর্তন গানে তন্ময়তার খবর পেয়ে শচী মাতা চিন্তিত হয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এদিকে হরিদাস নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন। তাঁদের সঙ্গ পেয়ে চৈতন্য মেতে উঠলেন। কাজীর আদেশ অমান্য করে পথে পথে সংকীর্তন। চৈতন্যের জয়ধ্বনিতে নবদ্বীপ আন্দোলিত।

এরপর চৈতন্য শিষ্যদের নিয়ে গয়াতে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর কাছে তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভক্তিভাবে তন্ময় হয়ে চৈতন্য বৃন্দাবন মথুরায় ছুটে যান। সঙ্গী-সাথীরা অনেক চেষ্টায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ঘরে আর মন নেই। কিছুদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থেকে চৈতন্য পুরী চলে যান স্থায়ী বসবাসের জন্য। পুরীতে পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশী মিশ্রকে ভক্তরূপে পান। কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ীতে চৈতন্য বসবাস শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই উড়িষ্যার রাজা ও রাজপরিজন চৈতন্যের ভক্ত হন। ধীরে ধীরে বাঙলা ও উড়িষ্যার জনগণ চৈতন্যকে দেবতারূপে মেনে ভক্তি-শ্রদ্ধার আসনে বসান।

এরপর চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক বছরের উপর পদব্রজে প্রায় সবস্থান ঘুরে রামানন্দ রায়, পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর পুরীতে ফিরে তিনি পুনরায় বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অরণ্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মহানন্দে তিনি কাশীধামে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন ভক্ত তপনমিশ্র, বৈদ্য চন্দ্রশেখর ও কীর্তনীয়া পরমানন্দ। কাশী থেকে প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডলে অবস্থানের সময় চৈতন্য ভাবাবেগে মগ্ন হন। সেখান থেকে প্রয়াগে আসেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হন রূপ, রূপের ভাই বল্লভ ও সনাতনের সঙ্গে। রূপ সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে লীলাচলে ফিরে আসেন।

জীবনের শেষ আঠারো বছর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে নীলাচলেই তিনি জীবন কাটান। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৪ খ্রিঃ) রথযাত্রার পরই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কার্য-কারণ সম্পর্কে নানা অভিমত আছে। জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন, সমুদ্রের বুকে বিলীন, পায়ে কাঁটা ফুটে তা থেকে বিষাক্ত ব্যাধি, গুপ্ত হত্যা—ইত্যাদি নানা মতামত আছে। আজও শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সঠিক রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়নি।

৪৫.৮.১ বাল্যলীলা (চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বৃন্দাবনদাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু। এই অধ্যায়ে আমরা নবদ্বীপে তার ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, প্রভুর জানুগতি, সর্পের বৃত্তান্ত, চোরদ্বয়ের বৃত্তান্ত, শচী-জগন্নাথের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ, তৈথিক ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রকাশ—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ পাই। আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত চতুর্থ অধ্যায়েই মূলতঃ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। 'হাতে খড়ি' থেকে শুরু করে পিতার কাছে 'ছলপড়া' পর্যন্ত এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানামধুর চিত্র বৃন্দাবনদাস তুলে ধরেছেন।

'হাতে খড়ি'র মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজজীবনে শিশুর বিদ্যার জগতে প্রবেশের সুনা। শুভদিনে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা আজও বিদ্যমান। শিশু-সন্তান এর গুরুত্ব বুঝতে পারে না। অন্যান্য খেলার মতো শিশু 'হাতেখড়ি'কেও একরকম খেলা মনে করে। অবুঝ ক্রিয়া কৌতুকে মত্ত চৈতন্যের হাতে খড়ি দেন জগন্নাথ মিশ্র। এরপরই 'দেবী কর্ণবেদ প্রসঙ্গ'। অন্যান্য শিশু যেমন এই শুভদিনে লিখতে বসে কৌতুকবোধ করে, একটি অক্ষর লিখতেই হিমসিম খায়, শ্রীচৈতন্য তার ঠিক বিপরীত। চোখে দেখেই সে সববর্ণ একের পর এক লিখে যায়। কবির ভাষায়—

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বমনে চায়।।"

চৈতন্য যে সাধারণ শিশু নয়, বাল্যলীলার এই 'হাতে খড়ি' অংশেই তার প্রমাণ কবি তুলে ধরেছেন। এরপরই কৃষ্ণের শতনাম লেখা শিক্ষা এবং রাতদিন পঠন পাঠনে মগ্ন চৈতন্য। তার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে যেন মধু ঝরতো। সকলেই তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে বিমুগ্ধ। অন্যান্য শিশুর মতই চৈতন্যও পাখা মেলে আকাশে উড়তে চায় এবং পাখা না পেয়ে অঝোরে কাঁদে এবং ধুলায় গড়াগড়ি যায়। কখনও বা আকাশের তারা, চন্দ্রকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। আত্মীয় স্বজনেরা নানা কথার ছলে তাকে ভোলাতে চায়, তবু সেই অসম্ভব বায়না থামে না। কিন্তু অবাক হতে হয় শত অনুরোধ উপরোধ, স্নেহ-ভালোবাসায় যার জেদ যায় না সেই বালক গৌরাঙ্গ হরিনাম শুনেই চুপ করত। তার হরেক বায়নাও কোথায় যেন হারিয়ে যেত। চৈতন্যের সব চাঞ্চল্যের অবসান ঘটত হরিনামের পীঠস্থানে।

একদিন হরিসংকীর্তনে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস যখন মুখর, তখন চৈতন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। সবাই তার কান্না থামার জন্য শত চেষ্টা করে কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না করে শুধু অঝোর ঝরে কাঁদতেই থাকে। এটা ওটা দিতে গেলে নিমাই শুধু বলে—

"যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাই।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাই।"

সেখানে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের শুদ্ধ চিত্তের নৈবেদ্য সবাই যদি খায় তবেই তার অশান্ত হৃদয় হবে শান্ত। সবাই একাদশীর নৈবেদ্য এনে দেবার কথা বলেন। এরপর দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ-শিশুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তাঁর এই শিশুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ম আছেন এই অভিমত প্রকাশ করে বলেন—

"এই শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

তাঁদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গৌরাঙ্গ গ্রহণ করে এবং হরিধ্বনি দিয়ে "নাচে প্রভু আপনা কীর্তনে।" ভাবে তন্ময় হয়ে কখনো মাটিতে, কখনো কারো গায়ে, কখনো বা শচী দেবীর কোলে লুটিয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর। তারপর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরবেলায় গৌরাঙ্গ গঙ্গার জলে স্নান করতে যায়। নদীবক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হয়। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে স্নানরত লোকজন দেখে নিমাই সঙ্গী সাথীসহ সাঁতার কাটছে, কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে। কিন্তু কেউই তাকে ধরতে পারছে না। বয়স্ক লোকেরা গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে জগন্নাথের কাছে নালিশ করে। অভিযোগ গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে সাধুদের ধ্যান ভঙ্গ করে কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায়, পূজার পূর্বেই প্রসাদ খেয়ে পালায়, কারো ধুতি, কারো গীতা নিয়ে পালিয়ে যায়, কারো কানের ভিতর জল দেয়, কারো পিঠে চড়ে বসে, পূজার আসনে বসে, বালি ছিটিয়ে দেয়, স্ত্রীলোকের কাপড় পুরুষের ঘাটে, আর পুরুষের কাপড় স্ত্রীলোকের ঘাটে রেখে দেয়। এককথায় গৌরাঙ্গের দস্যিপনায় ঘাটের সবলোকই অস্থির। নিমাই-এর এসব দুষ্টুমির মধ্যে চিরন্তন শিশুর সহজাত স্বভাবই প্রকাশিত। সমস্ত বালিকার দল শচী দেবীর কাছে নালিশ জানায়—গৌরাঙ্গ তাদের কাপড় চুরি করেছে, শুকনো কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, ব্রতের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে, চুলে ওকড়ার ফল দিয়েছে ইত্যাদি। তাদের শুধু এসব অভিযোগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলে যে শচীমাতা যদি পুত্রের এই দামালপনা বন্ধ

না করেন তবে প্রচণ্ড ঝগড়া হবে বলে শাসায়। সকলের রাগ দুর করার জন্য মা প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি সন্তানকে বেঁধে রাখবেন। পিতাও পুত্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে গৌরাঙ্গের দেখা নেই। পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় শিশুগণ বলে—"আজি স্নানে না আইলা।" ঘাটে পিতার তর্জন গর্জন শুনে নিমাই অন্য পথে পালিয়ে যায়। বাল্যলীলায় চৈতন্যের অশান্ত ব্যবহার সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

"নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে।" হাতে বই নিয়ে বিশ্বম্ভর অন্যপথে বাড়ী ফিরছে। তার সর্বাঙ্গ কালিমাখা। অপূর্ব উপমার সাহায্যে কবি তা বর্ণনা করেছেন—

"লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।।"

পিতা ঘরে গিয়ে নিমাইকে দেখে সস্নেহে তার বিরুদ্ধে নগরবাসীর অভিযোগের কথা বললে, নিমাই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" অন্য কেউ হয়তো খারাপ ব্যবহার করেছে। তা সত্ত্বেও পিতা অভিযোগের কথা তুললে দৃঢ় কণ্ঠে নিমাই বলে যে কিছু না করেও তাকে দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিমাই তাদের আলিঙ্গন করে, তারাও নিমাই-এর উপস্থিত বুদ্ধির পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। নিমাই-এর কথাবার্তা শুনে পিতা-মাতা কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে মনে মনে তাঁরা ভাবেন—

"এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ জন্মিলা মোর ঘর।।"

বেলা দুইপ্রহরে নিমাই টোলে পড়াশুনার জন্য যায়। তার পঠন-পাঠনে আগ্রহের ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির নানা চিত্র ও পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন আছে চিরন্তন বাস্তববাদী শিশুর মনস্তত্ত্বের নানা উপাচার, তেমনি মাঝে মাঝে রয়েছে অলৌকিক-বিস্ময়কর জগতের সন্ধান। বিশেষ করে 'হাতে খড়ি'র মুহূর্তে যা দেখে তাই লেখে, হরিনাম শুনে নাচতে থাকে ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অলৌকিত্বের প্রকাশ আছে। বাস্তববোধ, ভাবাবোধ ও ভক্তিবাদের মিশ্রণে বাল্যলীলার এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ। এই বাল্যলীলার মধ্যেই তৎকালীন পারিবারিক জীবনের ছায়া সম্পাতও ঘটেছে। সহজ, সরল ভাষায়, মাঝে মাঝে অলংকারের দ্যুতিতে অধ্যায়টি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

৪৫.৯ ব্যাখ্যা, টীকা, শব্দার্থ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিটি পদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা পড়ে আপনারা পাঠ্য বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারবেন।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

পদ ১।। গৌরসুন্দর — শচীমাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান চৈতন্যদেব নামেই খ্যাত। গৌরকান্তি রূপের জন্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ডাকতেন গৌর-গৌরাঙ্গ বা গৌরসুন্দর বলে। সুতরাং এটি চৈতন্যের অন্য ডাক নাম।

পদ ২।। নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন — চৈতন্যদেব ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও গদাধরের জীবন স্বরূপ। নিত্যানন্দ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বীরভূম জেলার একচাকা-খলপপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছোটবেলা থেকেই দেবলীলা-নাটগানে অনুরাগী ছিলেন। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়—"নিত্যানন্দ ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজনপানে নির্বিকার।" কৃষ্ণলীলা শুনতে ও হরিনাম গানে তার একাগ্র অনুরাগ ছিল। শচীদেবী তাঁকে সন্তানরূপে স্নেহাঞ্চলে বাঁধেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে তিনি নীলাচলে আসেন। কিন্তু পরে চৈতন্যদেব তাঁকে বাঙলাদেশে পাঠিয়ে দেন। বৈষ্ণবভক্তগণ নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার মনে করতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই বাঙলাদেশে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের যুগলমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আটবছর পরে নিত্যানন্দ স্বর্গারোহণ করেন।

গদাধর ছিলেন নবদ্বীপধামে চৈতন্যের প্রাণের বন্ধু। গদাধরের পিতার নাম মাধব মিশ্র। গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। 'দ্বিতীয়-চৈতন্য কলেবর' (দ্বিতীয় কায়ম্) রূপে নবদ্বীপ ধামে তাঁর পরিচিতি ছিল। নিত্যানন্দ ও গদাধর শ্রীচৈতন্যের উপাসনায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন।

পদ ৫।। শ্রী সেবাবিগ্রহ — নিত্যানন্দ বলরামের অবতার রূপে নবদ্বীপে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। বলরামের মতই নিত্যানন্দ দাস্যভাবে মগ্ন হয়ে চৈতন্যের সেবায় তন্ময় থাকতেন। এই একাগ্রমগ্ন সেবা যেন নিত্যানন্দের মধ্যেই মূর্তি (বিগ্রহ) ধারণ করেছিল। 'শ্রী' শব্দটি কবি শ্রদ্ধাবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ৬।। অবিজ্ঞাত তত্ত্ব — অজ্ঞাত তত্ত্ব। চৈতন্য-নিত্যানন্দ এবং ভক্ত বা পরিকরদের গূঢ় তত্ত্বকথা কেউ জানে না। এই তত্ত্বকেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১।। ভাগবতে শুকদেবের উক্তি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার (অজ) অন্তর গভীরে সৃষ্টির স্মৃতি প্রকাশ করতে করতে যাঁর অনুপ্রেরণায় স্বলক্ষণা সরস্বতী (ব্রহ্মা) মুখ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋষভ) তিনি আমার প্রতি সদয় হোন।

পদ ৮।। নাভিপদ্ম হৈতে — নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম।

পদ ১২।। অচিন্ত্য অগম্য — যা চিন্তার অতীত।

শ্লোক ২।। হে ভূমা — সকলের অন্তর্যামী সর্বব্যাপী পুরুষ-ভগবান।

শ্লোক ৩ ও ৪।। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—জগতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, অধর্ম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেকে সৃষ্টি করি। ধর্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পদ ১৭।। যুগধর্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি প্রতিটি যুগের ধর্ম স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ধর্ম-স্থাপনের জন্যই ভগবান নানা অবতাররূপে আবির্ভূত হন।

পদ ১৯।। সর্ব তত্ত্বসার—শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। চৈতন্যের কৃষ্ণের অবতার বলে প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। এই তত্ত্বই সর্ব তত্ত্বের সার বলে চিহ্নিত।

পদ ২৩।। বিরিঞ্চি — ব্রহ্মা।

পদ ২৫।। চাটিগ্রামে — চট্টগ্রামে।

পদ ৩৫।। করি পিতা ব্যাজ—বলরাম সকলের পিতা বলে সুচিহ্নিত। তাঁর কোনো পিতা নেই। তবু নিত্যানন্দ রূপে বলরামের আবির্ভাবের ধারণা অনুযায়ী হাড়াই পণ্ডিতকে পিতা অঙ্গীকার (পিতা ব্যাজ) করেছেন।

পদ ৩৯।। তিরোতে—পরমানন্দপুরীর জন্মস্থান তিরোতে অর্থাৎ ত্রিহুতে।

পদ ৪৮।। পবিত্র গঙ্গানদী তীরবর্তী দেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের অবতীর্ণ না করিয়ে কেন এর বাইরে পাপপূর্ণ অপবিত্র দেশে এঁদের অবতীর্ণ করালেন তার কার্য কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পদ ৫৩।। নবদ্বীপ ধামের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের চিত্র বর্ণিত। এর বিস্তৃত বর্ণনা আপনারা ৪৫.৭ (ক) অংশে পাবেন।

পদ ৫৪।। ত্রিবিধ বয়সে—জীবনের তিনটি মূলস্তর — বালক, যুবক ও বৃদ্ধ।

পদ ৫৭।। নাহি সমুচ্চয়—সীমা সংখ্যা নেই অর্থাৎ অসংখ্য।

পদ ৬০-৬১।। মঙ্গলচণ্ডী—চণ্ডীদেবীর কথা এবং ৭ দিন ধরে মঙ্গলচণ্ডী গীত গাওয়া হত। 'জাগরণ পালা'তে রাত জাগতে হত। বিষহরি — যে বিষ হরণ করে অর্থাৎ দেবী মনসা।

পদ ৬৫।। না বাখানে — ব্যাখ্যা করে না।

পদ ৭৪-৮১।। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—নবদ্বীপের হাতে গোনা যে ক'জন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড়ে। পিতার সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন। শান্তিপুরে স্থায়ী বাসস্থান থাকলেও তিনি নবদ্বীপে বসবাসের স্থান রেখেছিলেন এবং টোলও খুলেছেন। অদ্বৈত মহাপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধ, শৈব ও যোগী-তান্ত্রিকদের 'চর্যা গান ছড়াও তিনি জানতেন। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য বলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারে অভিভাবকত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন 'জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু।' নবদ্বীপে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তিনি ভক্তি সাধনার ধারা নবদ্বীপের বুকে ছড়িয়ে দেন। অদ্বৈতের আহ্বানেই চৈতন্যদেব সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে নাম প্রচার করে সকল জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।

পদ ৯২।। চৈতন্যবিলাস—নবদ্বীপে পাষণ্ডীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণব গোষ্ঠী মিলিত হয়ে রুদ্ধ দ্বারে সংকীর্তন করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে চৈতন্যদেব প্রায় ১ বছর শ্রীবাসের গৃহে রাত্রে ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করেছেন এবং বিভিন্ন লীলা (বিলাস) প্রকাশ করেছেন।

ত্রিকাল করয়ে-প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে বৈষ্ণব ভক্তগণ গঙ্গা স্নান করে কৃষ্ণ পূজা সম্পন্ন করতেন।

পদ ১০৯।। মহাতীব্র নরপতি যবন—মহাপ্রতাপান্বিত মুসলমান রাজা।

পদ ১১৭।। স্কন্ধনাশ—স্কন্ধ-অর্থ গাছের গুঁড়ি। কবি এই গুঁড়ির সঙ্গে বৈষ্ণব বিরোধী পাষণ্ডীদের তুলনা করেছেন। গুঁড়ি থেকে যেমন ডালপালা বের হয় ঠিক তেমনি পাষণ্ডীদের মুখে বৈষ্ণব বিরোধী নিন্দাবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাষণ্ডীদের বিনাশ করলেই-নবদ্বীপে বৈষ্ণব বিরোধী কর্ম-কাণ্ড বন্ধ হবে।

পদ ১৩০।। অবধূতবেশ—অবধূত নানারূপ বেশ ধারণ করেন। চৈতন্যভাগবতে অবধূতের বেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

‘বেত্রবান্ধা এক কাণা কুম্ভ বামহাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র সাথে।।”

এছাড়াও আছে—“বামশ্রুতি মূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।”

পদ ১৩৪।। কশ্যপ—সকল দেবতার পিতা।

পদ ১৪৬।। অতিমহাবেদ গোপ্য—এসব তত্ত্ব কথা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ বেদেও গুপ্ত আছে।

পদ ১৫৭-১৬০।। সত্যযুগে অবতারের বর্ণনা আছে।

পদ ১৬৫-১৭৫।। এই পদগুলিতে বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা আছে। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

হয়গ্রীবরূপে বিষ্ণু পাতালে মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ংকর দৈত্যকে নিহত করে পবিত্র বেদ উদ্ধার করেন।

হিরণ্য-বিদার — নৃসিংহ অবতারে বিষ্ণু প্রহ্লাদের পিতা হরিণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে তাকে বধ করেছিলেন।

সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী — দ্বাপরে কৃষ্ণের অবতারে সমস্ত লীলার প্রকাশ।

কলিযুগে চৈতন্য অবতার। চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ হয়েছেন ভক্তির বিষয়।

সর্বশক্তি পরচারি — চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ সকল শক্তিকে নিয়োগ করেন সংকীর্তন প্রচারের মধ্যে।

পদ ১৮৬।। গঙ্গার পুরিল মনোরথ—দ্বাপরে কৃষ্ণ যমুনার তীরে লীলা করেছিলেন কিন্তু চৈতন্য অবতারে তিনি গঙ্গার তীরে লীলা করবেন। গঙ্গার এইরূপ বাসনাই ছিল—সেই মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

পদ ২০৪।। রাহু কবল ইন্দু — চন্দ্ররাহু গ্রাসিত। অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ।

পদ ২০৪-২০৬।। পঁহু — প্রভু শব্দটি ব্রজবুলি গাজে — গর্জন করে। বেণু-বিষাণা — বাঁশি ও শিঙ্গা।

পদ ২২৫-২৩০।। ডিণ্ডিম — ঢোল জাতীয় বাদ্য।

পদ ২৩৯-২৪৪।। চক্রবর্তী লীলাম্বর — ইনি চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবীর পিতা।

পদ ২৪৫-২৫৮।। বিপ্ররূপে এক মহাজন—চৈতন্যের জন্মলগ্নে উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশী এক মহাত্মা। যিনি নবজাতকের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন।

।। তৃতীয় অধ্যায়।।

পদ ২।। অমায়ায় — দ্বিধাহীন চিত্তে, অকপটে।

পদ ৬।। আপ্তবর্গ — আত্মীয়-স্বজন।

পদ ১৮-২২।। সমাজ সংস্কারের নানা কথা আছে।

পদ ২৯-৩৫।। গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় নিজের রূপ গোপন করে তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের মতো লীলা করেন।

পদ ৪৫-৫০।। শ্রীচৈতন্যের নানা নামকরণ। বিশ্বম্ভর — বিশ্বকে যিনি ধারণ ও পোষণ করেন।

পদ ৬৫।। জানুগতি চলে — হামাগুড়ি দিয়ে চলে।

পদ ৭০-৭৪।। গরুড় — বিষ্ণুর বাহন। সর্পকুলের শত্রু।

পদ ৯৯।। বিহাণে — প্রভাতে।

পদ ১৩৩।। বস্ত্র শিরে রান্ধি তার — মধ্যুযুগে মাথায় নূতন বস্ত্র বেঁধে দেওয়া সম্মানসূচক শিরোপা রূপে চিহ্নিত ছিল।

পদ ১৫৮-১৬২।। তৈর্থিকব্রাহ্মণ — যে ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান।

পদ ১৯৭।। অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি — 'ঢাঙ্গাতি' শব্দের প্রাচীন অর্থ — প্রবঞ্চক, প্রতারক। কিন্তু কবি এখানে শিশু চৈতন্যের উদ্দেশ্যে 'দুষ্টু' - 'দস্যি' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ২০৮-২১১।। একরড় — একদৌড়ে বা এক ছুটে।

পদ ২৯৭।। সুতিয়া থাকিল — শুয়ে রইলেন। যোগনিদ্রা প্রভাবে — যোগমায়ার নিদ্রার প্রভাবে।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

পদ ২-৩।। শ্রীচূড়াকরণ — হাতে খড়ির পর গৌরাঙ্গের কর্ণভেদ চূড়াকরণ সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে শিশুর মাথায় নাপিত প্রথম ক্ষুর ছোঁয়ায় এবং কানের লতি ছিদ্র করে।

পদ ২১-৩৩।। অভেদ জীবন — জগদীশ পণ্ডিত ও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ।

শ্রীহরিবাসর — একদশী ব্রত।

পদ ৫৪-৫৬।। কুল্লোল প্রদান — কুলকুচির জল ছিটিয়ে দেওয়া।

পদ ৮৪।। এড়িমু বান্ধিয়া — নিমাই-এর বিরুদ্ধে নারীদের অভিযোগের পর মাতা শচীদেবী বলেন—পুত্রকে 'বেঁধে আটকে রাখবো।'

পদ ৯৮।। কতিগেলা — কোথায় গেল?

পদ ১২৩-১২৪।। অব্যভার — অব্যবহার, খারাপ ব্যবহার।

বিশেষ বিশেষ পদ্যাংশের ব্যাখ্যা করা হলো। এই ব্যাখ্যাদি পাঠ করে টীকা-শব্দার্থ জেনে আপনারা যে-কোনো পদাংশের ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।

(ক) (১) "পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক হয় সুনির্মল।। ১৭৮
বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশঃ, হেন নিত্য হেন তোর দাস।। ১৭৯
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনী সাহিত্য রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-ভাগবত" কাব্য গ্রন্থের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় তথা 'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্মবর্ণন' থেকে গৃহীত হয়েছে।

হরিনাম সংকীর্তনের মাঙ্গলিক দিকটি কবি তুলে ধরেছেন। যে-কোনো কৃষ্ণভক্ত নাম সংকীর্তনের সময় নৃত্যকালে তাঁর পদযুগলের তালে তালে পৃথিবীর দৃষ্টিতে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ইত্যাদি দশ দিকের এবং

উর্দ্ধবাহুতে স্বর্গের সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়। নাম সংকীর্তনের সীমাহীন মাহাত্ম কবি এই পদ্যাংশে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে ব্যক্ত করেছেন।

(২) 'বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।।" ২৪৪ (ঐ)

(আরম্ভ পূর্বের ব্যাখ্যা অনুসারী হবে)

শচীমাতার ঘর আলো করে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গের জন্মের পর নবজাত শিশুকে ঘিরে আনন্দ ধারা বয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে এক মহা জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব। তিনি জন্ম লগ্নাদি বিচার করে ভবিষ্যদবাণী করেন যে—শচীমাতার নবজাত পুত্র বৃহস্পতিকে জয় করে জগৎখ্যাত বিদ্যাবান বলে পরিচিতি লাভ করবে। শুধু তাই নয়—অল্প বয়সেই সকল মানবিক উজ্জ্বল গুণাদির অধিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করবেন। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় এই অংশে পাওয়া যায়।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

(৩) "সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।।" ৭৯

আলোচ্য পদটি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় থেকে সংকলিত। 'নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণনে'-র মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের শিশুবয়সের সৌন্দর্য্যের দিকটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। শিশু চৈতন্যের সুন্দর মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটি পদ্মফুলের মতো। লেখকের ভাবনায় শিশু গোপালের রূপ-বেশ যেন চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত।

(৪) " বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তা হইবারে চায়।।" ২১৮

(আরম্ভ পূর্বের মতই, তবে প্রসঙ্গ ভিন্ন)

চৈতন্যের চাপল্যের সীমা নেই। এক তীর্থ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথিরূপে আসেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মণ দু'বার নিজ হস্তে রান্না-বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন মুহূর্তে গৌরচন্দ্র ছুটে এসে সেই অন্ন মুখে তুলে নেয়। ব্রাহ্মণ তা দেখে 'হায়-হায়' করে উঠলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে যখন শাস্তি দেবার জন্য লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তখন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের হাত ধরে কথাগুলি বলেন। বালকের মন পবিত্র নিষ্পাপ। তারা খেয়াল খুশির স্রোতে ভেসে বেড়ায়। তাই তাঁর নিবেদিত অন্ন গ্রহণের মধ্যে শিশুর কোনো দোষ নেই। তাছাড়া যেদিনে যা ঘটবে তা ঘটবেই। শত চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁর অন্ন গ্রহণ করবেন না বলেই হয়তো এমনটি হয়েছে। শিশু গৌরাঙ্গের প্রতি চরম মমতা ও ভবিতব্যকে মেনে নিয়েই ব্রাহ্মণ কথাগুলি বলেছেন।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

"সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।।" ২৩

(আরম্ভ পূর্ববৎ শেষাংশ নিম্নরূপ)

শৈশবে গৌরাঙ্গ গোপাল কান্দাকাটি শুরু করলে হরিনাম শুনেই শান্ত হতো। কিন্তু আজ ভিন্ন রূপ। গৌরাঙ্গ অঝোরঝরে কাঁদছে—শত প্রলোভনে এমনকি হরিনামের কথাতেও তারা কান্না থামে না। সে শুধু জগদীশ পণ্ডিত হিরণ ভাগবতের ঘর থেকে একাদশী উপবাসের বৈষ্ণু-নৈবেদ্য আনতে বলে। একাদশীর নৈবেদ্য খেতে পেলেই সে কান্না থামিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

(৬) "ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে জল দিয়া ভাঙে মোর ধ্যান।।" ৬৭

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ে 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' অংশের এই পদটিতে গঙ্গার ঘাটের সাধুদের দস্যি নিমাই সম্পর্কে নানা অভিযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিমাই-এর চাপল্য ও দুষ্টুমি বুদ্ধিতে গঙ্গা ঘাটের সব স্নানার্থীই অতিষ্ঠ। তাদের কেউ কেউ জগন্নাথ মিশ্রের কাছে শিশু গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে তাঁর পুত্রের জ্বালায় কেউই প্রাণমন ঢেলে স্নানাদি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। গঙ্গাতীরের ধ্যান তন্ময় সাধুদের অভিযোগ এই যে গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁদের ধ্যান ভঙ্গ করে। শিশু গৌরাঙ্গের চাপল্যের দৃষ্টান্তে অংশটি ভরা।

৪৫.১০ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তরদান শেষে .... পাতার উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানডিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের জ্যৈষ্ঠ পুত্র।	☐	☐
(খ) চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস।	☐	☐
(গ) চৈতন্যের 'নিমাই' নাম রাখেন সীতাদেবী।	☐	☐
(ঘ) নবদ্বীপধাম চৈতন্য যুগে অবহেলিত ছিল।	☐	☐
(ঙ) অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের বয়োকনিষ্ঠ।	☐	☐
(চ) শ্রীচৈতন্য ছোটবেলায় শান্তশিষ্ট ছিল।	☐	☐
(ছ) চৈতন্য হরিনাম শুনে শান্ত হতেন।	☐	☐
(জ) নবদ্বীপ গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য লোক স্নান করতো।	☐	☐

	ঠিক	ভুল
(ঝ) চৈতন্য জন্মলগ্ন মুহূর্তে নবদ্বীপে জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্য ছিল।	☐	☐
(ঞ) চৈতন্যের মুখ চাঁদের মতো ছিল।	☐	☐

২। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(ক) স্বভাবেহ —————— কারুণ্য হৃদয়।

(খ) রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা ——————— রাম।

(গ) ———— ————— বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।

(ঘ) দিনে দিনে বাড়ে প্রভু —————।

(ঙ) —————— সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।

(চ) প্রভু বলে আজি ———————— নাহি যাই স্নানে।

৩) নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন এবং .... পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন—
(১) ১৪৮০ খ্রিঃ
(২) ১৫১০ খ্রিঃ
(৩) ১৪৮৬ খ্রিঃ

(খ) চৈতন্যের আত্মীয়-স্বজন তার নাম রাখেন—
(১) বিশ্বম্ভর
(২) গৌরাঙ্গ
(৩) নিমাই

(গ) নিত্যানন্দ পরিচিতি ছিলেন—
(১) কৃষ্ণরূপে
(২) বিষ্ণুরূপে
(৩) বলরামরূপে

(ঘ) চৈতন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জলকেলি করতেন—
(১) গঙ্গা বক্ষে
(২) যমুনা নদীতে
(৩) পদ্মা নদীতে

(ঙ) দুই চোর চৈতন্যকে কাঁধে করে নিয়ে পালানোর সময় চৈতন্য—

(১) কেঁদেছে
(২) হেসেছে
(৩) ছট্‌ফট্ করেছে

(চ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সমাপ্ত হয়েছে—

(১) পাঁচ খণ্ডে
(২) তিন খণ্ডে
(৩) চার খণ্ডে

(ছ) বৃন্দাবনদাসের কাব্যগ্রন্থের প্রথম নাম ছিল—

(১) চৈতন্যমঙ্গাল
(২) চৈতন্য চরিতামৃত
(৩) চৈতন্যভাগবত

৪। বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থখানির নামকরণের তথ্যাদি ১৫টি বাক্যে নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন।

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

৫। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

____
____
____
____
____

৬। চৈতন্য ভাগবতের ২য় অধ্যায় থেকে ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত ৩টি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করো। সেগুলি থেকে যে-কোনো একটি অলৌকিক ঘটনা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৭। চৈতন্যদেবের জীবনীর বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করুন।

৮। নবদ্বীপের জীবন চিত্র নিজের ভাষায় দশটি বাক্যে প্রকাশ করুন।

৯। চৈতন্যদেবের সমকালীন সমাজচিত্রের বাস্তব রূপ রেখাটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

১০। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাখ্যা করুন।

(ক) "কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রী চৈতন্য নারায়ণ।" ২০

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(খ) "সর্ব নবদ্বীপে দেখ হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।।" ১৯৪

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(গ) "সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গান।।" ৫৫

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঘ) "পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবনে।।" ১১৯

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঙ) "ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর।।" ৪২

(চতুর্থ অধ্যায়)

(চ) "এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায়।।" ১৩৮

(তৃতীয় অধ্যায়)

১১। তিন চারটি বাক্যে নিম্নের এক একটি টীকা নিজের ভাষায় লিখুন।
(ক) অদ্বৈত আচার্য, (খ) তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, (গ) নিত্যানন্দ।
(ঘ) জগন্নাথ মিশ্র (ঙ) চৈতন্য বিলাস, (চ) বিশ্বম্ভর।

১২। নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।
(ক) পঁহু, (খ) ডিন্ডিম, (গ) আপ্ত বর্গ, (ঘ) বিহানে, (ঙ) একরড়,
(চ) কতিগেলা, (ছ) অব্যভার, (জ) না বাখানে, (ঝ) তিরোতে, (ঞ) বিরিঞ্চি।

১৩। বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত ছাড়া আর কয়েকজন কবিও তাঁদের গ্রন্থের নামকরণ যাঁরা চৈতন্য জীবনী বাঙলা ভাষায় লিখেছেন।

৪৫.১১ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল, (ঞ) ঠিক।

২। (ক) অদ্বৈত, (খ) নিত্যানন্দ, (গ) হরি-হরি, (ঘ) শ্রী শচীনন্দন, (ঙ) নদীয়ার, (চ) আমি।

৩। (ক) ৩, (খ) ২, (গ) ৩, (ঘ) ১, (ঙ) ২, (চ) ২, (ছ) ১।

৪। বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এর নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। ‘অপ্রামানিক প্রেমবিলাস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে “শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল” ছিল। বৃন্দাবন মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।” শ্রীখণ্ডের ‘প্রাচীন বৈষ্ণব’ নামে গ্রন্থেও বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের গ্রন্থের নাম ‘চৈতন্যমঙ্গল রূপে চিহ্নিত। একই নামে একাধিক লেখকের গ্রন্থ পাঠক, সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ভেবে এবং মাত্রা নারায়ণী দেবীর নির্দেশে বৃন্দাবনদাস নিজেই তাঁর গ্রন্থের নাম ‘ভাগবত’ রাখার নির্দেশ দেন বলে ‘প্রাচীন বৈষ্ণব’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু কবির ভাবশিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতে’ সর্বত্রই বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে ‘চৈতন্যমঙ্গাল’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। কারো কারো মতে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ রচনার পর বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে ‘ভাগবত’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

“কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।।”

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলার অভেদত্বের জন্যই গ্রন্থটির নাম ‘ভাগবত’ এবং গ্রন্থকারের নাম ‘ব্যাস বা বেদ ব্যাস’ আরোপিত হয়েছে। তবে এই মতটি সর্বসম্মত নয়। গবেষকগণ বৈষ্ণব গ্রন্থাদির মধ্যে সবচেয়ে যে পুঁথি বেশী সংখ্যায় পেয়েছেন তা ‘চৈতন্যভাগবতে’র। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে একটিতেও ‘চৈতন্যমঙ্গাল’ নামটি নেই। লোচনদাস ও তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ নামটির কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“শ্রী বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎমোহিত যার ভাগবত গীতে।।”

জয়ানন্দ ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে ‘চৈতন্যভাগবত’ই বলেছেন। ‘ব্যাস’ নামটিও চৈতন্য চরিতামৃতের আগে কর্ণপুরের গৌর গনোদ্দেশ দীপিকাতে ও বৃন্দাবনদাসকে ‘বেদব্যাস’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম থেকেই যে ‘চৈতন্যভাগবত’ ছিল এবং এই নামকরণের ব্যাপারে বৃন্দাবনদাসই যে মূল হোতা এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। **ঐতিহাসিক গুরত্ব ঃ** মধ্যযুগে নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম বাল্যলীলার নানা ঘটনা, তারপর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ, পদব্রজে ভারতভ্রমণ এবং জীবনের শেষ দিনগুলি নীলাচলে অবস্থান করে রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত অবতাররূপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বজনস্বীকৃত। মানবতাবাদে পূজারী ভক্তিরসস্নাত মিলন মঞ্চের স্রষ্টা বাঙলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। ভক্তবৃন্দের কাছে ছিলেন ভগবানের অবতার। বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ—এই দ্বৈতরূপের সমন্বায়িত অবতার রূপেই তিনি অনুগামীদের দ্বারা পূজিত। চৈতন্য জীবনীকারগণ চৈতন্যদেবের খুঁটিনাটি, তাঁর জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সব জীবনী কাব্য রচনা করেছেন তাতে নানা অলৌকিকতার পাশাপাশি, চৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনের ইতিহাসও বাস্তব রসে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্যই চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ঐতিহাসিকদের কাছ এক মূল্যবান দলিল। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ — চৈতন্যদেবের ইতিহাস সমৃদ্ধ জীবনের প্রথম সার্থক সম্পদ।

ভক্তির অতিশয্য ও অলৌকিকতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধর্ম আন্দোলনের প্রতিটি স্তর বৃন্দাবন

দাস নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তত্ত্ব ও তথ্য ও গ্রন্থে আছে। নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নানা ধর্ম-কর্ম হত।

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষ হরি পুজে কোন্ জনে।।"

এছাড়া 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে।' বড়লোকেরা জলের মতো বিনা কারণে অর্থ ব্যয় করত। 'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।' বৈষ্ণবদের প্রতি পাষণ্ডদের অত্যাচার, উপহাস কবির লেখনীতে ধরা পড়েছে—

"সকল পাষণ্ড মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।"

কিছু কিছু সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবের কথাও আছে। অবক্ষয়ী সমাজের চিত্র অঙ্কণে কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে বাঙলার শাসন-ব্যবস্থা মুসলমান কাজীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত, জাত-পাতের ভেদবুদ্ধিতে সমাজ কলুষিত ছিল, জগাই-মাধাইরূপী গুণ্ডাদের তাণ্ডব চলত। হোসেন শাহের শাসনব্যবস্থাকে কবি 'পরম দুর্বার' বলে চিহ্নিত করেছেন। উড়িষ্যার যুদ্ধকালে সুলতানের ধ্বংস লীলা, ভক্ত হরিদাসের বিরুদ্ধে শরিয়তি আইনানুসারে অন্যায়-অবিচার, চৈতন্যের কীর্তনকে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি ইতিহাস সম্মত।

ভগবানের অবতার লীলার কাহিনী বর্ণনা করেও বৃন্দাবনদাস ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে নানা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ক্রন্দনরত শ্রীচৈতন্যের হরিনাম শ্রবণে শান্ত হওয়া, দুই চোরের কাঁধের উপর চৈতন্যের হাসি, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবতের একাদশী ব্রতের নৈবেদ্যের জন্য চৈতন্যের কান্নাকাটি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে যে ঘটনাটি আপনাদের ভাল লাগে তা মূল পাঠ ও সারাংশের সাহায্যে নিজের ভাষায় লিখুন।

৭। ৪৫.৮ অংশে শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ পাঠ করে জন্ম লগ্ন, শৈশব, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, ভারত ভ্রমণ, নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ইত্যাদি অবলম্বনে নিজের ভাষায় প্রশ্নটির উত্তর দিন।

৮। ৪৫.৭ (ক) 'নবদ্বীপ চিত্র' অংশটি পাঠ করে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় উত্তর দিন। তবে নবদ্বীপের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎটির তত্ত্ব তথ্যাদি সহ উত্তরটি যাতে সমৃদ্ধ হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

৯। ৪৫.৭ এর 'ঘ' সমাজচিত্র' অংশটি যথাযথ পাঠ করে রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত সহ উত্তরটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হবেন।

১০। ৪৫.৯ অংশে কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা করা আছে। সেগুলি পাঠ করে এই ব্যাখ্যাগুলি নিজের ভাষায় লিখুন। তবে অনুশীলনীর ব্যাখ্যাগুলি লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত সূত্র প্রদত্ত।

(ক) চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপধামে নানা ধর্মের লোকজনের মধ্যে বিরোধ বিবাদ ছিল, জাত-পাতের বৈষম্যও প্রকট ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবকে ঘিরে সর্ব-জাতির সমন্বয় ঘটে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হরিসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে নিবিড় ঐক্য গড়ে ওঠে।

(খ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ মুহূর্তে শচীমাতার গর্ভে চৈতন্যের জন্ম। শিশুর জন্ম মুহূর্তে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে শ্রীহরিকীর্তনও দিকে দিকে মহানন্দের ঢেউ জাগায়।

(গ) 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানে নানা দ্রব্যাদি ছড়ানো ছিল। কিন্তু চৈতন্য অন্য কিছুতে হাত না দিয়ে পবিত্র ভাগবত গ্রন্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সবাই অবাক বিস্ময়ে তা দেখে।

(ঘ) দুই চোর যখন চৈতন্যকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন চৈতন্যকে দেখতে না পেয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়। আত্মীয়-স্বজন দিশেহারা। কবি বাস্তব-উপমা দিয়ে তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, তেমনি নিমাই হারা আত্মীয় পরিজনও মৃতপ্রায়।

(ঙ) বিশ্বম্ভর অর্থাৎ চৈতন্য শৈশবে দূরন্ত ছিল। কিন্তু হরিসংকীর্তন শুনলেই তিনি শান্ত হয়ে যেতেন। কীর্তনের সময় শিশু বিশ্বম্ভরও তন্ময় হয়ে যায়। শচীদেবীর অঙ্গনে চাঞ্চল্য রসে মগ্ন নিমাই-এর বন্ধু হয়েছে বহু শিশু। তাদের সঙ্গে তার বিচিত্র খেলায় সময় কাটাত।

(চ) চঞ্চল দস্যি ছেলে চৈতন্য তার বিরুদ্ধে কত না নালিশ? কিন্তু তার বিস্ময়কর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেউই ধরতে পারে না, ভগবানের অবতার রূপে চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ নবদ্বীপবাসী বুঝতে পারছে না।

১১। ৪৫.৯ অংশের টীকা অংশ পড়ে অনুশীলনীর টীকাগুলির উত্তর দিন।

১২। (ক) প্রভু, (খ) ঢোল জাতীয় বাজনা, (গ) আত্মীয়-স্বজন, (ঘ) সকালে, (ঙ) একদৌড়ে, (চ) কোথায় গেল? (ছ) খারাপ ব্যবহার, (জ) ব্যাখ্যা করে না, (ঝ) ত্রিহুতে, (ঞ) ব্রহ্মা।

১৩।

	কবির নাম		**গ্রন্থের নাম**
(ক)	কৃষ্ণদাস করিবাজ	—	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(খ)	লোচন দাস	—	চৈতন্যমঙ্গল
(গ)	জয়ানন্দ	—	চৈতন্যমঙ্গল
(ঘ)	গোবিন্দদাস	—	গোবিন্দদাসের কড়চা
(ঙ)	চূড়মণি দাস	—	গৌরাঙ্গ বিজয়

৪৫.১২ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক ঃ

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম পর্যায়)— ড. সুকুমার সেন।

২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস— ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩। বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বৃন্দাবন দাস - চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)— ড. অবন্তীকুমার স্যানাল।

একক ৪৬ ❒ কাব্য পাঠের ভূমিকা

গঠন

৪৬.১ উদ্দেশ্য
৪৬.২ প্রস্তাবনা
৪৬.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
৪৬.৪ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ
৪৬.৫ মূলপাঠ—১ কাব্যের আঙ্গিক
৪৬.৬ সারাংশ
৪৬.৭ উত্তরমালা
৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্য বা কবিতা কী ও সেটি পাঠ করে রসোপলব্ধি করতে গেলে যে যে বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আপনি—

- পদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ধারণ,
- কাব্যের বিষয় ও গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা,
- কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে বিচার করতে পারবেন,

৪৬.২ প্রস্তাবনা

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন বর্তমান এককটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে গদ্য পদ্যের পার্থক্য ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে দ্বিতীয় অংশে কাব্যের বিষয় ভিত্তিক ও গঠনগত বিভাজন করে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা একটু বিশেষ গুরুত্বসহ বিস্তৃত করা হয়েছে। পরবর্তী এককগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিক বা উপস্থাপনার প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্যের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। পরবর্তী এককগুলি পাঠের সময় কাব্যের গঠনগত ও আঙ্গিক বিচারে অনেকটা সহায়ক হবে।

এই এককটিতে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু পঠনগত নয়, ভাব প্রকাশেও সেটি আলোচনা করা হয়েছে। কালক্রমে গদ্যও যে ক্রমশ ছন্দস্পন্দের টানে কাব্যের সীমানায় বা পদ্য সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনে

গদ্যের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে একদিকে বিষয়নির্ভর, বর্ণনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, অন্যদিকে ব্যক্তিনিষ্ঠ, সময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কবিতা অথবা হৃদয়াবেগনির্ভর গীতি-কবিতা, প্রচলিত বা কল্পিত কোন রোমান্টিক কাহিনী বা আখ্যান অবলম্বনে রচিত আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য—সব কিছুর কথাই আমরা জানব। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির জীবনের চিন্তাভাবনা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত সংহত রূপ লাভ করে। যে কাব্যে বিষয় ও ভাবনায় বিরাটত্ব ও বিস্তৃতবোধের সঙ্গে বিস্ময়বোধের সঞ্চার করে, তাকেই সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়। এই এককের দ্বিতীয় পর্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিকের প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ বা ভাষা, কাব্যের ভাবানুভূতির তরঙ্গ বা ছন্দ, কাব্য দেহের অলংকার বা শব্দ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ বা ব্যঞ্জনাগত চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি প্রথমে পূর্বাপর পাঠ করে পরে প্রতিটি পর্যায় স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করলে উপকৃত হবেন। প্রতিটি অংশ নিবিষ্ট পাঠের পর অনুশীলনীগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

৪৬.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিগুচ্ছ হল ভাষা। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মনন যখন কবিতায় ছন্দ ছাড়াই কোন বক্তব্যকে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করে তখন যে অর্থবহ ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাই হল গদ্য। দৈনন্দিন মুখের কথা যেহেতু ছন্দে সাজানো নয়, তাও গদ্য। তবে সাধারণভাবে ছন্দ ও মিলহীন লিখিত ভাষাই গদ্য নামে অধিক পরিচিত।

গদ্য মানুষের মনীষার তার যুক্তি-বুদ্ধি মননের বাহন। মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভাষা, বিচারে ভাষা। কাব্য হল আবেগ-অনুভূতি আর কল্পনার বাহন। অনুভব আবেগের তাড়নায় ভাষায় তরঙ্গ স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আর ভাবের তরঙ্গিত প্রকাশ সূত্রেই ছন্দের স্ফূর্তি। কাব্যমাত্রেই আবেগ ও রূপের স্বতঃপ্রকাশ। মানুষের মনে যেমন ভাবের অজস্রতা আছে কাব্যেও তেমনি আছে রূপের তথা ছন্দের বৈচিত্র্য। শুধু ছন্দ নয়, স্তবক পদ ইত্যাদির সজ্জাও কাব্যের শরীরে বৈচিত্র্য আনে।

এই কাব্যের স্বরূপ নিয়ে মত-মতান্তরের সীমা পরিসীমা নেই—এদেশে—ওদেশে। প্রাচ্যে ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যে ইউরোপে—গ্রীসে, ইংলণ্ডে সাহিত্য তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রাচ্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা নিজনিজ দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেহেতু কাব্যের শিল্পকর্মের মাধ্যমে শব্দ-কাব্য শব্দার্থময়, তাই শব্দ ও অর্থের মিলনেই কাব্য একথা জনৈক আলঙ্কারিক বলেছেন। অপর একজন বলেছেন ‘অভীষ্ট (ইচ্ছানুযায়ী) অর্থ-সংবলিত পদাবলিই কাব্য। এ মতবাদের বক্তা অর্থের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যজনের মতে মাধুর্য ইত্যাদি গুণযুক্ত পদ রচনাই কাব্য। মহাকবি কালিদাস বাক্ ও অর্থের সংযোগকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়।

কাব্যশাস্ত্রকার আনন্দ বর্ধনের মতে, যদি কোন শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আনন্দময় অনুভূতম সঞ্চার করে, সেটি হল কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের আত্মা বলতে তিনি শব্দের প্রধান অর্থ বা বাচ্যকে অতিক্রম করে বিশেষ

১. “বাগর্থৌ ইব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তরে”—রঘুবংশ।

বর্ণের যে ব্যঞ্জনা পাঠক হৃদয়ে সৃষ্টি করে তাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ-এর মতে আনন্দদায়ক বা রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ধ্বনিবাদীদের মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অনেকটা সমন্বয় আনলেও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়।

পাশ্চাত্য কাব্যসংজ্ঞার প্রথম প্রবক্তা প্লেটোর মতে 'শিল্প সৃষ্টি হল অনুকরণ।' কবিরা অপরিবর্তনীয় ভাবসত্যকে নয়, প্রতীয়মান বস্তুকে অনুকরণ করেন। তিনি শিল্পের সঙ্গো নীতির আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি যা ঘটতে পারে তাই বলেন। তিনি বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের কথা বলেন। কিন্তু ইয়োরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের কালে কাব্যকে কল্পনাবৃত্তির ক্রিয়ারূপে দেখা হল। মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্য বিচার প্রবণতা এল। ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক যুগের প্রথম কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কাব্য হল গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন (Spontaneous overflow of powerful feelings) অর্থাৎ কাব্য প্রবল আবেগের উচ্ছলিত স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু আর এক রোমান্টিক কবি কোলরিজ আবেগের চেয়ে কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় একদল সাহিত্যিক নিছক রস সৃষ্টি সাহিত্যের কাজ বলে মানলেন। আর একদল সাহিত্যে নিছক বাস্তবকে ও সত্যের অলংকারহীন মূর্তিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় মতটি থেকে বস্তুতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছে। আবার ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে কাব্য হোল জীবনের সমালোচনা (Criticism of life)।

কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে শব্দ, অর্থ প্রকাশ কবি প্রতিভা, কল্পনা প্রভৃতির সম্পর্ক যে গভীর ও অনেকটা ওতপ্রোত তা বোঝা যায়। উপসংহারে বলা যায়। কবিতা বা কাব্য হল প্রতিভার স্পর্শে নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গভীর আবেগ বা অনুভবের ব্যঞ্জনাময় ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। কোনো দেখা অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায়, কিংবা স্মৃতির জাগরণে, কবি যখন তাঁর কল্পনাকে অবাধে মুক্ত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়, তার প্রকাশ হয় সুরস্য শব্দরন্ধ্রে, ছন্দ মিলের গ্রন্থনায়। এভাবে কবি তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার (যে প্রতিভা যা ছিল না তা তৈরি করে) সাহায্যে সহৃদয় পাঠকের অন্তরে কবি যে অলৌকিক আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করেন কবিতা তার অবলম্বন।

অনুশীলনী—১

আপনার পাঠের অগ্রগতি বোঝার জেন্য নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠায় উত্তরমালার সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।

১। তিন চারিটি বাক্যে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

....

....

....

....

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) __________ সাহায্যে উচ্চারিত __________ ধ্বনিগুচ্ছ হোল __________ ।

(খ) গদ্য মানুষের মনীষার তার __________ বাহন, কাব্য হল __________ বাহন।

(গ) আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে __________ বা __________ হল কাব্য।

(ঘ) অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি __________ বলেন। তিনি বিশেষকে __________ করে __________ কথা বলেন।

(ঙ) ওয়ার্ডসওয়ার্থে মতে কাব্য হল __________ __________ ।

(চ) ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হোল __________ __________ প্রকাশ।

৩। কাব্যের শব্দর্থবাদী মতবাদগুলি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৪। কাব্যের সংজ্ঞায় প্লেটোর মতাদর্শ ৩-৪টি বাক্যে লিখুন।

৫। পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের 'কাব্য' সম্পর্কে বক্তব্য অবলম্বনে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। কাব্যের সংজ্ঞা একটি বাক্যে উপস্থিত করুন।

৪৬.৩ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়ভিত্তিক বর্ণনামূলক তন্ময় (objective) কবিতা — এই শ্রেণির কবিতায় জীবনের কোন গভীর অনুভব নয়, বস্তুবিশ্বের বর্ণনাই প্রধান প্রতিপাদ্য। বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, বহির্জগতের কোন ঘটনা, বিষয় নিয়ে বা কোন জ্ঞানগর্ভ নীতি আদর্শ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনার্থে যে সমস্ত কবিতা লেখা হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত।

নীতি কবিতা (Didactic poem) — যে কবিতায় সুভাষণের মাধ্যমে নীতিকথা প্রচার করে পাঠকের জ্ঞানোদয় বা চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়, তাকে নীতি কবিতা বলে। এই ধরনের কবিতায় কবি জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও নীতি প্রচারের প্রয়োজনে লঘু বা গুরুগম্ভীরভাবে কবিতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করেন। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে 'সদ্ভাবশতক', 'নীতিসুধা' ও রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ব্যঙ্গ কবিতা, লঘু বৈঠকি কবিতা ও লালিকা (Parody-প্যারেডি) বাংলা ব্যঙ্গকাব্যের উৎপত্তি বাঙালির রঙ্গপ্রিয়তায়—নামকরণ থেকেই এটি স্পষ্ট। প্রথম দুটিতে মানুষের আচার-আচরণ চরিত্র-সমাজ রীতিনীতিকে তির্যক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্ববিরোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রধান উপজীব্য। প্রসঙ্গত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীমাৎ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার' প্রভৃতি কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের 'দামু ও চামু', 'হিংটিং ছট', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল', মোহিতলাল মজুমদারের সরয়মতী প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্য ও কবিতার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক ত্রুটি সংশোধন। প্রথমোক্তটিতে কিছু আক্রমণাত্মক উপাদান থাকলেও, দ্বিতীয়টি লঘু বৈঠকি মেজাজে উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়টির সঙ্গে Parody বা লালিকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। 'লালিক' কোন প্রতিষ্ঠিত রচনার কায়িক অনুকরণ। এটি ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি হলেও সেখানে হাস্যরসের একটা স্বছন্দ মোড়ক থাকে ; রচনাটির মাধুর্য তার কৌতকময় উপস্থাপনায়। 'লালিকা' সকল পাঠকের কাছেই আনন্দদায়ক।

Elegy (এলিজি) বা শোককাব্য—মৃতের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথায় মৃত ব্যক্তির কীর্তি ও তার সম্পর্কে কবি হৃদয়ের বেদনার আর্তি জ্ঞাপক শোকোচ্ছাসই এ কবিতার প্রধান বিষয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ, সত্যেন্দ্রনাথক দত্তের মৃত্যুতে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা "২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮" শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেকোন উৎকৃষ্ট 'এলিজি'র সঙ্গো তুলনীয়। শোকার্ত কবির শোক জ্ঞাপক ছোট কবিতাকে ইংরাজিতে ডার্জ (Dirge) বলা হয়। এ পর্যন্ত আলোচিত সবকটি কবিকর্মই বিষয় নির্ভর ও বর্ণনামূলক হলেও কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে উপজাত। কিন্তু বর্ণনামূলক অপর একটি ধারা যা কিংবদন্তি, লোক প্রচলিত বা ইতিহাস পুরাণ আশ্রয়ী কাহিনী মূলক কাব্য—যথা গাথা কাব্য (Ballad), আখ্যান কাব্য (Narrative poem), মহাকাব্য (Epic) নামে পরিচিত। এর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। গাথা ও আখ্যানকাব্য উভয়ই আখ্যান কেন্দ্রিক। প্রথমটি মধ্যযুগের শেষে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রোমান্টিক লোকগাথা হিসেবে জনজীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এতে প্রেম, বীরত্ব, দেশপ্রেম, মহত্ত্ব আত্মত্যাগ ইত্যাদির পরিচয় থাকে। গাথার রচয়িতা প্রায়ই অজ্ঞাতনামা। এতে লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টি-চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে। গাথায় পরিবেশ বর্ণনার পাশাপাশি ঘটনায় নাটকীয় দ্রুততার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই শিল্পকলাটির অনুকরণে আধুনিক কালেও বহু গাথা জাতীয় কাব্য-কবিতা রচনা করা হয়েছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রেম ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি, স্বদেশীযুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অনেক রচনাই মহত্ব, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমেরক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আখ্যানকাব্য গাথা থেকে একটু স্বতন্ত্র। এখানেও প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাস-এর অবলম্বন। রচনারীতি বর্ণনাত্মক। রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী', 'রঙ্গামতী', ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাহিনী কাব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'পুরাতন ভৃত্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যশাস্ত্র প্রণেতাদের মতে অর্থাধিক সর্গবন্ধযুক্ত পদ্যময় কাব্য বিশেষ হোল মহাকাব্য। এর নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বীর এবং সদ্বংশজাত। কাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি। এতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভাত-সন্ধ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। কাব্যটি পাঠ করলে পাঠকের মনে একটি বিশালতার ধারণা জন্মাবে, যার পরিক্রমা ফল বিস্ময়বোধ। মহাকাব্যের কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত হবে। উপস্থাপনায় নাটকের মত সূচনা, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভসন্ধি ও উপসংহার থাকবে।

পাশ্চাত্য কাব্য শাস্ত্রীদের অন্যতম অ্যারিস্টোটল-এর মতে মহাকাব্যে সমগ্রত একটি মাত্র ঘটনা ও একজন নায়ক থাকবে, তার বিষয়বস্তু হবে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, আর একাধিক উপকাহিনী মূল কাহিনীর অংশ স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাব্য বর্ণনামূলক কাব্য। এখানে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ঘটে, ফলে এর ঘটনার পরিধিও হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে অনেকটা বিস্তৃত।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শুধু আলংকারিক ব্যাখ্যা নয়, মহাকাব্যের রসাস্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য হল 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথ', এ সেই কবির রচনা যাঁর রচনার ভিতর দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ নিজ হৃদয়ের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে মানবজীবনের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। মহাকাব্য বস্তুত সমাজ জীবনের মহনীয়তার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় এই কাব্যে তুলে ধরা হয়।

এবারে কাব্যের অপর ধারা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হৃদয়াবেগ নির্ভর কবিতা—গীতিকবিতা প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। ইংরাজি Lyric শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এক সময় lyre (লায়ার) বা বীণাযন্ত্র বাজিয়ে হৃদয়ের একান্ত আবেগের কথা পল্লী কবি সুর দিয়ে গাইতেন। সেই গানের কথা লিরিক কবিতা হিসেবে পরিচিত হয়। Lyre থেকে নীম হয় লিরিক। কবির ব্যক্তিগত চেতনাই এখানে মুখ্য। একান্ত আত্মগত আবেগানুভূতি এর উপজীব্য। নানা অভিজ্ঞতা আঘাতে উঠে আসা কবিজীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের কথাই গীতিকবিতায় বিষয়। গীতিকবিতা তাই কবির মনের অব্যক্তভাবে অভিব্যক্তি বিশেষ। যে কবিতা কবি হৃদয়ের অনুভব পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে, তার হৃদয়ে দোলা দেয় আর আনন্দের হিল্লোল তোলে তাই হল গীতিকবিতা।

'ওড' (Ode)—লিরিক কবিতারই রকমফের। মহৎ ভাবের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তার গুণগ্রাম ঘোষণা করতে ছন্দোরীতিতে বৈচিত্র্য এনে এর ধরনের 'ওড' লেখা হত। এ কবিতার প্রধান গুণভাবের স্বচ্ছতা এবং ভাষা ও ছন্দের বিশুদ্ধতা।

'সনেট' (Sonnet) অর্থ মৃদুধ্বনি। চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তির সাহায্যে সুর তুলে আবেগের একটি শীর্ষকে স্পর্শ করা এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। সনেটের আঙ্গিক ও পঙ্‌ক্তির ছন্দ বিন্যাস অনেকটা সুনির্দিষ্ট। সনেট সম্পূর্ণত গীতিকাব্যধর্মী হলেও রীতিমতো ভাবগম্ভীর। গঠনে কিছুটা ধরা বাধা ব্যাপার থাকলেও প্রেমের মতো ভাবাবেগপ্রধান বিষয়বস্তুর টানে সনেট আবেগোচ্ছল লিরিক কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অনুশীলনী—২

বর্তমান পর্যায়টি একাধিকবার পড়ে নিন। এরপর নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠার উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

(ক) গীতিকবিতা পাঠকের __________ বা __________ চেষ্টা করে।

(খ) 'লালিকা' কোন __________ রচনার __________ __________।

(গ) শোকার্ত কবির __________ ছোট কবিতাকে ইংরেজিতে __________ বলা হয়।

(ঘ) গাথা মধ্যযুগের শেষে __________ শতক পর্যন্ত __________ __________ হিসেবে __________ থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

(ঙ) মহাকাব্যের নায়ক __________ গুণসম্পন্ন __________ এবং __________।

২। **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) নীতি কবিতার কবি —

১। উপদেশপ্রবণ

২। আক্রমণাত্মক

৩। আনন্দদায়ক।

(খ) রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' — ১। গাথাকাব্য
২। আখ্যান কাব্য
৩। গীতি কাব্য।

(গ) মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান রস — ১। কৌতুক
২। বিস্ময়
৩। বীর।

(ঘ) সনেট — ১। গীতিকাব্য ধর্মী
২। বর্ণনামূলক কবিতা
৩। ওড জাতীয় কবিতা।

৩। ৩-৪টি বাক্যে 'লঘু বৈঠকি কবিতা' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মহাকাব্য কাকে বলে ? মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

৪৬.৫ মূলপাঠ — ৩ কাব্যের আঙ্গিক

ভাষা ঃ কবি যখন কোন ঘটনা, বিষয় বা অনুভবের দ্বারা তাড়িত হন, তখন তাঁর মনে যে ভাবের বা অনুভূতির সঞ্চার করে, তাই কবিতার উৎস। কবিতা বা কাব্যের কায়া গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস কাব্যের কায়া গঠন করে। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বিন্যাস যখন কোন অভাবিত ইঙ্গিত ও অনুষঙ্গ বিশেষ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে কবিমনের ভাবের প্রকাশ ঘটায়, তখনই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কবির একান্ত নিজস্ব হৃদয়াবেগ যখন কবিপ্রতিভার স্পর্শে কাব্যদেহের শব্দগঠিত বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনায় নূতনতর অভিব্যক্তি পায়, তখন আমরা তাকেই কাব্য বলি। এই কাব্য দেহের শব্দ কখনও কখনও অর্থরশ্মি ভেদ করে বর্ণময় দীপ্তি পায়, নূতন নূতন বাক প্রতিমা রচনা করে নিয়ে আসে নূতনতর অনুভূতি। কবিতার ভাষা অলঙ্কৃত বা অলংকৃত যাই হোক তা নির্ভর করে প্রকাশ মুহূর্তে কবির আবেগময় অভিব্যক্তির ওপর। কোনো কোনো কাব্যশাস্ত্রী তাই কাব্যকে শব্দার্থময় বলেছেন। কাব্যের মাধ্যমে যেহেতু শব্দ তাই কাব্য শব্দকায়। তাই বিচিত্র বাণী বন্ধ কৌশলকে কেউ কেউ কাব্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিশেষে শব্দের শঙ্গো অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কের উপমা দিয়ে তাঁরা বুঝিয়েছেন, ভাবের সঙ্গো শব্দময় কাব্যদেহ ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত। তাই কোনো কাব্য পাঠ করে তার ভাষা শিল্পটিকেও বিচার করতে হয়। কাব্য বিচারে ভাবপ্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে বোঝাতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে সমার্থক শব্দ ব্যবহার, ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বিন্যাস, ছন্দ্-পতন, পুনরুক্তি, অশ্লীল শব্দ ও অর্থ প্রয়োগ, দেশ-কাল, কলাশাস্ত্র, লোক ব্যবহার বিরোধী বর্ণনা ইত্যাদি পরিহার, তার পরিবর্তে কাব্যের মাধুর্য, সৌকুমার্য প্রসাদগুণ কান্তি ওজঃ প্রভৃতির অবতারণা কাব্যভাষায় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আলংকারিক আনন্দ বর্ধনের মতে যা রসসৃষ্টিতে বাধা দেয় তাই দোষ। সাহিত্য দর্পণের বিশ্বনাথের মতে কাব্যে দোষ থাকাটা আশ্চর্য নয়, দোষ প্রাধান্য কাব্যের রসবোধের অন্তরায়।

ছন্দ ঃ কবিতার বা কাব্যের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ। ছন্দই কবিতাকে সাধারণতঃ অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে পরিচয় দেয়। লঘু ও গুরুদল বা সিলেব্‌লের সুনিয়মিত বিন্যাস যে ধ্বনিতরঙ্গা বা রীদ্‌ম সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। ছন্দ, ছন্দঃস্পন্দ কবিতার প্রাণ। কবির অন্তরের ভাব শব্দধ্বনি স্পন্দনে ভর করেই কাব্য পাঠকের মনে অনুভবে প্রতিফলন তৈরি করে। তাই প্রতীকবাদীরা ছন্দস্পন্দকেই কবিতার আত্মা বলেছেন, এবং ছন্দস্পন্দের দ্বারা চালিত হয়ে শব্দ পরম্পরা কবিতার বাণীশিল্প তৈরি করে। এ বাণীশিল্প বস্তুত কবি মনে সঞ্চারিত ভাবেরই বীজ বহন করে, সেই বীজকে ছন্দস্পন্দে বিন্যস্ত করে গড়ে ওঠে কবিতা। ছন্দস্পন্দ শব্দকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। ধ্বনির উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একটি সুরস্পন্দিত সৃষ্টি হয়। এর ফলে কবিতা পাঠকের মনে প্রত্যাশা, পরিতৃপ্তি, আনন্দ বা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এটিই হল ছন্দ। ছন্দের সঙ্গো সচরাচর মিল (rhythm) বা মিত্রাক্ষর যুক্ত হয়ে ছন্দের আবেদন আরও সমৃদ্ধ করে। তাই কাব্য বিচারে কবি এই ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ছন্দ-স্পন্দনের সাহায্যে, অভিনব কোন সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম গড়ে উঠল কি না, বক্তব্য ও তার প্রকাশ কতটা সঙ্গাতিপূর্ণ হয়েছে বা মাত্রা, ধ্বনি, পদ, পর্ব বিন্যাসের সৌকর্য প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ বিচারে অপরিহার্য অঙ্গা।

কাব্য ছন্দের আলোচনায় স্বভাবতই ছন্দের প্রকৃতি পরিচয় তথা রীতি এবং আকৃতি বিন্যাস—যথা পর্ব সমাবেশ, মিলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গোর উল্লেখ করতে হয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দ আলোচনায় ছন্দে ব্যবহৃত শব্দের উৎসসূত্র বিচার করে তৎসম (অর্ধতৎসম), তদ্ভব ও দেশি বিভাজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিচারের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি ছন্দের তিনটি জাতিকে চিহ্নিত করতে পারলেও নামকরণে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ জাতি বা রীতির পরিয় নিয়ে মতদ্বৈধ না থাকলেও ছান্দসিকদের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে ভিন্নতা আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে তিন জাতীয় ছন্দের—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত-এর কথা বললেও পরে এদেরই তিনি মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বলেছেন। পরবর্তী ছান্দসিকরা এই তিনটি রীতিকেই যথাক্রমে তানপ্রধান অক্ষর মাত্রিক, ধ্বনি প্রধান স্বরমাত্রিক, শ্বাসাঘাত বা বল প্রধান দলমাত্রিক বলেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে এই বিভাজন ছাড়াও গঠনগতভাবে ছন্দ, বিশেষত তার পদবন্ধের দিক থেকে পয়ার মহাপয়ার, ত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী, চৌদপী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা প্রবাহমান পয়ার, প্রভৃতিতে বিন্যস্ত করা যায়। তবে এগুলি ছন্দের 'জাতি', নয়, ছন্দের নানা 'রূপ' মাত্র। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অলংকার ঃ কাব্যের রস-লোকে পৌঁছুবার অন্যতম উপায় অলঙ্কার। অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে, অলঙ্কারের সুনিপুণ বিন্যাস কাব্যকে রমণীয় করে। একজন আলঙ্কারিকের মতে অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রাহ্য। অপরজন বললেন, দোষহীন কিন্তু গুণযুক্ত অলঙ্কৃত শব্দার্থের নাম কাব্য। অলঙ্কার অলঙ্কারে কাব্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে মতভেদ আছে। কিন্তু যদি বলি, শব্দের সাহায্যে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত কোনো চমৎকারিত্ব যখন সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে অলঙ্কার। অলঙ্কার বস্তুত, শব্দের অন্তরের জিনিস। কবির কাব্য আর কাব্যের অলঙ্কার, কাব্য-ভাষা ও ছন্দের মতো, একই সৃষ্টির প্রয়াসে স্বতঃউৎসারিত। সাধারণ মানুষও প্রতিনিয়ত ব্যাকরণ-শাস্ত্র বা নন্দন তত্ত্বের কোনো জ্ঞান না থাকলেও, অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহার করে। শব্দের উচ্চারিত ধ্বনি (শব্দ) ও শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিত্তিতে অলঙ্কারের দুটি শ্রেণি শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আধুনিক কবিরা গতানুগতিক একঘেয়ে অলঙ্কার ব্যবহারে অনেকটা বীতরাগ হয়ে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যাঞ্জনার তাগিদে জগৎ থেকে

আহৃত নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সূত্রে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দ, চিত্র রচনা করছেন। ফলে কাব্যেও নব নব ব্যঞ্জনার দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। কাব্যের সার্থকতা বিচারে অলংকারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক—অলংকার প্রয়োগের মূল্যায়ন করে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে তার কতটা যোগ তা নিরূপণ করা হয়। প্রাচীন অলংকারের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারের চমৎকারিত্বেই কবির সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। কবি কবিতা রচনা করেন প্রকাশের তাগিদে ; কবিতাও অলংকৃত হয় তাই সম্পূণ৪ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূণর্তভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও তার প্রয়োগের সৌন্দর্য সন্ধান কাব্যালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

কাব্যে অলঙ্কার শব্দটির ব্যবহার বহু অর্থ জ্ঞানপ—রস, রীতি, ধ্বনি ছাড়াও অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলিকেও বোঝায়। এখানে বিশিষ্ট অর্থে অলঙ্কার বলতে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক) এবং অর্থালঙ্কার (উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক) প্রভৃতিকেই বোঝান হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার ওপর ভিত্তি করে শব্দালঙ্কার। আর শব্দার্থের ওপর ভিত্তি করে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকেই অর্থালঙ্কার বলা হয়। অর্থালঙ্কারে শব্দের ধ্বনি সৌকর্য প্রধান নয় আর অর্থগত তাৎপর্যই মুখ্য। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এককে করা হয়েছে। এখানে এই আলোচনা প্রধান বিষয় নয়।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এককটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুণরায় পাঠ করে তৈরি করুন।

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) কবির একান্ত নিজস্ব ___________ কবি প্রতিভার স্পর্শে ___________ ___________ ___________ অতিক্রম করে ___________ নূতনতর ___________ পায়।

(খ) লঘু ও গুরু দল বা সিলেব্‌লের ___________ বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা ___________ সৃষ্টি করে তাই ___________।

(গ) কবির কাব্য আর কাব্যের ___________, কাব্য-ভাষাও ___________ মতো একই সৃষ্টির প্রয়াসে ___________।

(ঘ) বাংলা ছন্দের ___________ জাতি বা রীতির পরিচয় নিয়ে ___________ না থাকলেও ___________ মধ্যে ___________ ব্যাপারে ___________ আছে।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কাব্য দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত —
১। ছন্দ
২। শব্দ
৩। অলঙ্কার

(খ) অলঙ্কার বস্তুত শব্দের —
১। অন্তরের জিনিস
২। বাহ্য প্রসাধন
৩। অপ্রয়োজনীয় অংশ

(গ) অর্থালঙ্কার বলতে বোঝান হয়েছে — ১। শ্লেষ
২। রূপক
৩। যমক

৩। ছন্দ ও অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৪। "কাব্যের কায়াকল্প গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।"—উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।

৫। কাব্য বিচারে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠককে বিচার করতে হয় সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। "কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ।" মন্তব্যটি কি আপনি সমর্থন করেন ? আপনার বক্তব্য তিন চারটি পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করুন।

৭। শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনটিকে আপনি কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন এবং কেন, সে সম্পর্কে ১০০টি শব্দে অভিমত দিন।

৪৬.৬ সারাংশ

গদ্য ও কাব্য প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন। একটি যুক্তি-বুদ্ধি মননের, অপরটি আবেগ অনুভূতির বাহন। কাব্যের সংজ্ঞা প্রকৃতি নিয়ে প্রাচ্য ভারতে ও পাশ্চাত্য ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা মত প্রকাশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা কেউ বা কাব্যে প্রকাশ বা ভাবাভিব্যক্তির উপস্থাপনা অথবা বিষয়ের ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, দুয়ের সমন্বয়েই কাব্যের কাব্যত্ব। তাই প্রাচ্য ধ্বনিবাদীরা প্রকাশবাদ ও ভাববাদ—এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিকে মেনে নিয়ে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুকরণ, অনুভূতি, রসানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর অপর তাত্ত্বিকেরা নগ্ন বাস্তব ও সত্যের উলঙ্গমূর্তিকে তুলে ধরাকেই কাব্যের প্রধান কাজ মনে করেছেন। ক্রোচে ও আর্নল্ডের মতে কাব্য হল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি এবং জীবনের সমালোচনা।

কাব্যের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ভিত্তিক বা আঙ্গিকগত দিন থেকে করা যায়। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি মনের যে দিকগুলি প্রধান হয়ে ওঠে তারই উপর ভিত্তি করে আঙ্গিক গড়ে ওঠে। নীতি কবিতা, শোককাব্য, গাথা ও আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি উপস্থাপনায় যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি এদের বিষয়বস্তু ও মননের গভীরতা ও ব্যাপ্তিরও তারতম্য আছে। গাথার প্রেম, বীরত্ব, মহত্ব, আত্মত্যাগ অজ্ঞাতনামক লোকায়ত কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক আখ্যান কাব্যের অবলম্বন কিংবদন্তি বা ইতিহাস। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপলব্ধিতে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অনেকটা ঐক্য আছে। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর নায়ক বীর ও সদ্বংশজাত, একাধিক উপাখ্যান কাব্যে বিশালতার ধারণা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ, মানবসভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিচেতনাই মুখ্য। একান্ত আত্মগত ভাবানুভূতিই এর উপজীব্য।

কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। কবির মনের কোনো সৌন্দর্যময় আবেগ যখন শব্দ ও ছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময়

হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে কাব্য। তাই কাব্য আলোচনায় ভাষা শিল্পেরও বিচার করতে হয়।

ছন্দ ঃ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধ্বনিনির্মিত লঘু ও গুরু দলের (সিলেব্‌লের) সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা রিদম (rhythm) সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। এই ছন্দ কবিতার অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে। তাই কাব্যবিচারে কবি ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে করেছেন সেটি বিচার্য। কাব্য ছন্দ বিচারে ছন্দোরীতি ও ছন্দবন্ধের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছন্দের শ্রেণি নিয়ে, গঠন নিয়ে মতভেদ না থাকলেও নামকরণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে প্রবোধচন্দ্র সেনের মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত নামগুলিই এখন গ্রহণ করা যেতে পারে।

অলঙ্কার ঃ অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে। অলঙ্কার শব্দধ্বনি ও শব্দ ব্যঞ্জনা ভিত্তিতে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার দু-ভাগে বিভক্ত। শব্দালঙ্কার ধ্বনি সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যনির্ভর ; অর্থালঙ্কার অর্থনির্ভর ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক তার মূল্যায়নে কবিকৃতি বিচার করা হয়।

৪৬.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ-১-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়লেই উত্তরটি দিতে পারবেন।

২। (ক) বাগ্‌যন্ত্রের, অর্থবহ, ভাষা।

(খ) যুক্তি, বুদ্ধি, মননের, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনার।

(গ) আনন্দদায়ক, রসাত্মক, বাক্যই।

(ঘ) যা ঘটতে পারে তাই, অবলম্বন, নির্বিশেষের।

(ঙ) গভীর, অনুভূতির, স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছলন।

(চ) বস্তুর, অন্তর্নিহিত, সৌন্দর্যের।

৩-৬ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাগ করে আরও বার কয়েক পড়ুন। তা হলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) জ্ঞানোদয়ের, চৈতন্য সঞ্চারের।

(খ) প্রতিষ্ঠিত, কায়িক, অনুকরণ।

(গ) শোকজ্ঞাপক, ডার্জ।

(ঘ) সপ্তদশ, রোমান্টিক, লোকগাথা, জনজীবন।

(ঙ) ধীরোদাত্ত, বীর, সদ্বংশজাত।

২। (ক) তাত্ত্বিক, (খ) আখ্যান কাব্য, (গ) বীর, (ঘ) গীতিকাব্য ধর্মী।

৩-৪ নং প্রশ্নের জন্য মূলপাঠ—২ -এর ব্যঙ্গা কবিতা বৈঠকি কবিতা এবং মহাকাব্য অনুচ্ছেদগুলি বার বার পড়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হন।

অনুশীলনী—৩

১। (ক) হৃদয়াবেগ, কাব্যদেহের, শব্দ, বাচ্যার্থকে, ব্যঞ্জনায়, অভিব্যক্তি।

(খ) সুনিয়মিত, ছক, রীদম্, ছন্দ।

(গ) অলঙ্কার, ছন্দের স্বতঃউৎসারিত।

(ঘ) ত্রিবিধ, মতদ্বৈধ, ছান্দসিকদের, নামকরণের, ভিন্নতা।

২। (ক) শব্দ, (খ) অন্তরের জিনিস, (গ) রূপক।

৩-৭ নং প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি একাধিকবার পাঠ করলেই আপনি লিখতে পারবেন।

৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

এককে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে আপনি নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারেন ঃ

(১) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — কাব্যতত্ত্ব বিচার (১ম খণ্ড)

(২) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — সাহিত্যের নানারূপ, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা।

(৩) ড. প্রবোধচন্দ্র সেন — ছন্দ-সোপান।

(৪) ড. তারাপদ ভট্টাচার্য — ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ মীমাংসা।

৪৭.৩ মূলপাঠ—১ ঃ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, নির্দেশ ও উনিশ শতক

মানুষ একসময় পৃথিবীর প্রভাত-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-বসন্ত, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে অপার রহস্যের সন্ধান পেয়ে বিস্ময় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অলৌকিক, অতিলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তায়—দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে মানুষের দৃষ্টি মর্ত্য পৃথিবীর দিকে পড়লে দেখে মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা—সেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির পরিচয়ই প্রধান। এই সমষ্টির মধ্যেও কালক্রমে সুন্দর পৃথিবীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ জনিত কারণে জাতিতে-জাতিতে, সভ্যতায়-সভ্যতায় নিরন্তর সংঘর্ষ সংগ্রামও সমন্বয় চলছে। এ যুগে মানুষ দেবাশ্রিত হলেও মানবচরিত্রের অসামান্য মহিমায়—তার বীরত্বে, মহত্ত্বে তার প্রেমে স্থান করে নেয়। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে, অ-সাধারণ মানুষকে দেবোপম বা অতিপ্রাকৃত করে নেবার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। এরই পাশাপাশি আবার মানুষের আদর্শে, দেবতাকে মানবিক করার আকাঙ্ক্ষায় তাকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসে কালক্রমে ঘরের মানুষে রূপান্তরিত করেছে। কালের সঙ্গে চিন্তা বিবর্তনে এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা কাব্যে ১৯শ শতকে মানবকেন্দ্রিক নতুন ভাববোধের সঞ্চার ঘটেছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলি। সেই সঙ্গে নিসর্গ চেতনার একটি স্বতন্ত্র বোধ, যথা, নিসর্গে যে একটি নিজস্ব রূপ-মাধুরী আছে এবং সে আপনাতেই স্বতন্ত্র—বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে তার যে বিচিত্র মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনুভূত হয়েছে। এই সময়ই মানবতার জয়ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর ধুলা-মাটি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-সংগ্রাম ভরা জীবনের সুন্দর কুৎসিত সবকিছু গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে জেগেছে সমাজ ও স্বদেশের চেতনা, সমাজের মধ্যে যে আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থা বিরাজমান কবির মনে তা নূতন প্রেরণা জোগাল। কাব্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। সমাজের সঙ্গে স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক মমতা থেকে দেশের সঙ্গে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণা ওতপ্রোত হয়েছে। আর স্বদেশপ্রীতি থেকে জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার গ্লানি তাকে ক্লিষ্ট করেছে। এভাবে বিশ্বপ্রকৃতি তার বুকে লালিত মানুষ এবং মানুষের সুখদুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কবিতায় প্রকাশিত হল তাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতার মানব প্রাধান্যের কারণে মানুষের জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবনা কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে। পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ কাব্যে যা এসেছে, তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ যুগের প্রকৃতি বোধেও বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ-বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নানাভাবে রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যথার্থ অর্থে নিসর্গ চেতনার কবিতা রচনা যেমন হয়েছে, কার সঙ্গে মানুষ আর প্রকৃতির অন্তরঙ্গ যোগটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে গতানুগতিক ধর্মাশ্রিত কাব্যের পরিবর্তে এ যুগের কাব্য নব নব রূপে বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের অন্তপ্রেরণায় ১৯ শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে।

কাব্যরূপের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় মধ্যযুগীয় সংস্কার অতিক্রম করে আধুনিক ধ্যানধারণার সূচনা করেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী গীতিকবিতা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, মধুসূদন মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট রচনা করে এই পর্বেই কাব্য শিল্প কর্মের অসামান্যতা তুলে ধরেছেন। দেশকালের প্রভাবে এই আধুনিক মানসিকতাই প্রাচ্যের সংস্কৃত তামিল প্রতীচিব গ্রিক লাটিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ উপাদান নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সময় আরমা দেখেছি জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাষাশৈলীতে স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে বাংলার গ্রামগঞ্জ, মাঠ-ঘাট ও অন্তরসুরের সহজ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। সব মিলিয়ে এ সময়ের

(ঘ) আধুনিক মানসিকতা থেকেই প্রাচ্যের _______ _______ প্রতীচীর _______ _______ ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা _______ _______ নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

(৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

ক) বিহারীলাল রচনা করেছেন—
১। আখ্যান কাব্য
২। গীতিকবিতা
৩। নীতি কবিতা

খ) যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে, সেখানকার সুখদুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে। বলেছেন—
১। ক্রোচে
২। মধুসূদন
৩। কোঁৎ

৪৭.৮ মূলপাঠ—২ আধুনিক কবিতা—বিশ শতক

আধুনিক শব্দটি দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। দেশ ও কালের ব্যবধানে আধুনিকতার সংজ্ঞা বদলায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯ শতকে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সেখানে য়ুরোপীয় বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য থেকে অন্তপ্রেরণা নিয়ে বাংলা কাব্য নবভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্যযুগীয় সংস্কার বর্জন করে নবজাগৃতির ঐতিহাসিক নিয়তিকেই বরণ করে নিয়েছিল। এ যুগে মানবিমহিমা, যুক্তিবাদ, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, স্বদেশচেতনার সঞ্চার হয়েছে। কবিমন চিন্তার সুনীল আকাশে মুক্তি পাওয়ায় কাব্য কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে রোমান্টিক ভাববিনাসে।

কিন্তু বিশ শতকে পর পর দুটি মহাযুদ্ধ—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম এবং নানা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন তোলায় বাংলার সমাজ জীবনেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এরসঙ্গো অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃসহ জীবন সংগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গো উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদানও এসময় মানবিক চেতনায় নূতন মাত্রা যোগ করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েড, মার্ক্স, সার্ত্র প্রমুখ মনীষীর চিন্তা মানবিক চেতনার গভীরে আলোড়ন তোলে। লেলিনের কৃতি রাশিয়ার কথা স্মরণে রেখে তরুণ কবিদের একাংশে সমাজ-পরিবর্তনের মতাদর্শ নতুন ভাবতরঙ্গা সৃষ্টি করে। এভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নতুন পটভূমি তৈরি হয়েছে। কবি ও কবিতা যেহেতু সমাজের মানব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে তাই কবিতায় এই ইতিহাস সঞ্জাত চেতনাবোধ নতুন বাঁক নেয়। এই কালচিহ্নিত কবিতাই হল আধুনিক কবিতা।

কাব্যে বিশ শতকের এই কালপ্রভাবকে আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তরণ থেকে আধুনিকতার সূচনা মনে করেন। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কল্লোলের তরুণ কবিকুল মুখ্যত রবীন্দ্র ঐতিহ্যে পুষ্ট হলেও রবীন্দ্র কবি-মহিমা এরা সর্বতোভাবে অনুভব করেননি

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় আধুনিক কবিতার মৌল লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে"—এ কবিতায়। অপর একটি আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনের ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আরও সংক্ষিপ্ততর এবং অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন—"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী।"

উপসংহারে আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বলা যায়—

১) এ কবিতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাতজাত। পরিণামে কবিতায় জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ-এর পরিচয় ফুটেছে।

২) দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্কতা এ যুগের কবিতার অন্যতম লক্ষণ।

৩) ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় দর্শন, আধুনিক কবিতায় অনেকটা স্থান করে নিয়েছে।

৪) জগৎ জীবন সম্পর্কে একটি অনিকেত ধারণা থেকে প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সংশয় ; ফলত দেহজ কামনা বাসনা এবং প্রেমের শারীরী রূপের বর্ণনায় আসক্তি।

৫) কবিতায় মননের প্রাধান্যের কারণে দেশ বিদেশের ইতিহাস, দর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্পে বহুব্যবহারে ও কাব্যে দুরূহতা এসেছে।

৬) কাব্যদেহে বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটায় গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমেছে। গদ্যছন্দের চলতি ও গ্রাম্য দেশি শব্দের সঙ্গো বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে।

৭) প্রচলিত কাব্যভাষা ও উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তে বিদেশি এবং নতুন নতুন উপমা-চিত্রকল্প রচনা করে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্বের অনেকেরক কবিতায় শব্দ প্রয়োগ হল সুমিত ও অর্থঘন।

৮) বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

একালের কবিরা উপরিউক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাব্যচর্চায় প্রয়োগ করে রাবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শৈলীতে রূপায়িত করে এবং আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে রাবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ ও চিত্র রচনা করে রবীন্দ্র ঋণের সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য ধারা এ কালের কবিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ২০ শ শতকের কবিদের অবস্থান হেতু তাদের রচনায় এ সময়ের বিষয়বস্তুর নবত্ব ও বক্তব্যের স্পর্ধিত ও সরল উপস্থাপনা, সংহত কাব্যকলায় প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এ কালের এই কবিতাগুলিকে বুঝি।

বর্তমান এককে মূলপাঠ—১ ও মূলপাঠ—২ পর্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শতকে আধুনিক কবিতার কালগত পরিবর্তনের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী চারটি এককে যথাক্রমে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের মধ্যে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কী ভাবে ঘটেছে, ও তার স্বরূপ কাব্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ—১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। ক) মানব, প্রাধান্যের, ভাগ্য, সূক্ষ্ম অনুভূতি।

খ) বিষয়, বস্তু, জীবনের, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র।

গ) জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার, ক্লিষ্ট।

ঘ) সংস্কৃত, তামিল, গ্রিক, লাতিন, উপকরণ, উপাদান।

অনুশীলনী—২

১। ক) প্রতিকূলতা, বিরোধিতাকেই, কাব্য-শক্তি, উপায়।

খ) শত্রুরা, শর, রবীন্দ্র, ঠাকুর, জ্বালিব, যুগসূর্য।

গ) অনিকেত, প্রেম, কল্যাণ, মূল্যবোধে, সংশয়।

২ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক কবিতার সূত্রাকারে উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্যগুলি ৬-৮ অংশটি ভালো করে পড়ুন।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর বর্তমান পাঠ্য অংশটি পড়লেই আপনি লিখতে পারবেন।

৪৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—আধুনিক কবিতার ইতিহাস।

২) দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়।

একক ৪৮ ❒ মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ

গঠন

৪৮.১ উদ্দেশ্য

৪৮.২ প্রস্তাবনা

৪৮.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

৪৮.৪ মূলপাঠ

৪৮.৫ সারাংশ—১

৪৮.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (৬ষ্ঠ সর্গ), শব্দার্থ টীকা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৮.৭ মহাকাবা ঃ স্বরূপ, বৈচিত্র্য

৪৮.৮ মেঘনাদবধ কাব্য—কাহিনী বিন্যাস (৬ষ্ঠ সর্গ)

৪৮.৯ মেঘনাদবধ কাব্য—দেশী-বিদেশী প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

৪৮.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

৪৮.১১ মেঘনাদবধ কাব্যের (৬ষ্ঠ সর্গ) ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

৪৮.১২ সারাংশ

৪৮.১৩ উত্তরমালা

৪৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪৮.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই একক সযে- পাঠ করেন এবং অনুশীলনগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনি—

- ১৯ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যধারার অন্যতম মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মহাকাব্য-শৈলীর অন্যান্য কবিকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাকাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ-এর সূত্রগুলির ধারণা করতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

আপনারা এই এককটি পড়ে উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে যুগন্ধর মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ মহাকাব্যে কীভাবে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক প্রচ্ছন্ন চিত্রের পটভূমিকায় তুলে ধরেছেন সেটি বুঝতে পারবেন। মেঘনাদবধের কাহিনী-উপকরণ কোনো একটি বিশেষ রামায়ণ নয়, বলা যেতে

পারে বাঙালির রামায়ণ-সংস্কার থেকে আহরণ করা হয়েছে। তার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে মধুসূদনের মাদ্রাজ সূত্রে তামিল-কম্বন্ রামায়ণের প্রভাব। কম্বন্ রামায়ণে রাবণ কুৎসিত বা অত্যাচারী শাসক নয়। মধুসূদন রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি কৃত্তিবাসের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে আর্যজাতিসুলভ উন্নতম্মন্য মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছেন। এভবে তিনি পুরাণকে যে নতুনতর অর্থে ব্যঞ্জিত করেছেন তার পেছনে সে সময়ের মানসপটভূমিটি কাজ করেছে।

ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মায়াদেবী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কাব্যের চরিত্র বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে রাম লক্ষ্মণের প্রতি কবির মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর গভীরতর পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। এটি কবির ব্যক্তিগত ; কিন্তু সমকালের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের পুনর্বিচার করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। মধুসূদনের এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছত্রশেষে মিলের বিলোপ এবং যতি স্থাপনের স্বাধীনতা। তিনি বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনার প্রয়োজনে ছন্দোবন্ধনকে ভাবের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। ফলে দেখা দিয়েছে ছত্র-উল্লঙ্ঘনকারী প্রবহমানতা (enjambment)।

ষষ্ঠ সর্গটি ভালো করে পড়ে কাব্যগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে নানা নতুন বিষয় আপনার নজরে পড়বে যার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। মরমি রসগ্রাহী পাঠক শুধু কাব্য পাঠ করেন না, তিনি কীভাবে এবং কোন্ বিশেষ রীতির মাধ্যম ব্যবহার করে কবি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তার কারণ সন্ধান করে কবির শিল্পকৃতিরও বিচার করেন। এ সম্পর্কে কিছু ধারণা এককের ৪৮.৯, ৪৮.১১, ৪৮.১২, ৪৮.১৪ উপবিভাগে দেওয়া হয়েছে। সর্গটি বিশ্লেষণ করে পড়বার সময় কিছু আভিধানিক শব্দ ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-বাক্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে মনে করে ৪৮.৬ উপবিভাগটি প্রস্তুত করা হয়েছে, এতে আপনাদের সুবিধা হবে। এছাড়াও আপনারা কিছু বিশেষ পঙ্ক্তি নির্বাচন করে গভীর ও সযে- পাঠ করতে পারেন।

আপাতত ষষ্ঠ সর্গ পড়ে কাব্যটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সঙ্গো কিছু অনুশীলনী দেওয়া আছে, সেগুলি এবং লেখক ও রচনা সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা আছে তা পাঠবস্তু বুঝতে সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৪৮.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন স্বরচিত সমাধি লিপিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ

'যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা, দত্ত মহামতি
রাজনায়ারণ, নামে, জননী জাহ্নবী।'

কবির জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, আম-জাম-কাঠাল গাছের শ্যামলতাস্নিগ্ধ একটি সাধারণ গ্রাম। এই গ্রামে জন্মের পর আরও সাত বছর কাটিয়েছেন। এর স্মৃতি তাঁর মানসলোকে স্থায়ী হয়ে ছিল। পিতৃসূত্রে তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, মাতৃসূত্রে তাঁর জমিদারি রক্তের সঙ্গো যোগ ছিল। মা ছিলেন জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। মধূসূদন চার-পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। সে সময় আইন-আদালত ফারসির চলন ছিল। তাই সেই ছয়-সাত বছর বয়সেই মধুসূদন ভিন্ন গ্রামের এক মৌলবির কাছে ফারসি পড়তেন। বাড়িতে মায়ের কাছে সাগ্রহে রামায়ণ, মহাভারত মঙ্গালকাব্যের পাঠ নিয়েছেন। বারো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। রাজনারায়ণ তখন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি

করতেন। পরে খিদিরপুরে একটি বাড়ি কিনে (১৮৩২) স্থায়ী হন। মধুসূদনের পিতা তাঁকে কলকাতায় এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কিছু কবিতা খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিলাত যাওয়ার আগ্রহ ও বাবা-মার ঠিক করা বিবাহ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত মধুসূদনের হিন্দু কলেজে পড়া হল না, তাই তিনি বিশপস্ কলেজে (শিবপুর) ভর্তি হলেন। পিতাই তাঁর শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতেন। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অসন্তুষ্ট রাজনারায়ণ আর্থিক সাহায্য বন্ধ করায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ চলে যান (১৯৪৮)। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেই রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ। মাদ্রাজ প্রবাসে তিনি তামিল, তেলুগু, গ্রিক ও হিব্রু ভাষা নিয়মিত চর্চা করতেন।

মধুসূদনের প্রথম বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামক আর এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রেবেকা পরাজিত হলেন। আত্মনিবেদন পরায়ণা হেনরিয়েটা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। ১৮৫৬ তে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতার পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। সে সময়ই তাঁর বাংলা লেখনী চর্চা শুরু। শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক, ১৮৫৯ সালে দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং ১৮৬০-এ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। এখানেই প্রথম অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৮৬০ অমিত্রাক্ষরে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' আর ১৮৬১ 'মেঘনাদবধ কাব্য'* ও 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়। তারপর 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। এ সময় পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের পর বিলি ব্যবস্থা করে, ১৮৬২-র ৯ জুন বিলাত যাত্রা করেন। ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য 'গ্রেজ ইনে' ভর্তি হন। ওই বৎসরই ১৯শে আগস্ট পাশ করে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। মধুসূদন বিদেশে বাসকালেই রচনা করেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। জীবন সায়াহ্নে 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) গদ্যকাব্য ও 'মায়াকানন' নাটক (১৮৭৪) রচনা করেছিলেন।

মহাকবির শেষজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। অসুস্থ কবি আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩-এ। তাঁর তিনদিন পূর্বে ২৬শে জুন হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়।

বর্তমান এককের পাঠ্যবস্তু মেঘনাদবধ কাব্য-এর ৬ষ্ঠ সর্গ। মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী এ সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে-'বধ'—"ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠ ঃ সর্গ।"

ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাকালের সূচনা রামরাবণের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন সকালে। স্থান—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার, বিষয়বস্তু লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। 'বধে'—এর মূল ঘটনাটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরিত্রে, ঘটনা উপস্থাপনা ও পরিণতিতে রামায়ণ অনুসরণ করা হয়নি। রামচন্দ্রের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা, রামের দৈববাণী শোনা ও আকাশে সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দেখা, মায়া-লক্ষী সংলাম, বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণের মায়াবলে লঙ্কা প্রবেশ, নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ, মেঘনাদকর্তৃক কোষা দিয়ে লক্ষ্মকে আক্রমণ ও ফলে তাঁর মূর্চ্ছা, মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদ, মায়ার যে- লক্ষ্মণের চেতনা লাভ ও দৈবাস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে তীক্ষ্মশরে বিদ্ধ করা, রক্তাক্ত মেঘনাদের উক্তি—'দুঃখ যে, একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে।'

---

* ১ম খণ্ড - ১ম সর্গ - ৫ম সর্গ, ১২৬৭ সন,
২য় খণ্ড - ৬ষ্ঠ সর্গ - ৯ম সর্গ ১২৬৮ সন
একে খণ্ডে ১৮৬১ খৃঃ

৪৮.৪ মূলপাঠ ঃ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা ; শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর[১] সংগ্রাম।
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীর্বাদে
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি, কাননে,
পুজিনু চামুণ্ডে[২], প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ[৩] যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এরে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে
পুজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসূত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা[৪] যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে[৫] যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে

---

১. নশ্বর — নাশশীল, এখানে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. চামুণ্ডে — বালীর নাম। ইনি ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন বলে চামুণ্ডা নামকরণ হয়েছে।
৩. মহোরগ — মহাসর্প।
৪. নিকুম্ভিলা—লঙ্কার পশ্চিমদিকের গুহা বিশেষ, সেখানে অবস্থিতা দেবী।
৫. পিধানে—কোষে, খাপে।

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোনিতস্রোতঃ হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল[৬] মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে-
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি ; কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে ?
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা !"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরায় সে ত্রিভুবনে ! দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষী[৭] পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ[৮] ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র, —"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস,[৯] অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত[১০] গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্বুররাজ[১১] ! উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র[১২], দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে

৬. আর্দ্রিল—আর্দ্র, সিক্ত করল বা ভেজাল। ৭. সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। ৮. বিরূপাক্ষ—শিব। ৯. বাসবত্রাস—বাসব বা ইন্দ্রের ভয়ের কারণ। ১০. জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন। ১১. কর্বুররাজ—(কর্বুর—রাক্ষস), রাক্ষসরাজ। ১২. বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র।

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে র-রাশি ;—মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পুজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !”
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
“স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরায় কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলা বধু ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরযে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ; — ‘নয়নের মণি
আমার, হরিলি, তুই রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে !
সঁপিনু এ ধন তোরে ! রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।’
“নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গাদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধুম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।”
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।” দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে[১৩]
ভৈরব আরবে[১৪] দেশ পুরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,

১৩. ফণীর স্বননে—সর্প গর্জন শব্দে।
১৪. আরবে—শব্দে। রব > আরব, আরাব।

হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর[১৫]—বিজয়ী সংগ্রামে।
    কহিলা রাবণানুজ ; —“স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজি[১৬] ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !”
    প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি—
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দ্বীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ[১৭] দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী-মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী !
    শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যাবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর, বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরিষলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গালবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
    আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; “তব পদ্যম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেরি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,[১৮]
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !”
    এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দাবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে[১৯] ; পবন অমনি।
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
    হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী ! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,

১৫. অজাগর - অজগর - বড়ো সাপ বিশেষ। ১৬. ছায়াবাজি—অলী মায়াজাল। ১৭. নিষঙ্গ—শরাধার, তূণীর। ১৮. মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবাপ্রিয়ে। ১৯. দিবিন্দ্র দিবে—দেবরাজ ইন্দ্র-স্বর্গে।

তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে !
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী !
    লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামেব, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !"
    আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে[২০] বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে !"
    বন্দি রাঘবেন্দ্র পদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে !
    যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-
রক্ষঃকুলে-রাজলক্ষ্মী-রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবী, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
    উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে,[২১] তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !"
    বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া,[২২] অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রের তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী — অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
    চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, মিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কব-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
    প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত

২০. মহেষ্বাসে—মহাধনুর্ধর (রামচন্দ্র)।২১. নীলাম্বুসুতে—সমুদ্রে কন্যা—লক্ষ্মী।২২. বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা (মায়াদেবী।)।

যেন দেব ত্বিষাম্পতি,[২৩] কিম্বা বিভাবসু
ধুমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী-
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী, কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র[২৪] ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
    বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
    প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
    সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
    হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী,[২৫]
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ;[২৬] তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল[২৭], বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে-
দেবলোভে, দৈত্যকুলে-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে র-, নক্ষত্র আকাশে ?
    নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড় ; হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,

২৩. ত্বিষাম্পতি—সূর্য। ২৪. নক্র—কুমীর।২৫. প্রক্ষেড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ।২৬. স্যন্দন—রথ।২৭. দেউল—< দেবকুল —দেবালয়, মন্দির।।

রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
ও হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—“যা কহিলে সত্য, শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !”
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য ! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যাজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজিপাল ; গর্জি গজ সাপটে প্রমদে[২৮]
মুদগর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
ঊষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ; — ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে, — “চল, ওহে উঠিগ্নে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।” কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে
মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে, চল সভাতলে।”
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ; —
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদান ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরশে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ; বসেছে, একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র, —কৈলাস গিরি। তব উচ্চ চূড়ে।

২৮. প্রমদে—প্রমত্ত হয়ে।

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘর বীরপদভরে।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্দ্ধ ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গাধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে[২৯] তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে!
নিঃশঙ্ক করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আইন রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গানাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে!"

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালনল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,-

২৯. প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায়।

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;— কি আর কহিব ?"
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে[৩০] বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি যে কৌশলে !"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ! ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্মুক[৩১] ধরি কর্ষিলা ; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
যথা শুণ্ডধর[৩২] টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতল শূল হস্তে, ধূমকেতুসম[৩৩]
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণে রণে !
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ? নিকষা, সতী তোমার জননী !
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী !
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে[৩৪] !"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

৩০. আনায় মাঝারে—ফাঁদে বা জালের মধ্যে। ৩১. কার্মুক—ধনুক। ৩২. শুণ্ডধর—হাতি। ৩৩. ধূমকেতুসম—ধূমকেতুর মতো অমঙ্গল সূচক। ৩৪. আহবে—যুদ্ধে।

অনুরোধ ?” উত্তরিলা কাতরে, রাবণি ;—
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে, শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ? ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”
    মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
“নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”
    রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিল শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস-শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)

বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ ঘন্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !
    ত্যাজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পুরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচুড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মুর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !
    অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—“বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন, আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,

কলঙ্কি ?” এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
    কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—
“সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্বুরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী[৩৫], উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !”
    এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—“সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর !” শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরসে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
    প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—“ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস,[৩৬] জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শত্রুজিৎ !” চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
“লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,

---

৩৫. রক্ষঃঅনীকিনী—রাক্ষস সেনাদল। ‘অনীকিনী’ অক্ষৌহিনীর পূর্ববর্তী সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাপক। বাংলায় শব্দটি সৈন্যদল অর্থেই ব্যবহার হয়। ৩৬ রঘুবংশ—অবতংস-রঘুকুলের শিরোভূষণ (রাম)।

হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্য ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে !”
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—“শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গাল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আমি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পুজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !” কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
“জয় সীতাপতি জয় !” কটক চৌদিকে,-
আতঙ্গো কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

৪৮.৫ সারাংশ—১

ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। দৈবাস্ত্র লাভ করবার পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে সেটি কীভাবে পেলেন তা বর্ণনা করে। তিনি জানান লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী বলেছেন দেবতারা সকলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন। ইন্দ্র দৈবাস্ত্র পাঠিয়েছেন, সেগুলি তিনি লক্ষ্মণকে দিয়ে বলেন সে যেন বিভীষণের সঙ্গো নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করে। দেবী আরও বলেছেন, তাঁর কৃপায় তাঁরা অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করতে পারবেন।

রামচন্দ্র বলেন, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব-নর সকলেই ভীত, সেখানে লক্ষ্মণকে তিনি কেমন করে পাঠাবেন ? সীতা উদ্ধারের জন্য বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ নেই। তিনি রাজ্য সম্পদ, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব সব হারিয়েছেন—বাকি ছিলেন সীতা, সেও রাবণ কর্তৃক অপহৃত, এখন একমাত্র লক্ষ্মণ আছেন, তাকেও যদি যুদ্ধে হারাতে হয়, এই আশঙ্কায় বলেন আর যুদ্ধে কাজ নেই।

রামের এই খেদোক্তিতে লক্ষ্মণ বলেন, দেবতা যেখানে সহায় যেখানে এই খেদ অনুচিত। তিনি যদি রামচন্দ্রের আদেশ পান তাহলে লঙ্কায় প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন। সুতরাং দেবতাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। বিভীষণও অনুরূপে বোঝালেন এবং বললেন স্বপ্নে দেবী তাঁকে আদেশ দিয়েছেন মেঘনাদবধ-এ লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে। তবুও রামচন্দ্র আশ্বস্তবোধ করেননি। রামচন্দ্রের জন্য যে লক্ষ্মণ রাজ্যে, মা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছেন সেই লক্ষ্মণের জীবন বিপন্ন করে তিনি কেমন করে সীতা উদ্ধারে পাঠাবেন ? তাই এ চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। এমন সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন, দেবাদেশ অবহেলা করা অনুচিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখেন সাপ আর ময়ূরের এক যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধে ময়ূরের মৃত্যু হলে সাপ গর্জন করতে লাগল। বিভীষণ ব্যাখ্যা করে বললেন সাপের কাছে সর্পভক্ষক ময়ূরের পরাজয় ঘটেছে, তার অর্থই হল লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হবে।

রামচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গো দ্রুত অদৃশ্যভাবে যাত্রা করলেন। মায়াদেবী রাক্ষসকুল-রাজলক্ষীর মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর তেজ সম্বরণ করতে অনুরোধ করলেন। রাজপুরলক্ষ্মী মায়াদেবীর সঙ্গো মন্দির ত্যাগ করে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারের দিকে গেলেন। লঙ্কায় একের পর এক অঘটন ঘটতে লাগল।

মায়াবলে লক্ষ্ণণের স্পর্শমাত্রে লঙ্কার সিংহদ্বার খুলে গেল, কেউ শব্দ শুনতে পেল না, এবং তাঁদের কেউ দেখতে পেল না। লঙ্কার অপরূপ ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তাঁরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পৌঁছুলেন—সেখানে নির্জনে বিবিধ উপাচার বেষ্টিত হয়ে মেঘনাদকে ধ্যানে রত দেখতে পেলেন। লক্ষ্ণণের অস্ত্রের শব্দে মেঘনাদের ধ্যান ভঙ্গা হল। লক্ষ্ণণের রূপ ধরে অগ্নিদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মনে করে। এভাবে তাঁর আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং দেব অসি কোষমুক্ত করে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, মেঘনাদ বললেন, যদি সত্যই তাঁর যুদ্ধে সাধ জাগে তা পূর্ণ করবেন। কিন্তু নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয়, তাই তাকে অস্ত্র-সজ্জিত হবার সুযোগ দেওয়া বিধেয়। লক্ষ্মণ বললেন রাক্ষসের সঙ্গো ক্ষাত্রধর্ম পালন অর্থহীন—শত্রুকে যে কোনো উপায়ে বধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্ণণের এ কথায় মেঘনাদ তার তীব্র নিন্দা করেন। এবং অবশেষে পূজার কোষা তুলে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর দৈবাস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে পারলেন না, বুঝলেন এ হোল দেবতাদের ষড়যন্ত্র। দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন শূলধারী বিভীষণকে। বিষণ্ণভাবে মেঘনাদ বললেন, এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে লক্ষ্মণ এখানে প্রবেশ করেছেন। বিভীষণের এ হেন কাজের জন্য মেঘনাদ তাঁর নিন্দা করলেন। পিতৃব্যকে অনুরোধ করলেন পথ ছেড়ে দিতে, তাহলে তিনি অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র নিতে পারেন। বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ তাঁকে ধিক্কার দিলেন। বিভীষণ লজ্জাবনত মুখে বললেন, তাকে ভর্ৎসনা বৃথা, রাবণের পাপের জন্যই সবংশে ধ্বংস হতে চলেছেন। মেঘনাদ তখন বললেন হীন সংসর্গে থাকার জন্যই আজ বিভীষণ এতই অধঃপতিত হয়েছেন যে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এদিকে মায়ার যে- লক্ষ্মণ চেতনা পেয়ে মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। মেঘনাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে মাটি লাল হয়ে গেল। বেদনায় অস্থির মেঘনাদ একের পর এক পূজাপাত্র লক্ষ্ণণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবে তা তাঁর গায়ে লাগল না। গর্জন করে লক্ষ্ণণের দিকে ধাবিত হলে মায়ার বলে দেখলেন দেবতারা লক্ষ্মণকে আঁড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে হতাশ হলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ দৈব-অসি দিয়ে মেঘনাদকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্র উদবেল হল, ভৈরব রবে বিশ্ব পূর্ণ হল। রাজসভায় রাবণের মাথার সোনার মুকুট খসে পড়ল। প্রমীলা ভুলে অকস্মাৎ কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেন, মন্দোদরী বিনা কারণে মূর্ছিত হলেন, রাক্ষস শিশুরা কেঁদে উঠল।

মৃত্যুপথযাত্রী মেঘনাদ বললেন তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, কিন্ত একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে, এটিই তাঁর দুঃখ। লক্ষ্মণকে দেবদৈত্য মানব কেউই শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর অপযশ কোনো কালে ঘুচবে না।

মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণও শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণের কোনো হাত নেই, বিধির বিধানেই সব ঘটেছে। এখন অনতিবিলম্বে ফিরে গিয়ে রামচন্দ্রের উৎকণ্ঠা দূর করা কর্তব্য। অবশেষে তাঁরা রামচন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে মেঘনাদ নিধনের সংবাদ দিলে, রামচন্দ্র তাঁদের সাধুবাদ ও বিভীষণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শঙ্করীর পূজা করতে বললেন। আকাশে

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, 'জয় সীতাপতির জয়' ধ্বনিতে লঙ্কার অধিবাসীরা সচকিত হল।

৪৮.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ শব্দার্থ, টীকা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তজি সে উদ্যান — লঙ্কার যে উদ্যানে 'চণ্ডীর দেউল' আছে, সেখানে দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করে সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করে রঘু-রাজ রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে গেলেন।

নীলোৎপলাঞ্জলি — নীলপদ্ম দিয়ে লক্ষ্মণের দেবীর অর্চনার বিষয়টি কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঘটনা থেকে পরিকল্পিত।

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি — সীতা উদ্ধারের জন্য মেঘনাদ ও রাবণ বধ প্রয়োজন। কিন্তু মেঘনাদ যে রকম পরাক্রমশালী, ভাই লক্ষ্মণকে পাঠালেন, তাঁর জীবনশঙ্কা আছে। তাই লক্ষ্মণের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা না করার কথা বলেছেন। দেবানুগ্রহ ও দৈবাস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও মেঘনাদের দুর্বার শক্তির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এ অংশ পরিকল্পিত হয়েছে মনে করা যায়। কিন্তু এর ফলে মেঘনাদের বীর্যবত্তার পরিচয় পেলেও রামচন্দ্রের চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে — রামের এই হতাশা ও বিলাপের সাহায্যে পরোক্ষে মেঘনাদ-এর গৌরব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আছিল, ডরায় পালিস প্রভৃতি লোকায়ত শব্দ মধুসূদন অনায়াসে মহাকাব্যেও প্রয়োগ করেছেন।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী — লক্ষ্মণকে এখানে রামচন্দ্রের চেয়ে পৌরুষ-সম্পন্ন করে আঁকা হয়েছে।

কালমেঘসম দেবক্রোধ — দেবতাদের বিরূপতার কারণে স্বর্ণলঙ্কার দীপ্তি মেঘছায়াবৃত হয়েছে—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা অন্তর্হিত হয়েছে।

দেবহাস্য উজলিছে — দেবতারা যে রামচন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন, তা বোঝা যায় রামচন্দ্রের শিবিরের উজ্জ্বলতায়।

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাত — পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গল ঘট। তাকে কেউ পদাঘাতে ভাঙে না। দেবানুগ্রহ পেয়েও মূঢ়ের মতো কেউ তাকে ভীতিবশে প্রত্যাখ্যান করে না।

স্মারিলে পূর্বের কথা — ইতোপূর্বে দুবার মেঘনাদের যে বীরত্বের পরিচয় পেয়েছেন, তা মনে হলে।

নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি — বিভীষণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের আর প্রয়োজন নেই বলেছেন, প্রধানতঃ মহাবিক্রমশালী ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষ্মণের পরাভাবের সম্ভাবনার কাথ ভেবে। এই সর্গের প্রথমদিকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

দেবাকৃতি, দেববীর্য — রামচন্দ্রের বানর সৈন্যরাই এ সংকটে একমাত্র সহায়। তাই বানরদের 'rabble' বললেও এখানে তিনি তাদের অসামান্য মহিমাকে স্মরণ করেছেন—বলেছেন, তারা দেবতাদেরই মতো শক্তিধর।

আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী — আকাশ থেকে সৃষ্ট বাণী ; দৈববাণী।

অহিসহ যুঝিছে অম্বরে শিখী — আকাশে সাপের সঙ্গো ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে। এই চিত্রকল্পটি ইলিয়াড কাব্যের অনুসরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল — যুদ্ধে রত সাপের মুখ থেকে তীব্র বিষ প্রলয়ংকর আগুনের মতো আকাশে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত — হাতির দাঁতে তৈরি।

কালানল সম তেজঃ তব...... এ নগরে ? — শক্তিময়ী তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ শত্রু মনোভাব নিয়ে কে লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ প্রসন্ন তখন কারও পক্ষে রাবণ তথা লঙ্কার ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রাক্তনের গতি — পূর্বকৃত কর্মফল — অদৃষ্ট।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা — লক্ষ্মীদেবীর তেজ সংবরণের ফলে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা আসলে বৃষ্টি নয়—লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রু বর্ষণ।

বিরূপাক্ষ ; তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর — এরা সকলেই রাক্ষস সেনাপতি।

দৈত্যকুল-মাৎসর্য — দৈত্যদের ঈর্ষার বস্তু।

মগাশীসঞ্জিনী — মৃগনয়না সুন্দরীদের গর্বহারিণী।

আয়সা-আবৃত — লৌহনির্মিত বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিশূর—ইত্যাদি — সুরক্ষিত লঙ্কার সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে প্রতিপক্ষ লক্ষ্মণের প্রবেশ কল্পনাতীত। দেহকান্তি-শোভিত লক্ষ্মণকে দেখে দেবতা লক্ষ্মণের রূপধারণ করে তাকে বর দিতে এসেছেন মনে করে ইন্দ্রজিৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সাষ্টাঙ্গ (স-অষ্ট + অঙ্গ)—জানুদ্বয়, পদদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষ, শির, বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি অথবা দুই জানু, দুই পা, দুই হাত, হৃদয় ও ললাট — এই আটটি অঙ্গ।

রৌদ্র দাশরথি — রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর লক্ষ্মণ।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে — ধার্মিক নলরাজার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তার শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেও অনেকদিন কোনো সুযোগ পায়নি। নল একদিন ভুলে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করায় কলি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁকে রাজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অনুরূপে মেঘনাদের হলেও প্রতিদিন কোনো ভয় স্থান পায়নি। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর মনে ভয় হল। এ থেকেই মেঘনাদের বিনাশ সম্ভাবনা হল।

শত্রু করে যথা ইরম্মদনয় বজ্র — ইন্দ্রের হাতে বজ্রের শক্তিতে পূর্ণ যে বজ্র হাতে তারই মতো চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর তরোয়াল তুলে ধরল।

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালি ইত্যাদি — লক্ষ্মণের এ হেন উক্তি তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। পক্ষান্তরে মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ শান্ত সংযত ও শিষ্ট আচরণ তাঁর চরিত্রমহিমাকে বাড়িয়েছে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—বীরের কথা নয়। এই উক্তি লক্ষ্মণ চরিত্রকে করেছে, সেই সঙ্গো মেঘনাদকে উজ্জ্বল করেছে।

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি — রাত্রির নিস্তব্ধতায় আকাশের মেঘের ক্রুধ গর্জন যেমন গম্ভীর শোনায়। সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি ..... ধূলায় ? — মহাদেবের ললাটের চাঁদের সঙ্গে তুলনার বিষয় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে — মেঘনাদের এটি বক্তব্য। 'যান গড়াগড়ি' শব্দযুগল বক্তব্যটিকে পাঠকের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদন লোকায়ত শব্দকে এভাবে অনায়াসে প্রয়োগ করে, প্রথাসিদ্ধ শব্দ বিন্যাসে স্বাভাবিকতা এনেছেন।

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! — বিভীষণের রাক্ষসরাজ-পক্ষ পরিত্যাগের মতো নিন্দনীয় কাজের জন্য গঞ্জনা করতে গিয়ে মেঘনাদের মনে পড়ে, হীনমতি রামের সংসর্গেই এরকমটি ঘটেছে। সংসর্গজনিত হীনতা ভর্ৎসনায় দূর হবে না। তাই বিভীষণকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা। নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে চরিত্রের অবনতি ঘটে। এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ করে, রামের সংসর্গেই বিভীষণের এমনটি ঘটেছে। মেঘনাদ বোঝাতে চেয়েছেন।

বামেতর নয়ন — বামভিন্ন অন্যতর নয়ন অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বা চোখ কাঁপা অমঙ্গালের সূচক।

মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে — সন্তান যে যত দূরেই বা যেখানেই থাকুক তার কোনো বিপদ ঘটলে, মা অন্তরে তার আভাস পান। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনে জননী মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের ঘরে অকস্মাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বাজিছে মঙ্গালবাদ্য ইত্যাদি — মেঘনাদবধ যে দেবতার ইচ্ছায় ঘটেছে এবং সেই কারণেই দিব্য বাদ্যধ্বনি দেবতাদের আনন্দ জ্ঞাপন করছে। একথা বলে, তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি — পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য, পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচটি ছেলেকে বধ করে যে আনন্দ ও ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিলে, সেইভাবে।

আতঙ্গে কনকলঙ্কা জাগিল যে রবে — মেঘনাদকে বধ করে লক্ষ্মণ শিবিরে ফিরলে রামচন্দ্রের সৈন্যরা 'জয় সীতাপতি জয়' ঘোষণা করলে লঙ্কার অধিবাসীদের সেই ধ্বনি সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই সর্গটিতে কবি তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যে মেঘনাদ চরিত্রটিকে সবিশেষ মহিমান্বিত করেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এখানে ততোধিক অনুদার—তাঁর মহিমা নানাভাবে খর্ব করেছেন। মেঘনাদ এখানে শৌর্যে-বীর্যে ও পৌরুষে যেমন উজ্জ্বল, লক্ষ্মণ তেমনি হীন, অমানুষ। দৈববলে বলীয়ান লক্ষ্মণের মেঘনাদ বধ এক অগৌরবের কাজ। সর্গের মূল ঘটনা রামায়ণ বহির্ভূত না হলেও কাহিনী গ্রন্থনা পূর্বাপর রামায়ণ অনুসারী নয়। লক্ষ্মণ চরিত্রের কাপুরুষতা দুর্বলতা রামায়ণ বিরোধী। সর্গ-বর্ণিত রামচন্দ্রের সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দর্শন ইলিয়াড কাব্যে হেক্টরের আকাশে ঈগল পাখির সঙ্গে সাপের যুদ্ধ দর্শনের প্রভাবে রচিত।

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬০ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন। যেগুলি ভুল হবে, এককের উপরের অংশগুলি আরও ভালো করে পড়লেই সংশোধন করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) __________ সদৃশ

__________ বেড়িল দেশ, পুড়িল চৌদিকে

__________ ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি

__________ ; বায়ুদেব গেল চলি দূরে।

খ) বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে

বীরবেশে __________, __________ রণে।

বরষিলা __________ দেব ; বাজিল আকাশে

__________ ; শূণ্যে নাচিলা __________,

স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল পুরিল __________।

গ) মধুসূদনের জন্ম __________ শে __________ ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে __________ __________।

ঘ) __________ পরাজিত হলেন। __________ পরায়ণা __________ শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

ঙ) মধুসূদন __________ সালে দুটি প্রহসন __________ ও __________ এবং পূর্ণাঙ্গা নাটক __________ রচনা করেন।

২) সঠিক উত্তরে টিক (✔) চিহ্ন দিন।

ক) মধুসূদন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন —

১। ১৮৪৮

২। ১৮৪৩

৩। ১৮৫৬

খ) মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা কাল —

১। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

২। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

৩। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ

গ) মধুসূদন লাতিন শেখেন — ১। মাদ্রাজে
২। হিন্দু কলেজে
৩। বিশপস কলেজে

ঘ) মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ — ১। হেক্টর বধ
২। মায়াকানন
৩। বিষ না ধনুর্গুণ

৩) নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

মহোরগ, পিধানে, আর্দ্রিল, জীমূতাবৃত, বিভাবসু, বায়ুসখা, অবিচয়ি, কাকোদর, পরুষ, অনীকিনী, অবতংস, কার্মুক।

৪) নীচে কয়েকটি শব্দ ও অর্থ দুটি সারিতে বিন্যস্ত আছে। শব্দের সঠিক অর্থটি চিহ্নিত করুন।

বাদিত্র	—	কার্ত্তিকেয়
কাদম্বিনী	—	বৃষ্টি
স্কন্দ	—	কুমীর
দিবিন্দ্র	—	মেঘরাজ
নক্র	—	আকাশ
আনায়	—	মেঘমালা
আহবে	—	সংগ্রামে, যুদ্ধে
জীমূতেন্দ্র	—	জাল
আসার	—	ইন্দ্র
শব্দবাহক	—	বাজনা

৫) নীচের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

ক) 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি'—কথাটি কে বলেছেন ? কেন বলেছেন ? বক্তা সম্পর্কে আপনার ধারণা সংক্ষেপে লিখুন।

খ) মূলপাঠ অবলম্বনে রাবণের পাঁচজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করুন।

গ) 'সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর'—কে, কাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণা করেছেন এবং কেন করেছেন ? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) 'ক্ষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব'—বক্তা কে ? বক্তা একথা কেন বলেছেন ? বক্তা সম্পর্কে আপনার অভিমত লিপিবদ্ধ করুন।

ঙ) 'আতঙ্কে কনক লঙ্কা জাগিল সে রবে'—কনকলঙ্কা আতঙ্কে জেগে উঠল কেন ? বুঝিয়ে দিন।

৪৮.৭ মহাকাব্য ঃ স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

মধুসূদন দত্তের অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। ‘মেঘনাদবধ’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও এ পর্যন্ত রচিত সফলতম কাব্যকৃতি। এই কাব্যের অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি মহাকাব্য লেখা হলেও মধুসূদনের মহাকাব্য অর্জনকারী কবিপ্রতিভাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

মধ্যযুগে রাজা বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষণায় সংস্কৃতি রচিত রামায়ণ মহাভারত কাব্যের অংশত বা সমগ্রত অনুবাদ হয়েছে। সেগুলি ছিল ভক্তিমূলক বা বীরত্বজ্ঞাপক কাহিনীর বঙ্গীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ এগুলি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ বা মৌলিক সৃষ্টি নয়। মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary epic) আদর্শে সৃষ্ট। এটি থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তনা ঘটেছে।

মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত, বিউলক প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি জাতীয় জীবনের সহস্ররূপকে তুলে ধরেছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘এপিক (Epic) গ্রিক ‘এপস’ (Epos) শব্দ থেকে এসেছে। এখানে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী থাকে, যে ভাষাতেই লেখা হোক, তা বিষয় ও ভাষায় মহত্বের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এ শ্রেণির রচনায় একটা বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সর্বজনীনতা থাকে। এই বিরাটত্ব ও বিস্তৃতি পাঠক হৃদয়ে এক মহিমান্বিত ভাবের সঞ্চার করে। মহাকাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রকাশের পরিবর্তে ব্যাপকতর সমাজ, গোষ্ঠী, জাতির ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়।

‘পোয়েটিকস্’ রচয়িতা অ্যারিস্টোটল ট্র্যাজেডির পাশাপাশি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এখানেও কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত থাকে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা উপাখ্যান যুক্ত হতে পারে। এ শ্রেণির কাব্যের ছন্দ ও ভাষারীতি ওজোগুণ সম্পন্ন। এখানে উপমার ঐশ্বর্য কখনও কাহিনীর গতি অবরুদ্ধ করলেও আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি ঘটায় কাব্যের উপস্থাপনায় বস্তু নিষ্ঠা যেমন তেমনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব ও কাব্যসম্মতভাবে থাকতে পারে। এপিক শ্রেণির রচনায় দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে, এখানে নায়ক হন জাতীয় বীর। উদাহরণ হিসেবে মেঘনাদ বধ-এর পূর্বমুহূর্তে মেঘনাদ কর্তৃক লক্ষ্মণকে আক্রমণের বর্ণনায় এই পরিচয় পাওয়া যায়—

অধীন ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহার পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিতা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রক্ষী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি অস্ত্রবসে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে।
সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারয়ে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।

আলংকারিক বিশ্বনাথ 'সাহিত্য দর্পণে' মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন, যেমন এতে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে। প্রতিটি সর্গে যে কথা প্রাধান্য পাবে সেই কথা বা তাৎপর্য অনুসারে এটির নামককরণ হবে। বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লেখা হবে। এ ছাড়া মহাকাব্যের নায়ক যিনি হবেন তিনি কোনো দেবতা বা সদ্বংশজাত ধীরোদাও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। রচনা অলঙ্কার এবং রসভাব-সম্বলিত হবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের যে কোনো একটি মহাকাব্যের অঙ্গী বা প্রধান রস হবে অন্য রসগুলি মূল রসকে পুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আলংকারিকেরা। আলোচনায় সেগুলি বাহুল্য বিচারে উল্লেখ করা হল না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে যে লোকগাথা কিংবদন্তি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী নানাভাবে ও ভাষায় লোকজীবনে বহুল প্রচলিত ছিল, সেগুলি থেকে উপাদান নিয়ে জাতীয় জীবনের একটি সংহত রূপ নিয়ে মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত এভাবেই গড়ে উঠেছে। এগুলিকে তাই স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth বা authentic epic) বলে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যক মহাকাব্য (literary epic) সঙ্গে এই শ্রেণির কাব্যের সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তটির কবিকল্পনায় আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের কবি কল্পনায় সরলতা ও প্রত্যক্ষতার পরিচয় থাকে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গৌরব মহিমা (sublimity) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই এর কাহিনীর কেন্দ্রে থাকে কোনো বীরত্ব উদ্দীপণাপূর্ণ যুদ্ধ এবং একজন বীরনায়ক এই কাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করেন। এর গঠনরীতি স্থাপত্যধর্মী হলেও ট্র্যাজেডির তুলনায় অসংহত, কিছুটা শিথিল। ঋজুতাহ এর কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন শিল্পীর রচনা—এখানে তাঁর তীক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। এখানেও নায়ক বীর, চরিত্রমহিমায় অনন্য। সে যুগের মানব মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্যে। ধর্ম, চরিত্র নীতি ও সমাজনীতির কাছে তার শৌর্যবীর্যের মান্যতা ছিল। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্য কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়—কিছু পরিমাণে জাতীয় কাব্য। ভার্জিন, মিল্টনের মতো মধুসূদনের কাব্যে মেঘনাদ ও রাবণের প্রতিরোধ-শক্তি এবং দেশরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের বলিষ্ঠ প্রকাশ যুগধর্মকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর যে নির্বাচিত অংশকে কাব্যরূপ দিয়েছেন তাতে নবজাগ্রত মানবিকবোধ ও আত্মগরিমার যোগ আছে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক সাধারণ বীর নয়, জাতীয় বীর। তাঁর বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গলাদর্শে ব্যয়িত হয়েছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবি, যেহেতু তাঁর যুগ পরিবেশের সৃষ্টি, যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাই তাঁর মহাকাব্যও সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রসঙ্গাত দেশি বিদেশি সাহিত্যিক মহাকাব্য কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ; ভার্জিনের 'ইনিড', তাসসোর 'জেরজালেমের উদ্ধার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গ মহাকাব্য (Mock epic, mock heroic epic) শব্দটির সঙ্গে মহাকাব্য শব্দ যুক্ত থাকলেও এটি বস্তুত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের বিদ্রুপাত্মক অনুকরণ। অতিশয় তুচ্ছ বিষয় বস্তু নিয়ে এ ধরনের কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ থাকে। আলেকজাণ্ডার পোপের 'দি রেপ অফ দি লক' এক সময় হোমারের নামে চালিত একটি ছদ্ম মহাকাব্যের অনুসরণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেক-মূষিক যুদ্ধ', জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' এই পর্যায়ভুক্ত। সাহিত্য হিসেবে এগুলির কোনো স্থায়ী মূল্য না থাকলেও সমকালীন পটভূমিকায় এর কিছু জনপ্রিয়তা থাকে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার (১৮৭৫) মহাকাব্য প্রকাশ করেন। মধুসূদনের বীরভাবপ্রধান কাব্যের মধ্যে অন্তর্গূঢ় করুণ রসের অন্তঃসলিল প্রবাহে কাব্যের বিষয়বস্তুকে হৃদয়বেদ্য করেছেন। ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গো বীর রসপ্রধান যুদ্ধায়োজনের প্রেক্ষাপটে এই রসসৃষ্টি কাব্যশিল্পের প্রয়োজনে এসেছে। হেমচন্দ্র কাব্যের ঘটনাসংঘট্টের নীরসতা দূর করবার জন্য আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোমান্টিক সুরের অবতারনা করেছেন। ফলে লৌকিক প্রেমকাব্যের মূল গতি মহাকাব্যের প্রবাহের সঙ্গো অন্বিত হয়নি।

অপরদিকে মধুসূদনের কবিচিত্তের সহানুভূতিতে রাবণ-মেঘনাদ, লঙ্কা ও রাক্ষসকুল অভাবনীয় মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু 'বৃত্রসংহার' কাব্যে কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যে বৃত্র ও অসুরকুল, ইন্দ্র ও দেবকুল প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বৃত্র নিধন এ কাব্যের প্রধান বিষয়, কাব্যের সমাপ্তি তার পতনে—পতন চিত্রই কবির বর্ণনীয় বিষয়। বৃত্রের পতনে কাব্যে কোন ট্রাজিক রস সৃষ্টি হয়নি ; তার পতনে পাঠকের ভাবলোকে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' এদিক থেকে বৃত্রসংহারের তুলনায় সার্থকতর সৃষ্টি। মেঘনাদবধে রাবণের শোকক্লিষ্ট বিদীর্ণ হৃদয়, মন্দোদরীর শোকব্যাকুল চিত্ত ও সর্বোপরি লঙ্কার হাহাকার ট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)-এ শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। রৈবতকে সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্রে জটিলতা ও বিস্তার প্রভাসে পরিণতি। কবি নীরস বর্ণনায় কাহিনী বিবৃত করেছেন। স্থানে স্থানে কাহিনী সূত্র ধরে রাখবার জন্য 'তত্ত্ব' নিয়ে এসেছেন, কখনও বা লঘু রোমান্টিক আখ্যানসূত্র। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়শই প্রবন্ধের উপযোগী হয়েছে। একারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনায় কৃষ্ণের আদর্শ মতবাদকে চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, কৃষ্ণ চরিত্রকে গৌণ করে কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি তখনই সফল যখন তিনি কোন আদর্শকে চরিত্রের জীবনে ও ব্যক্তিত্বে সত্য করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সঙ্গো তত্ত্বের মিলন ঘটান। মধুসূদন পেরেছেন তাই সফল। নবীনচন্দ্র তা পারেননি।

৪৮.৮ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ কাহিনী বিন্যাস (ষষ্ঠ সর্গ)

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আখ্যানভাগ রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র মেঘনাদ নিধন এর বর্ণনীয় বিষয়। ষষ্ঠ সর্গের বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা, রামায়ণ থেকে নেওয়া মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপ বাঙালির রামায়ণী সংস্কারের প্রভাবজাত। রাম এখানে অনেকটা আবেগপ্রবণ বাঙালি। চণ্ডীর বর ও দৈবাস্ত্র লাভ করে লক্ষ্মণ মেঘনাদ বধার্থে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব করলে লক্ষ্মণের অমঙ্গাল আশঙ্কায় রামচন্দ্র যখন বলেন "নাহি কাজ,—সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে' ।—তখন তাঁকে কৃত্তিবাসের প্রভাবে দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ রূপেই দেখি। সম্ভবত এ জন্যই মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে রাবণ-ইন্দ্রিজিৎকে ভিন্নতর ধাতুতে গড়েছেন। শৈশব স্মৃতির রামায়ণ-মহাভারত তাকে টানত, ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গো ইলিয়াডের দীপ্ত শৌর্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন। মেঘনাদবধের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু। এটি কাব্যকাহিনীর শীর্ষ। প্রথম দুটি সর্গে কাব্যের চরিত্রগুলির বহুমুখী বিকাশ ও দেবতাদের ষড়যন্ত্র, আর এই সর্গ কাব্যের চরম মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনী বিশ্লেষণে তাই, প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া দরকার। কাব্যের শেষ তিনটি সর্গ ক্রমাবণতির মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনাকালে তিনদিন দুই রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। একে কবি নয়টি সর্গে বিভক্ত করে উপস্থিত করেছেন। প্রথম সর্গের সূচনা দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণের খেদ ও যুদ্ধের উদ্যোগ ঘোষণা এবং সংবাদ পেয়ে প্রমোদকানন থেকে মেঘনাদ রাজসভায় এসে স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা, অনেক আশঙ্কা এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেকে প্রথম সর্গের সমাপ্তি। দ্বিতীয় সর্গে দেব কাহিনী—মুখ্যত মেঘনাদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎপট। মূল ঘটনার সঙ্গে এর যোগ ঘনিষ্ঠ। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ। শুধু বীরের মৃত্যুতে হাহাকার তীব্রতা পায় না। পাঠকের চিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে না। এখানে মেঘনাদ শুধু বীর নন, পিতামাতার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে সম্পূর্ণ মানুষ। প্রমীলাল স্নিগ্ধ প্রেম ও তার বীরাঙ্গনা রূপ তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। সমাগম নামে এই সর্গ এখানে তাই প্রাসঙ্গিক। চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা চরিত্রের উপস্থাপনা করে পরোক্ষভাবে রাবণ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চমসর্গ সবিশেষ ঘটনাবহুল। মেঘনাদ বধ-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তান্বিত দেবরাজ, মায়াদেবীর উপস্থিতি, রক্ষকুলচূড়ামণিকে চূর্ণ করবার সংকল্প জ্ঞাপন, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষার পরিকল্পনা, লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন, চণ্ডীপূজার উদ্যোগ, শিবের বাধা দান, লক্ষ্মণের সাহসিকতা, মায়া সুন্দরীদের ছলনা, লক্ষ্মণের সিংহবাহিনী পূজা, রাক্ষসবধের বর প্রার্থনা, দৈবাস্ত্র লাভ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, জননী মন্দোদরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা, যুদ্ধে পাঠাতে মায়ের আশঙ্কা, মেঘনাদের আশ্বাস, মেঘনাদের যজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা, প্রমীলার পারর্বতীর কৃপা প্রার্থনা ও বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইল তাহায়!

মেঘনাদবধের অন্যান্য সর্গের মতো পঞ্চম সর্গের অধিকাংশ ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কেবলমাত্র লক্ষ্মণ কর্তৃক চণ্ডীপূজা ও বরলাভ কৃত্তিবাস অনুসারী। বাকী অংশ পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে কল্পিত হলেও পাঠকের কাছে দেবতাদের ষড়যন্ত্র কতটা গভীর তা বোঝা যায়। তথাপি আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি কবি অসামান্য নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন স্বীকার করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাবর্ত ও কাব্যকাহিনী চরম মুহূর্তটিকে দেখতে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সর্গে পিতা-প-ী স্নেহ ও প্রেমের মাধুর্যে মেঘনাদ চরিত্র যেমন সহনীয় হয়ে উঠেছে তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গ দেব-মানবের যৌথ চেষ্টা ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলেছে। স্বর্গে-মর্ত্যে এবং (পরে) পাতালে বা নরকে কাহিনীর বিস্তার তাকে এক ধরনের মহত্ত্ব দিয়েছে। চতুর্থ সর্গের সীতাহরণ প্রসঙ্গ মেঘনাদের মৃত্যু ও লঙ্কার ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করার যুক্তি তৈরি করেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবৃত্ত ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মধুসূদন সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার—কেবল ঘটনা নয় রচনার দিক থেকেও এ সর্গের সৌন্দর্য অতুলনীয়। এ সর্গের বর্ণনাভঙ্গির বড়ো বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের স্বার্থও প্রয়োজনবোধের বর্ণে চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুরই মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ-লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্য লক্ষ্মণ বিভীষণকে বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্মণ এখানে যে রূপে চিত্রিত হয়েছে, তা কবির দৃষ্টি-নিরপেক্ষ নয়। এ পরিবেশে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ-ধিক্কার উৎসারিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গের সূচনায় লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ নিধনের যাত্রার কথায় রামচন্দ্রের ভীতি বিহ্বল রূপ ফুটে উঠেছে। রাম সভয়ে বলেছেন, "নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে। দুর্বার সমরে, দেব-দৈত্য-নরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।" ইন্দ্রজিতের সেই বীর্যবত্তা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে সমাহিত হবে। মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ কাব্যে থাকলেও তাঁর বীর্যবত্তার কোনো পরিচয় প্রত্যক্ষত কাব্যে তুলে ধরা হয়নি। সে যুদ্ধের অবকাশ পায়নি। তাই তার এই অপঘাত মৃত্যুকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাজেডি বলা যায়। ষষ্ঠ সর্গ এভাবে একটি ট্র্যাজিক বেদনায় সমাপ্ত হয়েছে।

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন এবং প্রয়োজনে ৪৮.৮ ও ৪৮.৯ অংশের মূলপাঠ আবার পড়ুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগে ____________ ____________ পৃষ্ঠপোষণায় রচিত ____________ ____________ কাব্যের অংশত বা সমগ্রত হয়েছে।

খ) মহাকাব্যের উপস্থাপনায় ____________ যেমন তেমনি ____________ ____________ জন্য কিছু ____________ ____________ ভাবে থাকতে পারে।

গ) সাহিত্যিক মহাকাব্য ____________ ____________ রচনা, এখানে তাঁর ____________ ও ____________ দৃষ্টির ____________ অনুভব করা যায়।

ঘ) শৈশব স্মৃতির ____________ ____________ তাঁকে (মধুসূদন) টানত, ____________ ____________ কাহিনী তাঁর ____________ উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও ____________ সঙ্গো ____________ দীপ্ত ____________ সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

২) ক) 'স্বতঃস্ফূর্ত', 'সাহিত্যিক' ও 'ব্যঙ্গা' মহাকাব্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করুন।

গ) নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যের শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। পর্ব তিনটি কী?

৩) সঠিক উত্তরের টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

ক) মেঘনাদবধ কাব্য—
১। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ
২। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুসরণে রচনা
৩। বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) বৃত্রসংহার কাব্যের রচনা কাল—
১। ১৮৬৫
২। ১৮৬১
৩। ১৮৭৫

গ) 'দি রেপ অব দি লক' রচনা করেন—
১। পোপ
২। হোমার
৩। ভার্জিল

ঘ) 'ভেক মূষিক যুদ্ধ'র রচয়িতা— ১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২। হোমার
৩। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪) অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেগুলি উল্লেখ করুন।

৫) আলংকারিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের কতগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

৬) 'স্বাতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যে'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৭) সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৪৮.৯ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ দেশি বিদেশি প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য রচনার কাহিনী বাল্মীকী-কৃত্তিবাস থেকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গো পাশ্চাত্য উপাদান সমন্বয়ে নূতন যুগের নূতন সৃষ্টি রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ। তাঁর রাম-লক্ষ্মণ, তাঁর মেঘনাদ-বিভীষণ, মায়া-লক্ষ্মীদেবী চরিত্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও যুগের অভিনব কল্পনার রঙে রঞ্জিত। ষষ্ঠ সর্হের বিষয় রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ-নিধন। এই মূল ঘটনা উপস্থাপন করতে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে হোমারের ইলিয়াড, দান্তের ডিভাইন কমেডি, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-নিধন তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত না হলেও মেঘনাদ বধ কাব্যে এর গুরুত্ব সমধিক। কবি এটিকে কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে বিন্যস্ত করে ষষ্ঠ সর্গে ঘটনা প্রবাহের সন্ধিক্ষণ বা (climax) তৈরি করেছেন। বিভীষণ প্রদর্শিত পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে লক্ষ্মণ প্রবেশ করে উষাকালে মেঘনাদকে নিহত করেছে। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে নিকুম্ভিলা কোনো যজ্ঞাগার নয়, নীল মেঘের মতো বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা'—সেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রে মেঘনাদের মৃত্যু এবং সময়টিও 'সূর্যাস্ত কাল'। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের রাক্ষসীয় মায়া অবলম্বনের কথা থাকলেও, মেঘনাদবধ কাব্যে তার উল্লেখ নেই। এভাবে ষষ্ঠ সংর্গেও ভারতীয় উপাদনের কিছু পরিবর্তন ঘটালেও এখানে মেঘনাদ বিভীষণ সংলাপে বাল্মীকিকে প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণের লক্ষ্মণ মেঘনাদবধে অনেকটা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। সুমিত্রার নির্দেশ মতো রামকে পিতা সীতাকে জননী জ্ঞানে সেবা করেছে। রামের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ রামের বিলাপে তাকে ভর্ৎসনা করেছে। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে মধুসূদন কাজে লাগিয়েছেন। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ নৈতিক শক্তির বলে মায়াকাননের নানা প্রলোভন অনায়াসে অতিক্রম করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো ছলনাময়ী বামাদলকে মাতৃ সম্বোধনে নিবৃত্ত করেছে। নুপূর অলংকৃত চরণের ঊর্ধ্বে সে কখনও তাকায়নি। কিন্তু এ হেন লক্ষ্মণ চরিত্র ষষ্ঠ সর্গে তাঁর উপরিউক্ত চরিত্রমহিমা বজায় রাখেনি। দেববলে বলীয়ান হয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। বীরধর্ম লঙ্ঘন করে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র মতো হীন উক্তি করেছে। বীরচরিত্রের আদর্শ বিরোধী এই আচরণ বোধ করি। রাবণ-

মেঘনাদের বীর্যের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহের কারণে মধুসূদন লক্ষ্মণকে তাঁর স্বভাব বিপরীত চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতারা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। তাদের চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ নেই, পৃথক কোনো দেবীমহিমাও নেই। মানুষের মতো তাঁদের কামনা-বাসনা-লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি আছে। মানুষেরই মতো তাদের গতিবিধি ইচ্ছামতো কার্যসিদ্ধি—এ সবই ভারতীয় পুরাণানুসারী। এই দেবতারা প্রবঞ্চনা ছলনা করতে পরাঙ্মুখ নয়। তাই রাবণের একান্ত ভক্তি সত্ত্বেও রক্ষকুলের রাজলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতকতা করে, ইন্দ্রজিতের কাছে পরাস্ত ইন্দ্র-ইন্দ্রজিদেতর সর্বনাশের উদ্যোগ নেয়। পার্বতী মোহিনী বেশে যোগী শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে। বলা হয় যে, রাবণ পাপী তাই দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রাবণও মানুষ—সে পিতা, স্বামী, সে বীর। তাঁর হৃদয় মমত্বময়, বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপ করে, মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়। রাজা তাই শোক জয় করে রাজকর্তব্য পালনে কৃতসংকল্প হয়—এ সব মিলিয়ে মানবপ্রকৃতির পূর্ণ বিগ্রহ। মেঘনাদবধের দেবতারা এর কাছে হীন, তুচ্ছ। এভাবে চরিত্র-পরিকল্পনার পেছনে বাংলা মঙ্গল দেবতার এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

মেঘনাদবধের দেবতাদের আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রিক ও লাতিন কাব্যের আদর্শে গড়া বলে মনে হয়। ইলিয়াডে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদেও তার অনুসরণ দেখা যায়। মেঘনাদের শিবপার্বতী যেন গ্রিক দেবাতা জিউস-হেরা। গ্রিক-সাহিত্যের নিয়তি মেঘনাদবধকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। এতৎসত্ত্বেও বলা হায় মধুসূদনের দেবদেবী চরিত্র-চিত্রণে পাশ্চাত্য প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তথাপি তাদের অচেনা বলে মনে হয় না। দেশীয় পুরাণে ও মঙ্গালকাব্যে এই ধরনের দেবদেবীর ভূমিকা আছে।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অনুসারে মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করতে গেলে দেখা যাবে মধুসূদন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু গতিশীলতা। ফলত দুই আদর্শের মিলনে তাঁর কাব্য বিচিত্র রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। মেঘনাদবধে বীররসের সঙ্গে করুণ রসের সম্মিলন ঘটেছে। বীররস এর স্থথায়ী রস হলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে করুণরসের অন্তঃসলিলা ধারা নিয়ত প্রহমান। প্রথম সর্গেই সে পরিচয় আছে। দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার রাবণ হাহাকার করেছেন, তারপরই রাজা রাবণ—'স্তব্ধ হইল মনস্তাপে।' লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে কহিলা ; "সাবাসি দূত। তোর কথা শুনি/কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে/সংগ্রামে ?" দীর্ঘ কান্নার পর আবেগকম্পিত হাহাকারই স্বাভাবিক কিন্তু সাবাসি দূত প্রভৃতি কথার কথার মধ্যে দিয়ে বীরত্বের যে উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর। রসবিচারে একে বীররস বলতেই হয়। সুতরাং বেদনার হাহাকার আর বীরত্বে উল্লাস—করুণ আর বীরের দ্বৈতসত্তা কাব্যটির প্রথম সর্গে ধ্বনিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বীর আর করুণের প্রতি কবির আকর্ষণ প্রবল। অন্যভাবে বলা যায়, বীরের আশ্রয়ে করুণ রস সৃষ্টি করে মধুসূদন কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির এক অভিনব ও সলার্থক পরীক্ষা করেছেন।

মেঘনাদবধ ধ্বংসোন্মুখ লঙ্কার চিত্র বিশেষ—রাবণ কেমন করে তিলে তিলে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেমন করে নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে দুর্বল করছে, লঙ্কার ঐশ্বর্য গর্ব ধূলিসাৎ হচ্ছে সেটি বীরবাহুর মৃত্যুতে যার শুরু মেঘনাদের মৃত্যুতে তার শেষ। অর্থাৎ বিষাদে করুণে শুরু আর বিষাদে করুণেই শেষ। তাই বীররসের অন্তরালে নিগূঢ় করুণ রস প্রবাহিদত হওয়ায় রস দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির মহিমা উপলব্ধি সম্ভব নয়। বস্তুত মধুসূদন বারী-কাব্যই লিখেছেন। কিন্তু বীররসের অপর দিকেই আছে বেদনা। যুদ্ধে বীরত্ব এক পক্ষের মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে, মৃত্যুতে বীরত্ব আরও মহিমা পায়। সুতরাং করুণরস সম্পূর্ণ বর্জন করে যে বীররস, তার মহিমা তত উন্নত নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের ট্র্যাজিক রস পরিণতি সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ট্রাজিডি রসসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি কী বা কে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং এক্ষেত্রে ষষ্ঠ সর্গের ভূমিকা আলোচিত হতে পারে। এ বিচারের সূচনায় ট্রাজেডি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা দরকার।

গ্রিক ও ইউরোপের অন্যান্য ট্রাজেডির উদ্ভব, বিকাশ তার স্বরূপ ও রূপান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। আমরা শুধু সংক্ষেপে বলতে পারি করুন কোনো কাহিনী, ঘটনার বর্ণনা ও তার রস পরিণতিই হোল ট্রাজেডি। তাই ট্রাজেডি করুণরসের আশ্রয়। মহৎ ও রাজকীয় কোনো ব্যক্তির শোকাবহ জীবনবৃত্ত বর্ণনা থেকে কালক্রমে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-বিপর্যয় ট্র্যাজেডির বিষয় হয়েছে। মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডি এ ধারণাও অপরিহার্য নয়। গ্রিক ইউরিপিদেশের রচিত মিলনান্ত ট্র্যাজেডিও আছে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় যখন নায়ক বা নায়িকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিয়তির সঙ্গো অসম যুদ্ধে সে যখন বিধ্বস্ত, তার সেই বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক আর্তির মধ্য দিয়ে পাঠক চিত্তে যে রসপরিণতি ঘটে তাকে ট্র্যাজেডি বলা যায়। অর্থাৎ প্রাণঘাতী পরিণতি নয়, মানবাত্মার মহিমাপূর্ণ অথচ নিরুপায় শোচনা ব্যক্তিহৃদয়ের দীর্ণ হাহাকারও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বিষয় মেঘনাদের মৃত্যু—ষষ্ঠ সর্গে তাঁর নিধন। একটি বীরের মহৎপ্রাণের বিনষ্টি। কাব্যটি এখানেই শেষ হয়নি। কারণ ট্র্যাজেডি যার মৃত্যু হয় তার নয়, যে বেঁচে থাকে তার। পরবর্তী তিনটি সর্গে এই ঘটনারই পরিণতি প্রলম্বিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে মেঘনাদবধ-এর পর রাবণ মন্দোদরীর ও সমগ্র লঙ্কার হাহাকারের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ নিধনোত্তর ভাবমণ্ডল নতুন মাত্রা পেয়েছে এই শোকের হাহাকারেই প্রমীলার চিতারোহন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের সর্বহারা চিত্তের যে সীমাহীন বেদনা, সমস্ত বিশ্বময় যে অনন্ত শূণ্যতাবোদের সঞ্চার করেছে, সেখানেই এ কাব্যের ট্র্যাজেডির রসপরিণতি ঘটেছে। তাই মেঘনাদবধ এখানে কেন্দ্রীয় ঘটনা হলেও, কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের হৃদরে আর্তনাদ লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশ তথা সর্বাত্মক ধ্বংসের আশঙ্কাজনিত বেদনা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই মেঘনাদের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই রাবণের জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা। মেঘনাদের মৃত্যু গভীর বেদনাবোধ থেকে করুণরস বা Pathos সৃষ্টি করে। একে একে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর রাবণের একান্ত নির্ভর বীরপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ট্র্যাজেডির রস পরিণতি এনে দিয়েছে।

যেকোনো ট্র্যাজেডির মতোই নিয়তিবাদ—এ কাব্যের একটি উপাদান মনে করা হয়। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের আক্ষেপ, বিধি, এ-ভব যার লীলাস্থলী তিনিই যাঁকে, 'বজ্র আঘাতে' যে কাতর তার বেদনা, অথবা চিত্রাঙ্গাদার অনুযোগের উত্তরে—'বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে', 'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? বিধিবশে দেবি, সহি এ যাতনা ।' উত্তরে চিত্রাঙ্গাদা 'নিজ কর্মফলে মজালের লাক্ষসকুলে, মজিলা আপিন', রাজলক্ষীর উক্তি 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এপুরে।' ষষ্ঠ সর্গেও লক্ষীদেবী অনুরূপ উক্তি করেছেন, 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? কৃতকর্মের ব্যাখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভীষণের উক্তি, 'নিজ-কর্ম-দোষে, হায় মজাইলা এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।'

গ্রীকপুরাণে নেমেসিস বা নিয়তি প্রতিহিংসার দেবী। আধুনিক সাহিত্যে দৈব, পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রতিকূল মানবসত্তার অসহায় অবস্থাকে বোঝানো হয়। গ্রিক ধারণায় নিয়তি অপরিরোধ্য। যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গো মানুষ নিয়ত সংগ্রাম করেও পরিণতিতে জয়ী হতে পারে না তাই নিয়তি। এ যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত এক বিশ্ববিধান যেখানে মানুষ সাধারণ ক্রীড়ণকমাত্র।

মধুসূদনের রাবণের মতে তিনি নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি তাঁকে এই কঠোর দণ্ড দিচ্ছে। যদিও চিত্রাঙ্গদা, রাজলক্ষী এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা রাবণের কৃতকর্মকেও দায়ী করেন। মেঘনাদ বধ-এর ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করার পর বিভীষণের চিত্ত দৌর্বল্য দেখা দিলে লক্ষণ বলেছে, 'চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে জগতের রীতি'—এ উক্তির মধ্য দিয়ে যা ঘটতে যাচ্ছে তা যে বিধির বিধান এটি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। আবার তিনি মেঘনাদকে বলেছেন, দৈবাদেশে রণে আমি আহ্বানি তোরে।' লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের পর বিভীষণের শোকে সান্ত্বনা দিতে 'বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার'—প্রভৃতি সমস্ত কাজই যে বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত তাই বোঝাতে চেয়েছেন। মধুসূদন মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো ফাঁক রাখেননি। তাঁকে আদর্শ নায়ক করে গড়েছেন। সর্বোপরি মেঘনাদের মতো মহৎপ্রাণ, পিতৃভক্ত, প`ীপ্রেমী, দেশপ্রেমিক বীরের স্বীয় যজ্ঞাগারে এই নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অন্যায়ভাবে নিহত হওয়াকেও অন্ধ নিয়তির নির্মমতা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। নিয়তি সৃষ্ট হয়েছে রাবণের 'পাপে' এবং তার প্রতিবিধানের জন্য রামের যুদ্ধযাত্রা ও দেবতাদের ষড়যন্ত্রে।

৪৮.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

ষষ্ঠ সর্গে রাম-রক্ষ্মণ, মেঘনাদ-বিভীষণ, লক্ষ্মী-মায়া প্রভৃতি চরিত্র কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গো স্বাভাবিক কারণেই সাদৃশ্যমূলক। মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার স্বীয় বংশগৌরব বীরত্বমহিমা প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি অনুচিত অবজ্ঞা "ভিখারী রাঘব" উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদনও একটি চিঠিতে বলেছেন 'I hate Ram and his rabble.'। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক তাঁর চরিত্র কবি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আঁকতে পারেননি। মধুসূদনের রামচন্দ্র বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র নয়। বাল্মীকির রাম ধীর, স্থির, বীর, নির্ভীক বীর্যশালী পুরুষ। কৃত্তিবাসেও সে বীর, কিন্তু বাঙালির চরিত্র মহিমায় কিছুটা কোমল। এদিক থেকে মধুসূদনের সৃষ্টি দ্বন্দ্বসঙ্কুল এবং অনেকরটা বিপীতধর্মী। নবম সর্গে 'পুত্রের সৎক্রিয়া' সমাধার জন্য রাবণ মন্ত্রী সারণকে রামচন্দ্র সকাশে পাঠিয়েছেন সাতদিন সময় চেয়ে। রাবণ সে সময় প্রসঙ্গত 'নরকুলোত্তম' রঘুকুলমণি যে বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবলে অতুল জগতে প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক বিশেষণ প্রয়োগ করে সাতদিন সময় চেয়ে নেয়। রাবণ আরও বলে, কী কুক্ষণে রক্ষদলপতির সঙ্গো নরদলপতির রিপুভাবে দেখা হয়েছিল। এর উত্তরে রামচন্দ্রও ক্ষমাশীল বীরের ঔদার্য নিয়ে বলেছেন, তাঁর দুঃখে পরম দুঃখিত আমি রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে হৃদয়, বিপদে অপর পর সম মম কাছে' এ রামচন্দ্র মহৎ, ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, যথার্থ বীর। কিন্তু তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গে এই চরিত্রই সীমাহীন দুর্বলতার আকড়। তৃতীয় সর্গেও প্রমীলার দূতী রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে লঙ্কায় যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে রামচন্দ্র বলেছেন, 'আর মম রক্ষঃপতি ; তোমারা সকলে কুলবালা, কুলবধূ, কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব আচরি তোমাদের সাথে ?' শেষে বলেছেন 'কি প্রসাদ, সুবদনে, দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।' এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ব, সস্নেহ আশীর্বাদ করার মধ্যে যে ঔদার্য তা বীর্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। মধুসূদনের সচেতন কল্পনা রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই মহৎ দিকটি দেখলেও, কবির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টি তাঁকে অন্যপথে চালিত করেছে। তাই তৃতীয় সর্গেই বিভীষণকে বলেছেন 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিণু হৃদয়ে, রক্ষোবর যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি। মূঢ় যে ঘাঁটায়, হেন বাঘিনীরে। বা ষষ্ঠ সর্গে 'চলো ফিরি। পুনঃ মোরা যাই বনবাসে ; বা 'নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে।" এই বীর্যহীন কান্নাও কবির রামচন্দ্র সম্পর্কে পূর্বকল্পিত 'ঘৃণা'র কারণেই বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে মায়াদেবীর সাহায্য নিয়ে যে নিন্দনীয় উপায়ে মেঘনাদকে বধ করা হয়েছে তা রামচন্দ্রের সপ্রশংস সমর্থন পেয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কবির কল্পনায়

রামচন্দ্রের যে দুর্বলচিত্ত একটি মানুষের ভাবমূর্তি আছে, এটি তারই প্রতিফলন। মধুসূদন মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমত্ববশত, রামচন্দ্রকে কালিমালিপ্ত করেছেন। পরিবর্তে মেঘনাদকে বীরত্বে মহত্ত্বে মহতো মহীয়ান করে তুলেছেন।

রামায়ণের লক্ষ্মণ মূলত পুরুষকার-নির্ভর। মেঘনাদবধে দেব-দৈত্য-নরত্রাস অজেয় মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও সে বাল্মীকি রামায়ণের ছায়া মাত্র। তবে এ কাব্যে সে রামের থেকে সক্রিয়। রামচন্দ্রের মতো ভয়-ভীতি কান্নায় সে ভেঙে পড়ে না, অসম সাহসে ভর করে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো বীর্যবত্তা ও শক্তি তাঁর আছে। রামচন্দ্র বিপন্ন বোধ করলে, সে তাঁকে সাহস দেয়। একা বনপথে লঙ্কায় চণ্ডীমন্দিরে যাওয়া লক্ষ্মণের পক্ষে অপরিমিত সাহস ও শৌর্য, রুদ্র ভৈরবকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, দানবীয় শক্তিকে পরাস্ত করেছে। সর্বোপরি ভোগবিলাসে প্রলুব্ধ করতে মায়া-সুন্দরীদের চেষ্টাকে প্রতিহত করেছে। সমস্ত প্রলোভন ও কামনাজয়ী এই ব্রহ্মচারী তুলনাহীন। মধুসূদন এদিক থেকে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, লক্ষ্মণের বীরত্ব বৈভব ম্লান হয়েছে, দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে মায়াদেবীর আনুকূল্যে চোরের মতো লঙ্কায় প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করায়। মেঘনাদ বলেছেন 'নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।' লক্ষ্মণ উত্তরে বলেছেন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। নিরস্ত্র মেঘনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে, বীরধর্ম-বিরোধী এই আচরণ লক্ষ্মণকে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর এতদিনের সমস্ত চরিত্র গৌরব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত করায় লক্ষ্মণ মনুষ্যধর্মের অবমাননা করেছেন। বস্তুত লক্ষ্মণের জয়ে মেঘনাদের বীর-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ রক্ষকুলগৌবপ—মধুসূদন-এর—Favourite Indrajit 'বধ' নামক কাব্যের বধ্য ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ। তিনি এ কাব্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাল্মীকি রামায়ণেও তিনি অসাধারণ বীর্যবান পুরুষ। সেখানে তাঁর দাম্পত্যজীবনের কোনো ছবি নেই। মধুসূদন তাঁর নায়কের চরিত্রে মানবিক বিস্তারের প্রয়োজনেই এদিকটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদ প্রেমিক, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃপিতৃভক্ত কর্তব্যপরায়ণ বীর। তিনি 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি', রাক্ষস কুল-ভরসা'। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কবির প্রিয়তম নায়কের মৃত্যু ঘটেছে। ইন্দ্রজিৎ তখন, 'পুজে ইষ্টদেবে নিভৃতে', কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরীয়, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।' এই পবিত্র ভূমিকে হীন চক্রান্তের মাধ্যমে লক্ষ্মণ বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। এত দ্বারা ইন্দ্রজিতের ধর্ম পরায়ণতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্মণকে আতিথেয় সেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বীর সাজে সেজে আসার অনুমতি চেয়েছেন। এতে তাঁর রণ নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণে উদ্যত হলে, তিনি কোষার আঘাতে তাঁকে মূর্ছিত করেন। অস্তসূর্যের শেষ দীপ্তি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে বীরের দেহ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত—লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে। মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার মধ্যে মেঘনাদের প্রতি একান্ত ভালোবাসার সঙ্গো শিল্পীর গভীর সংযমের অসামান্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

অমিতবল মেঘনাদের মৃত্যু ও রক্ষোবংশের পরাভবের মূলে রাবণানুজ বিভীষণ। রামায়ণের বিভীষণ পুণ্যাত্মা। এখানেও সে ধর্মভীরু। পাপী ভাইয়ের পক্ষ ত্যাগ করে সে বনজীবনের দুঃসহ কষ্টকে স্বীকার করেছে। ধার্মিকতার কারণেই আত্মীয় বন্ধুদের বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। উনিশ শতকীয় স্বাদেশিকতার দৃষ্টিতে আক্রান্ত দেশকে ত্যাগ করে আক্রমণকারীর সহায়তা করা বিশ্বাসঘাতকের দেশদ্রোহিতা বই কি ? মেঘনাদ একারণেই বিভীষণকে নিন্দাবাদ করেছেন।

মধুসূদনের বিভীষণ শুধু দেশদ্রোহী নয়, সে শুধু 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি' কে বিসর্জনই দেয়নি, রাবণের কর্মফল ইত্যাদি বলে নিজের পুণ্যাত্মারূপটি তুলে ধরে হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাও করেছে। নিদারুণ সিংহাসন লোলুপতা তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল। তার অন্তরবাসনাই স্বপ্নে রূপ পেয়েছে। রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী যেন দেখা দিয়ে বলেছে—"পাইবি শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্র দণ্ড সহ তুই"। এর থেকে বোঝা যায়, বিভীষণের যতই ধার্মিকতা থাকুক রামচন্দ্রের মিত্র বলে পরিচিত হয়েও, তার অন্তরে নিহিত ছিল রাজসিংহাসনের কামনা। সংস্কৃত রামায়ণে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থারলেও, বালীর উক্তিতে এর আভাস আছে। মধুসূদন একেই তাঁর কাব্যে স্পষ্টতর করেছেন।

এতৎসসত্ত্বেও বিভীষণ চরিত্রের আরেকটি দিকও স্মরণ রাখতে হবে। বিভীষণেরও যে হৃদয় ছিল, মমত্ববোধ ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপে। বিভীষণের এই বিলাপ, তার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। স্বার্থক্লিষ্ট দেশদ্রোহী একটি ব্যক্তির হৃদয়েও যে অন্তঃসলিল স্নেহের প্রস্রবণ থাকে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিলাপধ্বনি তার মানবিক ভিত্তিকেই বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবদেবীর ভূমিকাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে এঁদের অসামান্য অবদান আছে। রাবণ মেঘনাদের ভাগ্য এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে স্বর্গের লক্ষী ও মায়ার ভূমিকা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার নয়। প্রধানতঃ এরাই সক্রিয় কুশীলবের মত মেঘনাদবধ কাব্য সম্পন্ন করিয়েছে।

লক্ষ্মী একদা সমুদ্রতলে নির্বাসিতা ছিলেন। মধুসূদন কল্পিত এই দেবী সাগরমন্থনের পর স্বর্গে ফিরে যেতে পারেননি। রাবণের ভক্তিতে লঙ্কায় ঐশ্বর্যলক্ষী হয়ে বিরাজ করছেন। রাবণ বীর্যের দ্বারা ধনসম্পদ অর্জন করায় লক্ষ্মী সেখানে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গে বিষ্ণুবক্ষে ত্বারায় ফিরে যেতে চান, তাই রাবণের পতন না ঘটলে যেতে পারছেন না। বীরবাহুর পতনের পর তিন 'প্রভাসা'র ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানে সংবাদ দিয়ে মেঘনাদকে লঙ্কায় নিয়ে এসে সৈনাপত্যে বরণ করান। ইনি আবার বলেন 'চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী/বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি/প্রমদা-কুল-রোদন। প্রতি গৃহে কাঁদে/পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা সতী।' (নবম সর্গ)। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য তিনি তাঁর প্রতি বিরূপ, তাই রাবণ নিধনে উদ্যোগী। তিনিই দেবরাজ ইন্দ্রকে মেঘনাদের সৈনাপত্য গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে, তার বধের উপায় জানবার জন্য ইন্দ্র দম্পতিকে পার্বতীর কাছে পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলেছেন, না হইলে নির্মূল সমূহে/রক্ষপতি ভব রসাতলে যাবে।'—এ আগ্রহাতিশয্য শুধুই দুষ্কৃতিবিনাশ হেতু নয়, এর পেছনে বৈকুণ্ঠে ফিরে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়ও। লক্ষীর এই স্ববিরোধী আচরণ তাই শুধু কৃতি-দুষ্কৃতি নয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে।

বধকাব্যের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভৃতি সর্গে মায়াদেবীর কথা আছে। তিনি মোহিনী বা মায়াজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষের কাছে অনেক ঘটনা আড়াল করেছেন। রামচন্দ্র ষষ্ঠ সর্গে দেবী মহামায়া অম্বিকার কাছে লক্ষ্মণকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন। দেবী মহামায়ার আদেশে মায়াদেবী মেঘনাদবধ-এর সহায়িকা শক্তিরূপে কাজ করেছেন। মায়ার আনুকূল্যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। মায়ার ছলনায় ইন্দ্রজিতের সমস্ত দৈবাস্ত্র ব্যর্থ হলে কোষাঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছা গেছে। মায়াদেবীরই যে- পরে তার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। তাই বলা যায় মেঘনাদবধে মায়াদেবী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। দেবতাগণ রাবণের বিরুধ্বে ষড়যন্ত্র করে মায়ার সাহায্যে দৈবাস্ত্র দেওয়া থেকে সমস্ত সফল আয়োজন শেষে মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিধন সম্পন্ন করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ ও দেবতা এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাঁদের মানুষের মতো কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ আছে কিন্তু মানবচরিত্রের মতো তাদের কোনো ক্রমবিকাশ নেই। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে-কোনো কাজই তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের কেউ মানবচরিত্রের মহত্ত্বও পায়নি।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ৪৮.১১ এবং ২৮.১২ আরেকবার পড়ুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মূল রামায়ণে ____________ ____________ তেমন ____________ না হলেও ____________ এর গুরুত্ব সমধিক।

খ) নিকুম্ভিলা কোনো ____________ নয়, নীল মেঘের মতো ____________, ____________ বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা' যেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ____________ মেঘনাদের মৃত্যু।

গ) মধুসূদন ____________ অলংকারশাস্ত্র-সম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও ____________ কাব্য সাহিত্যের ____________ কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু ____________।

ঘ) মেঘনাদবধে ____________ রসের সঙ্গো ____________ রসের ____________ ঘটেছে।

ঙ) দূতমুখে ____________ মৃত্যু সংবাদ শুনে ____________ ____________ হাহাকার করেছেন, তারপরই ____________ ____________ 'স্তব্ধ হইল ____________।'

২) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায়—
১। বাল্মীকির প্রভাব আছে
২। কৃত্তিবাসের প্রভাব আছে
৩।পাশ্চাত্য প্রভাব আছে

খ) মেঘনাদবধ কাব্য লঙ্কার—
১। ঐশ্বর্যের চিত্র বিশেষ
২।ধ্বংসোন্মুখ চিত্র বিশেষ
৩।যুদ্ধ চিত্র বিশেষ।

গ) মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য—
১। বীরাঙ্গনা
২। মেঘনাদবধ
৩।চর্তুদশপদী কবিতাবলী

ঘ) ষষ্ঠ সর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র—
১। রাবণ
২। মেঘনাদ
৩।লক্ষ্মণ

৩) মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবিন্যাসে মৌলিকতা সম্পর্কে ৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।

৪) ষষ্ঠ সর্গের পাশ্চাত্য প্রভাবিত অংশগুলির পরিচয় দিন।

৫) ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত মেঘনাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিন।

৬) লক্ষ্মী ও মায়াদেবী ষষ্ঠ সর্গের মূল চালিকাশক্তি।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

৭) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ কতটুকু, আলোচনা করুন।

৪৮.১১ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ ভাষা, ছন্দ, অলংকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকরা মহাকাব্যের ভাব-রসের সঙ্গো তার ভাষা-ছন্দ-অলংকার নিয়েও ভেবেছেন। এর বিষয়বস্তু, চরিত্র কল্পনা, ভাব ও রস সমস্তই গুরুগম্ভীর। তাই মহাকাব্যের ওজস্বিতা, বিশালতা ও বিস্তৃতি। ফলে মহাকাব্যের কল্পনায় একটি অসামান্য সমুন্নতি, ভাষায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে—সেখানে প্রাধান্য পায় ওজোগুণ। অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের ভাব ও বাষায় ঐশ্বর্য ও রাসকিগুণ বিশিষ্ট ড্যাকটিলিক 'হেক্সামিটার' বা এ জাতীয় ছন্দ ব্যবহার সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথ গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সঙ্গো একই প্রকারের গাম্ভীর্যপূর্ণ ছন্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন, কেবল সর্গের শেষে অন্য পদ্যছন্দ অনুমোদন করেছেন।

যেহেতু ভাষা ভাবের বাহন, কবি ভাষার আশ্রয়েই ভাবকে প্রকাশ করেন। আলংকারিকরাও বলেছেন, ভাবের সঙ্গো ভাষার পার্বতীপরমেশ্বর সম্পর্ক। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর ভাষা সম্পদ যে কোনো পাঠকের কাছে বিস্ময়ের স্থল। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের কবির মতো মধুসূদনও তাঁর কাব্য সৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মণ—সতীসুমিত্রাপুত্র, সৌমিত্রি কেশরী, রামানুজ, রামবানুজ, সৌমিত্রি ভীমবাহু লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র—সীতানাথ রাঘব, রাঘবেন্দ্র, রঘুবর, রঘুকুলমণি, বৈদেহীপতি, বৈদেহীনাথ, দেবকুলপ্রিয়, দশরথাত্মজ। মেঘনাদ—রাবণি, দশাননাত্মজ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। এভাবে বিশেষণ ঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মধুসূদন বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। আবার শব্দ নির্বাচনেও তিনি বর্ণনায় ওজস্বিতার প্রয়োজনে গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে সন্ধিসমান বহুল ভাষা ব্যবহার করে যে ওজোগুণ নিয়ে আসা হত, একালে সেটি অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় মধুসূদন তাকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, পরিবর্তে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'। কিংবা 'উড়িল কলম্বকুল মলম্বা আকাশে।' এ ধরণের শ্বদ ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র যেমন একদা তৎসম শব্দের সঙ্গো ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে ভাষায় গতি সঞ্চার করেছিলেন, মধুসূদন, তৎসম শব্দের সঙ্গো 'দাপিছে', 'নির্বীরিবে', 'আশ্বাসলি' প্রভৃতি নামধাতু এবং লোকায়ত শব্দ (যথা, 'জাভাল ভাঙি) ব্যবহার করে সেই গতি এনেছেন। এদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা কিছু ত্রুটি যথা গুরুচন্ডালি (ঝড়াকারে' 'ফুলদল দিয়া')। ব্যাকরণে দুষ্ট (শিরোপরি, 'প্রফুল্লিত', গায়কী) শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বীররসপ্রধান কাব্যভাষার প্রয়োজনে ইংরেজি Biank Verse-এর ছন্দোরীতি বাংলার চতুর্দশ মাত্রার পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) কাঠামোয় পুরে মিলহীন প্রবাহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। যেহেতু কবিতায় ভাবের গুরুত্ব বেশি, তাই মধুসূদন ছন্দের বন্ধনদশা ঘোচাতে পঙক্তি অন্তে যতি পাত থেকে ভাবকে মুক্তি দিলেন। বন্ধনদশা থেকে মুক্ত এই ভাবরাশি স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল। অর্থাৎ পঙক্তি শেষে ছেদ আর আবশ্যিক রইল না—পঙ্ক্তি থেকে পঙ্ক্তি ক্রমে আপন বেগে চলতে সক্ষম হল, যেখানে প্রয়োজন সেখানে থামবার সুযোগ হল। এর ফলে আট ও ছয় মাত্রার পর নিয়মিত যতি পড়ায় যে একঘেয়েমি তৈরি হয়েছিল তা আর রইল না। নানা ছত্রে, নানা জায়গায় যতি পাতের ফলে কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্য এল। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে উপযোগী। ভাবের এই যে সচ্ছন্দ প্রবহমানতা এটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—মধুসূদন প্রবর্তিত পঙ্ক্তির অন্তে মিল হীনতা বা অমিত্র অক্ষরত্বই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন একে অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে প্রবহমান ছন্দ বলেন। পয়ারের যেমন দুটি ভেদ ৮ ও ৬ মাত্রার পয়ার এবং ১০ ও ৮ মাত্রার, মহাপয়ার প্রবহমান ছন্দের দুটি প্রধান ভাগ। প্রবহমান চতুর্দশমাত্রিক ও প্রবহমান অষ্টাদশমাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবিতায় মিল যুক্ত করে সমিল প্রবহমান বা জটিল প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। যেমন—মধুসূদন রচিত অমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে। (ষষ্ঠ সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য)

রবীন্দ্রনাথ রচিত সমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

কবিবর কবে কোন্ বিস্তৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (মেঘদূত, মানসী)।

প্রাচ্য আলংকারিক আচার্য বামনের মতে কাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা তার অলংকার প্রয়োগে। অলংকারেই কাব্যের সৌন্দর্য। আচার্য দণ্ডী ও কাব্যের শোভাকর ধর্মকেই অলংকার বলেছেন। এই অলংকার শব্দটি দুটি অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে—১) অলংকার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২) অলংকার কাব্যদহের অর্থ সামর্থ্য বাড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় অলংকার কাব্য দেহের ও ভাবের সৌন্দর্য বিধায়ক। কাব্য দেহ ভাবনা থেকে শব্দ নির্ভর ও 'ভাব' থেকে অর্থনির্ভর অলংকার অর্থাৎ শব্দালংকার (অর্থাৎ ধ্বনির অলংকার) ও অর্থালংকারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই লক্ষ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মেঘনাদবধে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। প্রসঙ্গাতঃ ষষ্ঠ সর্গে কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রসঙ্গা আলোচনা করা যায়।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রাচ্য আধারে, পাশ্চাত্যে আদর্শে পরিকল্পিত সাহিত্যিক মহাকাব্য। হোমার, ট্যাসো, দান্তে, মিল্টনের কাব্যদর্শের সঙ্গো কালিদাস, মাঘ, ভারবি তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবিত ও উদ্বেজিত করেছে। গ্রিক মহাকাব্যে অলংকার প্রয়োগ বিশেষতঃ উপমার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। হোমার অ্যাকিলিস, হেক্টর-এর সুমাহন ব্যক্তিত্ব এবং বিশালতার অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ যার পরিচয় "হোমোরিক সিমিলি"। এই উপমাগুলি দীর্ঘ যার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যিক বিশালতা ও বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। মেঘনাদবধে এর প্রয়োগ প্রাচুর্য আছে।

মধুসূদনের 'মহাগীত' যে 'মধুচক্র' রচনা করেছে তার মধু পান করে 'গৌড়জন' পরিতৃপ্ত ও আনন্দ অনুভব করেছেন। এ কাব্যের ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস প্রভৃতি ধ্বনি প্রধান অলঙ্কার প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। 'অসির ঝনঝনি', কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা', নীরব রবার, বীণা, সুরজ, মুরলী' ও কমলালয়ে, কমল-আসনে/বসেন কমলাজয়ী (১ম সর্গ, অনুপ্রাস) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর, স্মরিলা শঙ্করে (ষষ্ঠ সর্গ) বা লঙ্কার পঙ্কজ রবি কেলা অস্তাচলে/(ষষ্ঠ সর্গ) প্রভৃতি বৃত্তানুপ্রাস-এর ব্যবহার কাব্যে অসাধারণ ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে।

শব্দালংকারের থেকে অর্থালংকার গঠনে কবির ব্যক্তিমন অধিকতর ক্রিয়াশীল হওয়ায়, কাব্যের রূপকল্পসৃষ্টিতে কবি মানসের সুস্পষ্ট ছাড়া পড়েছে। অলংকার প্রয়োগে বিশেষত 'হোমোরিক সিমিলি' বা মহাকাব্যিক উপমা ব্যবহারে মধুসূদন বাংলা কাব্যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লঙ্কার পরিচয় দিতে 'কাঞ্চন-সৌধ কিরীটিনী' বা 'হীরাচূড় শিব দেবগৃহ' প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর 'উপমা' অলংকারে ব্যবহারে ব্রজ, বিজয়া প্রসঙ্গা এসেছে। যেমন ঃ

> মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিলা/শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিলা যেমতি/
> ব্রজে ব্রজকুল শিশু যবে শ্যামমণি/আঁধারি যে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।" (ষষ্ঠ সর্গ)

বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত চেতনা উপমা হিসেবে তাঁর কাব্য জগতেও নানা ভাবে ও রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, "তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি পাখী।" (চিত্রাঙ্গদার উক্তি—১ম সর্গ), নিদাঘে যেমতি/ফলশূন্য বনস্থলী, জনশূন্য নদী/, বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্ন ভিন্ন করে তারে' (১ম সর্গ)—প্রভৃতিতে উপমা ব্যবহারে কবির প্রকৃতি প্রীতি ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ হয়েছে। প্রথম সর্গের 'শোকেরক ঝড় বহিল সভাতে।' বা ষষ্ঠ সর্গের—'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে প্রাণাধিক—রূপক অলংকারের যেমন, তেমনি 'কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে, পঙ্কিল ?' কাকু বক্রোক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী—৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মহাকাব্যে থাকে ______ বিশালতা ও ______। ফলে মহাকাব্যের ______ একটি অসামান্য ______, ______ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে।

খ) বীর রসপ্রধান ______ প্রয়োজনে ইংরেজি ______ ______ এর ছন্দোরীতি বাংলার ______ পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) ______ পুরে মিলহীন ______ ______ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন।

গ) হোমার ______ ______ এর ______ ব্যক্তিত্ব এবং ______ অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক ______ আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের ______ সুপ্রসিদ্ধ, যার পরিচয় ______ ______।

ঘ) মধুসূদনের ______ যে ______ রচনা করেছে, তার ______ পান করে ______ ______ ও আনন্দ অনুভব করেছেন।

২) প্রতিটি অলংকারের দুটি করে উদাহরণ দিন ঃ ধ্বন্যুক্তি, বৃত্তানুপ্রাস, রূপক।

৩) মধুসূদন উপমাঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। তিনটি উদাহরণ দিন।

৪) মধুসূদন ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৫) প্রবোধচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে বলেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ। এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের যুক্তিটি বুঝিয়ে দিন।

৬) পয়ার ও মহাপয়ারের মধ্যে পার্থক্যটি ৫টি বাক্যে আলোচনা করুন।

৭) অমিল ও সমিল প্রবহমান বলতে কী বোঝেন। এ দুটির বৈশিষ্ট্য ৫টি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

৪৮.১২ সংক্ষিপ্তসার

মধুসূদন দত্ত যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবী। সেখানে শৈশব অতিবাহিত করে, কৈশোরে কলকাতায় হিন্দু ও বিশপস্ কলেজে লেখাপড়া শেখেন। এ সময় থেকেই কাব্য রচনায় হাতেখড়ি। বিলাত যাওয়ার একান্ত আগ্রহ ও বাবা মার ঠিক করে দেওয়া বিয়ে এড়াতে আকস্মিকভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও সাংবিদিকাত সূত্রে মাদ্রাজ যান, সেখানেই ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিয়ে করেন। পরে হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেন। ১৮৫৬ তে কলকাতা ফিরে কলকাতায় পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। ১৮৬২ তে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত যান, পাশ করে ফেরেন ১৮৬৭-তে। সাহিত্য রচনা শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), বীরাঙ্গানা (১৮৬২)। বিলাতে থাকাকালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী, শেষে হেক্টর বধ ও মায়াকানন ছাড়াও কিছু অসম্পূর্ণ রচনা আছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ এই এককের মূল পাঠ বিষয়। লক্ষ্মণ কর্তৃক দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ এই কাব্যের যে প্রধান উপজীব্য, তা-ই এ সর্গের বিষয়বস্তু। বীরবাহুর মৃত্যু ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণ, স্বর্গে দেবতাদের চক্রান্ত, মহাদেবের আনুকূল্য আদায়, মায়া প্রভাবে দৈবাস্ত্র নিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার পর লক্ষ্মণ কর্তৃক কাপুরুষের মত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হত্যা, এ সব দেবতাদের মায়ায় সম্ভব হয়েছে। মধ্যে তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করে ইন্দ্রজিতের প্রতি মানবিক মহিমা আরোপ করে তাঁর মৃত্যুকে অধিকতর ট্র্যাজিক করা হয়েছে। চতুর্থ সর্গ সীতার মুখ দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের

তথা রাক্ষসকুলের বিপর্যয়কে প্রাক্তনের রূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ তাই এ কাব্যের শীর্ষ, তার পরে তিনটি সর্গের সাহায্যে কাব্যের পরিণতি টানা হয়েছে।

এই সর্গটি পাঠের জন্যই মহাকাব্যের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সর্গটির মধ্যে মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের যে সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাব্যের উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব আনা হয়—ষষ্ঠ সর্গের পরিকল্পনায় তা আছে। বিশেষত মেঘনাদনিধনের পূর্বমুহূর্তে এমন দৃশ্যের অবতারণা অন্যতম। মেঘনাদবধ যেহেতু এ সর্গের প্রধান বিষয়, তাই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'বধঃ'। মহাকাব্যের বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দুধরনের যথা যুগসঞ্চিত কাহিনীকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের প্রেরণায় সাহিত্যিক প্রয়াসে রচিত 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' তৎসহ লঘু বিষয় নিয়ে বিদ্রুপাত্মক ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্য প্রয়াস জাত মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। শেষে দুজনসহ পরবর্তী মহাকাব্য রচনাপ্রয়াস মধুসূদনের কাব্যকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মেঘনাদবধে কবির সহানুভূতি রাম লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের ওপরই সমধিক। হোমার-ভার্জিলের কাব্য ও তামিল কম্বন রামায়ণের এ ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব আছে। এ ছাড়াও কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও চিত্রকল্প ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে মিল্টন, শেলি, কালিদাস মাঘ-ভারবি ভবভূতির প্রভাব ইতস্তত আছে। এ কাব্যের অঙ্গীরস বীর হলেও অন্তঃসলিলা করুণরসের প্রস্রবন আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যমতও আছে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বধ হলেও দেবতাদের চক্রান্ত, লক্ষ্মণের কাপুরষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মেঘনাদের অসম সাহসিকতা ও প্রত্যক্ষকে বীরত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পরিচয়ে।

পাশ্চাত্য মতে মেঘনাদবধের রসপরিণতি ট্র্যাজিক। মেঘনাদ-এর বধ মানবিক বেদনায় ঋদ্ধ। একটি বীরের অন্যায় মৃত্যু শোকের কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। শোকবিদ্ধ রাবণ দেখেছেন 'একে একে নিভিছে দেউটি'। উপলব্ধি করেছেন লঙ্কার অনিবার্য ধ্বংস। রাবণের এই অসহায় বেদনা ব্যক্তি হৃদয়ের হাহাকার-ই ট্র্যাজেডির রসপরিণতি। মেঘনাদের মৃত্যু সেই পরপরিণতিকে রঞ্জিত করেছে।

নিয়তিবাদ এ কাব্যের অন্যতম উপাদান। রাবণ বলেছেন 'বিধি বাম' রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'প্রাক্তনের ফল'। কিন্তু মেঘনাদের অন্যায়ভাবে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, অন্ধ নিয়তি নির্মমতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শেষোক্তদেরই তিনি এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণস্থল করেছেন। রামচন্দ্রের অনেক মহত্ব থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমতাবশত কালিমালিপ্ত করেছেন। অনুরূপে লক্ষ্মণের অপরিমেয় সাহস চরিত্রবল, ধৈর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়েও কাপুরুষের মতো মেঘনাদকে বধ করেছে। বীরধর্মের শুধু নয়, মনুষ্যধর্মের অবমাননা, মেঘনাদের বীরগৌরবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ মধুসূদনের Favourite Indrajit লক্ষ্মণের কাপুরুযোচিত আচরণের জন্যই ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার পঙ্কজরবি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বিভীষণ শুধুমাত্র দেশদ্রোহী নয়, তারও যে একটি দুর্বল হৃদয় আছে সেটি ফুটেছে মেঘনাদের মৃত্যুর পর তার বিলাপে। বিভীষণের বিলাপ একটি স্নেহরসসিক্ত হৃদয়ের বিলাপ।

এ কাব্যের দেবদেবীর ঈর্ষাদ্বেষপরায়ণ। মেঘনাদবধ ও রাবণকে তিলে তিলে ধ্বংস করার জন্য হীন কুচক্রী মানুষের মত কোনো চক্রান্তকেই বাদ দেননি। তাঁরা দৈবাস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হননি। মায়ার সাহায্যে সবার চোখের আঁড়ালে, প্রতিপক্ষের শক্তিহরণ করে, অস্ত্রাঘাতে জর্জনিরত করে নিহত হয়েছে। কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ নিয়ে দেবতা ও মানুষ এখানে একাকার হয়ে গেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা মহাকাব্যের ভাবরস ফুটিয়ে তোলার জন্য গুরুগম্ভীর তৎসম, যুক্ত ব্যঞ্জন, ধ্বনি সৌসম্যের জন্য অলঙ্কৃত। ছন্দ গতিশীল, প্রবহমান পয়ার অলংকার উপমার বাহুল্য ধ্বন্যুক্তি অনুপ্রাসের সঙ্গো উপমা হোমোরীয় উপমা রূপক প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকারে সমৃদ্ধ।

৪৮.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ক) কালাগ্নি, দাবাগ্নি, বনরাজি, বায়ুসখা।

খ) বিভীষণ, বিভীষণ, পুষ্প, মঙ্গালবাজনা, অপ্সরা, জয়রবে।

গ) ২৫ জানুয়ারি, জুন ১৮৭৩।

ঘ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রেবেকা, আত্মনিবেদন, হেনরিয়েটা।

ঙ) ১৮৬০, ‘একেই কি বলে সভ্যতা ?’ ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, ‘পদ্মাবতী’।

২। ক) ১৮৪৩, খ) ১৮৬২, গ) বিশপস্ কলেজ, ঘ) মায়াকানন।

৩। মহাসর্প, খাপে, সিক্ত করিল, মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি, অগ্নি, চয়ন করিয়া (তুলিয়া), সাপ, কর্কশ, সেনা, অলংকার, ধনুক।

৪। বাদিএ ____ বাজনা, কাদম্বিনী ____ মেঘমালা, স্কন্দ ____ কার্তিকেয়, দিবিন্দ্র ____ দেবরাজ ইন্দ্র, নক্র ____ কুমীর, আনায় ____ জাল, আহবে ____ সংগ্রামে, যুদ্ধে ; জীমুতেন্দ্র ____ মেঘরাজ ; আসার ____ বৃষ্টি, শব্দবাহক ____ আকাশ।

৫। ক) ৪৮.৬ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অংশটি দেখুন।

খ) বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর।

গ) ঘ), ঙ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১। ক) রাজা, বাদশাহদের, সংস্কৃতে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ।

খ) বস্তুনিষ্ঠা, চমৎকারিত্ব, সৃষ্টির, অলৌকিকত্ব, কাব্যসম্মত।

গ) সচেতন, শিল্পীর তীক্ষ্ণ, সুনির্দিষ্ট প্রভাব।

ঘ) রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসির, কল্পনাকে, স্নিগ্ধতার, ইলিয়াডের, শৌর্যের।

২। ক) রামায়ণ, মহাভারত/ইলিয়াড, ওডিসি, মেঘনাদবধ কাব্য, বৃত্রসংহার/কুমারসম্ভব, রঘুবংশ/ ইনিড, জেরুজালেম উদ্ধার, ছুছুন্দরীবধ কাব্য, ভেকমূষিক যুদ্ধ / রেপ অফ দি লক।

খ) নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

গ) রৈবতক-এ সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্র-তে জটিলতা ও বিস্তার, প্রভাসে-পরিণতি।

৩। ক) বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) ১৮৭৫, গ) পোপ, ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪-৭ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর করতে বর্তমান দুটি পাঠ একাধিকবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৩

১। ক) ইন্দ্রজিৎ, নিধন, তাৎপর্যমণ্ডিত, মেঘনাদবধে।

খ) যজ্ঞাগার, বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস, ঐন্দ্রাস্ত্রে।

গ) ভারতীয়, পাশ্চাত্য, অনুকরণে, গতিশীলতা।

ঘ) বীর, করুণ, সম্মিলন।

ঙ) বীরবাহুর, পিতা রাবণ, রাজা রাবণ, মনস্তাপে।

২। ক) বাল্মীকির প্রভাব আছে ; খ) ধ্বংসোন্মুখ চিত্রবিশেষ।

গ) মেঘনাদবধ কাব্য, ঘ) মেঘনাদ

৩-৭ উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।

৪৮.১১ এবং ৪৮.১২ মূলপাঠ অংশগুলি বারবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৪

১। ক) ওজস্বিতা, বিস্তৃতি, কল্পনায়, সমুন্নতি, ভাষায়।

খ) কাব্যভাষার, Blank verse, চতুর্দ্দশাক্ষর, কাঠামোয়, প্রবহমান পয়ার।

গ) অ্যাকিলিস, হেক্টর, সুমহান, বিশালতার, উপমার, উপমাগৌরব, হোমারিক, সিমিলি।

ঘ) মহাগীত, মধুচক্র, মধুপান, গৌড়জন, পরিতৃপ্ত।

২-৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য এককেরেক বর্তমান মূলপাঠটি একাধিকবার পড়ুন—তাহলে উত্তর করা সহজ হবে।

৪৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

২) অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

৩) ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প।

৫) ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য (১ম পর্ব)।

৬) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—কাব্যতত্ত্ব বিচার।

৭) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ।

একক ৪৯ ❒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাঁচটি কবিতা

গঠন

৪৯.১ উদ্দেশ্য

৪৯.২ প্রস্তাবনা

৪৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত

৪৯.৪ মূলপাঠ — ১ সোনার তরী

৪৯.৫ সারাংশ — ১

৪৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৪৯.৭ মূলপাঠ — ২ শতাব্দীর সূর্য আজি

৪৯.৮ সারাংশ — ২

৪৯.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৪৯.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে

৪৯.১১ সারাংশ — ৩

৪৯.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৪৯.১৩ মূলপাঠ — ৪ ঃ উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে

৪৯.১৪ সারাংশ — ৪

৪৯.১৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৪৯.১৬ মূলপাঠ — ৫ ঃ অমৃত

৪৯.১৭ সারাংশ — ৫

৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৪৯.১৯ উত্তরমালা

৪৯.২০ গ্রন্থপঞ্জি

৪৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সত্তর বৎসরের কাব্য জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। কবিতাগুলিতে কবির নিজের পরিবার, দেশ, সমাজ ও সমকাল থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিপুল ভাবসম্পদ নিয়ে তিনি অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তার পরিচয় পাবেন। তাই কবিতাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি —

- ১৯ শতকের শেষার্ধে রচিত আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ থেকে পরিণত কবিমানসের পরিচয় লাভ করবেন।

- গীতিকবিতার বিশেষত রবীন্দ্র-গীতিকবিতার বিবর্তন ধারাটির সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হবেন।
- রবীন্দ্র-কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আপনার মতামত গড়ে তুলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গীতিকবিতার গঠন সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাঠ্য কবিতাগুলি থেকে অর্জন করা সম্ভব হবে।

৪৯.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন দুটি শতাব্দীকে স্পর্শ করে আছে। ১৯ শতকের পরার্ধ আর ২০ শতকের প্রথমার্ধ এ দুটি পর্বই নতুন যুগের ভাব আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে একটিতে নব নব সৃষ্টির উল্লাসে মাতোয়ারা, অপরটিতে পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও যুগযন্ত্রণার সংশয় ও আর্তিতে সমকালী শিল্পীমানস পুরাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নতুনের সন্ধানে ব্যাকুল।

রবীন্দ্রনাথ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করে, তাঁর কবি-আত্মাকে সদা সতর্ক ও জাগ্রত রেখেছেন। মহর্ষি পিতার সান্নিধ্য—তাঁর আবেগ ও মননে ঔপনিষদিক বোধ সঞ্চারিত করেছিল। পরিণত রবীন্দ্র হয়ে উঠেছেন 'কবিমনীষী'। তিনি কবি হয়েও ছিলেন 'ঋষি' আর 'ঋষি' হয়েও জীবনশিল্পী। আচার্য সুকুমার সেনের কথায় "রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, "কবীনাং কবিতমঃ।" তাঁর মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে, দুঃখ-সুখে, জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান, জীবন-ভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। তিনি জগৎ জীবনকে, তার সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নিজের চিন্তন ও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মানবসম্পদকে তিনি অনবদ্য শিল্প-সাধনায় সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের এই ভাব-ঐশ্বর্যকে ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ ভাষায় নানা ধারায় ও রূপে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্র কবি-জীবনের এই কল্পনাসম্ভারকে স্পর্শ করবার একান্ত বাসনায় বর্তমান এককের পাঁচটি কবিতার পরিকল্পনা। এই কবিতা পঞ্চক কবির কাব্য জীবনের বিবর্তনের দুটি পর্বের পাঁচটি পর্ব থেকে নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবিমানস সম্পর্কে আপনার একটি সাধারণ বোধ জন্মাবে। এই উদ্দেশ্যেই 'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য', 'বলাকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' থেকে একটি করে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলি সবই গীতিকবিতা—কবির মনের একান্ত ভাবনার ফসল। গীতিকবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রথম এককে আছে। এখানে 'মূলপাঠে'র পর সারসংক্ষেপে কবিতার বিষয়বস্তু ও কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কবিতাকে সমগ্রত বোঝাবার জন্য। কবিতাগুলি পূর্বাপর পাঠে অনুশীলনীগুলি সাহায্য করবে।

৪৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (ইং ৭ই মে, ১৮৬১খ্রিঃ)। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র।

বাড়িতেই প্রথমে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিনের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছেন। শৈশবেই কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রকাশিত কবিতা "হিন্দু মেলার উপহার" (১৪ ফাল্গুন, ১২৮১, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। এটি দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'ভারতী'তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। 'কবিকাহিনী' (১২৮৫, ইং ১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১২৮৭, ইং ১৮৮০) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত গিয়ে, কিছুদিন ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে পড়ার পর, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মাস তিনেক অধ্যাপক মর্লির কাছে পাঠ নেন। ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারিতে কোনো পাঠক্রম শেষ না করেই দেশে ফেরেন। বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোর গানের আসর বসছে। এই পরিবেশে গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) অভিনয়ের আয়োজন হয়। এরপর একের পর এক তাঁর কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ কবির বিয়ে হয়। ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কবির কৈশোরের সাহিত্যসঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদের মৃত্যুতে জমিদারি দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওপর বর্তায়। এ সময় তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত, ব্রাহ্মমতের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দুত্ব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো নানা ঘটনা ঘটে। আর জমিদারি দেখার ফাঁকে 'হিতবাদীর' সাহিত্য সম্পাদকের দায়ে ওই পত্রিকায় পরপর ৬টি গল্প লেখেন—সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের সূচনাও এখানেই। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এ সময় গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চিঠিগুলি লেখেন, তারই গ্রন্থনা 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী'। 'সোনার তরী' (১৩০০ইং ১৮৯৪) এই পর্বেই লেখা। ১৯০১-এ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। ওই বৎসরেই বোলপুরে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা, এটি ১৯২১-এ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু। ১৯০৭ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত কবি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনার স্মৃতিতে তিনি 'স্মরণ' (১৯১৪) রচনা করেন। ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এ দেশবাসী কবিকে সম্বর্ধনা জানায় (১৯১২, ২৮শে জানুয়ারি)। অক্টোবর, ১৯১৩ ইংরেজি 'Song offerings' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) "সবুজের আহ্বান" কবিতা প্রকাশ। এ সময়েই রচিত কবিতার নতুন বাণী, নতুন ছন্দ 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন ধারা বাংলা কাব্যে নতুন শৈলী ও ভাবনা নিয়ে এসেছে। ১৯১৯-র জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করলেন। মে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে 'বিশ্বমৈত্রীর' কথা প্রচার করে বেড়ালেন। এ সময়েই 'বিশ্বভারতীর' সূচনা। দেশে তখন চলছে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন। নানা দেশের আমন্ত্রণে কবিকে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। পেরুর স্বাধীনতা যুদ্ধে শতবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বুয়েনোস এয়ারিসের শহরতলিতে কবিভক্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন (১৯২৪)। তাঁকেই কবি বিজয়া নাম দিয়ে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ (১৯২৫) উৎসর্গ করেন। দেশে ফিরে গান্ধিজির চরকা ও খদ্দর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী

হয়। তিনি অক্সফোর্ডে হির্বাট বক্তৃতাও দেন। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯৩২ গদ্যছন্দে কাব্য রচনার সূচনা করলেন, 'পুনশ্চ' (১৯৩২) প্রকাশিত হল। ১৯৩৫ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ ওসমানিয়া, ১৯৪০-এ অক্সফোর্ড (শান্তিনিকেতনে এসে) কবিকে ডি.লিট. উপাধি দেন। এই বৎসর কবি প্রায় একমাস শয্যাগত থাকেন। এর মধ্যে লেখেন 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মাঝে একটু সেরে উঠলেও, আবার অসুস্থ হলে কলকাতায় এনে তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয় (৩০ শে জুলাই, ১৯৪১), সেদিনই করি শেষ রচনা 'তোার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। অবশেষে ৭ই আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

একাশি বছরের জীবনে প্রায় আটষট্টি বছর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্য বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। তিনি বাংলা কাব্যকে বাংলা ভাষার অন্তরশক্তি, ভাবমহিমা কল্পনালীলা ও ছন্দোগৌরবে, দেশকালের প্রেক্ষিতে মনন-চিন্তা-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে আধুনিক মনের উপযোগী করে তুলেছেন। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটি বিবর্তনসূত্র আছে, সেগুলিকে কয়েকটি পর্বে চিহ্নিত করা যায়। 'কবিকাহিনী', 'বনফুলে' কবির কাব্যচর্চার হাতে খড়ি। প্রথমপর্ব বা শিল্পিত কাব্যধারার সূচনা 'সন্ধ্যা-সংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) থেকে ধরা হয়। এগুলির মধ্যে কবির কৈশোর-কল্পনা, ক্রমশ অস্পষ্ট কুহেলিকা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথসন্ধানী বলা যায়। একটি অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি এসময় কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজায় ব্যাকুল দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্বে যার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া গেল 'মানসী' (১৮৯০) 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) ও 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যে। কবি এ সময় লীলাচপল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমাধুরীর সঙ্গে কালিদাসের তথা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য লোকে বিচরণ করে, দেশকালের আবহমানতায় নির্মিত স্বকীয় কবিসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে চিরন্তন সৌন্দর্য জগৎকে খুঁজে পেয়ে, নবতন আত্মোপলব্ধির আনন্দ হর্ষ-বিষাদ, কল্পজগৎ আর বাস্তবজগৎ একাকার হয়ে কবিতায় নতুন ভুবন রচনা করেছেন। চিত্রকল্পে, শব্দযোজনায়, কাব্যছন্দে, সে পরিচয় আছে। এই সময়ের 'সোনার তরী' শীর্ষক কবিতা দ্বিতীয় পর্বের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। সোনার তবী কাব্যে প্রথমে দেখি রহস্যময় সৌন্দর্য জগতের মধ্য থেকে উঠে আসা কতকগুলি প্রশ্ন কবি চিত্তকে পীড়িত করছে। বাস্তব পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, আর সৌন্দর্য জগতের উর্ধ্বগত আকাশে বিহারের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সৌন্দর্যের জগতে নিরুদ্দেশ যাত্রার অমোঘ আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কবির 'জীবন-দেবতা' ধারণার সূচনা।

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মভাবে জগতে বিচরণ করেছেন। জীবন দেবতা কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি, ভগবৎ-ভক্তি, ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয় পেয়ে এক সময় কবি মনে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল, তা-ই কবিতার প্রেরণা হয়ে দেখা দিল। প্রকাশিত হল — 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্য। শেষোক্ত কাব্যত্রয়ী গীতিধর্মী। উপরের সবকটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাও নির্বাচিত গানের কবির স্বয়ংকৃত ইংরেজি অনুবাদ W.B. Yeats-এর ভূ মিকাসহ Gitanjali (Song offerings) (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এখানে কবির বিশ্বানুভূতি থেকে অসীম বা 'ভূ মা'র ভাবনার সূত্রপাত। ভূমা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণে নয়, প্রকৃতির সীমাহীন রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর লীলাচঞ্চল পরিক্রমা। এ পর্বের ভিন্নতর রসের একটি কবিতা নৈবেদ্যের 'শতাব্দীর সূর্য' মূল পাঠের বিষয়।

চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে সুস্পষ্ট দিক পরিবর্তন ঘটেছে। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া' (১৯২৯) এই তিনটি কাব্য নতুন জীবনদর্শনের পরিচয়বাহী। এতদিন ছিল বস্তু বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীত সত্যের সন্ধান, প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় সীমা থেকে অসীমে যাত্রা এবার অসীম থেকে সীমাকে দেখা, বিশ্বজীবনের উপলব্ধি থেকে বস্তুজগৎকে দেখা—অর্থাৎ ভৌমচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা, এবার বিশ্বচেতনা থেকে ভৌম জগৎকে দেখা। তাই কবি এ পর্বে অনেকটা প্রাজ্ঞ-দার্শনিক, মননশীল জীবনদ্রষ্টা। তিনি পুরাতনকে নতুনরূপে দেখেছেন, পুরাতন যৌবনোজ্জ্বল আবেগঋদ্ধ প্রেমানুভূতির পরিবর্তে অনেক শান্ত ও সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। এই দার্শনিক ভাবানুভূতি তাঁর ছন্দ রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বলাকার এই নতুন ভাবরাশি, নতুনতর ছন্দের অনিয়মিত, অসম ছত্রের মুক্তক ছন্দে অভিব্যক্তি পেয়েছে। 'বলাকা'র 'তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে' (শঙ্খ) কবিতা এককের মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্য মুক্তকে রচিত নয়।

পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি — 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) 'পত্রপুট' (১৯৩৬) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থকে পুনশ্চবর্গের কাব্যগ্রন্থ বলা চলে। পুনশ্চতেই গদ্য কবিতার সূচনা, 'শ্যামলী' পর্যন্ত এই গদ্য কবিতার বিস্তার এবং কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। রবীন্দ্রকাব্যধারার যে সামান্য পরিচয় ইতোমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এটি লক্ষণীয় যে তিনি সর্বদাই, তাঁর অতীত ও কীর্তিকে অতিক্রম করে নিত্য নতুন পথে অজানার সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। সত্তর অতিক্রান্ত কবি বিচিত্র ভাব ও রূপচর্চার মধ্য দিয়ে কাব্যশিল্পের চরমোৎকর্ষে পৌঁছেও তৃপ্ত নন। এই অতৃপ্তির বেদনা থেকেই 'তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে প্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা রচনা' করলেন। এ পর্বে তিনি ছন্দোমোহ সৃষ্টির পরিবর্তে, 'অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায় কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠক চিত্তে' সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্বের কবিতায় কোনো বিশেষ জীবন দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রবণতা হলেও, কবিতা তার নিজস্ব ভাবগরিমা, বিষম-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তায় হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে এ পর্বের কাব্যগ্রন্থে ন্যূনতম অলঙ্কার প্রয়োগে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে কাব্যরচনার পরীক্ষা করে যে ধারাটির সূচনা করেছেন, তা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের দ্বারা বহুচর্চিত হয়েছে। এককের ৪র্থ ও ৫ম মূলপাঠের জন্য নির্বাচিত দুটি কবিতা যথাক্রমে পত্রপুট ও শ্যামলী থেকে গৃহীত হয়েছে।

ষষ্ঠ বা শেষপর্বের কাব্য 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' এবং 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শেষলেখা' (১৯৪১)। প্রথমোক্ত চারটি কাব্যগ্রন্থ কবি কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গি ; অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের ভারে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও পরবর্তী মুহূর্তে কাব্যের অন্তর্নিহিত রূপটিকে "গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ প্রয়োগে" ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু 'রোগশয্যায়' থেকে 'জন্মদিনের' কবিতাগুলিতে রোগজীর্ণ কবি যেন আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপাতীত সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে স্বীকার করেও তিনি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাস ব্যক্ত করেছেন। শেষপর্বে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপর লোভীদের প্রতি ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সময় শব্দচয়নে, চিত্ররচনায়, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতার পরিবর্তে, নিরাসক্ত, তির্যক, ক্বচিৎ বিবর্ণ, তীব্র বাগ্‌বিন্যাসে ভিন্নতর রূপ রীতির সৃষ্টি করেছেন। 'রোগশয্যায়' কাব্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দৃষ্টির মমতা নিয়ে দেখা জীবনের যে সূক্ষ্ম ও সত্যরূপ এবং বিভীষিকা ও অসংলগ্ন চিন্তা ভারাক্রান্ত মনের উদ্ভট দুঃস্বপ্ন-পীড়িত অনুভূতির এরকম আবেগময় শিল্পসম্মত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এরই সঙ্গে আছে 'আরোগ্য' রোগমুক্তির স্বস্তি, আনন্দানুভূতি। 'জন্মদিনে' পৃথিবীর প্রতি কবির প্রসন্ন বিশ্বাসের কথা রূপায়িত হয়েছে।

কাব্যকথা প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'জন্মদিনে' পর্যন্ত কাব্য ও কবিমানসের এই পরিচয় থেকে এককের পাঁচটি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব হবে আশা রেখেই এই পরিক্রমা।

৪৯.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ সোনার তরী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে, খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে॥
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—

বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরণী' পরে।
আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে ॥

ঠাঁই ঠাঁই, ঠাই নাই — ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শিলাইদহ। বোট
ফাল্গুন ১২৯৮

৪৯.৫ সারাংশ — ১

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অবিরাম বর্ষণ থেকে ক্ষণিক ক্ষান্তির মুহূর্ত। এরই মধ্যে এক কৃষক নদীর ধারে একাকী বসে আছে, কোনো ভরসা নেই। জলভরা খরস্রোতা নদী, দুর্বার বেগে বহমান। তার চারিদিকে রাশি রাশি বোঝাই কাটা ধান।

ছোটো খেতের ধারে একলা বসে, তখন পরপারের তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামটি আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। দূর থেকে গান গাইতে গাইতে কে যেন আসছে, দেখে মনে হল সে যেন চেনা। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে পালতোলা নৌকায় ঢেউ তুলে কোথায় চলেছে। কৃষক মাঝিকে কাতর কণ্ঠে কূলে নৌকা ভেরাবার জন্য অনুরোধ করল। তার কেটে রাখা সোনার ধান তুলে নিয়ে তারপর সে যেখানে ইচ্ছা যাক—এটাই একান্ত ইচ্ছা।

অনুরোধ মত নৌকায় সমস্ত তুলে দিয়ে তাকে করুণা করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় উত্তরে 'ঠাঁই নেই' বলে সোনার ফসল নিয়ে গেলেও, কৃষক প্রবহমান নদীর তীরে নিঃসঙ্গ ও অচল হয়ে বসে রইল।

৪৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'সোনাতর তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা সোনার তরীর রচনা স্থান শিলাইদহ, কাল—ফাল্গুন ১২৯৮, ইং ফেব্রুয়ারি ৪ মার্চ ১৮৯২। কবিতাটির নামকরণ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সোনার তরী' সোনায় তৈরি তরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যঞ্জনাগর্ভ। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী তা-ই সোনার তরী। কবিতার এই নামকরণটি আক্ষরিক-অর্থ-অতিরিক্ত অন্যতর অর্থে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। সংসার-তরণীতে কবি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও, সংসার কবিকে গ্রহণ করল না। মহাকালরূপী নেয়ে ইতিহাসরূপ সোনারতরী নিয়ে সোনার ধান রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তুলে নিলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানুষের শিল্প, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্চিত থাকে। জগৎ স্রষ্টাকে চায় না, তার শিল্পকে সৃষ্টিকে চায়, এটাই চিরন্তন সত্য। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যটি আলোচ্য কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে বলে কবি কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'সোনার তরী'। সোনার তরী মানব সংসারের তরী যাতে কবি বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টি সম্ভারকে তুলে দিলেও "ঠাই নাই, ঠাই নাই—ছোট সে তরী"—তাই কবি স্বয়ং নির্জনতায় নির্বাসিতা। এ সব বিচারে কবিতার নামকরণ তাই সার্থক ও সুন্দর। এ পর্বে কবি আত্মস্থ, তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ—রবি-রশ্মির মধ্যাহ্নদীপ্তি বিচ্ছুরিত। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কল্পলোকের আলোকচ্ছটা থেকে বাস্তব জগতের উদার আকাশ-বাতাসে স্থাপিত। এ সময় কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশিত। কবি-কল্পনায় কবিত্বে প্রকাশ-ভঙ্গির চমৎকারিত্বে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলির দীপ্যমান। 'সোনার তরী' তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে যুক্ত হয়েছে, একটি তত্ত্ব যার ব্যাখ্যা নানা কবিতায় রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক।

কবিতাটি রচনার সময় কবি জমিদারি দেখাশোনার কাজে কখনো শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসরে বাস করেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর অনুভবে, রঙে, রূপে কল্পনায়, নিত্য নতুন হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। পল্লীর নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গো পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। এই পরিচয় সূত্রেই 'সোনার তরী' কাব্য। 'সোনার তরী' কবিতা এই অনুভবের সৃষ্টি। এখানেও প্রকৃতি ও মানুষ, কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের সঙ্গো একাকার হয়ে গেছে। একে বলা যেতে পারে বিশ্বানুভূতি—এটি সম্ভব কবির সৃষ্টিপ্রেরণা বা অন্তর্দেবতার অন্তঃপ্রেরণায়, সম্ভবত কবির এই অন্তর্দেবতাই সোনারতরী কবিতার 'নেয়ে'। অন্তর্দেবতা কোনো অলৌকিক শক্তিধর নন, কবির প্রকাশপ্রেরণা, যিনি কবির মনের মধ্যে বসে সমগ্র জগৎকে সাহিত্যে রূপদান করছেন। প্রকৃতি—সোনার তরী কবিতার উৎস, চলমান নদীস্রোত, যার মধ্যে কবি জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন, তাকে এখানে দেখেছেন সাংকেতিকতায়, রহস্যময়, রূপকের ব্যবহারে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী রূপে।

'সোনার তরী' কাব্যে কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ, পদ্মার প্রবহমানতা, বিচিত্র খণ্ড খণ্ড রূপকল্প ও চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও সাঙ্কেতিক রহস্যময়তায়, কখনো বর্ষা প্রকৃতির বিষাদ উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতাটিও এরকমই এক ঘন বর্ষায় আবৃত নদীচরের নিসর্গচিত্র। কবির ভাষায় পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেটি এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'সোনার তরী' কবিতা বহু-বিতর্কিত কবিতা। এর বস্তু সত্য ও ভাবসত্য নিয়ে নানা মত আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন— ".... ছিলাম পদ্মার বোটে। জলভারানত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু শ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ধেয়ে চলেছে....। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকা..... ভেসে চলেছে। এই ...... ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।" .... ঐ বাদলদিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ও তার ছন্দে প্রকাশিত। কেউ কেউ এতে একটি রূপকের সন্ধান পেয়েছেন। রূপক ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন — "সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ..... মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে, জীবনের ক্ষেত্রটা দ্বীপের মত ... সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে। একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে....... আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে — তোমার জন্য জায়গা কোথায় ?" — মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করে রক্ষা করে, কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করে না। এ কবিতাকে কেউ কেউ বস্তুবিশ্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের রূপক হিসেবেও দেখেছেন। কবিতার মধ্যে যে সমস্ত প্রতীক বন্ধন করেছেন, তা হল ঃ সোনার তরী — বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য, মাঝি — সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নদী — অখণ্ড কালপ্রবাহ, খেত — জীবনের কর্মক্ষেত্র, ধান — সৌন্দর্যের সঞ্চার। ড. নীহার রঞ্জন রায় বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা হিসেবেই 'সোনার তরী'কে দেখেছেন। শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী প্রভৃতির অপার সৌন্দর্য স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই সোনার তরী কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। এর কাছে তত্ত্ব অবান্তর। শূন্য নদীতীরে একা থাকার বেদনা, নিজেকে একান্ত করে দান করতে না পারায়, কোনো কোনো ভাব-মুহূর্তে প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ বলে মনে হয়—এ তো কোন তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র। সুতরাং তত্ত্ব নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণ নেই।

কিছু কিছু সমালোচক কবিতাটির একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে 'সোনার তরী'কে শুধুমাত্র প্রকৃতির কবিতা বলা ঠিক হবে না, তাঁরা এতে একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা মানুষের জীবন এক খণ্ড চাষের জমি বিশেষ। এ জীবন মহাকাল বেষ্টিত, জীবনের ছোটো খেতটুকুও খরস্রেতা নদী ঘেরা। মানুষ তাঁর সারাজীবনের সম্পদ সংসার-তরণীতে বোঝাই করে দিলেও, সংসার তাকে গ্রহণ করলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না — ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই — ছোট সে তরী। মহাকালের কাছে ব্যক্তি নয়, তাঁর সৃষ্টিই প্রধান। সে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। দেশ-কাল নিরপেক্ষ এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যটি এই কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য— কিছু সমালোচকের এই বিশ্বাস।

সোনার তরী-র ছন্দ লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্তের পক্ষে অভূতপূর্ব (৮ + ৫) ১৩ মাত্রার ছত্র বিন্যাস স্তবক গঠনে ৮ + ৫, ৮ + ৫ , ৮ +৮ + ৮ + ৫ এবং ৮ + ৫ ভাবের উপযোগী একটি সুর যোগ করেছেন। প্রথম ৮ + ৫ মাত্রার দ্বিপার্বিক দুটি ছত্রের মাত্রা সমকত্ব ও অন্তমিল যে ধ্বনিসৌকর্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী তিনটি ৮ মাত্রার সমধ্বন্যাত্মক তিনটি পর্ব বিন্যস্ত করে একটি সুরের ঐকতান নিয়ে আসা হয়েছে। তার সঙ্গে ৮ + ৫ মাত্রার

শেষ ছত্রের মিলের সঙ্গে পূর্ববর্তী ৫ মাত্রার পর্বের অন্ত্যমিল কাব্য সুষমা নিয়ে এসেছে। এভাবে দুটি স্তবক কবিতাতে অভিনব ও বিরল ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে কোনো যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ না থাকায় অসামান্য সুরতরঙ্গিত রমণীয়তা সৃষ্টি করেছে। চিত্র সন্নিবেশের কৌশলেও কবিতাটি আকর্ষক। ভরা নদী, খরজল, মেঘমেদুর পরপার, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তরী, মাঝি এ সবের সঙ্গে কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতা একটা করুণ রাগিণী সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ *ভরা নদী ক্ষুরধারা* — বর্ষায় নদীজল ক্ষুরের মতো ধারালো অর্থাৎ খরস্রোতা বোঝানো হয়েছে।

তরু ছায়া মসীমাখা (কালিমাখা) — আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গাছের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে।

বাঁকা জল করিছে খেলা — বাঁকা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি অর্থে নদী বেঁকে বেষ্টন করে আছে, অপর ব্যঞ্জনগর্ভ অর্থ 'কুটিল বা প্রতিকূল'।

কে আসে পারে — 'কে' এই শব্দটি ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে — বর্ষা সমাগমে কাটা ফসল নিয়ে তরীর অপেক্ষায় যখন আছেন এমনি সময় দূর থেকে দেখে কোন চেনা চেনা নেয়েকে যেন দেখা যাচ্ছে — এমনি সাধারণ অর্থ হলেও উদ্ধৃতিটি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। যাকে দেখে 'মনে হয় চিনি উহারে' সে যে কবির হৃদয়গত অন্তর্যামী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনায় ব্যক্তি আমির অতিরিক্ত পৃথক এক অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তর্শক্তি যাকে অনেকে অন্তর্দেবতা বা জীবনদেবতা বলেন তার কল্পনা করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এরা আভাস, চিত্রা'য় তার পরিণতি। ইনিই কবির প্রেরণা, তাঁর কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। *কোন্ বিদেশে* — এখানে বলতে কোনো অজানা জগতে।

শুধু তুমি নিয়ে যাও— সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ সম্ভার, মহাকালের তরণীতে তুলে দেওয়ার মধ্যেই স্রষ্টার সার্থকতা। কিন্তু কালের মাঝি কোনোদিকে দৃকপাত না করে নিতান্ত নিরাসক্ত চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে স্রষ্টার একান্ত অনুরোধ সে জীবনের যা কিছু অর্জিত ফল তাকে যেন নিয়ে যায়।

এখন আমারে লহো করুণা করে — একলা জনবেষ্টিত ছোটো খেতে বসে আছি। করুণা করে তোমার তরীতে তুলে নাও। এর আধ্যাত্মিক অর্থ হ'তে পারে, আমাকে সকল কর্মবন্দি থেকে মুক্ত করো। অথবা আমার শিল্পের সঙ্গে আমারও অস্তিত্বকে যুক্ত করো।

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী — আজীবন সঞ্চিত সোনার ফসল, সংসার তরণীতে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি সমাদৃত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থান না হওয়ায় — শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি — তিনি একাকিত্বের বেদনায় বিষণ্ণ।

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ — ১ একাধিকবার পড়ুন, তাহলেই প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) ছত্র পূরণ করুন

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা —

....

পরপারে দেখি আঁকা

....

....

প্রভাত বেলা

এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা ॥

খ) যেয়ো যেথা যেতে চাও

....

....

ক্ষমিক হেসে।

গ) চতুর্থ পর্বে কবি অনেকটা প্রাজ্ঞ দার্শনিক ___________ ___________ যিনি পুরাতনকে ___________ দেখেছেন, পুরাতন ___________ আবেগঋদ্ধ ___________ পরিবর্তে অনেক শান্তি ও সংযত, ___________।

ঘ) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি হল—

পুনশ্চ ___________ পত্রপুট ___________

২) সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ

ক) 'বলাকা' কাব্যের প্রকাশ — ১) ১৯১৪ খ্রিঃ
২) ১৯১৬ খ্রিঃ
৩) ১৯১৩ খ্রিঃ

খ) 'পত্রপুট' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৩৪ খ্রিঃ
২) ১৯৩৫ খ্রিঃ
৩) ১৯৩৬ খ্রিঃ

গ) 'রোগশয্যায়' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৪০ খ্রিঃ
২) ১৯৪১ খ্রিঃ
৩) ১৯৩৮ খ্রিঃ

ঘ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য — ১) জন্মদিন
২) শেষ লেখা
৩) শেষ সপ্তক

৩) 'সোনার তরী' কবিতা রচনা ও 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল লিখুন।
৪) কোন্ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'গদ্য কবিতা' রচনার সূচনা করেন ? কাব্যগ্রন্থটির রচনা কাল লিখুন।
৫) রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। আলোচনা ৫০টি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।
৬) 'সোনার তরী' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন (৩০টি শব্দ)।
৭) 'সোনার তরী' কাব্য রচনাকালের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার যতটুকু জানা আছে তা বর্ণনা করুন। (৫০টি শব্দে)।
৮) 'সোনার তরী' কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা বিস্তৃত করুন।
৯) 'সোনার তরী' কবিতায় কিছু সমালোচক দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৪৯.৭ মূলপাঠ — ২ ঃ শতাব্দীর সূর্য আজি

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বেজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৪৯.৮ সারাংশ — ২

অস্ত্রে অস্ত্রে যখন রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তার মধ্য দিয়েই (উনবিংশ) শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল। কুটিল ফণা তুলে নির্মম সভ্যতা নাগিনী তার বিষদাঁত নিয়ে উদ্যত। লোভী স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খসে গিয়ে বেধেছে সংঘাত। তারা জাতিপ্রেমের নামে, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শ্মশান কুকুরের মতো একদল কবি এর প্ররোচনা দিয়ে জয়গান গাইছে।

৪৯.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা , কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'শতাব্দীর সূর্য আজি' রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য (প্রকাশ ১৩০৮, ইং ১৯০১) কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতা। কাব্যের মতো কবিতার রচনাকাল ১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ইং ১৯০০-১৯০১। কবি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোনো নাম দেননি। কবিতার প্রথম ছত্র বা সংকলনের সংখ্যায় এর পরিচয়। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতাই কবির ঈশ্বর বা জীবননাথের জন্য নিবেদিত। "পারিবারিক শিক্ষা", ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান, বিশেষত পিতা মহর্ষি দেবের সাহচর্যের ফলে কবির মনে কিছু ধর্মসংস্কার ও ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভগবদ্‌ভক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, পৃথিবী ও মানুষ তাঁর ছিল প্রথম আশ্রয় ; সংসারের অসংখ্য কাজের জন্য, দৈনন্দিন জীবনের নানা সংশয়-সংকট সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়েছে, ব্যাকুল করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া কখনও কবিতায় প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কবিতা এমনই একটি ঘটনায় আশ্রয়ী যা মনুষ্যত্বের অবমাননার দ্বারা ধিক্কৃত। কবিকে এ সময়ে আমরা বিশেষভাবে বিশ্বমনস্ক দেখতে পাই। আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ বা চীনের বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা তার স্বাক্ষর। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ৯০টি নৈবেদ্য লিখে ফেলেছেন। বর্তমান ৬৪ সংখ্যক কবিতা এই সময়ের মধ্যেই লেখা। নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে উৎসর্গ করেছেন। কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রেম যৌবন সৌন্দর্য অথবা জীবন-প্রেতি জয়গান থাকলেও এর আড়ালে একটি তত্ত্ব, চিন্তা কল্পনা কাজ করেছে। একটি বিশেষ তত্ত্বও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটি ব্রাহ্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে রসের পরিবর্তে অনেক সময় ধর্ম ও নীতিবোধ প্রধানতর কাজ করেছে। উচ্চভাব ও স্পষ্ট বক্তব্য কবিতার প্রাণ। অপর কয়েকটি কবিতা সমাজ ইতিহাস, দেশপ্রেম, মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনে তীব্র। তীক্ষ্ণ বক্তব্যে ক্ষুরধার অথচ মার্জিত, মহত্ত্বব্যঞ্জক ও ওজোগুণসম্পন্ন।

এ সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ (১২ অক্টোবর ১৮৯৯-৩১মে ১৯০২) করে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও চীনে শোষণক্লিষ্ট চীনারা বিদেশী বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহে'র (১৯০০ খ্রিঃ) সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে ('স্বদেশ') এ প্রসঙ্গে লিখেছেন — "সম্প্রতি য়ুরোপে এক অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। .... সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম প্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ সংখ্যক কবিতা রচনা। কবি তখন শিলাইদহে। তিনি লক্ষ্য করেছেন নেশনতন্ত্রী ইউরোপ—অর্থ-বিত্ত-বৈভবের নেশায় মত্ত হয়ে হিংস্র আক্রমণে নেশন-এর ধুয়া তুলে মনুষ্যত্বের

অবমাননা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গো সঙ্গো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য জাতিবৈরের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থপর দেশপ্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কবি এইসব জাতিস্বার্থ প্রণোদিত যুদ্ধকে হিংসার উৎসব বলে গণ্য করেছেন, স্বার্থপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। নতুন শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের দেখা নেই, শতাব্দীর শেষ সূর্য ধ্বংসের মধ্য দিয়েই এভাবে অস্তমিত হল। এই বক্তব্যই পত্রপুটের ১৬ সংখ্যক কবিতায় (আফ্রিকা) ভিন্ন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

* **পাদটীকা** — বুয়র ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু ওলন্দাজ ১৬৫২ খ্রিঃ প্রথম বসতি স্থাপন করে চাষবাস শুরু করে। এদেরই কিছু স্থানীয় অধিবাসী 'হটেনটট্' মেয়েদের বিয়ে করে স্থায়ী হয়। এই মিশ্র জাতি 'বুয়র' নামে পরিচিত। পরে ফরাসি, জার্মান, সুইডিসরা নানা ধরনের অত্যাচারে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এখানে আসে। ইংরেজ আসে ১৯শ শতকের গোড়ায়। বুয়ররা উত্তরে সরে এসে তখনকার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রানস্‌ভাল-এ নূতন বসতি করে। অরেঞ্জ নদীর ধারে হীরা, ট্রান্সভালে সোনা আবিষ্কার হলে, ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। স্বাতন্ত্র্যবাদী বুয়রদের সঙ্গো যুদ্ধ বাধে, যার সূচনা ১৮৭৮-৭৯, পরিণতি ১৮৯৯-১৯০২ তে।

একই ধরনের শোষণের রাজনীতি চলেছিল চীনের ওপর। তাই বিদেশি বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৯০০) শুরু হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু য়ুরোপীয় নিহত হলে, ইংরেজ-জার্মান-রুশের সম্মিলিত আক্রমণে চীনারা পর্যুদস্ত হয় (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। অতঃপর ১২ টি পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অসমচুক্তিতে চীনকে আবদ্ধ করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

চতুর্দশপদী এই কবিতার উপস্থাপনা বক্তব্যের সঙ্গো খুবই সংগতিপূর্ণ। মিশ্রবৃত্তের সাধারণ পর্বের ৮ + ৬ ছত্রেতে বিন্যস্ত। প্রথম আট ছত্রে প্রস্তাবনা, শেষের ছয় ছত্রে মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা। এখানে যেহেতু বক্তব্য বিষয় বড়ো, তাই প্রস্তাবনা অংশ প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের কক, খখ, গগ, ষষ্ঠকের পর ঘঘ, ঙঙ, চচ, ছছ ছত্রগুচ্ছে উপস্থিত করেছেন। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় আত্মনিবেদনের ভাব, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকুতি, গভীর ধর্মবোধ প্রভৃতি মহর্ষির জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় অনেকটা শান্ত, সমাহিত ভাবপ্রকাশক নিরুত্তাপ, সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগে অভিব্যক্ত হয়েছে। আবার স্বদেশপ্রেমের কবিতায় ভাষা অপেক্ষা স্পষ্ট ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বর্তমান কবিতায় ভাষা বক্তব্য বিষয়ের জন্য হয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃপ্ত। রক্তমেঘ, হিংসার উৎসব, গুপ্ত বিষদন্ত, প্রলয় মন্থন ক্ষোভ, শ্মশান কুক্কুর প্রভৃতি যুক্ত সংযুক্ত শব্দ যে ধ্বনি ও অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা বক্তব্যকে তীব্রতর করেছে।

কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা —

শতাব্দীর সূর্য আজি ইত্যাদি— উনিশ শতকের শেষ সূর্য রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অস্ত গেল। একথা বলার পিছনে যে ব্যঞ্জনা আছে সেটিকে এভাবে বলা যায়—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আফ্রিকার সাধারণ বুয়র কৃষকদের আক্রমণ করছে হীন স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনা একান্ত বিদ্ধ করেছে বলেই নৈবেদ্যে ভগবৎভক্তিমূলক কাব্য রচনা করলেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি, তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট, ঋজু ওজস্বী ভাষায় বর্তমান কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী— য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে নির্দয় বিষধর সাপের সঙ্গো তুলনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ আফ্রিকার অরণ্য সমাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, সভ্যতার হিংস্র আক্রমণে আর্তরবে চিৎকার করছে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত — সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আফ্রিকার জুলু ও বুয়রদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণ। বুয়ররা নিজভূমে স্বাধিকার রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়তা দেখালে ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ইংরেজ শক্তিতে তাদের প্রতিহত করে। এর পিছনে যেমন ছিল জাতিগত স্বার্থ, তার পাশাপাশি ছিল তীব্র অর্থসম্পদ তৃষ্ণা। মানবতার পীড়নকারী অর্থলোভী সাম্রাজ্যবাদকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে।

প্রলয়মন্থন-ক্ষোভ — লোভ যখন হয় সীমাহীন, তখন লোভীর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। স্বার্থপর মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরই ফলে অনিবার্য ধ্বংস আসে। য়ুরোপী রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় লোভ সেই বর্বতার পরিচয় দিচ্ছে।

কবিদল চীৎকারিছে—উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক কবিকুল উৎকট, সংকীর্ণ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ করছিল, তাঁদের কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সেই সম্পর্কে এই তির্যক মন্তব্য। এসব কবিরা হলেন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। যেমন — ইংরেজ কবি হার্ডি, রার্ডিয়ার্ডি কিপলিঙ, রুপার্ট ব্রুক, সিগফ্রিড স্যাসুন।

অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্ত করুন। উত্তর শেষে ৪১ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলপাঠ — ২, প্রাসঙ্গিক আলোচনা সাহায্য নিয়ে উত্তর প্রস্তুত করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে .... নিমিষে
.... তার ভরি ....।

খ) ...., লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ....
.... উঠিয়াছে জাগি
................................।

গ) রবীন্দ্রনাথ এক সময় ________ সম্পাদক ও ________ পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, ________ ________ ও ________ তাঁর ছিল প্রথম ________।

ঘ) আফ্রিকার ________, ________ বা চীনের ________ ________ প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা।

২) **সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ**

ক) নৈবেদ্যে —
১) কবিতার নাম
২) কাব্যের নাম
১) কবিতাগুচ্ছের নাম

খ) নৈবেদ্যের কবিতা রচনা কাল —
১) ১৩০৭ সাল
২) ১৩০৮ সাল
১) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

৩) 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪) 'বুয়র' যুদ্ধ কী ও কেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৫০টি শব্দে)।

৫) 'শতাব্দীর সূর্য' বলতে কী বোঝান হয়েছে লিখুন।

৬) 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' — সভ্যতাকে 'নাগিনী' এবং 'দয়াহীন' বলবার কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

৭) 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' — উদ্ধৃত অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৮) 'কবিদল চীৎকারিছে' — উদ্ধৃতিটির বক্তব্য বুঝিয়ে দিন এবং দুজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৪৯.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে (শঙ্খ)

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে,
এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই রে অভয়শঙ্খ॥

চলেছিলাম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ।

এবার আমার হৃদয়ক্ষত,
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ॥

আরতিদীপ এই কি জ্বালা।
এই কি আমার সন্ধ্যা।

গাঁথব রক্তজবার মালা ?
হ্যায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপকতানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি, তন্দ্রা মম
    রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারাসম
    বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
    সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
    তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
    পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
    পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
    বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
    অভয় তব শঙ্খ॥

১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

৪৯.১১ সারাংশ — ৩

[শঙ্খ কবিতা রচনার সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয়নি। কবির মনে এক দুঃসময়ের আশঙ্কা। এই প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনা।]

যে শঙ্খে দেবতার আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে, তাকে ধুলায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। বাতাস থেমে যাওয়া থেকে আসন্ন দুর্দৈবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ সময় যারা অভয় শঙ্খ নিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে কণ্ঠে (শান্তির) গান ও জয় পতাকা নিয়ে চলবে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে থাকতে দেখছি যখন, হৃদয়-

বেদনা দূর করে নিষ্কলঙ্ক হওয়ার আশায়, পূজার অর্ঘ্য নিয়ে শান্তির সন্ধানে চলেছে। সমস্ত কাজের শেষে শান্তিতে কাটাবার জন্য আরতির শান্ত প্রদীপে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে, আজ আরাধনার সময় নয়, শঙ্খের যখন আহ্বান এই যে, রক্তজবাব মালাই গাঁথতে হবে।

অন্তরে যৌবনবেগ সঞ্চার করে উদ্দীপ্ত প্রাণের আনন্দে দীপক তান বেজে উঠুক। জাগুক অন্ধকারের পর, নতুন প্রাণের সাড়া। চোখে এখন আর ঘুম নয়। শ্রাবণের বর্ষণের মতো অস্ত্রাঘাত এলে, কেউ সমব্যথী হবে, কেউ বা হাহাকার করবে, এরই মধ্যে যে শঙ্খ বাজবে।

বিশ্রাম চেয়ে লজ্জা পেয়েছি। আজ সমস্ত আঘাত ও দুঃখ সয়েও রণসাজে সজ্জিত হয়ে, নির্ভয়ে সকল শক্তিতে অভয় শঙ্খ তুলে নিতে হবে।

৪৯.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনার সূচনা ১৩২১ সালের ১৫ই বৈশাখ (১৯১৪) শান্তিনিকেতনে, শেষ কবিতা লেখা হয় কলকাতায় ৯ই বৈশাখ ১৩২৩ (১৯১৬) এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ (মে, ১৯১৬)। মূলপাঠের কবিতাটির (৪নং) রচনা, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রামগড়ে এবং এটি আষাঢ়ের 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত হয়। কবি এ সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে হিমালয়ের রামগড়ে। তাঁর মনে দারুণ অশান্তি ও বেদনাভার। একমাত্র অ্যান্ড্রুজ এ খবর জানতেন। কবি বলেন,—"খবর পাইনি, প্রমাণ পাইনি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয় কাণ্ডের উদ্যোগ চলছে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কবিতা একে একে এল। ....তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এদেশে আসেনি, — আমার চার নম্বর কবিতা (শঙ্খ) লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা ২৮শে জুলাই ১৯১৪ (শ্রাবণ ১৩২১) শেষ ভার্সাই চুক্তিতে ২৮শে জুন, ১৯১৯।

যুদ্ধ কোনো সময়ই কারও কাঙ্ক্ষিত নয়। যুদ্ধ মানুষের সুখশান্তি শ্রী ও সম্পদের সর্বনাশ ঘটায়, অপরিসীম দুঃখ বেদনা ও ধ্বংসকে বয়ে আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সীমাহীন লোভ ও দম্ভ জগতের অন্তরাত্মাকে পীড়িত করে আত্মপ্রকাশ করল। যুদ্ধে শঙ্খ বেজে উঠল। দারুণ প্রলয়ের সূচনা হল। বিশ্বের ১৮টি দেশ ক্রমান্বয়ে সর্বনাশা এই মহামরণযজ্ঞে জড়িয়ে পড়ল।

এ সময় শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণধর্মের তপস্যায়, সৌন্দর্যের রজনীগন্ধা নয়, মানবকল্যাণে, অনিবার্যকে ধ্বংসকে রোধ করতে রক্তজবার মালা নিয়ে যুদ্ধে ব্রতী হতে হবে। শান্ত সন্ধ্যায় পূজা-বন্দনা স্বাভাবিক কিন্তু বিধাতার আহ্বান যখন মহাশঙ্খধ্বনিতে এসে পৌঁছায় তখন আর উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না, সাড়া দিতেই হয়। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের দিনে সচেতন মানুষ মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। তাই এ কবিতায় দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে কবি যুদ্ধের উপযোগী দীপক তানের সংগীতকে প্রার্থনা করেছেন। যৌবনের দুর্দমনীয় প্রাণশক্তিকে আহ্বান করেছেন। 'বলাকা'র কবিতায় কবি 'অজর-অমর-অক্ষয়' যৌবনের বন্দনা বার বার করেছেন। এখানেও তিনি প্রাণের হর্ষদীপ্তিকে কামনা করেছেন। দীপক রাগের ছোঁয়ায় যে আগুন জ্বলবে তাতে সমস্ত কলুষ, কল্মষ ক্ষয় হবে, অন্যায়ের অন্ধকার বিদূরিত হবে, দুহাতে শঙ্খ তুলে মানবাত্মার জয়ধ্বনি তখনই সম্ভব হবে।

কবিতার উপসংহারে দেখি বিরামে বিশ্রামে অলস জীবনযাপনের গ্লানিতে লজ্জিত কবি-আত্মা সে জড়তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। বস্তুত এই কবিপ্রাণ বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী, সর্বমানুষের অন্তর্গত সত্তা। এভাবে কবি ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে পৌঁছেছেন। একক হৃদয়ের বেদনার ভার এভাবে বিশ্বমানবতার কল্যাণে 'অভয় শঙ্খ' হাতে তুলে নেওয়ার কথাতে সমাপ্ত হয়েছে। বলাকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র কবিতাগুলিতে ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বরানুভূতির আভাস খুবই স্পষ্ট। কিন্তু কবিচিত্ত এখানে দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকতে পারেনি। চিরচঞ্চল, চিরপথিক কবি হৃদয়, গতিহীন অধ্যাত্মরসবোধে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে স্থায়ী হন না। কবি ভক্ত সাধক নন, তাই বিপরীত শক্তির অভিঘাতে নিসর্গ ও বিপুল মানববিশ্বকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় এতদিনের সীমা থেকে অসীম দেখা নয়, এবার অসীমের দৃষ্টিতে সীমাকে দেখার যাত্রা শুরু হল। 'বলাকা'য় কবি প্রেম জীবন যৌবনের জয়গান করেছেন, ও চিরচঞ্চল গতিশীলতার কথা বলেছেন। এর পেছনে সমকালীন কয়েকটি ঘটনার অবদান থাকা অসম্ভব নয়। (১) 'সবুজপত্র' — সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ (১৯১৪) চলিত বাংলায় সংস্কারমুক্ত গতিশীল জীবন যৌবনের কথা বলার প্রতিশ্রুতি। (২) ইউরোপের উদ্দম সমাজ, তার অদ্ভুত কর্মচাঞ্চল্য তার সংঘাত সংঘর্ষ। (৩) ফরাসি দার্শনিক বের্গশঁ-র elan vital এর দার্শনিক তত্ত্ব কবি মানসে কিছু প্রভাব ফেলে থাকবে। বের্গসঁ-এর মতে জগতের সবকিছুই এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। গতিই হল কালপ্রবাহ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। 'বলাকায়' এই চলার কথাই প্রধান। গতিতত্ত্বই বলাকার মূলসুর। বলাকা গতিরাগের কাব্য। এ গতি অসীমে ধাবমান। তাই উদ্দেশ্যহীন নয় আনন্দের রসলোকে পৌঁছানোই তার মূল লক্ষ্য। কবি যৌবনের মধ্যে সেই গতিকে দেখেছেন। কালধর্মে মানুষের শক্তি জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে সংস্কারের ঘেরাটোপে জড়িয়ে পড়ে। যৌবনের দুর্গম প্রাণশক্তি সেই রুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত করতে পারে বলেই তিনি 'সবুজের অভিযান' আকাঙ্ক্ষা করেছেন। শঙ্খ (৪নং) কবিতায় তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন—

> যৌবনের পরশমণি / করাও তবে স্পর্শ
> দীপক তানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

যৌবন গতিস্রোত আনে, সে নিয়ত গতিমান। বিশ্ব প্রকৃতিতে যে গতি, মানুষের ব্যক্তিজীবনেও সেই গতি। কবি 'বলাকায়' এই গতিকেই অনুভব করেছেন।

কবি 'বলাকা'য় জীবনের গতিকেই প্রকাশ করতে গিয়ে তার ছন্দপ্রকরণেও সেই গতিশীলতা নিয়ে এসেছেন। এই গতির প্রয়োজনে কবিতার ছন্দও বন্ধনমুক্ত হয়েছে। বলাকায় এই ছন্দকে 'মুক্তক' নামে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখানে সাবেক ছন্দকে ভেঙো নতুন করে ছন্দকে" পেয়েছেন। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল কবিতার ভাবের প্রয়োজনের কখনও অসম পর্ব ও ছত্র পর্বে মাত্রাবৈচিত্র্য এবং প্রবহমানতা। বাংলার তিন ধরনের (মিশ্রবৃত্ত, সরল কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত) ছন্দেরই মুক্তক রূপ রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে 'শঙ্খ' কবিতা মুক্তকের উদাহরণ নয়। এখানে সাধারণ দলবৃত্তের ছত্র পিছু চারটি পর্ব ভেঙে প্রতি ছত্রে দুটি করে সাজানো হয়েছে এবং এ কবিতায় স্পষ্ট প্রবহমানতা নেই, যেমন আছে 'নদী' বা 'শাহজাহান'-এ। এর ছন্দসজ্জাটি এইরকম —

তোমার শঙ্খ / ধুলায় পড়ে /	৪ + ৪ = দুটি পূর্ণ পর্ব
কেমন করে / সইব	৪ + ২ = একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব

বাতাস আলো / গেল মরে / ৪ + ৪

এ কীরে দু / দৈর্ব ৪ + ২

(সূত্র ঃ ১ম স্তবক)

এবং

চলেছিলেম / পূজার ঘরে / ৪ + ৪

সাজিয়ে ফুলে / অর্ঘ্য। ৪ + ২

খুঁজি সারা / দিনের পরে ৪ + ৪

কোথায় শান্তি / স্বর্গ ৪ + ২

(সূত্র ঃ ২য় স্তবক)

এখানে দলবৃত্তের তরঙ্গময় দোলাই কবির অন্তর্গত চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করছে। যথার্থ মুক্তকের বৈশিষ্ট্য হল ছত্রদৈর্ঘ্যের অভাবিত অসমতা এবং সেই সঙ্গে প্রবহমানতা। পর্বও প্রায়ই অসমান হয়।

প্রসঙ্গত ৬নং কবিতা 'ছবি' বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—

তুমি কি কেবল ছবি / শুধু পটে লিখা ৮ + ৬

ওই যে সুদূর / নীহারিকা ৬ + ৪

যারা / করে আছে ভিড় ২ + ৬

/ আকাশের নীড় ; ০ + ৬

এটি মিশ্রবৃত্ত পয়ার জাতীয় মুক্তক। এতে অন্ত্যমিল থাকলেও পর্বে ও পঙ্ক্তিতে মাত্রাসমকত্ব নেই।

ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন 'বলাকা'র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, দৃপ্তযোগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী।" এ ছন্দে আছে মুক্তির আশ্বাস। এর সূচনা মধূসূদনের অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ারে, পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'র গদ্য কবিতা ছন্দে। এবাবে বাংলা কাব্যে অতুলনীয় সমৃদ্ধি এসেছে।

অনুশীলনী — ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ (৪৯.১২) এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা (৪৯.১৪) ভাল করে পড়ে উত্তর দিন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) .... এই কি জ্বালা।

এই কি আমার ....।

গাঁথব .... মালা ?

হায় ....।

খ) তোমার কাছে ....

পেলেম শুধু .... ।

এবার সকল ....

পরাও .... ।

গ) শান্ত সন্ধ্যায় __________ __________ স্বাভাবিক কিন্তু __________ আহ্বান যখন __________ এসে পৌঁছায় তখন আর __________ থাকা সম্ভব হয় না, __________ দিতেই হয়।

ঘ) চিরচঞ্চল __________ কবি হৃদয় __________ __________ অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে স্থায়ী হল না।

২) অর্থ লিখুন।

দুদৈব, ধ্বজা, অর্ঘ্য, যোঝাযুঝি, জয়ডঙ্ক।

৩) তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

গাঁথব রক্তজবার মালা ? দীপক তানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ ; দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে / সুপ্তির পর্যঙ্ক।

৪) শঙ্খ কবিতার দুটি স্তবকের শেষে শঙ্খের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেগুলি উল্লেখ করুন।

৫) 'বলাকা' গতি রাগের কাব্য। — উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬) "বলাকা"য় কবি যে গতিবেগের কথা বলেছেন, তার পেছনে কয়েকটি ঘটনার অবদান থাকা সম্ভব।"—একটু বিশদ করুন।

৭) 'বলাকা'র 'মুক্তক' ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ('শঙ্খ' ছাড়া অন্যান্য কবিতার অবলম্বনে আলোচ্য)

৪৯.১৩ মূলপাঠ — ৪, উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে (আফ্রিকা)

আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জল-স্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলেন ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।
হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;

শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।
আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকালে ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, ক্ষমা করো,
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ শে মাঘ ১৩৪৩

৪৯.১৪ সারাংশ — ৪

সভ্যতার সেই আদিমযুগে বিশ্বের প্রাচ্য ভূভাগ থেকে আফ্রিকা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, অন্ধকার গভীর অরণ্যানীতে সে সমাচ্ছন্ন হয়। সেখানকার দুর্গম তমসাময় প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু সমস্ত শঙ্কাকে হার মানাতে চাইছিল। ছায়াবৃতা আফ্রিকার মানবরূপ বাইরের পৃথিবীর উপেক্ষায় অবজ্ঞায় অজ্ঞাত থেকে গেছে। এমনই সময় (ইউরোপের) সভ্যতাভিমানী বর্বর নেকড়ের দল নির্লজ্জভাবে আফ্রিকাকে শৃঙ্খলিত করবার জন্য এগিয়ে এল। ফলে দস্যুদের আক্রমণে বীভৎস অত্যাচারে রক্তে-অশ্রুতে মিশে গেল আফ্রিকার মানবতা। ওদিকে (ইউরোপের) পাড়ায় পাড়ায় চলল উৎসব সমারোহ।

আজ সেই পশ্চিমাকাশে সেই পশু শক্তিই আবার নতুন করে যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন মানহারা এই মানবীর (আফ্রিকার) পাশে দাঁড়িয়ে হিংস্র প্রলাপের মধ্যেও মানবতাবাদী কবি ক্ষমার আহ্বান জানাচ্ছেন। এটিই হোক সভ্যতার শেষ বাণী।

৪৯.১৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

পত্রপুট (১৯৩৬) কাব্য-এ ষোলো সংখ্যক কবিতা — ‘উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে’ (নাম আফ্রিকা) কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করায় ২৮শে মাঘ ১৩৪৩, ইং ১২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৩৬ রচনা করেন।

প্রথমে প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৩ ও পরে কবিতাটির পত্রপুটের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৫) প্রকাশিত হয়। ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৫ ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির নির্দেশে ইতালীয় আক্রমণকারী সৈন্যদল অ্যাবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে তার প্রতিবাদ করে আফ্রিকা, 'ছায়াচ্ছন্ন' আফ্রিকার সকল বঞ্চনা লাঞ্ছনার রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে এক অনবদ্য কাব্য রূপ দিয়েছেন। বেদনায় ভারাক্রান্ত চিত্তে একান্ত মমতায় এক লাঞ্ছিতা কৃষ্ণা মানবীর রূপ এই কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন। আবেদন রেখেছেন "দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে।"

কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন আফ্রিকার ইতিহাস কবি ভালোকরেই জানতেন। মোরেল (E.D. Morel) প্রভৃতির বই তাঁর পড়া ছিল। পৃথিবীর অসহায় কৃষ্ণকায় মানুষদের প্রতি তথাকথিত সভ্য শ্বেতকায় মানুষের অত্যাচারে সুবিদিত। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অমিয় চক্রবর্তী কবিকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আফ্রিকা'র ইংরেজি তর্জমা তিনি বিলাতে নির্বাসিত ইথিওপীয় সম্রাট হাইলে সেলেসীর হাতে দেন এবং সেটি পড়ে তিনি শান্তি পান। এছাড়াও উগান্ডার রাজকুমার নিয়াবঙ্গো কবিতাটির বান্টু ও সোয়াহিলি ভাষী আফ্রিকানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বোঝা যায় 'পত্রপুট'-এর অন্যান্য কবিতা লেখা যখন চলছে পূজাবকাশে (অক্টোবর নভেম্বর ১৯৩৫ অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৪৩-এ), তখন কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ ও গান লেখায় ব্যস্ত। অকস্মাৎ অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধ হাইলে সেলাসি ও নিয়াবঙ্গার প্রতিক্রিয়া আফ্রিকার সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বের প্রতি তাঁকে মনোযোগী করে তোলে।

মুসোলিনির ইতালি যখন অ্যাবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) স্বাধীনতা গ্রাস করবার জন্য সামরিক অভিযান চালায়* তখন নানা দিক থেকে দেশটি ছিল অনগ্রসর, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। শ্বেতাঙ্গ বিদেশিরা আফ্রিকাকে নানা ভাগে ভাগ করে যখন বসতি স্থাপন করে তখন অ্যাবিসিনিয়া ছিল স্বাধীন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্রাট হাইলে সেলাসির পক্ষে সোভিয়েতের সমর্থনে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। শ্বেতাঙ্গরা সেখানকার মানুষদের উপর বর্বর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অপমান করেছে, এ সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আফ্রিকার সেই অত্যাচার ও পৃথিবীব্যাপী শোষণের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। নৈবেদ্যে-র 'শতাব্দীর সূর্য আজি'র মতো এবারও তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জেগে উঠেছে। শক্তিমদমত্ত তথাকথিত সভ্য, অত্যাচারী উপনিবেশবাসীদের প্রতি তাঁর পুঞ্জীভূত ঘৃণা এখানে তীব্রভাবে প্রকাশিত হল। কবি বলেছেন, "সভ্যের বর্বর লোভ/নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।" ষোলো সংখ্যক 'আফ্রিকা' কবিতার পরবর্তী রচনা 'সতের' সংখ্যক কবিতায় জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ ও চীনের সাংহাই এবং নানকিং অধিকার কালে জাপানি বোমার আঘাতে অগণিত শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা হত্যার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ১৩৪৪ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের ভাষণে চীনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে বলেছেন, "চীনের প্রতি (জাপানের) নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, ... দুঃখ বোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে .... আমাদের অস্ত্র নেই .... মেশিনগান নেই, চিন্তা আছে........তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব।"

* Italy became particularly active at the beginning of 1930s. To consolidate its colonial possessions in Africa, Indian imperialism had long had aggressive designs with regard to Ethiopia, which was richly endowed with raw materials and occupied an advantageous strategic position. From the autumn of 1934 Italy started organising

provocations against Ethiopia. In this period, under the guise of "non-interference." French and Britain consented to the seizure of Ethiopia by Italy. Taking advantage of the connivance of the French and British imperialists, the Italian fascists began military operations against Ethiopia on October 3, 1935. The Ethiopian people rose to defend their country and waged a just defensive war, but they were greatly outnumbered. The Ethiopians did not have modern arms and frequently operated separately, whereas the Italian's used modern tanks, aircraft, and latest artillery against Ethiopian troops, and to crown it all, began to use chemical agents. (A. Contemporary World History 1917-45 V. Alexandrov, 446-47)

এভাবে কবি "বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখ" রূপে গ্রহণ করেছেন। কোথাও ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন — এ সবের জন্য কবির বেদনাবোধ আমাদের বিচলিত করে। কিন্তু এরও মধ্যে কবি মানব ইতিহাসের মূলে যে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে সে কথা মনে রেখে কল্যাণের পক্ষে সমস্ত কর্মকে, চেষ্টাকে প্রয়োগ করতে বলেছেন। সর্বজীবে মঙ্গলচিন্তা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। তাই আহ্বান জানিয়েছে, "এসো যুগান্তরের কবি / আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে / দাঁড়াও মানহারা মানবীর দ্বারে / বলো, ক্ষমা করো — / হিংস্র প্রলাপের মধ্যে / সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।" / — এই মঙ্গল চিন্তাই কবির মতে ভারতবর্ষকে সর্বজাতির শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

তথাপি বার বার দেখা গেছে, পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বা মানবতার অপমান ঘটেছে, সমস্ত ঘটনাই কবি-আত্মাকে সমভাবে মর্মাহত করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২৯-১৯৩৩ বিশ্বব্যাপী মন্দা শিল্পে বাণিজ্যে য়ুরোপে যখন হতাশা, সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশগুলির প্রতি প্রথমে থাবা বসায়। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষুদ্র স্বার্থ এতে চরিতার্থ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনা। এ পর্যায়ের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে স্থিতধী চিত্তে ঘটনাগুলির মূল্যায়ন করতে দেখা গেছে। সেখানে যেমন একদিকে ছিল প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য, অন্যদিকে তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া।

'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র রচনাভঙ্গির ছন্দ-অলংকার ভাষারীতি ও চিত্রাঙ্কন বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এ পর্বে প্রায় নেই। তার পরিবর্তে শান্ত, সংযত গদ্যবন্ধ বাগ্‌ভঙ্গিতে গভীর কথা সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। উপমা প্রয়োগ, ছন্দরচনায় গদ্যভঙ্গির অনায়াস ব্যবহার এবং অনলংকৃত বাগ্‌বিন্যাস এ পর্যায়ের কাব্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য-ছন্দ বলতে গদ্য কবিতার ছন্দ বুঝিয়েছেন। গদ্যে যেহেতু অর্থবহ শব্দ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয় এবং পদ্যে থাকে ধ্বনি প্রবাহ, তাই গদ্য-কবিতায় পর্ব অর্থানুসারী, কিন্তু কবিতার মিল ধ্বনি অনুসারী, গদ্য-কবিতা ভাবানুসারী হওয়ায় তার পর্ব ভাবপর্ব—তার ছন্দ ভাব-ছন্দ, তাই তার পর্বও মাত্রাসংখ্যা ধ্বনি নির্ভর কবিতার মতো সুনিয়মিত, সুশৃঙ্খল নয়। এ ছন্দ কবির বাগ্‌বিন্যাসের ছন্দবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কবিতার ভাষা তৎসম শব্দ বর্জিত না হলেও এতে চলিত গদ্যের ব্যবহার বেশি, এর ছন্দেও তাই মৌখিক ভাষার গুরুত্ব। 'আফ্রিকা'র কয়েকটি ছত্র বিশ্লেষণ করলেই সেটি ধরা পড়বে।

উদ্‌ভ্রান্ত সেই / আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন / নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে / বারবার করছিলেন / বিধ্বস্ত
তার সেই অধৈর্যে / ঘন ঘন / মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর / বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, / আফ্রিকা ;

অথবা

হায় ছায়াবৃতা /
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল / তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

দুটি স্তবকের ছত্রগুচ্ছের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিনের মধ্যে। কোথাও ছত্রের পর্ববহুত্ব নেই। প্রথম স্তবকে কয়েকটি ধ্বনিসঞ্চারী শব্দ ব্যবহার হলেও সাধারণভাবে কথা ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের আঙ্গিকে গদ্য-ছন্দে রচিত কবিতা বা গদ্যিকা। আফ্রিকায় ধ্বনি সুষমার পরিচয় তার অনুপ্রাসে 'রুদ্র সমুদ্র', 'প্রাচী ধরিত্রী', 'সভ্যের বর্বর লোভ' এবং উপমা 'তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদ' বা দেশের উপর নির্যাতিত মানুষের ব্যবহার আরোপ প্রভৃতি কবিতার রমণীয়তাকে বাড়িয়েছে। যথা— 'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে / এল মানুষ ধরার দল / গর্বে তারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে'/—এখানে বৈপরীত্যে যাদের চিত্র বর্ণনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাদের প্রতি কবির ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হওয়ায় উপমেয়কে উমানের চেয়ে নিকৃষ্ট করে দেখানোর ব্যতিরেকে অলঙ্কার হয়েছে। চিত্রকল্প "প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস"—প্রভৃতি স্মরণীয় চিত্র ও ছত্র কবিতাটিতে নতুন মাতা যোগ করেছে।

॥ প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ॥

"উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে..... অসন্তোষে — সূর্যের অগ্নিবলয়",

সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি নানা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ স্থলভূমি ও প্রাণের প্রকাশ ঘটে। কোটি কোটি বৎসরের সেই সুপ্রাচীন ইতিহাস বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। পরে প্রাগৈতিহাসিক কালে ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ে বিশ্ব প্রকৃতিতে নানা ঘটনা ঘটেছে, তারই ইঙ্গিত এখানে আছে।

"রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর.... আফ্রিকা" প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপের সঙ্গো জিব্রাল্টার টিউনিস সিসিলি ও ইতালি যুক্ত ছিল। তখন ভূমধ্যসাগর দুটি হ্রদের মতো মনে হত। ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ে কালক্রমে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়। পূর্ব গোলার্ধের এই মহাদেশ এক সময় এশিয়ার ও ইউরোপের সঙ্গো যুক্ত ছিল। অপর দিকে আফ্রিকা পূর্বে সাইনাই উপদ্বীপ দিয়ে এশিয়ার সঙ্গো যুক্ত ছিল। সুয়েজ খাল কাটার পর এশিয়ার সঙ্গো বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ বর্তমানে মিশরের অন্তর্গত।

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে" য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের উপনিবেশ গড়ে আফ্রিকাকে পদানত ও শৃঙ্খলিত করেছে, এই পরাধীনতার নিগড়কে এখানে বোঝানো হয়েছে 'লোহার হাতকড়ি' ব্যঞ্জনায়।

"সভ্যের বর্বর লোভ" আফ্রিকার মতো বিচ্ছিন্ন একটি মহাদেশ গভীর অরণ্যসঙ্কুল। সংখ্যাতীত জাতি ও উপজাতিকে বিভক্ত সে দেশে দেশে আধুনিক সভ্যতার আলো তখনও প্রবেশ করেনি। উপজাতি গোষ্ঠীশাসিত সেই আদিম সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটলেও দেশটি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের দেশগুলি তাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে, সীমাহীন লোভের তাড়নায় এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং দেশের জনগোষ্ঠীর শ্রমকে ব্যবহার করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করতে অমানবিক হিংস্রতার আশ্রয় নেয়।

"মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা.... দেবতার নামে" আফ্রিকার জনগণ যখন হিংস্র নগ্ন আক্রমণে রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত, সেই সময় সমুদ্রের অপর পারে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সম্পদের প্রাচুর্যে, আনন্দ-উৎসবে দেবতার কাছে কল্যাণ ভিক্ষা চলছে। এই বিপরীত চিত্রটি তুলে ধরে কবি আফ্রিকার শোষিত অসহায় মানুষের প্রতি সমবেদনায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি তির্যক বাণ নিক্ষেপ করেছেন।

'আফ্রিকা' কবিতাটি বিশেষ দেশকালের কথা হলেও, আজও যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্র নখর দেশ দেশান্তরে মানুষকে বিপন্ন করছে দেখতে পাওয়া যায়, তখন স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় এ কবিতার গুরুত্ব। এভাবে কবিতাটি দেশকাল নিরপেক্ষ একটি অসাধারণ কাব্যশিল্প বলে মানা।

অনুশীলনী — ৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য ৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা একাধিক বার পড়ুন।

১) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

ক) যেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
চিনেছিলে .... দুর্বোধ সংকেত
প্রকৃতির .... জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল .... মনে।

খ) মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা,
.... দয়াময় .... ;
শিশুরা .... কোলে ;
কবির সংগীত বেজে উঠছিল
....।

২) সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক) প্রাচীন ধরিত্রী, চেতনাতীত মন, উপেক্ষার আবিল দৃষ্টি, মানুষ ধরার দল, সভ্যের বর্বর লোভ, হিংস্র প্রলোপ।

৩) 'আফ্রিকা' কবিতাটির বিষয়বস্তু আপনার নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৪) 'বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়' ছত্রটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫) দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে' — ছত্রটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬) 'আফ্রিকা' কবিতাটির ছন্দ-বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৯.১৬ মূলপাঠ — ৫, অমৃত

অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেন তাকে,
'ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন —
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বলো।'
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি ;
বললে, 'এ কি উপদেশ।'
আমি বললেন তার হাত চেপে ধরে,
'ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।'

বিরক্ত হল অমিয়া ;
বললে 'তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।'
আমি বললেম, 'বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।'

অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়িল,
চলল ঘরের বাইরে।
আমি বললেন, ‘শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।’

দিন যায়, রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই—
দেহের কল অচল হয়ে এল বলে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা
তার ফটিক-জলের কল্‌কলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুন্‌গুনিয়ে বনের থেকে বনে।

দল বেঁধেছে নারকেল গাছ—
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে ;
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দু হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউ গাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া ;
ঝর্‌ঝর্‌ করে উঠছে তার পাতা।
বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে বলে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।
শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্‌ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।

মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে—
'ফিরে যেতে হবে।'
থেকে থেকে মনে পড়ছে
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝলে উঠেছিল যে আলো।

সেদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে ;
মনে হল, সেখানে বাস নেই কারও।
এলেম সদর দরজার সামনে ;
দেখি, তালা বন্ধ।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে।
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।
অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল-পেরোনো গ্রাম
একটি পুরোনো দিঘির ধারে ;
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখেনি ;
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গানে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে —
ছাইরঙের মোটা শাড়ি পরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো,
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।

পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সবজিখেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ
কোনো প্রশ্ন।

চোখের আড়ে
আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে—
'বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা ;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে
বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।

জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম, দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেশে শুধালেম,
'এখানে থাক কোথায়'
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, 'দেখবে ?'
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে,
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্চের পর্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে
একটা তক্তপোষের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের-খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া ;
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তরকোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।

দক্ষিণকোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী,
আর রঙকরা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললেন, 'এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।'

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে ডাকছে কোকিল।
মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্ করছে ঢালু পাড়ির তলায়
দিঘির উত্তরধারের একটুকরো জল,
কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লার আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো —
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,

চোখে যেন দূরে ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।

এমনি সময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় করে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল-নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক-গেলাস ডাবের জল।

মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
'খিদে নেই' বললে মিথ্যে হত না,
'রুচি নেই' বললে সত্য হত,
কিন্তু, খেতেই হল।
তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক—
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।

তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, 'বিষয়কর্ম দেখো'
ছেলে বললেন, 'কী হবে।'
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, ভয় নেই,
নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।
দুদিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললেন, 'কী হবে।'
বাবা রেগে বললেন, 'তবে তুমি আস কেন রোজ।'
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
'অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।'
অমিয়ার শেষ কথা এই —
'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।'
আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললেন, 'জেলখানায়'।

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই ১৯৩৬

৪৯.১৭ সারাংশ — ৫

আলোচ্য কবিতার লক্ষ্য যে নারী সেই 'অমিয়া'কে সম্বোধন করে নায়ক বলেছে, ভারতীয় নারীত্বের মূর্ত প্রতীক (মৈত্রেয়ী) একদিন বলেছিলেন উপকরণ নয়, তিনি 'অমৃত' চান—যা প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। অমিয়া চেয়েছে নায়ক তাকে মিথ্যে থেকে জোর করে ভালোবাসার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিক। কুণ্ঠিত নায়ক বলেছে, ধনে সমান না হয়ে সেখানে নিয়ে যেতে বাধে। তাই অমিয়ার ভালোবাসার বদলে দারিদ্র্যের অসম্মান সে দেবে না এই সঙ্কল্প নিয়ে 'সোনার মদের নেশায়' মত্ত হয়। কিন্তু, খ্যাতি আর আত্মশ্লাঘার সঞ্চয়ের নেশা বাড়তেই থাকে। শেষে ডাক্তার বলে, নায়কের দেহের কল অচল হয়ে এল বলে, তাই বিশ্রাম অবশ্যই চাই। দূর নির্জনে সমুদ্র, নদী, পাহাড় তার অফুরন্ত রূপ-রস-সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেওয়ায় সম্পদের নেশার ঝাঁজ কমে যায়। মনে পড়ে কোনো অনাদি নির্বাসনের গভীর বিশদ। 'ফিরে যেতে হবে' এই কথা মনের মধ্যে হু হু করে উঠে। দেশে ফিরে তার (অমিয়ার) কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে যখন পাওয়া গেল, তখন যে এক অন্য মানুষ। অমৃতের সন্ধান সে পেয়েছে। আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে আসা রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে 'যার বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে/রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা—সেই মহীভূষণ অমিয়াকে নিয়ে এসেছে 'যেখানে ওর কাজ।'

এ কাব্যের নায়ক অমিয়াকে 'অমৃতের' কথা বলে নিজে অকিঞ্চন থেকে 'বিত্ত-খ্যাত-আত্মশ্লাঘা'য় ভালবাসার মূল্য দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। অমিয়া 'লক্ষ্মী খেদানো' 'বাদুড়ের ঠোকার' স্পর্শে তখন অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

শ্যামলীর 'অমৃত' কবিতাটি রচনা, শান্তিনিকেতন, ৩রা জুলাই, ১৯৩৬। বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবীশদের আবাসে অবস্থানকালে এই কাব্যগ্রন্থের সূচনা 'দ্বৈত' ও 'শেষ প্রহরে' (২৩শে মে, ১৯৩৬) শেষ—'শ্যামলী' (৬ই আগস্ট, ১৯৩৫)। আর রানী মহলানবীশকে উৎসর্গ ১লা ভাদ্র, ১৩৪৩, ইং ১৭ই আগস্ট, ১৯৩৬)। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৪৩ এবং ইং ১৯৩৬-এ। এই বছরই বৈশাখ / এপ্রিলে 'পত্রপুট' প্রকাশ।

১৯৩৫-এর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনে 'শ্যামলী' নামে সুদৃশ্য এক মাটির বাড়ি তৈরি এবং তাতে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। কবি এখানে কিছুদিন থাকেন। ইট পাথরে গাথা বাড়ি মাঝে মাঝেই কবিমনে 'বন্ধনে'র প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। এ থেকে সাময়িক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে এ সময় পেয়ে বসেছিল। তাঁর মনে হয়েছে, মাটির ঘরে বন্ধন কম, তা তৈরিও যেমন সহজ আবার সে ভেঙেও যায় সহজে। তিনি মনে করেছেন মাটির ঘরে থাকার মধ্যে একটি উদাসীন নিরাসক্তি বিরাজ করে। এ কাব্যের শেষ কবিতা 'শ্যামলী' এই মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা। আর 'অমৃত' কবিতার 'অমিয়া' বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ প্রান্তরে গড়ে ওঠা একটি প্রেমিকা নারী যার হৃদয়ে লেগেছে প্রকৃতির শ্যামল রঙ, যে উপকরণের দুর্গ থেকে বেড়িয়ে এসে অমৃতের সাধনা করেছে। রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়ের ঠোকা-খাওয়া মহীভূষণ অমিয়াকে সেই অমৃতের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু কবিতার কথক-নায়ক তা পারেননি।

নারী যুগযুগান্ত ধরেই কবি শিল্পীদের প্রেরণাস্থল। তাদের রূপসৃষ্টিতে কল্পনায় ধ্যানে নানাভাবে সে মূর্ত বা বিমূর্তভাবে প্রকাশ পায়। কবি জীবনে ও সাহিত্যে নারী তাই অনেকখানি জুড়ে আছে। শ্যামলীর কয়েকটি

কবিতার রূপে-রসে বৈচিত্র্যে এই নারীস্বরূপ নানা বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'মিলভাঙা', 'কনি' বা 'অমৃত' প্রেমের কবিতা হলেও স্বরূপে স্বতন্ত্র। এ কবিতাগুলি আখ্যানমূলক, অনেকটা কথিকাধর্মী। কবিতাগুলিতে লিরিক মাধুর্য পূর্বাপর আশ্লিষ্ট হয়ে আছে। কথা অংশ যেন মানবজীবনের কতকগুলি ছোটো ছোটো ছবি। সেখানে প্রেম নিয়ে এসেছে নারীহৃদয়ে সবৈশ্বর্যের মধ্যে ত্যাগের মন্ত্র। তাই ধনী কন্যা অমিয়া মহীভূষণের প্রেরণায় অনায়াসে উপকরণের দুর্গ থেকে উদ্ধার পায়। নীরস বৈরাগ্যসাধনা নয়, সমাজের জন্য ত্যাগব্রতে সে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। পক্ষান্তরে কবিতার কথক নায়ক ভালোবাসার অমৃত খুঁজতে গিয়ে বাঁধা পড়েছে বিত্ত, খ্যাতি ও আত্মশ্লাঘা অর্জনের মোহে। এখানেই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি। অমিয়া যেমন পূর্ণতাকে পেল, নায়ক তেমনই সমস্ত (সম্পদ) পেয়েও অমৃতকে হারাল। অমিয়া বস্তুবিশ্বকে স্বীকার করেও, দুঃখসাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্যাগ কর্মের মধ্যে প্রেমকে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছিল। এ পর্বে রবীন্দ্র কবিমানসের দিক থেকে এই উপস্থাপনা সবিশেষ উপযোগী। বস্তুসর্বস্ব রূপাশ্রিত প্রেমমোহের আতিশয্য নয়, তাকে পেরিয়ে কল্যাণব্রতের দিকে চলার মধ্যেই 'চিরসুন্দরের সুরপুর' বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ 'অমৃতে' প্রেমের এই মূলীভূত সৌন্দর্যকে, মনুষ্যত্বসাধনার অন্তর্গত কল্যাণকে স্বীকার করে মেনে নিয়েছেন—মানুষের জীবনে। মৈত্রেয়ী-প্রার্থিত অমৃতের জন্য 'অমৃত'-এর অমিয়ার অমর্ত্যলোকের সন্ধান প্রয়োজন হয়নি, 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডলির' মধ্যেই যে তাঁর ভালোবাসার অমৃতকে খুঁজে পেয়েছিল। প্রেমের এই কবিতাটিতে নায়কের অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা 'মিল-ভাঙা' কবিতা স্মরণে রেখে বলা যায় বোধ করি বার্ধক্যে উপনীত কবি পূর্ব জীবনের কিছু হারিয়ে যাওয়া সুরকে 'শ্যামলী'র কয়েকটি কবিতায় ফিরে ফিরে অনুভব করেছেন, যার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে বিরহের বৈরাগ্যের সুর।

'পুনশ্চ' পর্বের গদ্যছন্দে লেখা কবিতার শেষ কাব 'শ্যামলী'। শ্যামলী 'অমৃত' কবিতায় ভাবসুন্দর কথ্য ভাষার? কলকাতা অঞ্চলের কথা ক্রিয়াপদ—'লুম' 'লেম'-এর প্রয়োগ ও বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণে অস্পষ্ট ছন্দতরঙ্গা বা ছন্দস্পন্দন অনুভব করা যায়। ভাবাবেগের স্পর্শেই কবিতায় গদ্যছন্দের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। কবিতাটি গদ্য ছন্দে লেখা। এখানে আধুনিক কথ্য ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করায় জীবনের বাস্তবের সঙ্গো তার আবেগময় এক উন্নতধ্বনিও মিলিত হয়েছে। ছত্রের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিন। দ্বিতীয় স্তবকের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে ছত্রের কথ্যতানির্ভর এই পর্ব বিন্যাস দেখানো হল।

বিরক্ত হন অমিয়া!
বললে / তুমি কেন / নিয়ে গেলেনা আমাকে / মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন / তোমার।
আমি বললেম, / 'বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না / ধনে হব সমান
আসব না / তোমার কাছে।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নয়া কয়েকটি সরল চিত্রকল্প কবিতার মধ্যে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের অসামান্য তাৎপর্য নিয়ে এসেছে অমৃতে।

যেমন,

ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।

ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়েছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।

অথবা—

বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে বলে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে !

শ্যামলী পর্বের কবিতাগুলির বক্তব্য প্রধান। প্রকাশভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সহজ, গদ্যছন্দ স্বাভাবিকভাবেই বক্তব্যকে অনুসরণ করেছে। শেষ পর্বে কবির জনমানসের কাছ পৌঁছোবার আগ্রহ থাকলেও 'মাঝে মাঝে ও পাড়ার প্রাঙ্গাণের ধারে' গেলেও 'ভিতরে প্রবেশ' করতে পারেননি—অন্তরায় তাঁর শীলিত কাব্য ভাষা। যা মুখ্যত বিদগ্ধজনের ভাষা। এ কবিতায় ভাষা 'মাটির কাছাকাছি' ভাষা নয়। এ ভাষা পরিশীলিত কাব্যপাঠকের জন্য।

'ভারতের একজন নারী......তিনি চান অমৃত'— কবি 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এর অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর একটি বাণী — 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' (২/৪/৩) দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তৃতীয় শ্লোক) — 'যা আমাকে অমৃতত্ব দেবে না, তা নিয়ে আমি কী করব।' মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাকে শুধু ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের আকুতি বলা যায় না, যে কোনো বাহ্য উপকরণকে সরিয়ে সাধনার দ্বারা অন্তরাত্মার অমরত্বকে অমৃত মনে করেছেন।

'ভালোবাসাই সেই অমৃত ...... বুঝবে একদিন' — শ্যামলীর 'অমৃত' কবিতার নায়িকা ধনীর কন্যা অমিয়াকে লক্ষ্য করে নায়ক বলেছ যে, মৈত্রেয়ী প্রার্থিত সেই অমৃতের জন্য অমর্ত্যলোকের সন্ধান প্রয়োজন নেই, মর্তের ভালোবাসার মধ্যেই তাকে পাওয়া যায়। এভাবে কবি উপনিষদের বাণীকে যথার্থতায় অনুসরণ না করে স্বতন্ত্র প্রেক্ষায় নিজের মতো করে তার অর্থকে সম্প্রসারিত করেছেন।

'দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান' — অমৃত কবিতার নায়ক মৈত্রেয়ীর বাণীর সূত্র ধরে নায়িকা অমিয়াকে প্রকৃত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অমৃতকে পাওয়া যায় এ কথা স্মরণ করিয়েও, নিজে ধনীকন্যা অমিয়ার যোগ্য হয়ে উঠবার জন্য সম্পদের সন্ধানে বেড়িয়েছে নিজের পৌরুষের পরিচয় দিতে। নায়কের এই অভিমান তার চরিত্রের একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু কোনোকিছুরই অতিরিক্ততা ভালো নয়। তাই শেষপর্যন্ত দীর্ঘদিনের ঐশ্বর্যসন্ধান তাঁর কাছে যেন ফাঁকি মনে হয়। নায়কের অহং শেষপর্যন্ত বিত্ত, খ্যাতি বাড়ালেও মনের শূন্যতা পূরণ করতে পারল না। ফলে প্রাণ ব্যাকুল 'জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্য।' মনের মধ্যে হু হু করে উঠেছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। অনেক সন্ধানের পর হারিয়ে যাওয়া অমিয়ার যখন সন্ধান মিলল, সে এক অন্য নারী, রাশিয়ার লক্ষ্মী খেদানো বাদুড়ের ঠোকর খাওয়া মহীভূষণের প্রেরণায় সর্বস্ব ত্যাগ করে সে তারই কাছে কল্যাণ ব্রতের দীক্ষা নিয়েছে। ভালোবাসার অমৃত তাকে নিয়ে গেছে বঞ্চিত মানুষের কাছে, তাদের মঙ্গালকর্মে।

'রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়' — ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হলে, রাশিয়ার জার শাসিত রাষ্ট্র, ব্যবস্থার অবসান হয় খেটে খাওয়া শ্রমিক-কৃষক মজুরের প্রোলেতারিয়েতদের সংগঠন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রশাসন কায়েম হলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তথা ধনিক শ্রেণি একে

সুনজরে 'দেখেনি'। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরূপ প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তাই বাইরের পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার সমর্থকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বর্তমান মন্তব্য সেই মনোভাবের দ্যোতক। অমিয়ার বাবার আশা এ সব সাময়িক। কিন্তু দুদিনে অমিয়া হল তার শিষ্যা। পিতৃগৃহের নিরর্থক উপকরণের দুর্গ থেকে মহীভূষণ তাকে উদ্ধার করল।

অনুশীলনী — ৫

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে ৪৯.২২-এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা একাধিকবার পড়ুন। সেখান থেকেই স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে

....

থামতে পারিনে, ... ।

....

বুক ফুলিয়ে এগিয়ে .... ।

খ) কর্মের নেশায় ....

এত কালের খাটুনি ....,

প্রাণ উঠল ....

জীবনের .... ।

২) "তিনি চান অমৃত।" লিখুন ছত্রটির মূল উৎস ও সূত্র কী এবং কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

৩) 'দেখলুম অমিয়া'কে—অমিয়াকে কে কেমন দেখলেন, বর্ণনা করুন।

৪) অমিয়ার অন্য নারীরূপটির পরিচয় দিন।

৫) 'অমৃত' কবিতার ট্র্যাজিক চরিত্র কোন্‌টি ও কেন বুঝিয়ে লিখুন।

৬) 'ভারতের একজন নারী বলেছিলেন' — নারীটি কে? কী বলেছেন? কোথায় বলেছেন? সংক্ষেপে লিখুন।

৭) 'দেবনা তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান'— বক্তা কে? কাকে বলেছেন? কোথায় বলেছেন? সংক্ষেপে পরিণতি কী হয়েছে? আলোচনা করুন।

৮) 'এতকালের খাটুনি মনে হল যেন' — কার মনে হল? কী মনে হল? কেন মনে হল? ব্যাখ্যা করুন।

৯)　নীচের উদ্ধৃতিটির ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন।

'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।
আমি শুধালেম 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললে, 'জেলখানায়',

৪৯.১৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১) ক) চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা। / তরুশ্রেণী মসী-মাখা / গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।

খ) যারে খুশি তারে দাও — / শুধু তুমি নিয়ে যাও

গ) মননশীল, জীবনদ্রষ্টা, নতুন করে, যৌবনোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির আদর্শ নিষ্ঠ।

ঘ) শেষ সপ্তক, শ্যামলী।

২) ক) ১৯১৬, খ) ১৯৩৬, গ) ১৯৪০, ঘ) শেষ লেখা

৩) কবিতা রচনা, ফাল্গুন ১২৯৮, কাব্যপ্রকাশ ১৮৯৪ (১৩০০)।

৪) কাব্যগ্রন্থ — পুনশ্চ, রচনাকাল — ১৯৩২।

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজনে ৪৯,৩ নম্বর অংশটি এবং ৬-৯ নম্বর প্রশ্নের জন্য ৪৯.৬ সংখ্যক অংশটি বারবার পড়ুন।

অনুশীলনী — ২

১) ক) কুটিল ফণা চক্রের ; গুপ্ত বিষদন্ত, তীব্র বিষে।

খ) স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; প্রলয়মন্থন ক্ষোভে ; ভদ্রবেশী বর্বরতা ; পঙ্কশয্যা হতে।

গ) ব্রাহ্ম সমাজের, আচার্যের, পৃথিবীর মানুষ, আশ্রয়।

ঘ) জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ, বক্সার যুদ্ধের।

২) ক) কাব্যের নাম, খ) ১৩০৭ সাল।

৩) তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি হল ঃ-

ক) ব্রাহ্মধর্ম ও নীতিবোধ, খ) সমাজ, ইতিহাস ও দেশপ্রেম

গ) মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনের কবিতা।

৪ থেকে ৮নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৪৯.১০ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। এখানেই উত্তরগুলি আছে।

অনুশীলনী — ৩

১) ক) আরতি দীপ, সন্ধ্যা, রক্তজবার, রজনীগন্ধা

খ) আরাম চেয়ে, লজ্জা, অঙ্গা, ছেয়ে, রণসজ্জা।

গ) পূজা, বন্দনা, শঙ্খে-বিধাতার উদাসীন, সাড়া।

ঘ) চিরপথিক, গতিহীন, অধ্যাত্ম রসবোধ।

২) দুর্দিন, পতাকা, পূজার উপচার, মুখোমুখি হওয়া, জয়সূচক বাদ্য। ৩ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্য নিন।

অনুশীলনী — ৪

১) ক) সংগ্রহ করেছিলেন দুর্গমের রহস্য, জল-স্থল-আকাশের, দৃষ্টি-অতীত, তোমার, চেতনাহীন।

খ) সকালে, সন্ধ্যায়, দেবতার, নামে ;

খেলছিল, মায়ের, সুন্দরের, আরাধনা।

২ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ভালো করে পড়ুন।

অনুশীলনী — ৫

১) ক) 'ততই আমাকে চলে ঠেলে।' ; 'থামাতে পারিনে তার তাড়না।' ; 'বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে' ; 'চলে আত্মশ্লাঘা'।

খ) 'ঝাঁজ এল ঘরে।' ; 'মনে হল যেন ফাঁকি' ; 'দুহাত বাড়িয়ে' ; সাঁচা সোনার জন্যে।'

২) মূল উৎস, রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অমৃত কবিতা, এর সূত্র হোল বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের তৃতীয় শ্লোক — ২/৪/৩।

মৈত্রেয়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩ থেকে ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশ ভালো করে পড়ুন।

৯) ছন্দোলিপি ঃ

এসেছি তাঁর কাজে /
উপকরণের দুর্গ থেকে / তিনি করেছেন / আমাকে উদ্ধার।
আমি শুধালেম / 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললেন, / 'জেলখানায়'।

এটি গদ্য কবিতার ছন্দ বা গদ্য ছন্দে লেখা। তাই প্রচলিত ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের নিয়মে এ কবিতাংশের ছন্দ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। প্রথম ছত্রের একটি মাত্র বাক্‌পর্ব থাকলেও দ্বিতীয়ে তিনটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থে দুটি বাক্‌পর্ব আছে। ওইগুলি অর্থ বা ভাবকে অনুসরণ করে গঠিত হয়েছে। কবিতাংশটি পরস্পর অসমান আটটি বাক্‌পর্বে রচিত। এর ছত্রে ছত্রে বহমান একটি অন্তঃসলিলা ছন্দস্পন্দন আছে।

৪৯.২০ গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — সোনার তরী, নৈবেদ্য, বলাকা, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (১-৪ খণ্ড)।

ড. সুকুমার সেন — বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ)।

ড. নীহাররঞ্জন রায় — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।

ড. খনা মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়।

ড. বাসন্তী চক্রবর্তী — রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য।

ড. পম্পা মজুমদার — রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস।

ড. পবিত্র সরকার — ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ।

একক ৫০ ❒ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ তিনটি কবিতা

গঠন

৫০.১ উদ্দেশ্য
৫০.২ প্রস্তাবনা
৫০.৩ নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা
৫০.৪ মূলপাঠ—১ নারী (সর্বহারা)
৫০.৫ সারাংশ—১
৫০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৫০.৭ মূলপাঠ—২ ঃ দারিদ্র্য (সিন্ধু হিল্লোল)
৫০.৮ সারাংশ—২
৫০.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৫০.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ গানের আঁড়াল (চক্রবাক)
৫০.১১ সারাংশ—৩
৫০.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৫০.১৩ উত্তরমালা
৫০.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৫০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র অনুরক্ত অথচ স্বাতন্ত্র্য সন্ধানী কবিদের অন্যতম কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নজরুলের সমকাল ও তাঁর কবিমানস সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। নজরুলের কাব্যজীবনের শুরু হয় ১৯১৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪২-এ। যদিও তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাব্য বা কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা যায় প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর কাব্যচর্চার আরম্ভ আর তার শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। এই এককটি পড়ে এই দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে যে সমস্যা ও শংকা দেখা দিয়েছিল, নজরুলের কবিতা তারই পরিণত ফল—এটি বুঝতে পারবেন।

এইসব ধারণা, বোঝা ও পড়া থেকে যে জ্ঞান আহরণ করবেন, সেটি থেকে প্রয়োজনে পরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারবেন।

- নজরুলের কাল ও কবিমানস সম্পর্কে ধারণা।
- নজরুলের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার সঙ্গো পরিচয়।
- নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন।

৫০.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আধুনিকতা ঃ ২০ শতক পর্যায়ে এ সময়ের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় তার যুগ লক্ষণ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কাব্য রচনা করলেও (তাঁর নিজস্ব কাব্য ধর্ম সূত্রে) তিনি রবীন্দ্র-উত্তর কবি হিসেবে চিহ্নিত।

উনিশ শতকে ঘটে গেছে বাংলার নবজাগরণ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশি, অসহযোগ, সত্যাগ্রহের মতো নানা ঘটনা। দেশের জনমানসে স্বাধীনতার স্পৃহা। ইংরেজি শিক্ষার আনুষাঙ্গিক ফল একদিকে যেমন বিশ্বকে চিনতে শিখিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক পণ্য-উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত সীমাহীন শোষণের ফলে প্রতিবাদী কণ্ঠ ভিন্নতর পথে সংগঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার গুণে, মেকলের নির্দিষ্ট পথ অর্থাৎ চাকুরি ছাড়া আর কোনো কাজকেই কাজ মনে করছে না। ফলে বেকারি জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ বাড়ছে। এমনই সময় এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। এর ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভারসাম্য আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধান্তে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশ ঘটেছিল, সেই নৃশংস হত্যালীলায় উদ্ধত শাসকশক্তির হটকারী আচরণে, দেশ জোড়া মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের আচরণে হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় থাকেই শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় বিক্ষোভ উদ্দাম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত যুবকের জীবনের সমস্যা যত বেড়েছে, ততই দৃঢ় হয়েছে শাসক ইংরেজের প্রতি অভিশ্বাস। শতগুণে বেড়েছে তার পরাধীনতার গ্লানি। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা তার জীবন আরও জটিল ও আবর্ত সংকুল করেছে। ফলত তরুণ মনে যেমন অবিশ্বাস, হতাশা জাগে, তেমনই সমস্ত প্রচলিত ও প্রথাগত ধারণা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সবই সমকালীন কবিদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক কবিতার ভূমিকায় এই যুগ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করেছেন —"একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের।" আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানের নতুনতর আলোকদীপ্তি। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। এতদিন রাজা- বাদশা, জমিদার, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে সাহিত্য বৃত্তের চলন ছিল, তারই মধ্যে বিপ্লবের নতুন আলো নতুন জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করল। আবহমান কাল থেকে সাহিত্যে গ্রামবাংলার কৃষক-শ্রমিক ক্বচিৎ স্থান পেলেও প্রাণমন জুড়ে কোনো সময়েই সে প্রাধান্য বিস্তার করেনি —তাঁরা তাঁদের বৃহৎ জীবন স্পন্দন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত ও স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিল। এরই ফলে ঘটল হয়তো বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন, 'বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।'

বাংলাকাব্যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্যচেতনার সূচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮০-১৯৫২)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে বেশ শক্তিশালী, বৈচিত্র্যের সাধনায় নানা দিক থেকে অনন্য। তিনি রবীন্দ্রপ্রীতির জন্য খ্যাত হলেও, বিবিধ বিষয় ও ছন্দ নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা ও তাতে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'চরকার গান', 'পালকির গান', 'ঝরনার গান' ইত্যাদি বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমনি ছন্দ ও রূপবন্ধেও অভিনব। ফলে তাঁর কল্পনা ও প্রকাশ—দুইই বিচিত্রসঞ্চারী। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসে যে একটি রোমান্টিক

সৌন্দর্যলিপ্সা ছিল, তা তাঁর কবিতার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছত্রসজ্জায় ধরা পড়ে, কিন্তু সেটি অনেক সময়ই চাপা পড়েছে তার চেষ্টাকৃত তথ্য ও জ্ঞানবৈভব প্রদর্শন ও ছন্দোসৌকর্যের সচেতন চর্চায়। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাময়িক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কবিতা রচনা ছাড়াও বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রচুর দেশি-বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এসব রচনার মধ্যে অন্যতর স্বাদ পাওয়া গেলেও, গুণগত মান সর্বত্র উল্লেখযোগ্য নয়। অনুবাদ ভাবানুবাদ অনেকক্ষেত্রেই মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়নি। দেশপ্রীতিমূলক কবিতায় উচ্ছ্বাস থাকলেও, ভাব-গভীরতা ছিল না। অতীত গৌরবের প্রশস্তি থাকলেও, দেশের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা ছিল না। রচনাগুলি তাই ক্ষেত্রবিশেষে কবির কলমে লেখা না হয়ে অগভীর সাংবাদিক সুলভ পদ্যরচনায় পরিণতি পেয়েছে। বস্তুত "কবিতা যখন প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সেখানেই সত্যেন্দ্রনাথের চির নির্বাসন।" কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮—অনুবাদ), 'তীর্থরেণু' (১৯১০—অনুবাদ), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ বৃত্তিতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। জেলা বোর্ডে কর্মসূত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। গ্রামের শস্য শ্যামলতার মধ্যেও অগণিত মানুষের নীরন্ধ্র দারিদ্র্য, হতচ্ছড়া কৃশ মূর্তি তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে তিনি এই বাস্তবের সন্ধান পাননি। এ সময় তরুণ কবিরা যখন আত্মবদ্ধ কল্পনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নির্গমের পথ খুঁজছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথের দেশ ও জগৎ, তাঁর কবিতার খেদ-পরিতাপ ও নৈরাশ্য তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুজগৎ, তাঁর রোমান্টিক অনুভূতিকে আড়াল করে বস্তুতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁর মরুকাব্যত্রয়ী—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) এবং 'মরুমায়া' (১৯৩০) বাংলার শ্যামল আবহাওয়ার ঊষর, রুক্ষ নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে। তিনি ব্যঙ্গে, তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কাব্যের প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নিপুণ যুক্তি শৃঙ্খলায় আক্রমণ করেছেন। সমস্ত মোহজাল, এমন কী মঙ্গলময় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ প্রত্যয়কেও তিনি বর্জন করেছেন, বলেছেন ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ বা সুবিচারক নন, তিনি মঙ্গলময়ও নন ; বরং এক ছদ্মবেশী নিষ্ঠুর সত্তা যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের সুখদুঃখে শুধু উদাসীন থাকেন না, তাদের দুঃখের ভার বৃদ্ধিতেই যেন বেশি সচেষ্ট থাকেন।

তাঁর কবিতার কলাকর্মেও এই নেতিবাদ শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দপ্রকরণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কবির 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'-য় বিপরীতে সুর বেজেছে। এর আভাস অবশ্য প্রথম পর্বে তাঁর মনের গভীরে মানুষ সম্পর্কে যে প্রত্যয় ছিল তা থেকেই, অর্থাৎ মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বেদনা থেকেই এসেছে মনে হয়। তাই শেষ পর্বের কবিতায় সন্ধ্যার রক্তিম দিগন্তে প্রতিবাদ নয়, অনুতাপম্লান বিশ্বাসে করুণার যে সুর বেজেছে তা কবির রবীন্দ্রঅনুরক্তির আভাস নির্মাণ করে। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও স্বতন্ত্র কবিপ্রতিভায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

প্রথম জীবনে মোহিতলালও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, তাঁর 'স্বপনবসারী' সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য ভোগকামনায়, দেহবাদে। প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মতোই ধ্যানী, উদাসীন। মোহিতলালের কবিতায় যেখানে উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন কামনা ও সম্ভোগ পিপাসা মুখ্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথে দেহোত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। মোহিতলালের কবিতার কাব্যনির্মিতি অনেকটা মধুসূদনের, শৈলীর স্মারক, ক্ল্যাসিক্যাল বা ঐতিহ্যপন্থী। সেখানে কোথাও শিথিলতার অবকাশ নেই। ছত্র, স্তবকবিন্যাসে একটি সদাসচেতন কবিমনের পরিচয় আছে।

মোহিতলালের মনোভঙ্গিতে লঘুতার কোনো স্থান নেই। তিনি সততই গুরুগম্ভীর মনন-কল্পনার বর্মে ক্লাসিক্যাল সংযম, বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে 'সনেট' রচনায় মোহিতলাল বিশেষ সফল। সনেটেরে পদবিন্যাসে তিনি দক্ষ শিল্পী। কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী (১৯৫১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬) আবির্ভাব। কবি খ্যাতিতে এ সময়ের কবিকুলে নজরুল সর্বাতিক্রমী। তিনি অনেকটা স্বভাবকবি ছিলেন। প্রাণের একান্ত আবেগের তাড়নায়, নিজেকে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সেই স্বতঃস্ফূর্ত সূত্রেই তাঁর কবিতা ও গান রচিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তা নতুন বক্তব্য, ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য কবিতা ত্রয়ীতে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

৫০.৩ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ; ২৪শে মে ১৮৯৯ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। শৈশবেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা দেন। সংসারের চাপে সেখানে একবছর শিক্ষকতার সঙ্গো মোল্লাগিরিও করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে শিয়ারসোল হাই স্কুল ও পরে মাথরুন স্কুলে ভর্তি হন, পরের বছর পড়াশুনা ছেড়ে লেটো ও কবি দলে যোগ দেন। দারিদ্র্যের চাপে ১৯১৬তে প্রথমে বাবুর্চির ও পরে রুটির দোকানে কাজ নেন। মাঝের এক বছর ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়ে, বাৎসরিক পরীক্ষার পর ১৯১৫ শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। এক্ষণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)-এর সঙ্গো বন্ধুত্ব হয় এবং বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে তাঁর প্রাণে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চার হয়। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌসেরাতে প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে যান।

কৈশোরে কিছু গান বা রচনা থাকলেও, নজরুলের যথার্থ সাহিত্য রচনার সূচনা করাচির সেনানিবাসে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে লেখা প্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' (সত্তগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫), প্রথম কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬) এবং প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত, কার্তিক ১৩২৬)-এ প্রকাশিত হয়। মার্চ ১৯২০ বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ায় কর্মহীন নজরুল কলকাতায় ফিরে শৈলজানন্দের মেসে আশ্রয় নিলে, সেখানে তাঁর ধর্মমত অন্তরায় হওয়ায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে মুজফর আহমেদের সঙ্গো বাস করতে শুরু করেন। এপ্রিলে একবার চুরুলিয়া যান। এ সময় কবির কিছু রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়, কিন্তু খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গো সঙ্গো।

ইতোমধ্যে জীবিকার তাগিদে অস্থিরচিত্ত নজরুলকে কয়েকটি কাগজে কাজ করতে দেখা যায়। ১২ জুলাই, ১৯২০ দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ৬০ টাকা বেতনে কাজ নেন, ওই বছরই ডিসেম্বরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সঙ্গো ১০০ টাকার বিনিময়ে লিখতে চুক্তিবন্ধ হন। ১৯২১ ফেব্রুয়ারিতে আবার 'নবযুগে' যোগ দিলেও মার্চ-এ ইস্তফা দেন। ১৯২২ জুন এ 'দৈনিক সেবক' কাগজে ১০০্ টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রচিত সম্পাদকীয় লেখা নিয়ে মতবিরোধ হলে সে কাজ ছেড়ে দেন। ১১ই আগস্ট নিজেই সপ্তাহে দুবার প্রকাশে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ধূমকেতু' কবিতা নিয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানেই পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে'

কবিতা ও অক্টোবরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ‘ধূমকেতুর পথ’ সম্পাদকীয় লেখেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে নভেম্বরে নজরুলের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, আর ২৩শে নভেম্বর তিনি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট হয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। এ সময় স্নেহভাজন নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটকটি উৎসর্গ করেন। হুগলি জেলে, জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ৩৯ দিন অনশন করার পরে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়। সেখান থেকে এক বছর তিন সপ্তাহ পরে মুক্তি পান। ১৯২৪, ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গো বিবাহ। ওই বছর অক্টোবরে ‘বিষের বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ এবং নভেম্বরে ‘ভাঙার গান’ বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২৫ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গো কবির ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ ঘটে। নভেম্বরে ‘শ্রমিক কৃষক প্রজা পার্টির ইস্তাহার এবং ডিসেম্বরে তাঁর লাঙল’ পত্রিকায় ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন। ১৯২৬ এ নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনে ‘শ্রমিকের গান’, ছাত্র-যুবা সম্মেলনে ‘ছাত্রদলের গান’ রচনা করেন ও গেয়ে শোনান। ১৯২৭-এ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম ও ১৯২৮-এ দ্বিতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় সম্লেন উপলক্ষে ‘চল চল চল’ গানটি রচিত হয়। ১৯২৯-এ জাতির পক্ষে কবিকে সংবর্ধিত করা হ। ১৯৩০-এ কাব্যগ্রন্থ ‘প্রলয় শিখা’, ‘চন্দ্রবিন্দু’ যথাক্রমে বাজেয়াপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। এই বছরই ২৫শে নভেম্বর কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে ৬ই নভেম্বর গ্রেপ্তার ও ১১ ডিসেম্বর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯২২, ১০ই নভেম্বর ‘ধূমকেতু’ ১ম বর্ষের ২১শে সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে, কবি ‘নওরোজ’ (১৯২৭) পত্রিকায় স্বল্পকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এ ফজলুল হক তাঁর দলের মুখপাত্ররূপে নবপর্যায়ের ‘দৈনিক নবযুগ’ প্রকাশ করলে নজরুল প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৪১ কলকাতায় সমারোহসহকারে নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ‘রবিহারা’ কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৯৪২, ১০ই জুলাই নজরুল আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিপত্নী প্রমীলা ১৯৪০ সালেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রথমে লুম্বিনী পার্ক ও রাঁচিতে চিকিৎসার পরে ‘নজরুল নিরাময় সমিতি’ এবং পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে ছয় মাস লন্ডনে, পরে ভিয়েনায় চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই তাঁর চেতনা ও সৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নজরুল ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ; বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার ‘২১শে পদক’ ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত হন। ২৭শে আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে ২৯শে কবির জীবনাবসান হয়।

কাব্যকথা ঃ নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ ১৩২৯ সালের কার্তিক (অক্টোবর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়। বইটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে বিদ্রোহী, আগমনী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা আছে। অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী বীরেশ্বর জৈন। ‘দোলন চাঁপা (আশ্বিন ১৩৩০, ইং ১৯২৩) কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ‘ধূমকেতু’ প্রকাশের দায়ে করাদণ্ডে দণ্ডিত কবি যখন জেলে, সেইসময় কবিতাগুলি লেখা। জেলের ওয়ার্ডারদের সাহায্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাইরে এনে সেগুলি কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।’ এ কাব্যের মুখ্য আবেগ প্রমীলা বা দোলন দেবীর সঙ্গো কবির সম্পর্ক। ‘বিষের বাঁশী’ (আগস্ট, ১৯২৪) বইটির সূচনায় জানিয়েছেন ‘অগ্নিবীণা’র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে যেটি প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল সেটি ‘বিষের বাঁশী’ নামে প্রকাশিত হল। এই

সব স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নজরুল 'ছায়ানট' (১৯২৫), দেশবন্ধুর মৃত্যুশোকে উদ্বেল কবির চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী বর্ণনা করে 'চিত্তনামা' (আগস্ট, ১৯২৫) রচনা ও প্রকাশের পর কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য 'সর্বহারা' (১৯২৬), যার অন্যতম কবিতা নারী এবং 'ফণিমনসা' (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সঞ্চিতা (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার আদর্শে সে সময়ে প্রকাশিত সকল কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংকলন—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি নজরুলের কিছু গল্পগ্রন্থ—ব্যাথার দান (১৯২২), শিউলিমালা (১৯২৮), এবং উপন্যাস 'বাঁধনহারা' (১৯২০), কুহেলিকা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) প্রভৃতির সঙ্গো সঙ্গীত সংকলন 'চোখের চাতক' (১৯২৯) প্রতিভা সোম (বসু)-কে উৎসর্গীকৃত, চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), গুলবাগিচা (১৯৩৩), গানের মালা (১৯৩৪), গীতিশতদল (১৯৩৪) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কবির কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ছোটদের উপযোগী নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনই ওমর খৈয়াম ও হাফিজের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এসমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা যেমন প্রাণের টানে লেখা, আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা কর্ম বা অর্থে প্রয়োজনে কলম ধরা রচনাও আছে।

৫০.৪ মূলপাঠ—১ ঃ নারী (সর্বহারা)

নারী

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা, করে নারী হেয়-জ্ঞান ?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে !
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান !
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,

পুরুষ এসেছে মরুতৃষ্ণা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল ;
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে !
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?
কোনো কালে একা হয় নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিয়াছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিল রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধনে না ক' অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিক্ষা'র শিশু-পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে কলি সে অবরোধ।

তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি' কুঠার !
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর !
সে যুগ হ'য়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক' নারীরা আছিল দাসী !
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !

যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্ত্যের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো কোন সে অত্যাচারী ?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা !
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না ; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোম্‌টা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল !
যে ঘোম্‌টা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ !
দুর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ !
ধরার দুলালী মেয়ে !
ফিরনা ত আর গিরিদরীবনে শাখী-সনে গান গেয়ে !
কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উ'ড়ে,
ধরিয়া তোমায় পূরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি।
মরণের পুরে ; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি' !
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি !
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে

লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে !
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সে-দিন সুদূর নয়—
যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !

৫০.৫ সারাংশ—১

সাম্যের গান গাওয়া কবির কাছে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ অকল্যাণ সবেতেই নারী পুরুষের ভূমিকা আছে। খ্রিস্টিয় আদি পাপের পিছনে যে শয়তানের (Satan) কথা ভাবা হয় সেই অমঙ্গালের শক্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। তাই নারীকে এজন্য হেয় করা ঠিক নয়। বরং পৃথিবীর যা কিছু ভালো সেই সব সৃষ্টি—যা মঙ্গালময়—সম্পদ, জ্ঞান, গুণ সৌন্দর্য সমস্তেই নারীর অবদান আছে। দিনের শেষে তপ্ত দেহ মন নিয়ে পুরুষ ঘরে ফিরে নারীর কল্যাণস্পর্শে স্বস্তি শান্তি পেয়েছে। নারী বাইরে কর্মৈষণা জোগায়, ঘরে সে-ই কল্যাণী। দুয়ের শক্তিতেই সৃষ্টি রয়েছে সচল।

অলঙ্কার সে তো নারীদেহ স্পর্শেই সুন্দর। নারীর মিলন-বিরহে কাব্যসৃষ্টি। ক্ষুধা-সুধার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিজয় অভিযান, মানুষের সমস্ত কীর্তির পিছনে নারীর অবদান সীমাহীন।

নারীর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই পৃথিবীতে অমর মনীষীরা মহান সব প্রয়াস করেছেন। নারীর কোমল হৃদয়ের স্পর্শেই শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে স্নেহ প্রেম-প্রীতি দয়ামায়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

নারীর প্রেরণায়, শক্তিতে এতদিন যাঁরা আশ্রয় পেয়েছে, তারাই আজ নারীর মর্যাদাকে স্বীকার করছে না, এ বড়ো বিস্ময়। আজ সাম্যবাদের যুগ—নারী পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার বা তাকে বন্দী করতে চাইলে, তাকেই এক সময়, তারই সৃষ্ট কারাগারে বন্দী হতে হবে। কেননা এটাই যুগধর্ম—পীড়ন করলে নিজেকেই পীড়িত হতে হবে। সেই সঙ্গো নারীকেও আর স্বর্ণ-রৌপ্যের অন্ধকারে বন্দিনী থাকা চলবে না ; হাতের রুবি, পায়ের মল-শিকল, মাথার ঘোমটা ফেলে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা একসময় পদানত করে রেখেছিল, তাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, প্রয়োজনে পরাভূত করে, নারীকে বিশ্বজয় করতে হবে। আর তা হলেই অনাগত ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গো নারীর জয় ঘোষিত হবে।

৫০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'নারী' কবিতাটি কবির 'সাম্যবাদী' কবিতা গুচ্ছের অন্যতম। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। পরে 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে 'সাম্যবাদী'র অন্যান্য কবিতার সঙ্গো 'নারী'-ও সংকলিত হয়। কবিতাটিকে প্রকাশকালের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

'নারী' কবিতাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনার শুরুতেই, ভারতীয় জনজীবনে সাধারণভাবে নারীর কি স্থান ছিল এবং শতাব্দীর সূচনাকালের পরিস্থিতিটিও জানা দরকার। তাহলেই ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমিতে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নারী কবিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

এমন একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই নারীর স্থান উঁচুতে ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম অধিকারের পর নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটে। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১] তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক সমাজ যখন ক্রমশ গোষ্ঠীযুদ্ধ, যূথবন্ধ সমাজ ভেঙে পরিবার আশ্রিত বা কুলবন্ধ সমাজে পরিণত হচ্ছে, তখন থেকেই পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাধান্যের কারণেই পুরুষের একাধিক পত্নী-উপপত্নী বা গণিকা সম্ভোগ ; পত্নীর সামান্য ত্রুটিও কুলে বা সমাজে ক্ষমা পেত না। তখন লক্ষ্য এক পুত্র সন্তান বৃদ্ধির দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি। পুরাণের কালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২] ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসময় বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়। তাদের স্বার্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য পরিবারের বৈধ সন্তানের জন্য সঞ্চয় রেখে যাওয়া। এজন্য পুরুষ স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। মহাভারতে এর চরম উদাহরণ দেখা যায়—যে নারী স্বামী ব্যতীত কোন পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট (নামের বস্তু) চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ ও দর্শন করেনা সে-ই ধর্মচারিণী। (১২/১৪৬/৮৮)। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের অনুপাতের সঙ্গে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। এজন্য মধ্যযুগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মধ্যযুগে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্নতর ঐতিহাসিক পটভূমিতে এরই কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে মাত্র।

বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত না করে, তাঁর উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যাক—"বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাঁদের উত্তর পুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে কথা ; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল।" শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।" "এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্য অতীতের যে বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়।"

১৯২০র জানুয়ারিতে নজরুল করাচির সেনানিবাস থেকে এসে কলকাতার বন্ধু শৈলজানন্দ ও মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান। ঐ বছরই মার্চে বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে কর্মহীন কবি প্রথমে শৈলজানন্দ পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের আশ্রয়ে বাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই সোভিয়েত বিপ্লব ঘটেছে (১৯১৭), ১৯১৯-এ প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হয়েছে। দেশে দেশে 'সাম্যবাদে' আস্থাবান যুবসমাজ একটি সংগঠনের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে উদ্যেগী হয়েছেন। 'নবযুগ' (জুলাই ১৯২০) পত্রিকা পর্বে নজরুলের বিদ্রোহী[৪] ভূমিকার পর, 'ধূমকেতু' (আগস্ট ১৯২২) পর্বে বিপ্লবী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এরপর 'লাঙল'-এ কবিকে সাম্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে দেখা যাচ্ছে।

---

১ ও ২ বৈদিক সমাজে নারীর স্থান। নারীর স্থান—রামায়ণে ও মহাভারতে। দ্রষ্টব্য ঃ প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর নেতৃত্বে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ হয়েছে।

৪ বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯২২।

নজরুলের কাছে সাম্যবাদ / সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুত দেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি পথ মাত্র। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর কোনো তাত্ত্বিক শিক্ষা ছিল না। মুজফ্‌ফরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁর আবেগপ্রবণ মনোধর্মে মানবপ্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, নিজের জীবনের দুঃখযন্ত্রণার যে পীড়ন ছিল, তাই, তাঁকে এই মতবাদের মৌনতত্ত্ব নয়, বাহ্য উদ্দীপনা তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে বিশের দশক থেকে প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব পর্যন্ত এটি ছিল এক সংশায়াতীত সংগ্রামী চেতনা।

কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফরের সঙ্গে কিছু কাল সমবাসী হলেও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও রোমান্টিক কবির মনে মানব হিতৈষণা যতটা জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সাম্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা ততটা নয়। তাই নবযুগ বা ধূমকেতুতে জাতীয়তাবাদ 'মোসলেম ভারতে' ধর্মভাব যতটা সক্রিয় ছিল, মার্ক্সীয় ত্ত্ব ততটা প্রবল ছিল না। 'লাঙলে'র প্রধান পরিচালক, নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ সেটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হল।

একসময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮'শ শতকের ইংরেজ 'বার্নস'-এর প্রভাবে 'সাম্যসাম' কবিতায় রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, আর মুজফ্‌ফরের প্রভাবে এর প্রায় দু দশক পরে নজরুল সর্বহারার মুক্তির জন্য সাম্যবাদী চেতনামূলক একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেন। এতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা থাকলেও, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই গুচ্ছের 'সাম্যবাদী' কবিতা—অর্থনৈতিক বা শ্রেণিচেতনার কবিতা নয়—মরমি সাধনার কবিতা, 'মানুষ', মানুষের চেয়ে বড়ো বা মহীয়ান কিছু নেই। কিন্তু এখানে স্রষ্টাকে অস্বীকার কার হয়নি। পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাত ঘোষণা করা হয়েছে। 'চোর-ডাকাত' কবিতায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণের এবং মানবসব্যতার এক দেউলিয়া রূপ তুলে ধরা হয়েছে—দেখান হয়েছে ছোটোদের সব চুরি করেই বড়োরা বড়ো হয়েছে ; 'নারী' কবিতায় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির নারী জাতিকে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—এজন্য তিনি অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছেন। এদিক থেকে কবিতাটিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী কবিতা বলা যায় বটে, সেই সঙ্গে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে কবির দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—কারণ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। আবার নরাী পুরুষের জীবনে উভয়ের স্নেহ ও প্রেম এক পরম সম্পদ—সঞ্জীবনী সুধা। উভয়ের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হৃদয়হীন পুরুষের কাছে নারী পায় অমর্যাদা ও আঘাত। পুরুষের এঅই অনুদার মনোভাবের কঠোর সমালোচনা আছে এ কবিতায়। নারী কবিতায় কবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নজরুলের নারী-সম্পর্কিত সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে—

'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

'সাম্যের যুগ আজি' এই বোধ থেকে এ কবিতা রচনার প্রেরণা বলেই নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই। বিশ্বের রিন্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা। কিন্তু নারীই প্রধানত তার ভার বহন করে। পুরুষের দ্বারা সংসার চলে না, নারীর জন্যই সংস্কার স্বর্গলোকে পরিণত হয়—

"এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে, যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ রস মধু-গন্ধ-সুনির্মল।"

পুরুষের জীবনের যত দাবদাহ নারীর স্নেহ-প্রেমে তা স্নিগ্ধ হয়। এই নারী-ই যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিশীল রচনার প্রেরণা জুগিয়ে আসছে—

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নজরুল এই কবিতাটিতে বক্তব্যবিষয়কে তার কবিস্বভাবের উচ্ছ্বাসময়তার কারণে আকারে অনেকটা বড়ো করেছেন। বক্তব্যকে দীর্ঘায়ত করায় কাব্য সৌন্দর্য বিচারে কবিতাটির রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়ে তা বাক্ সর্বস্ব ও বক্তৃতাধর্মী হয়েছে। তিনি এখানে নরনারীর পাপ-পুণ্যের কথা, কল্যাণ-অকল্যাণ, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক ভূমিকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই যেমন কৃষি নির্ভর বাংলার গ্রাম সমাজে নরনারীর যৌথ পারিবারিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প—

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

আবার, পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত, নারী জাতির বেদনা ও ট্র্যাজেডি এ কবিতায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।

সামন্ত সমাজে নারী নানা আবরণে, আভরণে বাঁধা পড়ে থাকে, তাকেই সাম্যবাদের টানে কবি নজরুলের নারীমুক্তির কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে আহ্বান হিসেবে ফুটে উঠেছে—

হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ "সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে...নারীরার আছিল দাসী।" সেই বেদনার যুগ পার হয়ে আজ "মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি", তাই "অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।" আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নারী সঙ্গী, সাথী বন্ধু। নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়।

নারী কবিতাটি ছয়মাত্রার সরল কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছত্রে তিনটি ষন্মাত্রিক পর্ব, একটি দু-মাত্রায় অপূর্ণ পর্ব।

বিশ্বে যা কিছু । মহান সৃষ্টি । চির কল্যান। কর

অর্ধেক তার । রচিয়াছে নারী । অর্ধেক তার । নর।

পূর্বাপর দ্বিপদী অন্তমিল যুক্ত পদবন্ধে রচিত। কয়েকটি ছত্রে একই যুক্তাক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে সার্থক শব্দালঙ্কারের ও ধ্বনি ঝঙ্কারের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে—

'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,

সুষমা লক্ষ্মী, নারী-ই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।'

প্রসঙ্গা কথা ঃ

নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা—বৈদিক ভারতে নারীকে অশুচি, স্বাভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গালের হেতু গণ্য করা হয়েছে। মৈত্রায়নী সংহিতা বলেছে 'নারী অশুভ।' শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—যজ্ঞ কালে, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না। তাঁদের সংজ্ঞায় নারী পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতেও যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে গাভী-স্বর্ণ-শস্যের সঙ্গো অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। খ্রিস্টীয়শাস্ত্র বাইবেলেও নারীকে 'নরকের দ্বার' বলা হয়েছে। নারীর এই অবমাননার অবসান আধুনিক কালের ঘটনা। সাম্যবাদী কবিতার 'নারী'তে নজরুলের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ এই ব্যভিচারের বিরুধ্বে। তাঁর বক্তব্য নারী যদি অশুচি-অপবিত্র সে তো পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই দান। সুতরাং এর জন্য তো মূল অপরাধী পুরুষ। নারীকে নরককুন্ড বলে ঘৃণা করা কেন ? কামনার অগ্নিদহনের জন্য দায়ী পুরুষ তাই ঘৃন্য সে তো পুরুষ। সুতরাং নারীকে কোনক্রমেই হেয় জ্ঞান করা যায় না।

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল—নারীর স্নেহপ্রেম প্রীতি রসে আর্দ্র ও তার সয- লালনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি আজও সচল ও সক্রিয়। বিশ্বসৃষ্টির যে নেপথ্যবিধানে প্রাণের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে নারীর ভূ মিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী যেমন ধারণ ও লালন করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণাও নারী—এই সত্যটিকে নজরুল পংক্তিগুলিতে তুলে ধরেছেন।

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই—সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠার সময় থেকে পুরুষের যে শক্তি, প্রাধান্য ও অধিকারদম্ভ ক্রমশ নানারূপে ও বাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তা বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক যুগ বাহিত হয়ে সামন্ত শাসন পর্যন্ত ব্যপ্ত হয়েছে। আধুনিক মননে ও সমাজ-রাষ্ট্র ধারণায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে নিপীড়িত মানুষের যে জাগরণ বাস্তবায়িত হল, তা নারীকেও তাঁর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই যে কোনো ধরনের পীড়নের সঙ্গো প্রতিরোধ-শক্তিও বৈজ্ঞানিক নিয়মেই গড়ে ওঠে—এই সত্যটি কবি এখান উচ্চারণ করেছেন।

এতদিন শুধু বিলালে অমৃত—একদিন যে নারী অন্দরের অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিল, তাকে সেই আদিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গো সংগ্রাম হবে। কারণ বন্ধন থেকে মুক্তি কেউ দেয় না, নিজ অধিকারে অর্জন করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো ইউরোপের পুরুষকেন্দ্রিক সমাজেও ব্যতিক্রম ছিল না। বিশ্বের যা কিছু মহান, 'অর্ধেক তার করিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। নারীকে সেই

সমানাধিকার থেকে সামাজিক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলন তার শোধনের কাজ করেছে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা নারী পুরুষের সমান অধিকারকে মানে। তাই প্রয়োজনে নারীকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী প্রয়াস নিতে হবে। 'আজ প্রয়োজন যবে, যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।' কবির আশা 'সে দিন সুদূর নয়।' বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়'।

অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন অথবা প্রয়োজনে ৫০.৬ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা কয়েকবার পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রাজা করিয়াছে ________, রাজার ________।
রাণীর দরদে ________ গিয়াছে ________ যত ________।

খ) মাথার ________, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও ________।
যে ________ তোমা করিয়াছে ________ ________ সে।
দূর করে দাও ________ চিহ্ন আছে যত ________।

২) কোন্ রচনা প্রকাশের জন্য কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়?

৩) "১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।" নতুন সম্ভাবনার কথাগুলি কী, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) "তাঁর (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) মরুকাব্যত্রয়ী বাংলার শ্যামল আবহাওয়ায় উষর, রুক্ষ, নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে।"—কাব্যত্রয়ীর নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) কবিতায় তীব্র যৌবন-কামনা প্রকাশ পেয়েছে—
(১) রবীন্দ্রনাথ-এ।
(২) সত্যেন্দ্রনাথ-এ।
(৩) মোহিতলাল-এ।

খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য—
(১) হেমন্ত গোধূলি।
(২) সায়ম্।
(৩) ব্যথার দান

গ) কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন— (১) চরকার গান।

(২) ভাঙার গান।

(৪) পালকির গান।

ঘ) ‘চিত্তনামা’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— (১) নজরুল ইসলাম।

(২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৩) মোহিতলাল মজুমদার।

ঙ) কাজী নজরুল ইসামের বিদ্রোহী কবিতার প্রথম প্রকাশ— (১) ১৯২২-বিজলীতে

(২) ১৯২০-সওগাতে-এ

(২) ১৯২০ মোসলেম ভারত পত্রিকায়।

৬) নজরুল ইসলাম সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এরকম যে কোনো তিনটি পত্রিকার নাম করুন।

৭) ক) ‘এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল’—ইত্যাদি অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

খ) “এতদিন শুধু বিলালে অমৃত”-এই উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে দিন।

৫০.৭ মূলপাঠ—২ — দারিদ্র্য

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা ! দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্দ কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহি, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল !

টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা নীহার বিন্দু ! ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে ! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল !

জ্বালা নাই নেশা নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা

এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার 'টীকা' !....
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা !....

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের, দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা ! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক, 'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর ভোগ !'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !

চল পথে অনশন ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যাভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জান না কো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধুলিতলে ! বীণ-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি !

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরি ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া' !
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে ! সখী বলে, 'বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল ?'

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই !
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি !
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
'চুম্বনে বিবশ করি' ! ভোমোরোর পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের ! অকারণে আঁখি
পু'রে আসে অশ্রু-জলে ! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে !
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দুটি মাটি মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !
সহসা চমকি উঠি ! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর !

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে !—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস !...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।
[সিন্ধু-হিন্দোল]

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৩।

৫০.৮ সারাংশ—২

দারিদ্র্য মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। মানুষের প্রকৃত সত্তা, তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহারা এ সময়েই ফুটে ওঠে। ভারতীয় জীবনবোধের মধ্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় আছে, তা কখনই ঐশ্বর্য বিকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাই দারিদ্র্যই মানুষকে মহতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই যথার্থ শক্তির তীব্রতা প্রকাশ পায়।

দুঃখের দহন তাপে জীবনের সমস্ত রস যখন শুকিয়ে যায় তখন দু চোখে শুধু আগুন জ্বলে। ফুলের সৌরভ আর তেমন ছড়ায় না। পৃথিবীর সমস্ত করুণা ধারা যখন সূর্যের খরতাপে শুষ্ক হয় তখন আর জীবনের স্বপ্ন, তার সুন্দর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বেদনার ভার নিয়ে যে গান রচনা হয় তা তো বেদনারই গান। তখন মনে হয় দারিদ্র্য ছাড়া জীবনের কোনো কিছুই আর সত্য নয়। মহা দারিদ্র্যের প্রলয়ঙ্কর শক্তি সর্বস্ব গ্রাস করতে উদ্যত।

এরই মধ্যে পৃথিবী যখন অপরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়, আগমনীর আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়, তখন আশা জাগে, ম্লানমুখী শেফালিকাও ঝরে পড়বার আগে গন্ধ বিলিয়ে যায়। প্রজাপতি নেচে বেড়ায় পুষ্প থেকে পুষ্পে চঞ্চল পাখায়। এর মধ্যে কবি-প্রাণে বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে। আগমনী গানের মধ্যে যেন শুনতে পাওয়া যায়, নাই, কিছু নাই।

৫০.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'দারিদ্র্য' কবিতাটির রচনাকাল ২৪শে আইশ্বন ১৩৩৩ (ইং অক্টোবর ১৯২৬)। এসময় কবি বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারের ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর বাস করছিলেন। সেকানে নজরুল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন ও ছাত্র-যুবা

সম্মেলনে শ্রমিকের গান ও ছাত্রদলের গান রচনা করে গেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল-এর জন্ম। এসময় কবি সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য লড়াই করেছেন। 'দারিদ্র্য' কবিতা প্রত্যক্ষত এই নিষ্করুণ দুর্দিনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ এ, পরে 'সওগাত'-এ মাঘ ১৩৩৩-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে কবির সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ 'সিন্ধু হিল্লোল' (১৩৩৪)-এ সংকলিত হয়। 'সিন্দু-হিল্লোল' প্রেমের কবিতা সংগ্রহ।

'দারিদ্র্য' কবিতা রচনার ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট কবির অপর সহযোগী বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ-এর বর্ণনায়—"নজরুল ইসলাম তখন কৃষ্ণনগরে থাকত, আমি আরও কজনের সঙ্গে থাকতাম ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টির অফিসে...। আমাদের অফিস হতে পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোলে'র অফিস নিকটে ছিল। একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে ফিরে যাচ্ছিল। ....যাওয়ার আগে আমার হাতে সে 'দারিদ্র্যে'র পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলল, 'এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছে দিও। ......দিনেশ রঞ্জন দাশ মনিঅর্ডার যোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই কবিতাটি লিখেছি বড় দুঃখে।'"

নজরুল গবেষক ড. মিলন দত্ত এ সময়ের কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। ড. দত্ত লিখেছেন—"ঘরে দারিদ্র্যে শতমুখী আক্রমণ। যে আক্রমণে প্রমীলা ও গিরিবালা জর্জরিত। .....অক্টোবর মাসে ৯ তারিখে প্রমীলা একটি পুত্র সন্তান (বুলবুল) প্রসব করলেন। ...ঘরে টাকা নেই। টাকার প্রচন্ড দরকার। চিঠি লিখলেন প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মনকে—'টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাও।' ব্রজবিহারী পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা পেয়ে তাকে জানালেন—'চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়।' অপর এক চিঠিতে বন্ধু মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—"নিত্য অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায়... দুর্বল করে তুলছে।..." মুরলীধরকে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে 'বঙ্গবানী' থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। আক্ষেপ করেছেন, "আর মান ইজ্জত রইল না,... অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে।"—এরই মধ্যে কবির দ্রারিদ্র্য কবিতা—

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান ...।

জনৈক সমালোচক কবিতায় মর্মসত্যটি তুলে ধরেছেন—১৩৩৩ সালের শরৎকালে কৃষ্ণনগরে আগমনীর করুণ সানাইয়ে যেন কবির জীবনের ব্যথা-বেদনার কান্না ঝরে পড়ছিল, সেই মুহূর্তের অমর সৃষ্টি 'দারিদ্র্য'[১]।

এ কবিতায় কবি জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ বশত যে চিত্তক্ষোভ, বেদনাভার মনকে বিচলিত করেছে সে তো জীবনকে একান্ত করে ভালবাসার কারণেই। এদিক থেকে সিন্ধু হিল্লোলের গভীর জীবনরসরসিকতা বা প্রেমভাবনার কোনো বিরোধ নেই।

এ কবিতায় 'দারিদ্র্য' দুঃসহ দহনে প্রাণের রূপরসসৌগন্ধ্য শুষে নিয়ে জীবনকে বিবর্ণ করলেও, কবির জীবনানুরাগ বেদনায় ম্রিয়মাণ হলেও তা শেফালির শুভ্র সুরভি ছড়াতে পরাঙ্মুখ হয়নি। আশাহীন ভরসাহীন বিশুষ্ক দিনগুলিতেও কবি দেখেন, 'নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়, দুরন্ত নেশায়, পুষ্প প্রগল্‌ভায় চুম্বনে বিবশ করি।' শত হতাশার মধ্যেও এই আশার কথা, ভরসার কথা কবি নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব।

১ রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা। পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৭

এ কবিতায় কবি আবেগের তীব্রতা নিয়ে বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতার প্রথম স্তবকটিতে যে কথা বলেছেন, তা কোন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই বলা সম্ভব। দারিদ্র্য কবিকে মহান করেছে, খ্রিস্টের সম্মান দান করেছে—এ কথার মধ্য দিয়ে দীনহীন আস্তাবলে মাতা মেরির সন্তানের জন্মের বার্তা যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তা স্মরণাতীত কালের জ্যোতিমণ্ডিত এক অম্লান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিও যেন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। পার্থিব সম্পদ রিক্ততার মধ্যে জীবনের পরীক্ষা দিয়ে, মহত্তর জীবনের বাণীকে লাভ করেছেন, আর সেই প্রাণ-শক্তিতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনকে ভালোবেসে তার প্রেমসৌন্দর্যকে কাব্যে সংগীতে তুলে ধরেছেন। সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই কবি সৌন্দর্যকে যেমন দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন রিক্ত জীবন ব্যথিতের অশ্রু। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই কবি অর্জন করেছেন সেই শক্তি যা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 'সত্যকে' দুরন্ত সাহস ভরে অসংকোচে, স্পষ্ট ও ক্ষুরধার ভাষায় প্রকাশ করেছে। কবির শিল্পী সত্তা, তাঁর সৌন্দর্য চেতনা, সৃষ্টিশীল আবেগ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে দারিদ্র্যরূপী নিয়তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে। তার পরিচয় পাওয়া যায়—

> দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
> অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস—পংক্তিদ্বয়ে।

সুন্দরের দান গ্রহণ করবার জন্য কবির মন যখনই উন্মুখ হয়েছে, তখনই দারিদ্র্য, ভয়ংকর ক্ষুধারূপে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যসাধনাকে ব্যর্থ করেছে। কল্পনার জগৎ হয়েছে যেন শূন্য মরুভূমি, এ যেন নিয়তির সঙ্গে কবির সৌন্দর্য কল্পনার সংঘাত।

কবিতাটির রচনাকাল আশ্বিন, শরৎকাল,—শারদীয়া উৎসবের কাল, আগমনীর সানাই, শেফালির শুভ্রতা ও তার প্রাণমাতানো সুবাস বাঙালির গৃহ জীবনকে বর্ণগন্ধময় করে তোলে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে কবির সৌন্দর্যচেতনায় করুণ পরিণতি ফুটে উঠেছে—

> বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
> শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
> বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
> দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম।"

এই ছত্রগুলিতে এক মর্মান্তিক বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে। তবুও কবি হতোদ্যম হননি। তিনি কণ্ঠে জ্বালা নিয়েও গান গেয়ে মালা গেঁথে চলেছেন। 'ক্ষমাহীন দুর্বাসা'র মতো ক্ষুধার্ত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—দুর্বাসার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতেই পৃথিবীতে মহামারি দুর্ভিক্ষ, তুফান দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে—

> ধরনী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো
> অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
> আছে কাঁটা শয্যাতলে, বাহুতে প্রিয়ার
> তাই এবে কর্ ভোগ।

এসব সত্য বটে, কিন্তু আরও সত্য এরই মধ্যে আছে শরতের আনন্দময়ীর আগমনে সানাই-এর সুরে আগমনী গান—এ যেন প্রবাসী প্রিয়তমের প্রতীক্ষার কাল শেষের গান—

বধূদের প্রাণ আজ সানায়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে।

আর প্রিয় সখী বলে, "বল্ মুছিলি কেন না আঁখি, মুছিলি কাজল।"—এখানেই ফুটে উঠেছে শত বেদনায়, শত হতাশায়—আশার প্রদীপ জ্বালবার সংবাদ।

জীবনের এই বিচিত্র রূপৈশ্বর্যে কবিপ্রাণ যখন সুরে তালে লয়ে উদ্‌বেলে হয়ে ওঠে তখনই 'ধরিত্রী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার। ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।' —এই অনুভব যখন জাগে, তখনই 'সহসা চমকি' উঠে মনে পড়ে যায় দারিদ্র্যের নির্মম যন্ত্রণার কথা। তাঁর ক্ষুধাতুর শিশু দুদিন না খেয়ে জেগে উঠে কাঁদছে। দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে না পারায় বেদনাহত কবিপ্রাণ আত্মগ্লানিতে বলেন আগমনীর আগমনে তাঁর আনন্দের নেই অধিকার।

'দারিদ্র্য' নজরুলের একটি অনবদ্য কবিতা। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মানবজীবনের রস ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে। তবি জীবনে দারিদ্র্যের সুতীব্র জ্বালা কবিতাটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা অবনমিত হয় নি। পবির্তে উপহার দিয়েছে এক সংগ্রামী চেতনা।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দে রচিত।

শীর্ণ করপুট ভরি / সুন্দরের দান।।
যতবার নিতে যাই/—হে বুভুক্ষু তুমি।।
অগ্রে আসি কর পান।**/শূন্য মরুভূমি।।
হেরি মম কল্পলোক।**/আমার নয়ন।।
আমারি সুন্দরে করে/অগ্নি বরিষণ।** ।।

শ্বাসযতি ও অর্থযতির বিযুক্তি ও পরস্পর দুটি ছত্রে অন্ত্যমিল বা মিত্রাক্ষর। ছত্রের দ্বিপর্বিক মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে ৮ + ৬ মাত্রার।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস যথা ঃ উদ্ধত উলঙ্গা দৃষ্টি, তরল গরল, অমরার অমৃত-সাধনা। অর্থালঙ্কার—যথা উৎপেক্ষা—"উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ," "ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার/ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।"

উপমা ঃ শেফালির মতো শুভ্র সুরভি বিথার,

সমসোক্তি ঃ শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

উদ্ধৃত অলংকারগুলি কবতির বিশেষ তাৎপর্য বাড়িয়েছে শুধু নয় কাব্যকেও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—

দানিয়াছে খ্রিষ্টের সম্মান—যীশু জাতিতে ছিলেন ইহুদি। তিনি পরমেশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত দূত। খ্রিস্ট একজন মুক্তিদাতারূপে গণ্য হল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত খ্রিস্ট ধর্ম নামে পরিচিত। যীশুর প্রথম শিষ্যরাও ইহুদি ছিলেন।

তিনি তাঁর বাণী প্রচার এবং নানা অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করলে ইহুদিরা তাঁকে খ্রিস্ট বলে মেনে নেন। যীশুর এই কার্যাবলি ইহুদি ব্যতিরিক্ত অন্যদের মধ্যে প্রচার করলে, নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যীশুর বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক বাণী অনেক ইহুদি নেতা ও যাজকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে যীশুকে বিদেশি শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করে এবং শেষে কাঁটার মুকুট পরিয়ে বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশু বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপ ও অপরাধের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন।

যীশু যেমন বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ ও মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তেমনি কবিও যেন বিনা দোষে সীমাহীন দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কাল যাপন করেছেন। এই জীবন-যন্ত্রণা কবির মনে যে ভাবানুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা-ই 'দারিদ্র্য কবিতার উৎস' যীশু যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন, কবিও এই জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তর সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

ঋষি ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা—কোপন স্বভাবের জন্য খ্যাত পৌরাণিক ঋষি। এ থেকে প্রচলিত কথায় ক্রোধী ব্যক্তিকে 'দুর্বাসা' বলা যায়। তাঁর উগ্র স্বভাবের পরিচয় নানা কাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে পতিচিন্তায় নিমগ্না অনন্যমনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের বিবরণ দিয়েছেন। এই অভিশাপের ফলে পতি দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন এবং তাঁকে দীর্ঘকাল পতিবিরহ বেদনা সহ্য করতে হয়।

(সূত্র ঃ ভারতকোষ, খণ্ড—৪)

কবি নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতায় দারিদ্র্যের সীমাহীন নিপীড়ন কবি চিত্তকে বিহ্বল করেছে। তিনি এর কোনা কারণই খুঁজে পান নি। যখনই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রেরণায় সত্য সুন্দরের সাধনায় নিরত হয়েছেন তখনই কোনো অজ্ঞাত পথে ক্ষুধা, দুঃখ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাঁর স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। আর ক্ষুধার তাড়নায় অর্থের প্রয়োজনে দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাচ্ছেন—"টাকার বড্ড দরকার....অন্তত পঁচিশটি টাকা পাঠাও" বা দুটি গান পাঠিয়ে প্রত্যাশা করেছেন যদি ওঁরা টাকাটা দেয় তা হলে খুব উপকার হয় অথবা ভাবছেন, "অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় শেষে।"—এই অর্থচিন্তার প্রেক্ষাপটে এই 'দারিদ্র্য' কবিতা, তাই 'দুর্বাসার' শাপের মত 'ক্ষুধা, দারিদ্র্য' কবিকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করেছে একথা বলেছেন।

লক্ষ্মীর কিরীটী—ইত্যাদি—লক্ষ্মীর স্বর্ণমুকুট, সরস্বতীর বীণা ঐশ্বর্য ও সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য কল্পনার প্রতিভূ—এ তো ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসম্পদের বিচিত্র বৈভব যে গুণীজন সৃষ্টি করেন, তাঁদের উপর দারিদ্র্যের অমোঘ আক্রমণ সে সৃষ্টিকে অকালে বিনষ্ট করে, বিরূপ প্রতিকূলতায় সমস্ত 'সুর' যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় ৫০.৮ এর মূলপাঠ এবং ৫০.১০ এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। তাহলেই, যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ________ দৃষ্টি, বাণী ________

বীণা মোর ________ তব হল ________।

খ) তুই নাগ, ________ তোর ________ দহে।

________ বসি তুই গাঁথিবি ________,

গ) বীণা-তারে ________ হানি

________, কী সুর বাজাতে চাহ ________ ?

যত সুর ________ হয়ে ওঠে শুনি।

২) 'দারিদ্র্য' কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩) 'দারিদ্র্য' কবিতার ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে আলোচনা করুন।

৪) 'দারিদ্র্য' কবিতা থেকে একটি করে অনুপ্রাস, উপমা, ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ দিন।

৫) ক) 'দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান কন্টক মুকুট শোভা'—উদ্ধৃতির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

খ) 'দুর্বাসা' কে ? তাকে ক্ষমাহীন বলবার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫০.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ গানের আড়াল

গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু র'বে পরিচয় ? আর সব অবসান ?
অন্তর-তলে অন্তর-তর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয় ?

হয় তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা ?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি'—
উপকূলে ব'সে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে ?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দলেছে দুল হ'য়ে শুধু কানে ?

হায় ভেবে নাহি পাই—
যে চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই।
সাগরের সেই ফুলে' ফুলে' কাঁদা কুলে কুলে নিশিদিন
সুরের আড়ালে মূর্চ্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ্ ?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁলা হৃদয়ে আসি' ?
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি ?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে'—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে' !
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি'
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি'।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল, রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'—
দেখ' নাই তারে ! —মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি !

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয় !
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হ'য়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি !

৫০.১১ সারাংশ—৩

বিরহবেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তের স্মৃতিচারণামূলক কবিতা এটি। গায়ক কবি তার লেখা গান ও সুর সৃষ্টি একান্ত প্রিয় পাত্রী ও অনুরাগিণীকে শিখিয়ে যে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন, সেই সুখস্মৃতি থেকেই জিজ্ঞাসা—শুধুই কি গান রেখে এসেছেন, অন্তরের অন্তস্থলে ? যে ব্যথা জমা আছে তার কিছুই কি সে পায়নি। হয়তো কোনো কথা হয় নি গানের বাণী শুধু কি মিথ্যা, তার মধ্য দিয়ে উদ্‌বেল হৃদয়ের জোয়ার কি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। সুরটুকুই সে শুনেছে, তা কি তার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি।

যে চাঁদ সাগরে জোয়ার এনেছে, সেই চাঁদ কি সাগরের উদ্‌বেলতা সুরের মূর্ছনা, শুধু কণ্ঠেই স্থান পেয়েছে, হৃদয়ে সাড়া জাগায়নি। গানের মালার সৌরভ পরদিন যা বাসি হয়ে যায়, তাবে তাকে প্রভাতে শুধু সুবাসের জন্য তোলা কেন, বরং চির বিস্মৃতির অতলে তাকে নির্বাসন দেওয়াই ভালো। হৃদয়ে স্থান যদি তা না পায় তা শুধু কণ্ঠের গান হয়ে কী হবে, সে গান ভুলে যাওয়াই ভালো। আর যদি কণ্ঠ থেকে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছেন এমন কোনো দিন আসে তা যেন সে গীতস্রষ্টাকে জানায়।

৫০.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

গানের আড়াল 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের (১৩৩৩, ইং ১২ আগস্ট ১৯২৯) একুশটি কবিতার অন্যতম। গ্রন্থটি বিরাট প্রাণ, কবিক দরদী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলেন। সেসময় প্রথমে অতিথি হন মুসলিম হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হোসেনের বাসায়, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের বাসায়। সঙ্গীতপ্রিয় সুরসাধক কবি মোতাহারের পাঁচ বছরের মেয়ে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথের কন্যা উমা (নোটন)-কে অনেক য- করে গান শেখাতেন। ওদিকে টিকাটুলির রেণুকা সেনকে (পরে দাশগুপ্ত) দিলীপ রায় গান শিখিয়ে কয়েকটি রেকর্ড করিয়েছেন। সেগুলি বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। দিলীপ রায়ের কাছে রাণু সোম (পরে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসু) নজরুলগীতি শেখেন। নজরুল দিলীপ রায়ের কাছে রানুর সংবাদ পেয়ে তিনি ঢাকার বনগ্রামস্থ রাণু সোমের সঙ্গো তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে গিয়ে পরিচয় করেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাণু নজরুল ইসলামকে দেখলেন—যাঁর যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান এবং বেগবান। রাণুর ভাষায় "আমার মতো একটা নগণ্য সদ্য কিশোরীর জীবনে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে সেদিন যে প্রচণ্ড সুখ এবং সম্মান এনে দিয়েছিলো তার কোন তুলনা নেই।" নজরুলও তাঁর স্বাভাবধর্মে সোম-পরিবারকে আপন করে নেন। সংগীত পারদর্শিনী রাণু দুদিনেই নজরুলের প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠলেন। নজরুলের ইচ্ছা রাণু দিলীপ রায়ের ছাত্রী রেণুকার থেকেও বড়ো শিল্পী হয়ে উঠুক। এ সময় তিনি অনেকগুলি গান রচনা ও সুর দিয়ে রাণুকে সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করে শিখিয়েছেন। গানগুলি হল, 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়', 'যাও যাও তুমি ফিরে', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', 'আমি কি সুখে লো গৃহে রব', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', 'নহিয়া কর পার, কূল নাহি নদী জল সাঁতার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গানগুলি 'চোখের চাতক' সংগীত গ্রন্থে সংকলিত ও ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ প্রকাশিত হয়। কবি, সুরকার ও সংগীত শিক্ষক নজরুল গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন, 'কল্যাণীয়া বাণী-কণ্ঠী প্রতিভা সোম-কে"। 'গানের আড়াল' কবিতার প্রেক্ষাপটে কবিতা ও গানগুলির রচনার সময় অনুভবের গভীরতা এ দুটির মধ্যে অন্তরঙ্গা সম্পর্কের কথা স্মরণ করায়। কবির বক্তব্য গান ও গায়িকার সঙ্গো ওতপ্রোত সম্পর্কান্বিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রসঙ্গো আরও একটি ঘটনার কথা কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন সেটিকেও বিচার করা যেতে পারে। নজরুল জীবনীকার ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে নজরুলের ঢাকা সফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ফজিলতুন্নেসার সঙ্গো সম্পর্কের জন্য। ফজিল ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমানে জেলা) করটিয়া গ্রামে ওয়াহেদ আলি খাঁ-র কন্যা। বিদ্যানুরাগী ফজিল নিজ চেষ্টায় অনেক বাধা অতিক্রম করে এ সময় অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পাঠরত। অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে তার সঙ্গো নজরুলের পরিচয়। ফজিল পর্দা মানতেন না, বোরখার ধার ধারতেন না। তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গো মিশতেন। তার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল। তার গায়ের রঙ শ্যামলা, কিন্তু চেহারা প্রচণ্ড আকর্ষণীয়, কথাবার্তায় বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় ছিল। নজরুল তার ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হন। ফজিলের বেপরোয়া স্বভাব, বুদ্ধিদীপ্তি অসংকোচ ব্যবহার উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে মুগ্ধ নজরুল ঘরের কথা ভুলে যান। মাত্র তিনদিনের দেখাসাক্ষাতেই পরস্পর গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঢাকা থেকে ফেরার পথে পদ্মায় জাহাজে

বসে অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে লেখা একটি চিঠিতে এর আভাস আছে—"আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় অমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের, লোক লোকান্তরের দুখ-জাগানিয়া বন্ধু। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।"

ফজিলতুন্নেসার মনেও বিচ্ছেদের দোলা লেগেছিল। তিনিও নজরুলকে একটি চিঠির সঙ্গে 'দুদিনের দেখা' নামে 'গল্প' পাঠিয়েছিলেন 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এর প্রতিক্রিয়ায় নজরুল মোতাহারকে লেখেন, "বুঝতে পারছিনে—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু, একজন নারী যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে ?..." । অপর এক চিঠিতে "আমার ব্যথার রক্তকে রঙীন রঙের ফেনা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়তো দেবতা—আমাদের ব্যথা অশ্রুর বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি মাটির নজরুল হলেও সে দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।..."

এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টেনে বলা যায় রাণু সোম ও ফজিলতুন্নেসার ঘটনা একই সময়ের এবং এগুলি য়িে অনেক গল্প কাহিনি থাকলেও, শেষোক্ত ঘটনা বিরহ-বেদনা সাময়িক ভারাক্রান্ত করলেও, তা স্থায়ী ভাবরূপ পায়নি। সুতরাং 'রানুই' এ কবিতার আলম্বন বিভাব বলা যায়।

'চক্রবাক' প্রেমের কবিতার সংকলন। প্রেম আর প্রকৃতি কবির কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবি প্রিয়াকে কখনও দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে কখনও বা প্রকৃতি প্রিয়ার ভাবকল্পনাকে উজ্জীবিত করে। এখানে কবি অতীত স্মৃতিমেদুর মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করেছেন। যখন গানের আড়ালে হৃদয়ের আন্তরিক আবেগ গানের কথা ও সুরে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে লীলায়িত ভঙ্গিতে তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। হৃদয় নিঙড়ানো আবেগকে সংযত ও শিল্পীত ভঙ্গিতে প্রকাশ করে কবি সেই তরঙ্গাবিক্ষেপকে সুন্দরভাবে sublimated বা ঊর্ধ্বায়িত করেছেন।

'গানের আড়াল' কবিতায় বিরহ-মেদুর হৃদয়ের একধরনের রোমান্টিক বিষণ্ণতার ছায়াপাত আছে। কবিতাটি মানবী প্রেমের। সে প্রেমে ব্যক্তি মুখ্য। নারী হৃদয়ের জন্য আকুলতা এর নেপথ্যভূমি। অনুরাগিনী যে নারীকে গান শিখিয়েছেন প্রেমের, তিনি গানটুকু নিলেও প্রেমকে নেননি। তাই কবিকে বলতে শুনি "তোমারর কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান" এবং একথা বলার পরই শুনি 'অন্তর তলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়"—সেই গানের আড়ালে 'পাও নাই তার কোন পরিচয় !' কবিতার প্রতিটি ছত্রে অনুচ্চারিত পূর্বরাগের বেদনা যেন লীন হয়ে আছে। ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে একটি বিরহ-ব্যথিত প্রাণের গভীর বেদনার অনুরণন। এতে বেদনার গভীরতা উপলব্ধি করা গেলেও, ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা নেই। বরং বলেছেন, 'বন্ধু গো যেয়ো ভুলে'—'প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে।' সুতারং 'ভোলো মোর গান, ...আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়।'—এতে ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ সুর ধ্বনিত হলেও কোনো অনুযোগ নেই। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেহেতু প্রেমে আশাবাদী, তাই বলেছেন, 'যদি আসে দিন জানায়ো আমারে,' 'কন্ট পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি।'

কবি নজরুলের আবেগদীপ্ত হৃদয়ের গভীর অনুভব বারবার নারী হৃদয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের বিচিত্র রূপ ও স্বরূপ মহিমা তিনি নিত্য নতুন করে কবিতায় গানে তুলে ধরেছেন। অধিকাংশই অপরিপূরিত, কিংবা একপক্ষীয় প্রেম হলেও নারীপ্রকৃতির রহস্যময়তা তাঁর রোমান্টিক কবিহৃদয়কে আকৃষ্ট করেছে। অন্তহীন চলার পথে অন্বেষণ করেছেন পার্থিব প্রিয়ার মধ্যে শাশ্বত নারীকে। গানের আড়াল সেই চলার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গারের কাব্য।

কবিতাটির অবয়ব গঠনে ষণ্মাত্রিক কলাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন নজরুল।

তোমার কণ্ঠে /রাখিয়া এসেছি/মোর কণ্ঠের গান—৬+৬+৬+২

এইটুকু শুধু/রবে পরিচয়/আর সব অবসান।—ছয় ছয় দুই মাত্রার অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত তিনটি পর্ব নিয়ে প্রতিটি ছত্র গঠিত। একে কলাবৃত্ত লঘু ত্রিপদী বলা যায়। প্রথম ও পঞ্চম স্তবক চার ছত্রের, দ্বিতীয় তৃতীয় ছয় ছত্রের এবং চতুর্থ স্তবক আট ছত্রে বিন্যস্ত। নজরুল আবেগ-তাড়িত তাই কবিতা রচনায় ভাবনাসংযম ও শিল্প সচেতনতার অভাব দেখা যায়, তাঁর বেশ কিছু কবিতার গঠন ও শিল্পনির্মিতিতে তীব্র আবেগের কারণেই অনেক সময় কল্পনাশৃঙ্খলার অভাবে অযথা দীর্ঘ ও ভাববাহুল্য দেখা যায়। 'গানের আড়াল' সম্পূর্ণরূপে এ সব দোষ মুক্ত, সংহত শিল্পসৃষ্টি। এর কিছু কিছু শব্দ ও চিত্র নির্মাণে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। যেমন—"তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান"—এখানে দুবার কণ্ঠ শব্দটি তোমার ও মোর শব্দের সঙ্গে ব্যবহার হওয়ায় প্রণয়াশ্লেষের চিত্ররূপটি ফুটিয়ে তুলেছে। এবং "হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারই প্রতিধ্বনি/ কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি।"—হৃদয়ের (প্রেমের) জোয়ার কণ্ঠের তটরেখায় (বাধা পেয়ে) সুর ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে —এখানে সে কথাটি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন।

গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা—কবিতা ও গান কবির অন্তঃপ্রেরণার সৃষ্টি হলেও সে কি শুধুই শিল্প, না-কি কবি জীবনে গভীরতর ভাবানুভূতির পরিচায়ক ? বিশুদ্ধ কাব্যবাদীরা মনে করেন কবিতা সে শুধু কবিতার জন্যই। কিন্তু সমাজ বাস্তবতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁর মনে করেন কবিও সামাজিক মানুষ, তাই কবিতার প্রেরণায় যে-বাস্তব ভিত্তি থাকে তার একটি চিরন্তন রূপই কবিতায় প্রকাশ পায়। গানের পিছনেও যে গভীরতম অন্তবেদনাটি থাকে তাই সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করে আত্মপ্রকাশ করে। গানকে লোকে গ্রহণ করলেও গানের স্রষ্টার ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনাকে স্মরণ করে না। কিন্তু কবি মনে করেন গানের বাণী সে শুধু বাণীবিলাস নয়। সেখানে যে আকুলতা ছিল তা গায়কের প্রাণে সাড়া জাগায় নি কি—এই তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন।

যে চাঁদ জাগালো সাগর জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই !—চাঁদের সঙ্গে সমুদ্র জলের জোয়ার ভাঁটার নিত্য সম্পর্ক — কাব্যে ও বিজ্ঞানে এটি স্বীকৃত। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্র জোয়ার আসে, কিন্তু চাঁদ কি সেই সাগরের জীবনচাঞ্চল্য, তার ভাবাভিব্যক্তিকে দেখে না ? প্রকৃতির এই রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে অন্তরসত্তার এই জাগরণের যে হেতু সেই প্রেরণাদাত্রী কি এটি তার অন্তরে অনুভব করেনি। কবির মনে এই প্রশ্ন প্রকাশ করেছেন।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭৩ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় ৫০.১৪ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদি অংশটি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) অন্তর তবে ______ যে ব্যথা ______ রয়

______ ______ পাও নাই তার কোনদিন ______ ?

খ) জানায়ে আমারে ______ ______ ______ এইটুকু শুধু যাচি

______ পারায়ে হয়েছি ______ ______।

২) ‘তোমারে কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি’—উদ্ধৃতিটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দিন।

৩) ‘হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা”,—কে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছেন ?

৪) ‘যে চাঁদ জাগালো সাগর জোয়ার’—উদ্ধৃতিটির অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৫) ‘ভোলো মোর গান’—কে, কাকে এবং কেন ভুলতে বলেছেন ?

৬) ফজিলতুন্নেসা কে ? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫০.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১) ক) রাজ্যশাসন, সামিল, রাণী, ধুইয়া, রাজ্যের, গ্লানি।

খ) ঘোম্‌টা, শিকল, ঘোম্‌টা, ভীরু, ওড়াও, আবরণ, দাসীর, আভরণ।

২) ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় ‘ধূমকেতু’ কবিতা ও ‘ধূমকেতুর পথ’ সম্পাদকীয়ের জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

৩) ৫০.২ অংশে ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার পর বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল, তার কথা বলা হয়েছে।

৪) মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০)

৫) ক) মোহিতলাল-এ (খ) সায়ম্‌ (গ) ভাঙার গান

খ) নজরুল ইসলাম (ঙ) ১৯২২, বিজলী-তে।

৬) ১) জুলাই ১৯২০, পরে ফেব্রুয়ারি ১৯২১ নবযুগ

২) আগস্ট ১৯২২ ধূমকেতু ৩) ১৯২৫, ডিসেম্বর, ‘লাঙল’।

৭) ক) ও খ) এর জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ দেখুন।

অনুশীলনা—২

১) ক) উদ্ধত, উলঙ্গ, ক্ষুরধার, শাপে, তরবার।

খ) জন্ম, বেদনার, কাটা-কুঞ্জে, মালিকা, বেদনার, টীকা।

গ) করাঘাত, সারদার, গুণী, আর্তনাদ।

২ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অংশ ভালো করে পড়ুন।

অনুশীলনী—৩

১) ক) অন্তর-তর, লুকায়ে, গানের, আড়ালে, কোনদিন।

খ) যদি, আসে, দিন, কণ্ঠ, হৃদয়ের কাছাকাছি।

২ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অংশটি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর দেওয়া সহজ হবে।

৫০.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) কাজী নজরুল ইসলাম—সঞ্চিতা/সাহারা, সিন্দুহিল্লোল, চক্রবাক।

২) ড. রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৩) ড. মিলন দত্ত—নজরুল জীবন-চরিত

৪) অধ্যাপক আতভির রহমান—নজরুল কাব্য-সমীক্ষা।

৫) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প।

৬) পশ্চিমবঙ্গা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ১৪০৬।

৭) পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি ঃ নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক-গ্রন্থ।

একক ৫১ ❐ জীবনানন্দ দাশ ঃ তিনটি কবিতা

গঠন

৫১.১ উদ্দেশ্য
৫১.২ প্রস্তাবনা
৫১.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা
৫১.৪ মূলপাঠ—১ ঃ বনলতা সেন
৫১.৫ সারাংশ—১
৫১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।
৫১.৭ মূলপাঠ—২ ঃ বিড়াল
৫১.৮ সারাংশ—২
৫১.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৫১.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ ভিখিরি
৫১.১১ সারাংশ—৩
৫১.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৫১.১৩ উত্তরমালা
৫১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৫১.১ উদ্দেশ্য

প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষত বিশ ও তিরিশের দশকে এক তরুণ কবি-গোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসে স্বতন্ত্র ধরনের নতুনতর কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে, শুধু তাঁর প্রতিধ্বনি হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। কল্লোল-কালিকলমের যে কবিকুল সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন জীবনানন্দ বোধ করি তাঁদের মধ্যে ভাব স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যভঙ্গিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এ হেন কবির কাব্য ও কৃতি সম্পর্কে আপনার বিশেষভাবে জানবার সুযোগ ঘটবে তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। আপনি কবির—

- কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যনির্মাণে অভিনবত্ব,
- প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ-এর পরিচয়
- কাব্যের উপমা ও চিত্রকল্পে অনন্যতা
- কালচেতনা ও ইতিহাসবোধ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বক্তব্য প্রধান নয়
- ইতিহাস ও সমাজচেতনা এক তীক্ষ্ণ নতুন বেদনাবোধ সঞ্চার
- রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে শূন্যতা ও নির্জনতার একটি পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে

- রোমান্টিক মেজাজ ও মহৎ প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা অন্তরাশ্রয়ী হওয়ায় বিষণ্ণতা তাঁর কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়েছে
- কাব্য প্রকরণে অচিন্তিত পূর্ব বৈচিত্র্য—প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। আর এই ধারণা থেকে জীবনানন্দ ও তাঁর সমকালের কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করে তাঁদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে পারবেন।

৫১.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় এককে আপনি আধুনিক বাংলাকাব্যে ১৯শ ও ২০ শতকে দেশকালগত পার্থক্য জনিত কারণে কবি ধর্ম ও কবিকৃতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনেছেন। সেই পরিচয় সূত্রে তৃতীয় এককে ১৯শ শতকের কবি মধুসূদন ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ পাঠ ও চতুর্থ এককে ১৯শ-এর উত্তরার্ধ ও ২০শ শতকের প্রথমার্ধের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম এককে একান্তভাবে প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কবি নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্য দিয়ে যুগলক্ষণগুলি সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা জন্মেছে। বর্তমান এককের কবি প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে কল্পনা ও প্রকাশে বিশেষ স্বতন্ত্র।

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ('বর্ষ আবাহন'—ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৬) প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯১৯ সেই সময় থেকে আমৃত্যু (মৃত্যু ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪) তিনি কাব্যরচনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার পরিসর প্রায় ৩৫ বছর। এ সময়টি থেকে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য রচনারও সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর সংখ্যাও অগনিত। সেই সঙ্গে অনুসারীও কম ছিল না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ অনুসরণ করেও—যেহেতু দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ হওয়া অসম্ভব,—তাই লোকদৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছেন। প্রমথনাথ ও ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, রমনীমোহন ঘোষ ইত্যাদি তাই বিস্মৃত নাম। কিন্তু করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্র ভাবানুভূতির পরিচয় সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্ব থাকায় এঁরা রবিরশ্মিকে শুধু প্রতিফলিত করেননি। স্বকীয় ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কাব্যাদর্শক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এটিও ছিল অনেকাংশে রবীন্দ্র ছায়াছন্ন। এঁরা লোকায়ত সংস্কার ও রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলনের অনেকটা চেষ্টা করেছিলেন, ফলে এঁরা বাংলাকাব্যে অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছর কয়েকজন কবিকে আমরা পেয়েছি যাঁদের কবিতা সে সময় পাঠক সমাজকে সচকিত করে তুলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক আবহ নিয়ে আসে। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত ও রবীন্দ্র ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় ছন্দের দোলা, বাঙালির সমাজ ও প্রতিবেশের নানা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন—রচিত হয়েছে 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা', ইলশে গুঁড়ি', এবং 'গান্ধিজী', 'নফর কুণ্ডু', 'জাতির পাঁতি', 'মেথরের' মতো কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ দেশি বিদেশি কাব্যের অনুবাদ করে বাংলা কাব্যে দেশ বিদেশের মনোভূমিকে কাছে নিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম গাড়োয়াল ধর্মঘট এবং ১৩১৩ সালে কিংবা তারো আগে 'সাম্যসাম' রচনা করে অসামান্য ঘটনা ঘটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

> "মানিনা গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
> দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তার ঘর।"—

একথা তিনি প্রথম বলেছেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও শ্লেষমিশ্রিত উচ্চারণ ও নজরুলের বিদ্রোহদীপ্ত ঘোষণা। এঁদের কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আধিক্য অনিবার্যভাবেই বাংলা কবিতার সে সময়ের পাঠককুলকে আকৃষ্ট করেছিল। এসব থেকে এই ধারণা জন্মানো সম্ভব হল যে, রবীন্দ্র কাব্যধারার সর্বত্রসঞ্চারী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ সম্ভব। এঁরা বাংলা কবিতায় আমদানি করলেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ও জীবনাদর্শের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন 'মানুষের সঙ্গো মানুষের ভেদ নেই'। তিনি মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। যতীন্দ্রনাথ চাষিকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলেন, নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে 'বারাঙ্গানাকে' মাতৃসম্বোধন করলেন। ওদিকে মোহিতলাল কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষ তরুণতর কবিদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'যৌবনবন্দনা', তাঁর তন্ত্রধর্মী দেহবাদ—'ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা'—সে যুগের তরুণতর আধুনিক কবিদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁক কবিতার Eternal Passion ও Eternal Pain—জীবন, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গোই তুলে ধরেছিলেন। কল্লোলের কবিরা এতে মুগ্ধ হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'মোহিতলালের জীবনবোধে যে তীব্রতা "অক্ষম হাতে শুধু উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাসে অপব্যয়িক হতে পারত", তা তাঁর হাতে "সুতীব্র অথচ শাসিত স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে।" "ইন্দ্রিয়গোচর মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ" তাঁর মতো সুনিপুণভাবে কেউ পরিবেশন করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সোভিয়েত সমাজ বিপ্লব। এর ফলে মানুষ ও মানব সমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের মনে ভাঙাচোরা পরিবার সমাজজীবনে নানা দুর্যোগ দুর্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। জনসমাজ জনজীবন তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। কল্লোল-কালিকলম উত্তরা-প্রগতির কবি গোষ্ঠী এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁদের রচনা প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়েছিল। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা। ওদিকে 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ার লালিত সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে প্রভৃতি সকলেই ১৯০০—১৯১০-এর মধ্যে জন্মেছেন। প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব-এর প্রবণতাগুলিকে যদি সূত্রায়িত করা যায় তবে বলা যেতে পারে প্রথমোক্ত জন যদি হন হুইটম্যানীয় আদর্শে সমাজসচেতন, দ্বিতীয় নির্জন, নিঃসঙ্গ, প্রেম ও প্রকৃতিচেতন আর বন্দির বন্দনায় কবি দেহজ প্রেমের তীব্র আকুলতায় কাতল। 'পরিচয়ের' কবিরা এদিক থেকে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র চরিত্রলক্ষণযুক্ত এবং অনেক অংশেই মননশীল মার্জিত বৌদ্ধিক।

কল্লোলের প্রথম পর্যায়ে (১৯২৩-১৯৩০) প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪—১৯৮৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 'প্রথমা'র (১৯৩২) কবিতায় তিনি কখনো বহুলোকের মিলিত অনুভবকে, কখনো বা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে সঞ্চারিত করেছেন। এখানে কবির স্বপ্নভাঙা প্রাণের পরম বেদনা বোধের পরিচয় আছে। তাঁর ব্যক্তিমানস যেমন দুর্গম পথ সন্ধান করেছে, তেমনি সভ্যতার বিবর্তনেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিকণ্ঠ ছিল অব্যর্থ।

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। প্রেমের কবিতাতেই তাঁর কবিত্ব শক্তির পূর্ণ পরিচয়। তাঁর কাব্য সাধনার শুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে।

'মর্মবাণী' (১৩৩১) কাব্যগ্রন্থে সে পরিচয় আছে। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রানুসরণে নতুন যুগ ভাবনার প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁদের কবি মানসেরও মুক্তি নেই। অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক। সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।" বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। এ প্রেম মূর্ত, শরীরী 'প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, দেহজ কামনার শাপে নিরন্তর দগ্ধ।' কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু তাতেই নিমজ্জিত থাকেননি। ইন্দ্রিয় তাঁর কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করবার উপায় মাত্র।

বুদ্ধদেবের নায়িকা রক্ত-মাংসের নারী। দেহী বলে তার নামরূপ দিয়েছেন—মৈত্রেয়ী, কঙ্কাবতী। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'য় বর্ণিতব্য নারী প্রকৃতিকে ধরিয়ে দিতে নাম ব্যবহার করেছেন, তার কোনো শরীরী রূপ দিতে চাননি। 'মানসী', মানসসুন্দরী তো ভাবলোকবিহারিণী। বুদ্ধদেব ও আধুনিক কবিরা রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকাকে দেহী রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে তাদের আরও স্পষ্ট করে তুলতে পদবী যোগ করেছেন—বনলতা সেন, শেফালিকা বোস, অরুণিমা সান্যাল।

পরে প্রৌঢ় পরিণত বুদ্ধদেবকে দেখেছি তিনি জীবনের অমোঘ সত্যটিকে উপলব্ধি করেছেন—জীবনে যেমন সত্য যৌবনের ঐশ্বর্য, তেমনি সত্য যৌবন-কামনা-মুক্ত পরিণত প্রৌঢ়ত্বের নিরাভরণ রূপ। মোহ ও মোহমুক্তি এই দুই নিয়েই মানুষের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে—'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) ; 'শীতের প্রার্থনা', বসন্তের উত্তর', (১৯৫২) ; 'যে আধার আলোর অধিক' (১৯৫৮)-এ সে পরিচয় আছে।

(১৯০১—১৯৮৬) পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১—১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮০), ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৬) কাব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবিরা একই সামাজিক পটভূমিকায় বাস করেও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও তাঁর কাব্যে ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের পরিচয় আছে। একসময় নিজেকে পূর্বগামী কবিদের অনুসারী বললেও, পরে, তাঁর কবিতায় আধুনিক কালের সংহত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রবহমান ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে কবিতার রূপান্তর ঘটান। তিনি তাঁর স্বকীয়তাকে অর্জন করেছিলেন নিখুঁত কারুকৃতির সহায়তায়। সাবলীল রচনাকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। সাধারণ পাঠকের কাছে যা স্বচ্ছন্দ, তাকে তিনি চর্বিতচর্বণের নিদর্শন মনে করতেন। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সুধীন্দ্রনাথ মানতেন নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আয়ত্ত করাই কাব্যচর্চার হেতু। মননপ্রধান কবি বহু ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন বলেই আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণুদের কবিতা এ কালের পাঠকের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ। ইনিও একসময় রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দরের সাধনায় আগ্রহী ছিলেন। চেয়েছিলেন 'আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ-নিষ্যন্দন আকাশ' কিন্তু বিরোধী পারিপার্শ্বিকতা সম্ভব ছিল না। ঊর্বশী ও আর্টেমিশ-এ 'ছেদ' কবিতায় বলেছেন,—'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' ফলে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনাজনিত সমষ্টির অঙ্গীকার তাঁর কবিতায় অসামান্য মর্যাদা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্য সংগ্রাম—এ সবের মধ্যেও তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। তাঁর কাব্য স্বপ্নবাক্, ভাবগম্ভীর, দেশি প্রতীক ও চিত্রকল্পের পাশাপাশি বিদেশি প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতার ভাষা বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল অনেক সময় একটু জটিল কদাচিৎ তাঁর কবিতার বিষয় ও ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু দুরূহ বলে মনে হতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিক চিন্তাভাবনা, নতুনতর আঙ্গিকে ও ভঙ্গিকে রচিত কবিতা প্রথম থেকেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাঁর কবিতা আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সহজ মনে হলেও, সেটি ঠিক নয়। বরং বলা যায় তাঁর কবিমানস অনেকটা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁকে মনে হতে পারে অনেকটা আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক বা মরমিয়া চেতনার উত্তরাধিকারী, বস্তুত এটি তাঁর এক ধরনের ছদ্মবেশ। "নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তলায় যেমন লুকিয়ে থাকে মগ্ন শৈল ও ঘন অরণ্য, ঘূর্ণাবর্ত ও জলচর জীবের বিক্ষোভ, তেমনি ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গাতি'র কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস—সমন্বয় যার কাম্য" অথচ যাকে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিমানসের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্যকে দেখেছেন, পরে উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞান ও বস্তু চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যকে উপলব্ধি করা যায় না। "বাহিরের সকল ঘটনার তাৎপর্য, সকল বিরোধের সঙ্গাতি, সকল বৈষম্যের ঐক্য নিহিত আছে কবির ধ্যানে।" তাই যা দেখা যায়, তাই সব নয়—অর্থাৎ "দৃষ্টির দর্শন" সব কথা নয়। কাব্যেরও একটি শ্রেয়তা আছে, তা সমাজ-নিরপেক্ষ, সংসারের সুখ দুঃখ থেকে ভিন্ন—তাকে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়। কাব্য এভাবে অমিয় চক্রবর্তীকে সমাজ থেকে দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলত তাঁর কবিতায় দৃষ্টির জগৎ ধ্যানের জগতের বিরোধ বেধেছে—কবির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আছে তাঁর কবিতায় বিশ্বপথিক কবির এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়। উপসংহারে বলা যায় অমিয় চক্রবর্তী বস্তুবিশ্ব-সমাজদর্শন-বিশ্বদর্শন-এ নিয়ত পারাপার করে যে প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, তা তাঁর কবিতাতে জটিল করেছে। কবিতার ভাষাকে আপাত বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে তাতে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছন। বলা যায় তাঁর রচনারীতিতে সৃষ্টিশীল বিশৃঙ্খলার—(Creative violence)-এর সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা চেতনাসমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের আবির্ভাব। জীবৎকালে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কিছুটা সমাদর পেলেও তাঁর কবিমণীষা মৃত্যুর পর যেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার মর্যাদা পেয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পাননি। জীবনানন্দের জীবনবৃত্ত ও কাব্যকথা প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য।

৫১.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, বরিশাল শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষরা এক সময় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'গাউপাড়া' গ্রামে বাস করতেন। সেটি পরে পদ্মার ভাঙনে লুপ্ত হয়েছে। পিতামহ সর্বানন্দ প্রথমে পড়াশুনা পরে চাকরিসূত্রে বরিশালে স্থায়ী হন। সর্বানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দ বাবার ইচ্ছায় কলকাতার সিটি কলেজে পড়ে প্রথমে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সত্যানন্দের স্ত্রী কুসুমকুমারী ব্রাহ্ম চন্দনাথ দাসের মেয়ে। বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরেও তিনি কাজের ফাঁকে লেখাপড়া করতেন, কবিতা লিখতেন। দুই ছেলে—জ্যেষ্ঠ জীবনানন্দ, কনিষ্ঠ অশোকানন্দ, বোন সুচরিতা দাশ। শৈশবে ভোরে উঠে বাবার উপনিষদ আবৃত্তি, মায়ের গান শুনতেন। পরিচারক-পরিচারিকাদের কাছে গল্প-গাথা-ছড়া শুনতেন ; গাছ, পাখি লতা পাতা এদের কাছে চেনা। ১৯১৫ তে ব্রজমোহন স্কুলে থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. (১৯১৭), পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক ইংরেজি সহ বি. এ. (১৯১৯)

এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১-এ এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু (১৯২২), কলেজের অর্থ-সঙ্কটে কনিষ্ঠ অধ্যাপক জীবনানন্দের কর্মচ্যুতি (১৯২৮)। বৎসরাধিককাল টুইশন নির্ভর বেকার থাকার পর ১৯২৯-এ মাস তিনেক খুলনার বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়ান। ওই বছরের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত-র ভাইপো সুকুমার দত্ত কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩০-এর ৯ই মে খুলনার সেনহাটি গ্রামের রোহিণী গুপ্তের কন্যা লাবণ্য দেবীকে বিয়ে করেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে। শোনা যায়, রামযশ কলেজ বিয়ের জন্য ছুটি দিতে চায়নি, তাই তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি। প্রায় বছর পাঁচেক বেকার ছিলেন। মাঝে কিছুদিন জীবন বিমার এজেন্ট-এর কাজ করেছেন। কিছুদিন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসাও করেছেন। জীবনধারণের একমাত্র উপায় গৃহ শিক্ষকতা—এই সুদীর্ঘ অন্ধকারের দিনের পরিচয় পাওয়া যায় এ সময় রচিত কবির কতকগুলি গল্প ও তিনটি উপন্যাসে। যার সন্ধান কবির জীবৎকালে মেলেনি। অবশেষে কবি ১৯৩৫-এ বরিশাল-এ ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। টানা এগারো বছর সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। মাঝে ১৯৪৩-এ একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসে বেড়িয়ে গেছেন। ১৯৪৬-এ দেশ বিভাগের বেশ কিছুদিন আগে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন, আর ফিরে যাননি। বছর দুয়েকের জন্য আবার বেকার। মধ্যে কয়েকমাস সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চেষ্টায় 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা ভার পান। সে বছরের শারদ সংখ্যাও সম্পাদনা করেন। এরই মধ্যে স্পষ্ট হল সাংবাদিকতা তাঁর ধাতে নেই। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ছেড়ে দেন। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে চাকুরি দরখাস্ত, বন্ধুদের কাছে আরজি জানানো। প্রায় আড়াই বছর বেকারিত্বের পর ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে খড়গপুর কলেজে চাকরি পান। সেখানে হোস্টেলে থাকতেন আর সুযোগ পেলেই চলে আসতেন কলকাতায়। নানা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত জীবনানন্দ এ সময় দুশ্চিন্তাপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্ত্রী বি. টি. তে ভর্তি হয়েছেন। বলা যায় সংসার তাঁরই ঘাড়ে- তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিও প্রায়ই ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকেন, অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে চাকরি ছাড়েন। আবার বেকারি, আবার চাকরি খোঁজা। ১৯৫১ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রিসার্চ এসিস্টেন্টের জন্য এবং চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা, অস্থায়ী ব্যবসা, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুপারিশে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ তে লাবণ্য দাস বি.টি. পাশ করে স্কুলে চাকরি পেলে প্রাথমিক সমস্যা মেটে বটে কিন্তু উদ্‌বেগ কমেনি।

১৯৫২-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার মাস বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে লিভ ভ্যাকেন্সিতে অধ্যাপনা করেন। কাগজ দেখে আবেদন পত্র পাঠিয়ে ১৯৫৩ মার্চে ফকিরচাঁদে কলেজ, ডায়মণ্ডহারবারে, গোপাল রায়ের সুপারিশে চাকরি হলেও সাংসারিক অসুবিধার কারণে যোগ দিতে পারেননি, ফলে টুইশন নির্ভরই জীবনই চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি উক্ত শ্রীরায়ের চেষ্টাতেই অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা পেলেন, সেখানেই আমৃত্যু চাকরি করেছেন। ইত্যবসরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের তৎপরতায় ডি. পি. আই পরিমল রায়ের সাহায্যে এবং রাজ্য সরকারের এবং দিল্লির একটি কলেজে চাকরির সুযোগ এসেছিল, জীবনানন্দ যেতে চাননি। কলকাতায় এসময় কবি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সহকর্মী ও ছাত্রীদের কাছ থেকে যেমন তেমনি কবি হিসেবেও ব্যাপক প্রীতি সমাদর ও মর্যাদা লাভ করছেন। কবিমহল ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন' ১৯৫২ তে সিগনেট প্রেস

প্রকাশ করে। গ্রন্থটি নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেল।১৯৫৪ জানুয়ারিতে সিনেট হলের কবি সম্মেলনে কবি স্বরচিত পড়ে শোনালেন। এ বছরই ১৩ই অক্টোবর বেতারকেন্দ্রের কবি-সম্মিলনে কবিতা পড়লেন।১৪ই অক্টোবর বিকেলে অন্যমনস্ক কবি রাসবিহারী ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে চাপা পড়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি হলেন। সেভাবেই কয়েকদিন কাটল, শেষে সেপটিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪র ২২শে অক্টোবর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাব্যকথা—জীবনানন্দ শৈশবের মায়ের কাছে কাব্যচর্চার প্রেরণা পেয়েছেন। মা কুসুমকুমারী সংসারের কাজের ফাঁকে কাব্যচর্চা করতেন। স্বভাবকবির নৈপুণ্যে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল', ও 'প্রবাসী'তে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বাবা সত্যানন্দ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' সম্পাদনা করেন। এখানেই জীবনানন্দের 'বর্ষা আবাহন' শীর্ষক কবিতা এপ্রিল ১৯১৯ (বৈশাখ ১৩২৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সদ্য বি. এ. পাশ করেছেন। কবিতাটির কোন অসামান্যতা ছিল না। পরে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে "দেশবন্ধু প্রয়াণে" বঙ্গবাণী'তে, এবং অন্যান্য কবিতা কল্লোলে, প্রবাসী, ধূপছায়া, বিজলী, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা ৫৯৯টি (দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ কাব্যসংগ্রহ)।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঃ 'ঝরা পালক' (১৩৩৪), পুণর্মুদ্রণ (১৩৭৯),

২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ;

৩. 'বনলতা সেন' (১৩৪৯), কবিতা ভবন সংস্করণ ; দ্বিতীয় সংস্করণ সিগনেট, (১৩৫৯) ;

৪. 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১), পূর্বাশা সিগনেট সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৫. 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৬. 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৬১), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ; তৃতীয় সংস্করণ (১৩৬৭), চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭০), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৩) দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ (১৩৯০),

তারপর এ পর্যন্ত প্রকাশিত—

৭. 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), দেবেশ রায় সম্পাদিত সং (১৯৮৪) ;

৮. 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৬৮) ;

৯. 'সুদর্শনা' (১৩৮০), ইং (১৯৭৩) ;

১০. 'মন বিহঙ্গম' (১৩৮৬), ইং (১৯৭৫) ;

১১. 'আলো পৃথিবী' (১৩৮৮), ইং ১৯৮১ প্রভৃতি।

প্রকাশক ঃ শ্রী গোপাল রায়, সাহিত্য সদন। এই গ্রন্থত্রয়ী তালিকাবন্ধ হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা) 'জীবনানন্দ' পুস্তকে।

৫১.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ বনলতা সেন

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হায়ায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেল পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৫১.৫ সারাংশ — ১

অনেক আবেগ আকাঙ্ক্ষা আকুলতা নিয়ে অন্বেষায় স্বপ্ন যখন ক্লান্ত, পথকে মনে হয়েছে দূরপ্রসারী, জীবনের চারিদিকে সফেন সমুদ্র উদবেল হয়ে উঠছে কিন্তু হাঁটার শেষ হয়নি — সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগর পর্যন্ত — বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ পেরিয়ে সুদূর বিদর্ভ নগরে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের কল্প জগতের সন্ধানে, এমনই সময় মিলেছে দুদণ্ডের শান্তি —

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলেছে সে
এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

আতপ্ত হৃদয় অবশেষে দিনের শেষে, সন্ধ্যা নামে জোনাকি জ্বলে, সেই অন্ধকারে সব কাজ সেরে মুখোমুখি বসবার অবকাশ পায়।

৫১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম প্রকাশ 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪২এ) মোট ১২টি কবিতা নিয়ে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯ ইং ডিসেম্বর ১৯৪২। গ্রন্থটি প্রকাশমাত্র নামকবিতা সহ কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করেন। 'কবিতায়' বুদ্ধদেব বসু ও 'চতুরঙ্গো' আবুল হোসেন চৈত্র, ১৩৪৯ ; 'একক'-এ শুদ্ধসত্ত্ব বসু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিরুক্ত', আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'বনলতা সেন' কবিতা সম্পর্কে তাঁর কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'জীবনানন্দের কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত। দূর দেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গো আকাশ-বিহারী, কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। জীবনানন্দের জগৎ সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। .... তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল। তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তবে, প্রথমে দৃষ্টি, পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শ পিপাসু। ....জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "উপমাই কবিত্ব।" তাঁর কবিতায় উপমার ছড়াছড়ি। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দুরবগাহ। — কোন অভিনব বিশেষণ, কিংবা পুরানো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্য পদের রূপক প্রয়োগ — এ সমস্তই তো উপমা। — জীবনানন্দ যখন বলেন — বলেছে সে, "এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। — তখন বোঝা যায় কবির মন কীভাবে কাজ করেছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গো পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশ কালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

আবুল হোসেনের বক্তব্য — জীবনানন্দ একান্তভাবেই বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক। রবীন্দ্র ঐতিহ্যমুক্ত হয়েও, তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক। ভাবকে তিনি কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। .... কবির কাব্যের প্রাণ হল অদ্ভুত মিশ্রণে, অতীতের সঙ্গো বর্তমানের। পুরোনোর সঙ্গো নতুনের। অসম্ভবে-সম্ভবে এসে দেখেন নাটোরের বনলতা সেনকে সে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলে "এতদিন কোথায় ছিলেন ?" আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎ স্পর্শের শিহরণ সঞ্চারিত হয়। এটাই জীবনানন্দের টেকনিক। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতে 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের পর এত সুন্দর ও সার্থক রোমান্টিক কবিতা আর সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনানন্দ ইয়েটস-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য খুঁজে পান। বনলতা সেন-এ এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে। কবির প্রেম কাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে— তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'বনলতা সেন'-এ—

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ....।" — নাটোরের একটি সাধারণ নারীকে — কবির প্রেমানুভূতি

কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের যেন কাব্যময় প্রতীক সে। বনলতা সেন' প্রেমের নিবিড়তায় মূর্ত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে রূপ জীবনানন্দ সৃষ্টি করেন আবেগের তাড়নায় তা শুধু দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয়, তা উপলব্ধিরও—এখানেই জীবনানন্দের স্বচেতন স্বকীয়তা।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পর্বে কবিও কবিতা পত্রিকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হল। তিরিশের দশকে যে কবির কাব্যযাত্রা শুরু প্রায় এক দশক পরে তার প্রাথমিক স্বীকৃতি লাভ ঘটল। এই বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণও যে স্বয়ং জীবনানন্দের—তাঁর অন্তর্মুখী গহন মন, গভীরতর ভাবানুভূতি, তাঁর অভাবনীয় কল্পনার ঐশ্বর্য, শব্দ নির্বাচন ও চিত্র রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা। তাই 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিচার বিশ্লেষণে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি এক সময় কাব্যালোচনার আসরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেউ কেউ একে কবির শ্রেষ্ঠর রচনা বলেছেন।

তিন স্তবকে ১৮ ছত্রে রচিত কবিতাটি কতকগুলি অপ্রত্যাশিত শব্দযোজনায় এমন একটি অসামান্য কাব্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির আরম্ভ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—যেন কোন দূরাগত কল্পনার জগতে জীবনের আভাস নিয়ে এসেছে—এই নিরন্তর চলার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোল ছাড়িয়ে কিছু আছে। কিন্তু কবিতা কবির অনুভব থেকে সৃষ্ট—এর উৎস, আদি-অন্ত্য সন্ধান দূরবগাহ। তাই সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর বিম্বিসার অশোকের বস্তু জগৎ থেকে কল্পনা ব্যঞ্জনার্থ সন্ধানই স্বাভাবিক। এ থেকে একটি দেশে ও কালে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ জগতের যখন আভাস আসছে, তার মধ্যে অকস্মাৎ কোনো পরিচয়হীনা নাটোরের বনলতা সেন, যার প্রসঙ্গ টেনে তারই কাছে জীবনের সফেন সমুদ্রে ভাসমান নিদারুণ অস্তিত্বের ভারে ক্লান্ত প্রাণের দুদণ্ড শান্তি পাওয়ায় সংবাদ—বস্তুত, সেই রমণীয় অসামান্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপস্থাপনার অভিনবত্বে নাটোরের বনলতা সেন কাব্য রসিকের কাছে হেলেন বা বিয়াত্রিচের মতো চিরকালের একটি স্মরণীয় প্রতিমা হয়ে আছে।

কবিমানসী সম্পর্কে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা মনোলোকের বাসিন্দা, অদেহী—প্রকৃতির বিচিত্র মহিমায়—সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণে, উষার কনক স্বর্ণে, নীল আকাশের নীলিমায়-স্বপনচারিণী। বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্ণুদের কাছে তারা শরীরী রক্তমাংসের নারী—তাই তাদের নাম রূপ আছে—এমনকী জীবনানন্দে গাঁই গোত্রটি পর্যন্ত—নাটোরের বনলতা সেন। রোমান্টিক প্রেমের অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকা এখানে দেহী এবং ভৌগোলিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তী স্তবকেই তাঁর একটি বর্ণনা পাই। বনলতার উপস্থাপনা পর্বে—তাঁর দুদণ্ডের শান্তি দেওয়ার জন্য যে প্রশান্ত মাধুর্য পাঠক উপলব্ধি করেছে, তাতেই অনুভব করা গিয়েছে তার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আকর্ষক ও পরম রমণীয়তা। কবির দেওয়া বর্ণনায় জানা যায় কবি কী করে তিলে তিলে তাকে সৃষ্টি করেছেন—শব্দকে কত সহজে ব্যবহার করে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করা যায়। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য। কালিদাসের কল্পনা সৃষ্টি সৌন্দর্য জগতের সেই অস্পষ্ট কল্প জগতের বিদিশার অন্ধকার রাত্রির থেকেও কালো যাঁর চুল, মুখ যাঁর প্রাচীন ভাস্কর্যকলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো—এমনই একজন বনলতা সেন। এই উল্লেখেই পাঠক কবির সঙ্গে কবি অনুভূত সৌন্দর্য জগতে বিচরণ করে এমন কোনো এক রমণীয় রূপকে কল্পনা করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে যেন এক অপ্রত্যাশিত জগতের আরও এক অপ্রত্যাশিত নারীর সন্ধান দিলেন, যা ছিল এতদিন একেবারেই অভাবনীয়। বনলতা সেন, তাই এক সচকতি-করা কবিতা। আজও বনলতার চোখের বর্ণনা—'পাখির নীড়ের মতো চোখ'—শুধু একটি চিত্রকল্প নয়, তা যেন গভীরতর ব্যঞ্জনায় সঞ্চার করে অন্তর্লোককে আচ্ছন্ন করে। এদিক থেকে পাখির নীড় শুধু নীড় নয়, পাখিদের ক্লান্তি

অপনোদন ও শান্তির নীড়। সেই বিশ্রান্তি ও শান্তির আশ্বাস আছে বনলতার চোখে—সে চোখ আশ্রয় দেয়, ক্লান্তি অপনোদন করে, শান্তি দেয়। উপমাটি এদিক থেকে সার্থক। কবিতাটি এখানেই শেষ হয়নি। এরপর জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে আপাত বিষাদময় গোধূলির এক নিঃসঙ্গ জগতে নিয়ে গেছেন—"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী"—এই প্রত্যাবর্তনের বার্তা মাত্র দুটি শব্দে বিধৃত হলেও, এর গভীরতা সুদূর প্রসারী। কবি কবিতার প্রথমেই কাল স্রোতের প্রবহমানতার ইঙ্গিতের (হাজার বছর ধরে পথ হারায়) সঙ্গে চিরন্তন নিঃসঙ্গতার সহজ সত্যের আভাস দিয়েছেন, তা দ্বিতীয় একটি ঘটনার পটভূমি রচনা করেছে। 'সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন'—জীবনের দুকূল বেয়ে চলার নদী বা কালপ্রবাহের পরেও অবশিষ্ট থেকে যেটুকু সময়, সেটিই তো কবির কল্পজগৎবাসিনী কবি মানসীকে একান্ত আপন করে পাবার মুহূর্ত — "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"—বনলতা সেন তারই মূর্ত প্রতীক। বনের লতা যেমন চির শ্যামলতার প্রতীক তেমনি বনলতা সেনও মানবীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিময় প্রকাশ—সে ক্লান্তিহারী শান্তির নিশ্চিত আশ্রয়। এদিক থেকে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু কবিতাটির কোথাও বনলতাকে প্রিয়া সম্বোধন বা কল্পনা করা হয়নি—কবির আচরণেও তার আভাস নেই। তাই কবিতাটিকে বলা যায় নির্বিশেষে প্রেমের কবিতা—নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, পারস্পরিক আকর্ষণ এই কবিতাটিকে অনেকটা রহস্যময় করেছে।

কোনো কোনো সমালোচক এজন্য বনলতা সেন কবিতায় মহাসময়ের সঙ্গে মহাজীবনের অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে দেখেছেন। তাঁদের মতে কবি যেমন বর্তমান সময়গ্রন্থিতে নিবিষ্ট, নাটোরের বনলতা সেন তেমনি আছেন। এতে যেমন অন্ধকার অতীত ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ মাঝে দুদণ্ডের শান্তির বর্তমান—কিন্তু সেও অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই মিলন মুহূর্তেই বলেছে—'এতদিন কোথায় ছিলেন?' ইতিহাসের অতীতের জীবনবোধের যে কল্পছবি কবির মনে ধরা পড়েছে, তা-ই তিনি দেখতে পেয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন ও যাঁর 'চুল .... কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার' মতো, তাঁর মুখ যেন "শ্রাবস্তীর কারুকার্য"। কালপ্রবাহে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একাকার হওয়ার কথাই এ কবিতার কথা — মনে করেছেন কিছু সমালোচক। এভাবে কবিতাটিকে চিরন্তনের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে বনলতা সেন। অপর সমালোচক ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু এই কালচেতনার মধ্যে ইতিহাসবোধ, ইতিহাস চেতনাকে অধিকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—"কবি তাঁর মানসপরিমণ্ডলে প্রেম হোক আর প্রকৃতি হোক, কিম্বা জীবনের বিবিধ বোধের ব্যাপারই হোক, কালজ্ঞান এবং ইতিহাস চেতনার বেধ ও পরিধিতেই তিনি তার রূপদান করতেন।"

তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিসরের ব্যাপ্তিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে—"এমন কি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ জীবন-সংগ্রামে নিরত থেকেও নারীর প্রতি ভালোবাসা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকেনি। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটার প্রতীকতায় সেই চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। অতীতের শ্রাবস্তীপুরীর শিল্পী নিজ অন্তরের সংবেদনশীলতায় যে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—সেই মমতার প্রতিচ্ছবি বনলতা সেনের মুখে। একবার সিংহল সমুদ্র, পরমুহূর্তেই মালয়-সাগর, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগৎ থেকে অবশেষে বর্তমানে নাটোরের বনলতা সেনকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে কালচেতনার কথা বলেছেন—"কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" এই ইতিহাস চেতনাও কালজ্ঞান কবির মনোলোককে উদ্বেল করলেই, তিনি ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই "অপরিহার্য সত্যটি" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণেই তিনি তাঁর নায়ক নায়িকার নামের সঙ্গে উপাধি বসিয়ে বাস্তববোধ সঞ্চার করে তাঁদের প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন। এজন্যই তিনি অনায়াসে অতীতের শ্রাবস্তী থেকে বর্তমানের নাটোরের মুহূর্তে পাড়ি জমাতে পেরেছেন। জীবনানন্দের কল্পনার এই অভাবনীয় ব্যাপ্তি প্রসৃত সময়সীমা ও ভূগোলচেতনার এই বিস্ময়কর ও অভিনব সমীভবনের জন্যই তাঁর পাঠকদের চমকিত করেছে।

জীবনানন্দের কবিতায় শুধু কাল-ইতিহাস-কল্পনার কথাই বা বলি কেন, তাঁর প্রকৃতিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখবার, উপভোগ করবার ও পাঠককে সেই অনুভূতির অংশীদার করবার জন্য অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু চোখ দিয়ে প্রকৃতির রূপ মাধুরী দেখেননি, কান দিয়ে তার ধ্বনি মাধুর্য শুনেছেন, মন দিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে অনুভব করেছেন। এভাবে তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়ের বস্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। যেমন, আলোচ্য বনলতা সেন কবিতার তৃতীয় স্তবকে 'শিশিরের শব্দ' 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ'। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ভাবা যায় না। রোদের বর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় হলেও, গন্ধ তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের। কিন্তু কবি তাঁর তীব্র ও গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে রৌদ্রের ঘ্রাণ উপলব্ধিগম্য করে নিয়েছেন। এখানেই ফুটে উঠেছে কবির ইন্দ্রিয় সচেতনতা—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় sensuousness বা ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। এরকম আরও অনেক উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়—'ঘুমের ঘ্রাণ', 'বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ'।

জীবনানন্দ কাব্য শরীর সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৌশল, পদবিন্যাস, উপমা ব্যবহার বাকপ্রতিমার রূপনির্মিতিতে তিনি একক ও অনন্য। নিজের ভাষা বলয়ে তিনি বার বার আবৃত হয়েছে। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি অপ্রচলিত শব্দ, গ্রাম্যশব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কাব্যের কায়াগঠনে এরা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক আশ্চর্য মায়াময় জাদু সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে জীবনানন্দের সমাজ সচেতনতা এবং বাস্তববোধ সম্পর্কিত কিছু কবিতায় বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভাবজনিত কারণে অতি দ্রুততায় চিত্র থেকে চিত্রান্তরে গিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অসংগতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'বনলতা সেন' এদিক থেকে একটি নিটোল শিল্পরূপময় কবিতা। এ কবিতার কোন শব্দই দুরূহ বা নতুন নয়। কোথাও কোনো শব্দকে নিয়ে কষ্ট কল্পনার অবকাশ নেই। চিত্ররচনায় অনন্য ও অসামান্য এক শিল্পিত মননের পরিচয় আছে। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ যে চিত্র তুলে ধরেছে। তা শব্দার্থকে অতিক্রম করে নতুনতর ব্যঞ্জনায়, অন্যতর ভিন্নতর অর্থ দ্যোতনা করে। এবং সেটি মন ও অনুভূতি নিয়ে বোঝবার বিষয়। এ না হলে নিছক অভিধানের শব্দার্থ দিয়ে এর মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। জীবনানন্দের ছত্র—'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' বা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—ধ্বনি সুষমা তাঁর রোমান্টিক মনটিকে তুলে ধরবার সঙ্গে, পাঠকের চৈতন্যের গভীরে সাড়া দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

ছন্দ ব্যবহার জীবনান্দ মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি ৮ + ৮ + ৬ মাত্রার তিনটি পর্বে ২২ মাত্রার ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন।

হাজার বছর ধরে / আমি পথ হাঁটিতেছি / পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে / নিশীথের অন্ধকারে / মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ;/

এর মিলের ক্ষেত্রেও কিছু অভিনবত্ব আছে। মিলবিন্যাস মূলত একান্তরিক, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠে দ্বিপদী মিল। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপ মিল থাকলেও ছত্রের মাত্রা বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। তৃতীয় স্তবকেও মিল একই রকম তবে ছত্রের মাত্রাবিন্যাস ভিন্নতর।

অলঙ্কার প্রয়োগে উপমা কালিদাসস্য-র পর বোধ কবি জীবনানন্দের কথা বলতে হয়। "উপমাই কবিত্ব"—এ কথার কথক-এর কয়েকটি উদাহরণ 'বনলতা সেন' থেকেই দেওয়া হল ঃ

* "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ"
* "চুল তার কাব্যের অন্ধকার বিদিশার নিশা"
* "বলেছে সে — এতদিন কোথায় ছিলেন ?

পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

দুটিই লুপ্তোপমার উদাহরণ। দুটিতেই উপমান ও উপমেয় থাকলেও সামান্য ধর্ম অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টিতে চোখ উপমেয়, পাখির নীড় উপমান, মত সাদৃশ্যবাচক শব্দ কিন্তু সামান্য বা সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। পাখির নীড় যেমন স্নিগ্ধ ও শান্ত, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নিগ্ধ ও শান্ত—এটি পাঠককে ধরে নিতে হয়েছে।

যে কোনো মহৎ কবির মতো জীবনানন্দের কবিতার উৎস তাঁর মনে, তাঁর অনুভবে—অন্তর্লোকের রহস্যময় পথে তার জন্ম। এই জন্মের সঙ্গে সহজাত তার শব্দ-ছন্দ-ধ্বনি-অলংকার। এ সবই ভাব ভাবনাকে রঙ, রূপে, রসে প্রকাশের জন্য—অর্থে ও ব্যঞ্জনায়। তিনি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন—প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে তাঁর কবিতায় নানা উপমায় প্রতীকিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কালে কালোত্তরে। 'বনলতা সেন' এ যুগের কবিতা পাঠককে 'প্রথম পাঠ' হিসেবে নতুনতর পথ দেখিয়েছে।

প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ঃ

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি — হাজার বছর ধরে কোনো মানুষের পক্ষে পথ হাঁটা সম্ভব নয়, তথাপি এ শব্দ গুচ্ছের ব্যঞ্জনায় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত অন্তহীন পরিক্রমা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বাস্তবের সত্য নয়, কবির অনুভবের সত্য। জীবনের সফেন সমুদ্র মন্থন করতে করতে এই অনন্ত যাত্রার জন্যই ক্লান্ত প্রাণ দুদণ্ডের শান্তি প্রত্যাশা করে। অন্বিষ্ট সেই অধরা ভাবের যদি মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ হয় বনলতা সেন, তার পক্ষেই সে শান্তির আশ্রয় দেওয়া সম্ভব।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক — ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের মতো এ যুগের অনেক আধুনিক কবির অন্যতম প্রধান সুর। এই চেতনা অবশ্য সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়নি। যুগের বন্ধ্যা রূপ, অচরিতার্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর উৎসার। রবীন্দ্র-কবিভাবনায় রোমান্টিক হৃদয়াবেগ মানসী, মানসসুন্দরীর ভাব ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হত। আধুনিক কবিরা বস্তুবিশ্বে, ভাব ব্যঞ্জনার পরিবর্তে সব কিছুকেই শরীরী করতে চেয়েছেন, তাই জীবনানন্দও তাঁর কাব্যে প্রধানত বাস্তব সূত্রকে অবলম্বন করে তাকে প্রকাশ করেছেন। অন্তহীন পথ চলার শেষ নেই, তথাপি ক্লান্ত দেহমন-এর ভারাক্রান্ত রূপটি এ ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন—

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—"বিশেষ লক্ষ্য করতে হবে 'দু-দণ্ড' শব্দ বন্ধ। এই শান্তি

ক্ষণকালীন, কারণ মানুষের যাত্রাপথে আশ্রয়, শান্তি ও স্থিতির ধ্রুব আশ্বাস নিয়ে কোনো বনলতা সেনের আবির্ভাব ঘটেনি। ইতিহাসের কোনো কোনো সিন্ধ লগ্নে চকিত-উদ্ভাসে হঠাৎ কখনও দেখা যায় তাকে, যেমন কবি দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বাসী কৈশোরে, নাটোরের কোনো এক বসন্তের ভোরে।"

সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী ফুরায় — এ-জীবনের সব লেনদেন— 'সব নদী' শব্দ যুগ্মের সংকেত একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। দিনান্তে পাখির ঘরে ফেরা, তার শান্তি নীড়ে ফেরা। নদী ফুরায় জীবনের লেনদেন — অংশটির তাৎপর্য হল নদী ও মানুষের জীবন বস্তুত একটি প্রবহমান ধারা — জীবনের লেনদেন মিটিয়ে যেমন মানুষের জীবনাবসান, নদীও তার উৎস থেকে নিরন্তর চলার পর সে মহাসমুদ্রে তার চলার অবসান হয় অর্থাৎ সমুদ্রে লীন হয়ে নদী তার নিজস্বতা হারায়। মানুষও তার জীবনের সমস্ত কর্ম অবসানে, জীবনের সমস্ত দেনাপাওনা সেরে, নীল মৃত্যু উজাগর অন্ধকারে বিলীন হয়।

অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে নিন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশগুলি ভালো করে পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) অনেক ঘুরেছি আমি ; ________ ________ ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে ________ ________,

খ) সমস্ত দিনের শেষে ________ ________ মতন

________ আসে ; ডানার ________ ________ মুছে ফেলে চিল ;

গ) জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ________ প্রকাশ ________ পত্রিকায়, বৈশাখে ________।

ঘ) জীবনানন্দের জন্ম ________ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ________ খ্রিস্টাব্দে।

ঙ) নজরুলের ________, যতীন্দ্রনাথের ________ এবং মোহিতলালের ________

উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক ________ নিয়ে আসে।

২) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) 'কল্লোল'-'কালিকলম' পত্রিকার সমসাময়িক দুটি পত্রিকার নাম করুন।

৫) 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ায় লালিত তিনজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৬) বুদ্ধদেব বসুর শেষের দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৭) জীবনানন্দ স্বল্প সময়ের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। পত্রিকাটির নাম কী ?

৮) জীবনানন্দের এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা কত ?

৯) ‘উপমাই কবিত্ব’ কে বলেছেন ?

১০) ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থটি ‘কবিতা ভবন’ প্রকাশিত সংস্করণ করে প্রকাশিত হয়েছে ?

১১) জীবনানন্দ কথিত ‘কালচেতনা’ বিষয়টি একটু বুঝিয়ে লিখুন।

৫১.৭ মূলপাঠ — ২ ঃ বিড়াল

বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গো ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় ঃ
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ’য়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ায় গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

৫১.৮ সারাংশ — ২

সারাদিনই একটা বিড়ালের সঙ্গো গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতর, বাদামি পাতার ভিড়ে দেখা হয়। মাছের কাঁটা বা অন্য কিছুতে নিজেকে নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকে। তবুও সে দিনমানে কৃষ্ণচূড়া গাছ আঁচড়ায়। হেমন্তের সন্ধ্যায় অস্তায়মান সূর্যে তাকে খেলতে দেখা গেলেও যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তাকে আর দেখা যায় না।

৫১.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বিড়াল' কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩৬-৪৩ (ইং ১৯২৯-১৯৩৫) প্রকাশ 'কবিতা'য় চৈত্র, ১৩৪৩। বারোটি কবিতা নিয়ে কবিতা ভবন প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় এটি প্রকাশিত হয়, পৌষ ১৩৪৯ (ডিসেম্বর, ১৯৪২-এ) কবি নিজেই এর প্রকাশ ছিলেন। সিগনেট প্রেস-এর দ্বিতীয় পরিচিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৯ (১৯৫২) তারিখে প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে 'বনলতা সেন'-এর প্রথম সংস্করণের বারটি কবিতা সহ আরও কিছু কবিতা নিয়ে পূর্বাশা প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী' (প্রকাশ ১৩৫১—ইং ১৯৪৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটির প্রথম তিনটি ছত্রে একটি বিড়ালের কতিপয় বর্ণময় সহজবোধ্য চিত্র সংকলন মনে হলেও চতুর্থ ছত্রে পৌঁছে "তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর / নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মত নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি।"—ইত্যাদিকে অকস্মাৎ যেন একটি চিন্তার উল্লম্ফনের মুখোমুখি হতে হয়। পরবর্তী স্তবকে "সূর্যের নরম শরীরে শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা" করা বা ছোটো ছোটো "বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে" আনা প্রভৃতিতে আবার সেই অনুভবের আলো-আঁধারি দেখা যায়।

'বিড়াল' বস্তুত 'সুররিয়ালিস্ট' বা 'পরাবাস্তব' বা 'অধিবাস্তববাদী' কবিতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি ১৯১৫-১৬ তে প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুরোপের বিধ্বস্ত সমাজজীবনে মূল্যবোধের ভয়াবহ অবক্ষয়, অশান্তি ও বিষণ্ণতার ঘূণ বাসা বাধে। বাণিজ্যিক লেনদেন সর্বস্ব সেই সমাজে হৃদয় বৃত্তির কোনো মর্যাদা ছিল না। মানুষও বস্তুমূল্যে (commodity) বিকোচ্ছে — একটা গোপন হতাশা সর্বত্র দানা বেঁধে ওঠে। ইতোপূর্বে উনিশ শতকে পশ্চিম মহাদেশে অগ্যস্ত কোঁতের 'ধ্রুববাদ', কার্ল মার্ক্সের 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' সনাতন দার্শনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে। গির্জা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আপ্তবাক্যের বাইরে মানুষ তাঁর অস্তিত্বের নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মানবমনের স্বরূপ বিশ্লেষণ—চেতন, অবচেতন, অচেতন স্তর বিভাজন এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তব জীবন থেকে মানবমনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ বিশ শতকের প্রথম ভাগে যুদ্ধভীত নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের মনে এক ধরনের সমাজবিচ্ছিন্ন প্রবণতার সৃষ্টি করল। ১৯১৭ তে সোভিয়েত বিপ্লবের পর সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার (Socialistic Realism)-এর দাবি উঠেছিল, সেই সমকালেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটের প্রেক্ষাপটে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'সুররিয়ালিজম' বা 'অধিবাস্তববাদ'। এঁরা শিল্পে সাহিত্যে অবচেতন মনের ছিন্নভিন্ন কল্পনাকে প্রতিফলিত করতে মনোনিবেশ করলেন। এতে অবচেতন মনের প্রাধান্য স্বীকৃত হল। যেহেতু অবচেতন মানসে পারম্পর্য থাকে না, সুবিন্যস্ত চিন্তাপদ্ধতিও থাকে না, সব কিছুই প্রায় এলোমেলো, বিশৃঙ্খল — সেগুলি যে অবস্থায় যেমনভাবেই আসুক না কেন, তাকে সুররিয়ালিস্টরা যথাযথভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিশৃঙ্খল যুক্তিহীন, অবচেতন মানসের চিন্তালোকের অবিকল উন্মোচনই হল সুররিয়ালিস্ট কবিকর্ম। যেহেতু অবচেতন মনের যুক্তিহীন ভাবনাগুলিকে সজ্ঞান মনের বোধ দিয়ে যুক্তির আলোয় পরিমার্জিত করা যায় না, তাই অধিবাস্তববাদীরা চেতন জগৎ এবং অবচেতন জগতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা ভেঙে দিলেন। অন্তর্চেতনার জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কোনো বাধা থাকল না, চেতনলোকের বাস্তব আর মগ্নচৈতন্যের অতিবাস্তব একাকার হয়ে গেল—চিন্তা, কল্পনা এবং স্বপ্নের জগতের একীভবন ঘটল। সাহিত্যে ও শিল্পে এর ফলে এক বিপ্লব ঘটল।

কবি ও পাঠক যেহেতু বাস্তবজগতের অধিবাসী তাই বস্তুবিশ্বের ঘটনাবলির প্রতি তার আকর্ষণ, মগ্নচৈতন্যের স্বপ্নালোকে তার বোধের মধ্যে কাজ করে না, পক্ষান্তরে এই ধারণার বিপরীতে যে শিল্পীরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে মগ্ন চৈতন্যের জগৎ-ই বাস্তব—তাঁদের মতে স্বপ্ন তো বাস্তবেরই একটা জট পাকানো প্রতিরূপ। তাই স্বপ্ন বস্তুবিশ্বের কাছে অপরিচিত বা alien নয়। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে মিল রচনা করাই শিল্পীয় কাজ। ভাষা দিয়ে ভাষাতীতকে ব্যঞ্জিত করাই সুররিয়ালিজমের কবি-ধর্ম। সুরয়ালিজমকে তাই কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন—নিজের মগ্নচৈতন্যে ডুব দিয়ে অবচেতন মনের রহস্য সন্ধান করা। তাই কবি যখন নিজের বোধের সাহায্যে বস্তু ও বিশ্বকে জানেন, নিজের অবচেতন ও মগ্ন চৈতন্যকে জানেন তখনই সুররিয়ালিজমের সৃষ্টি হয়। এরই প্রকাশ যে কাব্যে তাই সুরলিয়ালিস্ট কাব্য।

সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদ ও অধিবাস্তববাদ সমগোত্রীয় না হলেও, তাদের মধ্যে সামান্য মিল দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের কালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা আশার আলো দেখিয়েছিল, সেদিনের সমস্যাজীর্ণ মানুষ এরই মধ্যে আগামী দিনের স্বপ্নোজ্জ্বল সম্ভাবনাকে দেখছিল। আর এ সময়েই একদিকে যেমন সুররিয়ালিজমের প্রথম দলিল প্রকাশিত হয়েছে (১৯২৩) — রবীন্দ্র ঐতিহ্য বিরোধিতার শুরুও এ সময়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্লোলীয় কবিদের যে দ্বন্দ্ব তা সবকিছুকে অস্বীকার করবার মধ্যে নয়, অংশত রোমান্টিকের সঙ্গে সুর-রিয়ালিস্ট কবিদের দ্বন্দ্ব। কবি জীবনানন্দ এঁদেরই একজন। পশ্চিমি কবিরা একেই বুঝিয়েছেন — প্রকৃত ও অপ্রকৃত, ধ্যান ও কর্মের মধ্যে সম্মিলন বা 'সুপাররিয়াল' বা 'অধিবাস্তব' সত্তা। জীবনানন্দ ঘোড়া, হাঁস, বিড়ালকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। কবি ১৩৪৫-এর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধে রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই।" তিনি আরও বলেছেন সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি, তা সম্পূর্ণত কাব্যে থাকে না........ সৃষ্টির ভিতর নানা শব্দে, বর্ণে, গন্ধে মিশে থাকে। একথা একান্তভাবে সুর-রিয়ালিস্ট কবির পক্ষেই বলা সম্ভব।

জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে প্রয়াসী ছিলেন। 'ঝরা পালক'-এর কাল থেকেই তার সূচনা হয়েছে। কল্লোলের বিদ্রোহের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও স্বাধীনতার স্বাদ নিতে চেয়েছেন—

> একদিন শুনেছ যে সুর — / ফুরায়েছে — পুরানো তা — কোন এক
> নতুন কিছুর / আছে প্রয়োজন / তাই আমি আসিয়াছি ; — আমার
> মতন / আর নাই কেউ। (কয়েক লাইন / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের কবিতা কতকগুলির ছবির মতো, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'চিত্ররূপময়'। এ ছবি এক ঝলকে প্রকৃতিকে দেখে নিয়ে আঁকা। তাই রং আলো-ছায়া যেটি মনে গেঁথে আছে, সেটি নিয়ে, তার শিল্পরূপময় একটি ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন, ছবিগুলি খণ্ডাংশে বিভক্ত হয়ে গেছে — তা নিয়ে একটি সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করাই তো সুররিয়ালিস্ট কাব্যের লক্ষ্য। জীবনানন্দ কোনো বস্তুকেই তুচ্ছ করেননি। যে-কোনো প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তু, দেশজ ও গদ্য গান্ধী শব্দে নিরঙ্কুশ ব্যবহার দৈনন্দিনের মৌখিক শব্দ যেমন ঘাস, বিড়াল প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি সাধারণ লোকায়ত কাব্য থেকেও শব্দচিত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিতায় শব্দ ছন্দের অসামান্য অধিকার সত্ত্বেও মিশ্রবৃত্ত বা পয়ার জাতীয় ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন এবং বক্তব্যের প্রয়োজনে কথ্য ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

‘বিড়াল’ কবিতার সূচনা ছত্রটি অথবা “কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে” অনেকটা কথ্য ভঙ্গিতে বর্ণনামূলক বলে মনে হবে, এরই পাশে “হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে” কাব্যরীতি সমান আয়াসে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে কবি অবচেতন মনে যে একটি অন্যতর অনুভব বিরাজ করছে, তা বুঝতে পারা যায়, অকস্মাৎ “তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর” বা “সূর্যের নরম শরীরে সাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা” বা “অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ সচেতন কল্পনার উপকরণ হিসেবে এসেছে। এ সমস্ত কবিতা থেকেই জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যের সুররিয়ালিস্ট বা অধিবাস্তববাদী কবিতার প্রবর্তক বলা যায়।

‘বিড়াল’ কবিতায় বিড়াল প্রাণটির অবতারণা প্রসঙ্গে বাঙালি জীবনে ‘বিড়াল’-এর প্রচলিত ভাবানুষঙ্গ একটি বিচার করা যেতে পারে। এই প্রাণীটি বাঙালির ঘরোয়া জীবনের অনেকটা একাত্ম হয়ে গেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর সঙ্গে একটি অপ্রাকৃত ধর্মীয় সংস্কার যুক্ত হয়ে আছে। আদিম যৌথ জীবনে জনসংখ্যার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনে সন্তান কামনা ও তাঁর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ষষ্ঠী পূজা ও তাঁর বাহন হিসেবে বিড়ালকে মানা হয়েছে। সম্ভবত এক সঙ্গে বহু সন্তান জন্মায় এবং গৃহপালিত বলে সচরাচর অপঘাতে মৃত্যু হয় না বলে বেড়ালকে সন্তানদায়িনী ও রক্ষাকারিণী দেবী ষষ্ঠীর বাহন রূপে গণ্য করা হয়ে থাকবে। দেবমূর্তির বিবর্তনতত্ত্ব অনুসারে আদিতে বেড়ালই যে ছিল আরাধ্য দেবতা পরে নারীমূর্তিধারিণী মাতৃকাদেবী ষষ্ঠীর আবির্ভাব বেড়াল তার বাহনে অবনমনে ঘটেছে বলা যায়। অর্থাৎ এক সময়ে যে প্রাণীটি ছিল গোষ্ঠীগত কুলপ্রতীক, পরে উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারা বিকাশে তার ক্রিয়াকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়, সে হয়ে দাঁড়ায় সন্তানকামনা ও রক্ষণের প্রতীকে। বিড়ালকে মারতে নেই—এই নিষেধ সংস্কার বা ‘ট্যাবু’ই তার প্রাচীন টোটেম মর্যাদার স্বীকৃতি।

জীবনানন্দের কবিতায় বিড়াল অধিবাস্তববাদী একটি প্রত্যয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। কবির অধিবাস্তববাদী আত্মচেতনার আশ্রয়ে তাঁর অবচেতন মনে উদ্ভূত বোধকে তিনি অবিকৃত অবস্থায় এখানে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন, এতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এটি কিঞ্চিৎ দ্বিধাজড়িত সংশয় ও দুরূহ ঠেকতে পারে। বিড়াল কবির কাছে তাঁর মগ্ন চৈতন্যের প্রকাশে যতটাই সহজ ও অভ্যস্ত হোক না কেন, এতে পাঠকের পক্ষে সবসময় তাঁর অন্তর্গহনের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। যেহেতু কবি তাঁর মগ্ন চৈতন্যকে কবিতায় হাজির করতে চান — ফলে যেখানে যুক্তি এবং পারম্পর্য সূত্র ছিন্ন হয়, আর সেটিকে পাঠক তাঁর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গড়ে নেয়—এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন মানসপ্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব। তাই বিড়ালের যে অধিবাস্তববাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হচ্ছে, তা যে কবি ও সমস্ত পাঠকের মানস পরিচয়বাহী হবে—এ দাবি করা যায় না।

‘ঝরা পালক’ (কাব্য রচনাকাল ১৯২৫-২৭) বা ‘বনলতা সেন’ (রচনাকাল ১৯২৫-৩৬)। প্রধানত কবির নির্জনতম পর্যবেক্ষণ বা কবিকল্পনার প্রকৃতি থেকে প্রেমে রূপান্তরের পর্ব। এর ফলে ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত ‘বেলা অবেলা কালবেলা’য় ক্রমশ যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ এর মধ্য দিয়ে অন্তর্লীন নৈরাশ্য ও আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর অন্ধকার টান কবি অনুভব করতে লাগলেন। শেষোক্ত পর্বে তাই প্রেমের চেয়ে অপ্রেমের কথা এসেছে। কিন্তু আলোচ্য ‘বিড়াল’ কবিতায় “আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা’র ভয়াবহ’ প্রকাশ থাকলেও তা ‘চমৎকার’ ভাবে নতুন একটি সৃষ্টি হয়েছে। বিড়ালকে যদি প্রজাবৃদ্ধি বা সন্তানকামনার প্রতীকী দ্যোতনা ধরা যায় তবে এক্ষেত্রে অধিবাস্তববাদী দৃষ্টিতে জীবনের বা সত্তার এক ইতিবাচক প্রকাশ হিসাবে অবশ্যই ভাবা যেতে পারে। কবির মগ্ন চৈতন্যে যে বাসনা বা ক্ষুধা দ্বিধাজড়িত ও অবিন্যস্ত রূপে বিরাজ করছে, তারই কাব্যময় প্রক্ষেপ এ কবিতায় ঘটেছে। মগ্ন চৈতন্যের সব অনুভব যেহেতু সব সময় যুক্তি শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ থাকে না, তাই এ ধরনের কবিতায় অনেক সময় বিশৃঙ্খল—অনেকটা মনে হতে পারে অযৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত।

বিড়ালকে ধরা যেতে পারে কবির মনের অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা দ্যোতক। কবির নির্জ্ঞান মনের মধ্যে জগতের উপর নিজের স্বীকৃতি ও অধিকার স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তার অচরিতার্থতার বেদনাই এ কবিতার উৎসার। সারা দিনই সেই আকাঙ্ক্ষা ঘুরে ফিরে আসে, সে প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় — ছায়া রোদ — বাদামি পাতা প্রতীক মাত্র। কোথাও বা কোন স্থূল বস্তুতে — মাছের কাঁটায়, কিন্তু তার পরই, কোন অন্তর্লীন নৈরাশ্যে মন নিমগ্ন হয় — শাদা মাটির কঙ্কাল — আশা নিরাশার দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা মদির মন দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিয়ে সমস্ত দিনমান কাটায়। অবশেষে হেমন্ত সন্ধ্যার প্রসঙ্গ এসেছে। জীবনের রঙিন স্বপ্নিল শেষ বাসনাটুকুও আলো-আঁধারের শেষ বুনন সৌকার্যে দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত কবির 'সাতটি তারার তিমির'—এর মহীনের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ যুগ যুগান্তরের ঘোড়া আদিম স্মৃতিবাহী নিওলিথ ঘোড়া — যুগান্তরের যৌবন কামনার প্রতীক, যে যৌবন কামনা ঘোড়ার মতোই তেজোদ্দীপ্ত ছিল। আজ তা শুধুমাত্র প্র-ইতিহাসের সাক্ষ্য — প্রস্তরীভূত ফসিল — নিষ্প্রাণ হলেও "এখনও ঘাসের লোভে চরে" — অর্থাৎ কামনা নেই বটে তবে তার স্মৃতি এখনও অন্ধ আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ হেমন্ত। হেমন্ত জীবনানন্দের কাছে শব্দ-গন্ধময়, শিশিরের মতো স্বচ্ছ, সূর্যের আলোর মতো হীরক দ্যুতিসম্পন্ন। এই হেমন্তে যেমন জীবনের মাদকতা আছে, "ঋতুর বাসরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদনা হেমন্তের।" তার রূপে নানা বৈপরীত্যের মিশ্রণও আছে। সে একাধারে পূর্ণতা ও রিক্ততার, জীবন ও মৃত্যুর ঋতু। একাধারে ভরা ফসল ও ফসলকাটা ফাঁকা মাঠেরও ঋতু। এই হেমন্তই আবার "শীতলতার, নির্জনতার, পরিত্যক্ত কালের প্রতীক" — "আবার মৃত্যুর, বিচ্ছেদের, ব্যথার লগ্ন," (দ্রষ্টব্য — অম্বুজ বসু — *একটি নক্ষত্র আসে,* পৃষ্ঠা ১০৮)। হেমন্ত যেমন পূর্ণতার তেমনি হেমন্ত জীবনের বিচ্ছেদ-ব্যথাতুর হৃদয়ের ঋতু। সুতরাং হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রং-এর সূর্য — জীবন প্রান্তের রঙীন স্বপ্নময় কল্পজগতের সূচক। রোমান্টিক মেজাজের কবি জীবনানন্দ যেমন ছিলেন মহৎ প্রতিভার অধিকারী, তেমন তিনি ছিলেন অনেকটাই অন্তরাশ্রয়ী। বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমে তাঁর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্বেও বাস্তবে তাঁর ব্যক্তিসত্তার অপ্রাপনীয়, তাই দেখা যায় তাঁর বাস্তবচেতনা প্রখর থাকা সত্বেও অন্তরলগ্নমানস তাঁর উপর প্রভুত্ব করছে। জীবনানন্দ সুন্দরী প্রকৃতি ও লাবণ্যময়ী নারীকে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর কাছে উভয়ের অনুভব একই রকম, তাই বিড়াল-এ সৌন্দর্য ও প্রেমের জন্য যে-আকুলতা বাস্তবায়িত হয়নি, তাই যেন বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা জর্জর সংবেদনে আলোকহীনতার ম্লান অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

বাংলা কাব্যে জীবনানন্দই বোধ করি সুররিয়ালিস্ট কবিতার পথিকৃৎ। তাঁর এ ধরনের কবিতা ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত থাকবে এটা ধরে নিয়েই সুররিয়াজিমের পথ পরিক্রমায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ঘোড়া, বোধ, —এরকম কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর সুররিয়ালিস্ট কবিতার বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়নি। বিড়াল সম্পর্কে এখানে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যাত হল।

জীবনানন্দ যখন পূর্ণোদ্যমে কাব্যচর্চা করছেন তখন তাঁর সামনে ছিল বলাকা — পুনশ্চ ও লিপিকার কাব্য ও গদ্যভাষা ও ছন্দরীতির ঐশ্বর্য। জীবনানন্দ প্রধানত মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের কবি। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন — কিন্তু এ ছন্দকেও কাব্য ভাবনার মতো তিনি নানাভাবে ভেঙেচুরে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। কাব্যে যেমন, তেমনি ছন্দেও প্রচলিত অনুশাসন ভেঙে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কিছুটা মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছত্রে বেশিরভাগ সময় পর্বে ছত্রে মাত্রাসমকত্ব থাকেনি। একই রীতির কবিতার ছত্রে বিন্যাসে অসমান দৈর্ঘ্য দেখা যায় — কোন ছত্র যদি ২০ মাত্রার ; তো

অপরটি হয়তো ১৬ বা ৩২ মাত্রার। অসমামাত্রিক পংক্তি বিন্যাস সত্ত্বেও জীবনানন্দের 'বলাকা'র ছন্দের মতো ধ্বনির তীব্রতা বা গতির বেগ নেই। তাঁর কবিতার ছন্দগতি 'মন্থর'। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—"যেন ইচ্ছে করে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ না করা, এ ছন্দ থেমে — থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে।"

সারা দিন একটা বিড়ালের সঙ্গে / ঘুরে-ফিরে / কেবলই আমার দেখা হয় /

গাছের ছায়ায় / রোদের ভিতরে / বাদামি পাতার ভিড়ে /

কবিতার ছন্দটি অসম মাত্রিক ছন্দে ধীর মন্থর গতিতে চলছে তো চলছেই, শেষে সপ্তম ছত্রের শেষে তার বিরতি ঘটেছে।

অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় নির্দেশ অনুসারে ৫১.৯ অংশটি বার বার ভালো করে পড়ে উত্তর করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কোথাও কয়েক টুকরো ________ ________ সফলতার পর
তারপর ________ মাটির ________ ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে ________ মতো ________ হয়ে আছে দেখি।

(খ) হেমন্তের সন্ধ্যায় ________ রং-এর সূর্যের ________ ________
________ থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে ________ করতে দেখলাম তাকে ;

(গ) 'বিড়াল' কবিতাটির রচনাকাল ________ ________ প্রকাশ ________ চৈত্র ________।

(ঘ) 'বিড়াল' বস্তুত ________ বা ________ বা ________ কবিতা।

(ঙ) বিশৃঙ্খল ________ ________ মানসের ________ যথার্থ ________ হোল সুররিয়ালিস্ট।

(চ) কবি যখন নিজের ________ সাহায্যে ________ ও বিশ্বকে জানেন, নিজের ________ ও ________ চৈতন্যকে জানেন তখনই ________ সৃষ্টি হয়।

২) 'বিড়াল' কবিতাটিকে অনেকে অধিবাস্তববাদী বা সুররিয়ালিস্ট কবিতা বলেন। আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩) 'সুররিয়ালিজম' বা 'অধিবাস্তববাদ' সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

৪) 'বিড়াল' সম্পর্কে প্রচলিত ভাবানুষঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫১.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ ভিখিরী

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবে মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত ;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো —
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু — হ্যারিসন রোডে — আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরীর ভুলে ঃ এক পৃথিবীর ভুলচুক।

৫১.১১ সারাংশ — ৩

কবিতার প্রথম স্তবকে কিছু প্রাপ্তির কথা। তারপরই অজ্ঞাত বিশ্বে নিজের স্থান করে নেবার আকাঙ্ক্ষা ও তাতে বিপর্যয়ের আভাস।

দ্বিতীয় স্তবকের সূচনায় সেই প্রাপ্তি কথা, আর স্বপ্ন সম্ভব সমৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রত্যাশা কিন্তু শেষ পরিণামে শুধু স্বপ্নভঙ্গা।

৫১.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

কবি জীবনানন্দের 'ভিখিরী' কবিতাটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকার পৌষ, ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সিগনেট দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬১) এটি সংযোজিত হয়েছে।

‘বনলতা সেন’-এর কবিতাগুলি ১৯২৫-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। আর এরই পাশাপাশি ‘মহাপৃথিবী’ ও ‘সাতটি তারার তিমির’-এর কবিতার রচনাকাল যথাক্রমে ১৯২৮-১৯৪১, ১৯২৮-৪৩। অর্থাৎ তিনটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাই কালের দিক থেকে ১৯২৯-৪৩ এই শেষ প্রান্তীয় সীমায় কতকগুলি জটিল ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসে রচিত।

‘ভিখিরী’ কবিতার একবছর পরে পৌষ ১৩৪৮ ‘নিরুক্ত’ পত্রে প্রকাশিত ‘লঘু মুহূর্ত’ (‘সাতটি তারার তিমির’ গ্রন্থে সংকলিত) কবিতাটি একই সঙ্গে পাঠ করা উচিত। দুটির বিষয়ই ভিখিরি ও তাদের জীবনবৃত্ত। কবিতাদুটির রচনা চল্লিশের দশকে। উত্তর তিরিশ থেকে বাংলা কবিতায় একটি ভিন্ন নতুন স্বর শোনা যাচ্ছিল, তা ছিল কল্লোলের কাল থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে যত সর্বগ্রাসী, স্বার্থান্ধ, অশুভ ও সংহারক ঘটনা — শ্রমজীবী মানুষ তো কোন্ ছার, সাধারণ মানুষের শুভাশুভের যাবতীয় ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে হানাহানি ও ধ্বংসের ব্যাপক তাণ্ডবের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, কাব্যে ও গদ্যে ধরা পড়ছে এরই মধ্যে এদেশে শুরু হল এক নতুন বিপর্যয়—মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর—মারী, দারিদ্র্য, মানবতার ক্ষয় ও মৃত্যুর চলচ্চিত্র। এ সব ঘটনার ছায়া পড়েছিল তৎকালীন বাংলা কবিতায়। কবিরা যেন বাধ্য হয়েই সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিরিশের কবিরাও তখন পারিপার্শ্বিকের দাবি মেনে সংগ্রাম, সাম্যবাদ ও গণচেতনার কবিতা লিখলেন। বিষ্ণু দে সরাসরি চলে এলেন সাম্যবাদের পথে, সুধীন্দ্রনাথ রাজনীতি মনস্ক নৈরাশ্যবোধের কবিতা লিখছেন। এমনকী বুদ্ধদেব বসুও লিখছেন, ‘এবার তবে ঝড়’ কবিতা। ফ্যাসি-বিরোধী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে অনেকেই মিলিত হলেন, লিখলেন, ‘কেন লিখি’র মতো সাহিত্যিক অঙ্গীকার।

জীবনানন্দের ‘ঝরা পালক’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘রূপসী বাংলা’ ও ‘বনলতা সেন’-এর কবিতাগুলি রচনার সমকালে এমন কতকগুলি কবিতা তিনি লিখলেন যা চরিত্রে ও উপস্থাপনায় ভিন্নতর। (১৯৪১-১৯৪২) মহাপৃথিবী ও (১৯৩৯-৪৩-এ) কয়েকটি ব্যতিক্রম সহ ‘সাতটি তারার তিমির’-এর কবিতাগুলি লেখা। এখানে জীবনানন্দ ভিন্ন ধারায় এগিয়েছেন—জটিল, বিপন্ন, নিষ্ঠুর এই সমাজপ্রেক্ষিতে তিনি কলকাতার মতো মহানগর, রাত্রি, ফুটপাথ, গ্যাসলাইট, লঙ্গারখানা, গলি, হাইড্রান্ট, করাত প্রভৃতির অর্থবহ তির্যক বাগ্‌বিন্যাসে।

বনলতার ‘ভিখিরি’ রচনাকাল মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। এটি জীবনানন্দকে নিদারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। যুদ্ধ, কালোবাজারি, ঠিকাদার, দালাল, দুর্নীতি, বঞ্চনা, ভয় ও অভাবের সব কটি উপসর্গ সমাজ জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে, কবি গ্রামীণ জীবনের নিসর্গ তন্ময়তা ও ইন্দ্রিয়চেতনা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দ্বিখণ্ডিত দেশে নাগরিক অস্থিরতার মানুষকে খুঁজছেন, তখন শুধু জীর্ণ, ক্ষীণ-দুর্বল, অসহায়, ক্ষুৎপীড়িত কঙ্কালসার মানুষগুলো ও তাদের দুঃসহ জীবনই শুধু নজরে আসছে। বনলতা সেন-এর ‘ভিখিরি’ তারই কাব্যময় প্রতিচ্ছবি।

যুদ্ধ ও ঝড়ে সর্বস্ব হারানো মানুষ জীবনের দাবিতে ভিক্ষাবৃত্তিকেই শেষ আশ্রয় করেছিল। তাদের অবিরাম অনুনয়ের কান্না, কলার নিচ থেকে, পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা দীর্ঘ আর্তনায় শুনতে শুনতে একটা কষ্ট গলার কাছে উঠে আসে। বাড়িতে, প্রতিবেশীদের দরজায় পথে ঘাটে এই কান্না শুনতে শুনতে সাধারণ নষ্ট ও মমতার বোধও ভোঁতা হয়ে যায়। সংবেদনশীল কবি হৃদয় এ অবস্থা মানতে পারেনি। তাই সেই অবক্ষয়ের ছবি উঠে এসেছে ‘ভিখিরি’ কবিতায়। জীবনানন্দও সহসা রোমান্টিকতা থেকে বাস্তব অবক্ষয়ের ছবিতে এসে পৌঁছে গেলেন।

দুর্দৈবে শহর ঢুঁড়ে একটি পয়সা তথা, সামান্যতম প্রাপ্তিও জীবনের কাছে মহামূল্যবান। আরেকটি আগামী দিনের সঞ্চয়, জীনের আশার আলো, তদতিরিক্ত প্রাপ্তি তো বাঁচবার আশ্বাস। আর এই আশ্বাস থেকেই আগামী যে কোনো সংস্কারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার সঙ্কল্প—''অন্ধকারে হাত' বাড়ানো ও 'তাঁত বুনে যাওয়া'র বাসনা সম্ভব কিন্তু সেখানেও অপেক্ষমান অক্ষম 'নুলো শাঁখারির' করাত। দ্বিতীয় স্তবকে ওই প্রাপ্তির শেষে যে-কথাটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হল স্বচ্ছল সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা ছাড়া জীবনে প্রার্থিতকে পাওয়া যায় না।

প্রতিকূল পরিবেশে শত হতাশার মধ্যেও যে জীবনে আশার আলোকবর্তিকা থাকে এবং আছে বলেই মানুষ বাঁচে, বাঁচতে চায় এই পরম সত্যটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য।

বনলতার ভিখিরির পাশাপাশি সাতটি তারার তিমির-এর লঘু মুহূর্ত কবিতায় 'তিনটি আধো আইবুড়ো ভিখিরি' ও এক ভিখিরিনীর উল্লেখ আছে। এখানে কবিতাটিতে অধিবাস্তবতার আভাস আছে। তাই বনলতার সমান্তরাল চরিত্র হিসেবে এদের গণ্য করা ঠিক হবে না। তবে তুলনায় প্রতিতুলনায় দুটি কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। 'ভিখিরি' ও 'লঘু মুহূর্তে' ভিখিরির বর্ণনা আছে। ভিখিরি উচ্চারণে পাঠক মনে একটি সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এমন কিছু মানুষ যাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, আইবুড়ো তাই জীবনের স্বপ্নও নেই। দুটি ক্ষেত্রেই এ বক্তব্য প্রায় সমান। প্রথম কবিতার জন আহেরিটোলা বাদুড়বাগান মাঠকোঠা ঘুরে পাথুরিয়াঘাটা যায় পয়সার খোঁজে, আর শেযোক্তদের অন্ন জোটে না বলে তারা বায়ুভূক হয়ে থাকে—এক গাল ধূসর বাতাস খায়, তাতেই আচমন করে আর রঙিন নদী আর সব অসম্ভবের কল্পনা করে। বনলতা সেন—এর 'ভিখিরি' প্রাপ্তির আনন্দে স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু হীন চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়েছে। এখানে প্রাপ্তিটিই ঘটেনি। বায়ুভূক ও অসম্ভবের কল্পনাতেই তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে দেখি, স্বপ্নের দেশে কল্পনার জগতে যাওয়ার আগে তারা চা-পান করতে করতে নিজেদের রাজা উজির কোটাল ভাবছে। এই সামান্য প্রাপ্তিতেই তারা তৃপ্ত উচ্ছ্বসিত। জুটে যায় এক ভিখিরিনীও। চায়ের আসরে তিনজন প্রতিবন্ধী তাকে আপনার করে নেয়।'' ''মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কান''। তাদের হৃদয়ের এই ঔদার্য কিন্তু নেই সমাজের অন্যদের মধ্যে, তারা ভিখিরির সঙ্গো আত্মিক যোগ অনুভব করে না।

দু স্তবকের ভিখিরি এবং দুটি স্তবকের 'লঘুমুহূর্ত' কবিতার ভিখিরি ও এক ভিখিরিনীর মধ্যে সমাজ বাস্তবতার দুটি ছবিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষায় তুলে ধরেছেন। প্রথমটির পাঠক চিত্তে সরাসরি আবেদন সৃষ্টি করলেও, ব্যঞ্জনায় সে কবিতায় বক্তব্যকে বুঝে নিতে হয়। 'লঘু মুহূর্ত'-এ সর্বস্ব হারানো তিনজন মানুষের জীবনের রূঢ় বঞ্চনাকে সহনীয় করতে তাদের মত্ততার একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আর সেই সুযোগে তাদের মুখে অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন বাক্য সমাবেশ, অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ, স্বচ্ছতাহীন জীবনযাপনের পরিচয় অর্থবহ, ব্যঞ্জনাগর্ভ, তির্যক বাগ্‌বিন্যাসে, ব্যঙ্গো শ্লেষে তুলে ধরেছেন। কবি এর মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি অবিচারের স্বরূপটি বিশৃঙ্খল শব্দ ও বাক্যসজ্জা প্রতিফলিত করে যুগের বিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গাতিকে প্রকাশ করেছেন। দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ ভিখিরি জীবনের প্রাণধারণের যন্ত্রণাকে এক শিল্পময় রূপ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ছন্দে যে অসামান্য বৈচিত্র্য এনেছেন, তার পরিয় আছে 'বলাকা'র ছন্দে। সে ছন্দও কালক্রমে মুক্তি পেয়েছে 'লিপিকা'র গদ্য ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বলা যায় কাব্যের গণ্ডির শৃঙ্খল ভেঙেছে। সেই ঐতিহ্য নিয়ে 'বলাকা' আর 'লিপিকা'র গদ্যছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনানন্দ তাঁর কবিতাগুলিকে প্রবহমান

পয়ারের নতুন ধরনের পরীক্ষা করেছেন। সে পরিচয় আছে ভিখিরি কবিতাতেও।

একটি পয়সা আমি / পেয়ে গেছি আহিরীটোলায় / ৮ + ১০
একটি পয়সা আমি / পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে / ৮ + ১০
একটি পয়সা যদি / পাওয়া যায় আরো— / ৮ + ৬
তবে আমি হেঁটে চলে / যাব মানে মানে। / ৮ + ৬

—প্রথম চারটি ছত্র বিন্যাসে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে, আকৃতি মহাপায়ারে হলেও, জীবনানন্দ শেষ দুটি ছত্রে বৈচিত্র্য এনেছেন।

পরবর্তী তিনটি ছত্রের বিন্যাসে—

৮ + ৬ — বলে সে বাড়ায়ে দিল / অন্ধকারে হাত /
১০ + ৮ + ৮ আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে / এক কানা যেন বুনে / চেয়ে চেয়েছিল তাঁত
৮ + ১০ তবুও তা নুলো শাঁখারীর / হাতে হয়েছে করাত।

কবিতার সমগ্র ছত্র সজ্জায় মধ্যে মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির অনুসরণ করেও যে অসামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়, তা দেখিয়েছেন।

কবিতার শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগে সহজ গদ্যভঙ্গি এবং দৈনন্দিনতার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে, আহিরিটোলা, বাদুড়বাগান যেমন এসেছে তেমনি দেশি 'নুলো', 'ঢেঁকি' ইংরেজি গ্যাসলাইট, হ্যারিস রোড প্রভৃতি শব্দ যোজনা একালের কবি ও কবিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না।

অনুশীলনী — ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১০০ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় নির্দেশ অনুসারে ৫.১২ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদি বাস করে বারবার পড়ুন। তাহলেও উত্তর করতে পারবেন।

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আগাগোড়া ___________ নিয়ে এক ___________ যেন বুনে যেতে চেয়েছিল ___________, তবুও তা ___________ ___________ হাতে হয়েছে ___________।

(খ) ভিড়ের ভিতরে তবু ___________ ___________ আরো গভীর ___________ এক ___________ ভুল ; ___________ ভুলে ; এক পৃথিবীর ___________।

(গ) 'ভিখিরি' কবিতা ___________ পত্রিকায় ___________ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ___________ কাব্যগ্রন্থের ___________ সালের সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

২। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

(ক) ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি —
১। প্রকৃতি প্রেমের কবিতা
২। প্রেমের কবিতা
৩। অধিবাস্তববাদী কবিতা

(খ) ‘বিড়াল’ একটি —
১। নীতি-কবিতা
২। গীতি-কবিতা
৩। সুররিয়ালিস্ট কবিতা

(গ) জীবনানন্দ দাস রচিক কাব্যগ্রন্থ —
১। সংবর্ত
২। হেমন্ত গোধূলি
৩। বেলা অবেলা কালবেলা

৩। দুটি তালিকার একটিতে কবির অপরটিতে কাব্যের নাম আছে—কবির নামের পাশে কাব্যের সঠিক নাম লিখুন।

রবীন্দ্রনাথ	—	কুহু ও কেকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	—	চোরাবালি
নজরুল ইসলাম	—	বন্দীর বন্দনা
মোহিতলাল মজুমদার	—	মরীচিকা
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	—	অর্কেস্ট্রা
প্রেমেন্দ্র মিত্র	—	পারাবার
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	—	ঝরাপালক
বিষ্ণু দে	—	প্রথমা
জীবনানন্দ	—	হেমন্ত গোধূলি
অমিয় চক্রবর্তী	—	বলাকা
বুদ্ধদেব বসু	—	অগ্নিবীণা

৪। ‘ভিখিরি’ কবিতাটি পড়ে আপনার যে ধারণা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। ‘ভিখিরি’ কবিতার ছন্দ-বৈচিত্র্যটি বুঝিয়ে দিন।

৫১.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ক) বিম্বিসার, অশোকের, বিদর্ভ, নগরে।

খ) শিশিরের, শব্দের, সন্ধ্যা, রৌদ্রের গন্ধ।

গ) ‘বর্ষ আবাহন’, ব্রহ্মবাদী, ১৩২৬।

ঘ) ১৮৯৯, ১৯৫৪।

ঙ) বিদ্রোহ, দুঃখবাদ, দেহবাদী, আবহ।

২ এবং ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.২ অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

৪। ‘উত্তরা’ ও ‘প্রগতি’ পত্রিকা।

৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে।

৬। ‘দ্রোপদীর শাড়ী’, ‘শীতের প্রার্থনা’, ‘বসন্তের উত্তর’।

৭। দৈনিক স্বরাজ।

৮। মোট ৫৯৯ টি।

৯। কবি জীবনানন্দ দাশ।

১০। ১৩৪৯ সাল, ইং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।

১১। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.৬ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেটি একটি ভালো করে পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

১। ক) মাছের, কাঁটার শাদা, কঙ্কালের, মৌমাছির নিমগ্ন।

খ) জাফরান, নরম, শরীরে, শাদা, খেলা।

গ) ১৯২৬-১৯৩৬, কবিতায়, ১৩৪৩।

ঘ) সুররিয়ালিস্ট, পরাবাস্তব, অধিবাস্তববাদী।

ঙ) যুক্তিহীন, বস্ত্র, অচেতন, মগ্ন, সুররিয়ালিজমের।

২—৪ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.৯ অংশটি বার বার পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী—৩

১। ক) শরীরটা, তাঁত ; নুলো, শাঁখারীর, করাত।

খ) হ্যারিসন, রোডে, অসুখ, পৃথিবীর, ভিখিরির, ভুলচুক।

গ) নিরুক্ত, ১৩৪৭, ‘বনলতা সেন’, ১৩৬১.

২। ক) প্রেমের কবিতা, খ) সুররিয়ালিস্ট কবিতা, গ) বেলা অবেলা কালবেলা

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ বলাকা ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কুহু ও কেকা ; নজরুল ইসলাম ঃ অগ্নিবীণা ; মোহিতলাল মজুমদার ঃ হেমন্ত গোধূলি ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ মরীচিকা ; প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ প্রথমা ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা ; বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি ; জীবনানন্দ ঃ ঝরাপালক ; অমিয় চক্রবর্তী ঃ পারাবার ; বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা।

৪ নং এবং ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ৫১.২ সারাংশটি ভালো করে পড়ে তৈরি করুন।

৫১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)—জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ।

২) অম্বুজ বসু—একটি নক্ষত্র আসে।

৩) ড. শুদ্ধাসত্ত্ব বসু—কবি জীবনানন্দ।

৪) সঞ্জয় ভট্টাচার্য—কবি জীবনানন্দ দাশ।

৫) অরুণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ।

৬) ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।

৭) প্রভাতকুমার দাস—জীবনানন্দ দাশ।

৮। পবিত্র মুখোপাধ্যায়—সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ।

৯। অনুষ্টুপ ঃ জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—১৪০৫।